সীরাতুল মুস্তফা সা.
১ম খন্ড
আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.)

সীরাতুল মুস্তফা (সা)

প্রথম খণ্ড

মূল

আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র)

কালাম আযাদ অনূদিত

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সীরাতুল মুস্তফা (সা) (১ম খণ্ড)
মূল : হযরত আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র)
কালাম আযাদ অনূদিত

অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ২৪৯/১
ইফা প্রকাশনা ২১৭১/১
ইফা গ্রন্থাগার ২৯৭.৬৩
ISBN 984-06-0819-3

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০০৪

দ্বিতীয় সংস্করণ
আষাঢ় ১৪১৭
রজব, ১৪৩১
জুন ২০১০

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
নূরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ হালিম হোসেন খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য ঃ ১১০.০০

SEERATUL MUSTAFA (SM) written by Hazrat Allama Idris Kandlavi (R.) in Urdu, translated by Kalam Azad in Bangla and published by Director, Translation and Compilation Dept. Islamic Foundation Agargaon, Sher-e-Bangla nagar, Dhaka-1207, Revised 2nd Edition June, 2010.

Website : w w w. islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@ islamicfoundation-bd.org

Price : Tk. 110,00 US Dollar : $ 3.25

সূচিপত্র

মহাপরিচালকের কথা

আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে গোটা মানব জাতির জন্য উত্তম আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন :

بُعِثْتُ مُعَلِّمًا "আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।"

মহানবী (সা)-এর জীবন এক মহাসমুদ্রের মত। তিনি যদিও পৃথিবীতে মাত্র ৬৩ বছর জীবিত ছিলেন কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্মের আলোচনা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি হয়েছে। তবুও মানুষের জন্যে খোদায়ী জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণতা ও পরিসমাপ্তি একমাত্র তারই মাধ্যমে ঘটাতে তাঁর সীরাত বা জীবনী চর্চার প্রয়োজন বর্তমানে আরো অধিক।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সব ভাষায়ই মহানবী (সা)-এর সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষের তথ্য অনুযায়ী শুধু বাংলা ভাষায়ই বিগত কয়েক শ' বছরে পাঁচ শ'-এর অধিক সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

'সীরাতুল মুস্তফা (সা.)' শিরোনামে এই প্রসিদ্ধ সীরাত গ্রন্থটি রচনা করেছেন মুসলিম বিশ্বের সুবিখ্যাত আলিম শায়খুত তাফসীর আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (রহ.)। তিনি হাদীস ও তাফসীরের মূলগ্রন্থ সমূহে বর্ণিত সীরাত বিষয়ক সকল রিওয়ায়াত তুলে ধরেন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যাসহ অত্যন্ত পারদর্শিতার সাথে উপস্থাপন করেন। আর এ কারণে আলিম উলামাসহ সর্ব স্তরের পাঠকের কাছে গ্রন্থটি বিপুল গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে আসছে। উর্দূ ভাষায় তিন খণ্ডে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি প্রথম খণ্ড অনুবাদ করেছেন কালাম আযাদ। আমরা লেখক ও অনুবাদকসহ গ্রন্থটি প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের যাবতীয় প্রকাশনা কে কবুল করুন। আমিন।

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

পরিচালকের কথা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বিশ্বজগতের জন্য মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক অনন্য আশিস্—রাহ্মাতুল্লিল আলামীন। তাওহীদের আলোকময় বাণীর অবিনাশী ঝাণ্ডা নিয়ে তিনি অজ্ঞানান্ধ ও সত্যভ্রষ্ট মানুষকে আহ্বান করেন সত্যের পথে, কল্যাণের পথে; শান্তি, সাম্য, মানবতা ও সৌভ্রাতৃত্বের পথে। আল্লাহ্র প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাঁর অসাধারণ চরিত্র-মাধুর্য, সততা-নিষ্ঠা, আমানতদারি— সর্বোপরি পরিপূর্ণ তাকওয়াসমৃদ্ধ কল্যাণকর এক আদর্শ মানব সমাজ গঠনে তাঁর অসাধারণ সাফল্য বিশ্ব ইতিহাসের শীর্ষতম স্থানে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। প্রখ্যাত মনীষী এডওয়ার্ড গীবন তাঁর 'দি ডিক্লাইন এন্ড দি ফল্ অব দি রোমান এম্পায়ার' নবী মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"আরবীয় পয়গাম্বরের মেধা, তাঁর জাতির আচার-আচরণ এবং তাঁর ধর্মের প্রাণশক্তি প্রাচ্য সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ এবং আমাদের দৃষ্টি অন্যতম প্রধান স্মরণীয় একটি বিপ্লবের দিকে অভিনিবিষ্ট, যা বিশ্ব জাতিসমূহের ওপর এক নতুন ও স্থায়ী বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে। মহানবী (সা) বিশ্ব মানবের, বিশ্ব সমাজের ওপর 'সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী' এক মহান মানুষ মহান পয়গাম্বর।

মানবমুক্তির মহান দিশারী সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আলোকোজ্জ্বল জীবনাদর্শ বিশ্ব মানবের সামনে অনির্বাণ প্রদীপ শিখার মতো যুগ যুগ ধরে পথনির্দেশনা দিয়ে চলেছে কোটি কোটি মানুষকে। সেই আদর্শ আজও যেমন আমাদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়, ভবিষ্যতেও তেমনি নিজের অনন্য অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যে চির প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অম্লান জীবনাদর্শ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে অগণিত সীরাত গ্রন্থ। আরবী, উর্দু, ফারসি, ইংরেজিসহ পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় রচিত এ সকল সীরাত গ্রন্থ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা-বিশ্লেষণ, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বৈচিত্র্যধর্মী উপস্থাপনা-নৈপুণ্যে ভাস্বর এবং স্ব-বৈশিষ্ট্য স্বমহিমায় উজ্জ্বল। এ কারণে মহানবী (সা)-এর মহাসমুদ্রতুল্য জীবন ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানতে হলে বিভিন্ন ভাষায় রচিত সীরাত গ্রন্থসমূহ পাঠ করা অত্যন্ত জরুরী।

এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষায় রচিত বিখ্যাত সীরাত গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে আসছে। এই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, আলিম আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র) কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত মূল্যবান সীরাত গ্রন্থ 'সীরাতুল মুস্তফা (সা)' অনুবাদ ও প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। বইটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। বিশিষ্ট আলিম ও লেখক কালাম আযাদ কর্তৃক অনূদিত প্রথম খণ্ডটি ২০০৪ সালে এ বিভাগ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

'সীরাতুল মুস্তফা (সা)' বইটি যেমন তথ্য বহুল, তেমনি সুলিখিত ও সুঅনূদিত। এ কারণে প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই এর দু'টি সংস্করণের সকল কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এটি পুনঃ সম্পাদিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমরা আশাকরি, বইটি আগের মতোই পাঠকবৃন্দের সমাদর লাভ করবে।

আল্লাহ্ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

নূরুল ইসলাম মানিক

পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সীরাতুল মুস্তফা (সা)

প্রথম খণ্ড

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত কুতুবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আশরাফ আলী সাহেব থানভী (কু. সি.)-এর

বরকতময় বাণী

بِسمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

.দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الْعَلِیِ الْحَکِیْمِ وَالصَّلٰوۃُ عَلٰی نَبِیِّہٖ ذِیْ خُلُقٍ عَظِیْمٍ

"মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সমস্ত প্রশংসা এবং মহান চরিত্রের অধিকারী, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নেতা, নবী (সা)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম।"

অতঃপর আহকার আশরাফ আলী থানভীর আরয, এই 'সীরাতুল মুস্তফা' (সা) শীর্ষক গ্রন্থের নিম্নোক্ত অংশটি স্বয়ং বিজ্ঞ লেখক ইলম ও আমলের বিশেষ অধিকারী মৌলবী হাফিয ইদ্রিস আলী কান্ধলভী (র)-এর মুখ থেকে শুনেছি। শ্রবণ মুহূর্তে এ দৃশ্যই সামনে পুরোপুরি ভেসে উঠেছিল :

یَزِیْنُكَ وَجْهُهٗ حُسْنًا اِذَا مَا زِنْتَهٗ نَظَرًا

"তার চেহারার সৌন্দর্য তোমার দ্বারা বৃদ্ধি পাবে, যখন তার প্রতি বেশি বেশি দৃষ্টিপাত করা হবে।"

অংশটি এরূপ প্রথম ভূমিকা, দ্বিতীয়, ওহী নাযিলের বর্ণনা, যাতে সৎ স্বপ্নকে নবূয়াতের অংশ সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এর তত্ত্ব তাৎপর্য; তৃতীয়, নাজ্জাশীর দরবারে হযরত জা'ফর (রা)-এর ভাষণ, চতুর্থ, আসহাবে সুফফার বর্ণনা, পঞ্চম নবী-রাসূল (আ)-গণের নবূয়াত পদে ভূষিত হওয়ার পূর্বেও পূত-পবিত্র ও মাসূম থাকা প্রসঙ্গসহ জীবনী গ্রন্থের জন্য যত আবশ্যকীয় বিষয় প্রয়োজন, মা-শা আল্লাহ্, তা বিশেষভাবে পূর্ণ করা হয়েছে। তাঁকে আল্লাহ্ উত্তম প্রতিদান দান করুন।

কোন কোন স্থানে এ অধম হালকাভাবে কিছু পরামর্শও দিয়েছিল যা বিজ্ঞ সংকলক আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছেন—এটা তাঁর সুবিবেচনা ও একনিষ্ঠতার প্রকাশ্য প্রমাণ। গ্রন্থটির প্রতিটি অংশই এমন চিত্তাকর্ষক যে :

زفرق تابہ قدم ہر کجاکہ مع نگرم

کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا ایں جاست

"আপাদ মস্তক যেখানেই তাকাই, কারিশমা অন্তরের আঁচল ধরে টেনে বলে, জায়গা এখানেই।"

যদি আমার সময় ও শক্তি থাকত তবে আমি এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনতাম; কিন্তু দুর্বলতা ও সময় সংকীর্ণতাহেতু এ ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারিনি। আশা করি, কিতাবের বাকী অংশও ইনশা আল্লাহ্ وَ للاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى (পূর্বের চেয়ে পরবর্তীই তোমার জন্য উত্তম)-এর নমুনা হবে।

অতঃপর আমি ঐ বিজ্ঞ লেখককে উদ্দেশ্য করেই এ বিষয়ের উপর একটি বিশেষ পরামর্শ, আর একটি সাধারণ পরামর্শ ও দু'আর দ্বারা আমার বক্তব্য শেষ করছি। বিশেষ পরামর্শ হলো এই যে, উল্লিখিত বিষয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে আমার احسن التفهيم لمقولته এর সায়্যেদুনা ইবরাহীম (আ)-এর বর্ণনা (যা ইমদাদুল ফাতাওয়ার অংশ হিসেবে এর পঞ্চম অধ্যায়ে পৃ. ৪০৮ থেকে ৪১২-তে মুদ্রিত হয়েছে) সঙ্গতিপূর্ণভাবে হুবহু বা সার-সংক্ষেপ এর সাথে সংযুক্ত করে দেয়া যায়—যা এক উত্তম সংযোজন হবে।

সাধারণ পরামর্শ হলো সার্বজনীনভাবে সাধারণ লোকদের জন্য, যারা উর্দূ ভাষায় সাধারণ জ্ঞান রাখেন, তারা যেন এ কিতাব পাঠ থেকে বঞ্চিত না হন। এর সবচেয়ে উত্তম ও সহজতম উপকারিতা হবে এই যে, নিজ শ্রদ্ধাস্পদ পয়গাম্বর (সা)-এর প্রয়োজনীয় পরিচিতি অর্জিত হবে। এতে করে সঙ্গতভাবে ওয়াদাকৃত জান্নাত আপনার নসীব হবে—আর এটা উত্তম নিয়ামত হওয়ার ব্যাপারে কি কারও দ্বিমত থাকতে পারে?

আর দু'আ হলো, আল্লাহ্ তা'আলা গ্রন্থটির লেখককে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য, পার্থিব ও পারলৌকিক বরকত দান করুন এবং এ গ্রন্থটিকে গ্রহণযোগ্য ও কল্যাণকর করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

থানা ভবন, ৫ শাওয়াল, ১৩৫৮ হি. **আশরাফ আলী**

গ্রন্থকারের ভূমিকা

بِسمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالصَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْاَ نْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِه وَاَصْحَابِه وَاَزْوَاجِه وَذُرِّيَّاتِه اَجْمَعِيْنَ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক ও মুত্তাকীদের শেষ আশ্রয়। দরূদ ও সালাম আমাদের নেতা, আমাদের পরম অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর প্রতি, যাঁর মাধ্যমে নবী-রাসূলগণের নবূয়াতী ধারার পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে আর দরূদ ও সালাম তাঁর সমস্ত সাহাবী, সহধর্মিণী ও বংশধরগণের প্রতি।"

আমি গুনাহগার মুহাম্মদ ইদ্রিস কান্ধলভী, (যে আল্লাহর জন্য নিবেদিত এবং আল্লাহ যার জন্য যথেষ্ট) সকল শ্রেণীর মুসলমানের প্রতি আরয এই যে, কোন মুসলমানের জন্য নিজেকে জানা ততোটা আবশ্যকীয় নয়, যতোটা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানা আবশ্যক। যে ব্যক্তি মুহাম্মদ রাসূল (সা)-কে জানে না, সে তার ঈমান ও ইসলামকে কিভাবে জানবে ? মু'মিন তার ঈমানী অস্তিত্বের জন্য সরাসরি পয়গাম্বরের অস্তিত্বের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্ মাফ করুন, যদি পয়গাম্বর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়া হয়, তবে এক মুহূর্তের জন্যও মু'মিনের ঈমানী অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকতে পারে না। এ কারণেই ইরশাদ হয়েছে :

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ "মু'মিনদের নিকট নবী তাদের আপন সত্তা অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর।"

(সূরা আহযাব : ৬)

কেননা মু'মিনের অস্তিত্ব নবূয়াতী সূর্যের একটি সাধারণ প্রতিচ্ছায়া, প্রতিবিম্ব। আর এটা স্পষ্ট যে, প্রতিবিম্বের মূল উৎস সূর্যের সাথে তার যেই নৈকট্য, আয়নার দ্বারা তা ঘনিষ্ঠ নয়। মু'মিনের নিকট যে ঈমান, তা নবীর মাধ্যমেই এসেছে। কাজেই বুঝা যায় ঈমান নবীর নিকটবর্তী আর মু'মিন থেকে দূরবর্তী। এটা এ জন্যে যে, নবী ঈমানের সাথে প্রকৃতিগতভাবে একীভূত আর মু'মিন ঈমানের সাথে মাধ্যম দ্বারা

সম্পৃক্ত। কাজেই মু'মিনের জন্য নিজেকে এবং নিজের ঈমানকে জানার আগে নবী (সা)-এর জীবন সম্পর্কে অবগতি লাভ অত্যাবশ্যক; যাতে সে নিজে ঐ পথে চলতে পারে এবং অপরকেও চলার আহ্বান জানাতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা হূদ-এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রেরিত নবী-পয়গাম্বরগণের অবস্থা ও ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। অবশেষে এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কেন নবী-পয়গাম্বর (আ)গণের অবস্থাদি বর্ণনা করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে :

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاۤءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ وَجَاۤءَكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

"রাসূলগণের যে সমস্ত বৃত্তান্ত আপনার কাছে বর্ণনা করছি, এসব দ্বারা আমি আপনার চিত্তকে সুদৃঢ় করি, এ সবের মাধ্যমে আপনার কাছে সত্য এসেছে এবং মুমিনদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধান বাণী।" (সূরা হূদ : ১২০)

অর্থাৎ এসব ঘটনা অবহিত হয়ে যেন তোমরা (কুরআনে বর্ণিত) প্রশান্ত চিত্তের অধিকারী হতে পারো, তোমাদের অন্তরে ঈমান স্থির ও প্রতিষ্ঠিত থাকে, সত্যের উপর থাকতে পারো অটল, অবিচল। আর এগুলো শুনে তোমাদের শিক্ষা ও উপদেশ লাভ হয়। বরং পবিত্র কুরআনের অনেক সূরাই নবীদের নামে নামকরণ করা হয়েছে—যাঁদের জীবনধারাও সূরাগুলোতে আলোচিত হয়েছে। যেমন সূরা ইউনুস, সূরা হূদ, সূরা ইউসুফ, সূরা ইবরাহীম ইত্যাদি। আর সূরা লুকমান এবং সূরা কাহফ হযরত লুকমান (আ) ও আসহাবে কাহফের নামে নামকরণ করা হয়েছে। এর দ্বারা অনুমিত হয় আম্বিয়া, উলামা ও সৎকর্মশীল বান্দাদের জীবন বৃত্তান্ত ও ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রাখা কত জরুরী। জীবনী দ্বারা মহানবী (সা)-এর সুমহান মর্যাদা, ফযীলত ও কামালিয়ত সম্পর্কে জানা যাবে; আর সাথে সাথে রাসূল (সা)-এর সাহাবা (রা)-দের গুণাবলী ও কামালিয়াতও অবহিত হওয়া যাবে। এতে ঈমান শক্তিশালী হবে ও ঈমানের প্রবৃদ্ধি ঘটবে। এ সাথে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত ও মহানবী (সা)-এর হাদীসের অর্থ ও তাৎপর্য জানা যাবে। যে ব্যক্তি ঈমান পোষণ করে না, এ জীবনী গ্রন্থ পাঠে তার সীরাতে নববী সম্পর্কে জ্ঞান হবে, ঈমান ও সত্যের গুরুত্ব সে উপলব্ধি করবে। পূর্ববর্তী উম্মতগণ নিজেদের নবী এবং বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায় নিজেদের বড় বড় নেতাদের জীবনী ও ইতিহাস লিখেছেন কিন্তু সবই অসম্পূর্ণ। যে সব সম্প্রদায়ের অবস্থা এই যে, তারা যেই গ্রন্থকে আসমানী কিতাব ও মহান আল্লাহ্র বাণী বলে মনে করে সেটিও তাদের কাছে সংরক্ষিত নেই। আর তাদের এটাও জানা নেই যে, এ বাণী কার প্রতি নাযিল হয়েছে, কোথায় এবং কিভাবে নাযিল হয়েছে। তারা যাঁদেরকে আপন নেতা ও পথিকৃৎ বলে মনে করে, তাঁদের কবরের ঠিকানাও তাদের জানা নেই। এ সব সম্প্রদায় নিজেদের নেতার পরিপূর্ণ জীবনী ও ইতিহাস কিভাবে উপস্থাপন করবে? গোটা জীবনের ঘটনাবলী ও ইতিহাস তো অনেক বড় কথা, তারা তাদের

নেতাদের একটি বাণীও এভাবে উপস্থাপনে সক্ষম নয়, যার পরম্পরা বর্ণনা লতিকা প্রামাণ্য সূত্রসহ তাদের নেতা পর্যন্ত সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ রয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ্। এ মর্যাদা কেবল উম্মতে মুহাম্মদী (তাঁর ও তাঁর সাহাবা কিরামের প্রতি সহস্র দরূদ ও সালাম) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তারা তাদের পয়গম্বর (সা)-এর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ সনদের মাধ্যমে উপস্থাপন করে থাকে। এরা কেবল এরাই এমন এক উম্মত, যারা নিজেদের নবীর সাথে সুসম্পর্কিত। নবী (সা)-এর যামানা থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত এক মুহূর্তও এমন কাটেনি, যে সময়টুকুতে নিজেদের নবী থেকে এ উম্মত বিচ্ছিন্ন হয়েছে। মহানবী (সা)-এর প্রকৃত সীরাত তো হাদীসসমূহ। কিন্তু পূর্ববর্তী আলিমদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেবল ছোট-বড় যুদ্ধ-বিগ্রহ ও এর ঘটনা সমষ্টিকেই সীরাত বলা হতো। মূলত আটটি জ্ঞানের সমষ্টি হচ্ছে হাদীস, আর সীরাত হচ্ছে এর একটি অংশমাত্র।

سیر آدب و تفسیر و عقاید فتن اشراط و احکام و مناقب

"সীরাত, আদব, তাফসীর, আকাইদ, ফিতান, আশরাত, আহকাম, মানাকিব।"

কিন্তু বর্তমানে 'সীরাত' শব্দ জীবন বৃত্তান্ত অর্থে আলাদা ব্যবহৃত।

মুহাদ্দিসগণ মহানবী (সা)-এর বাণী ও কর্মের বস্তুনিষ্ঠতা সহকারে প্রাপ্তির মাধ্যমে ওগুলো চুলচেরা বিশ্লেষণের যে সব নিয়ম-বিধি নির্ধারণ করেছেন এবং সহীহ ও দুর্বল পরিচিতির যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন, তা কোনরূপ পার্থক্য বা নির্দিষ্ট ব্যতিক্রম ছাড়াই সর্বতোভাবে সর্বাস্থানে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং যে কোন হাদীসই, সেটা আহকাম তথা বিধি-বিধান সম্পর্কিত হোক, অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা দণ্ডবিধি, তাঁর সকল কথা ও কর্ম এ মানদণ্ডেই যাচাই করা হয়েছে। অবশ্য যেসব হাদীসে দীনের মূল নীতি নিহিত, যেমন আকাইদ হালাল-হারাম ইত্যাদি। এসব হাদীস সনাক্তের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ অধিক কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। আর যেসব হাদীস দীনের মূল নীতি-সম্পৃক্ত নয়, যেমন ফযীলত ইত্যাদি; সেখানে এ মানদণ্ডে কিছুটা শিথিলতা অবলম্বন করা হয়েছে। কারণ এখানে বিশেষ কোন কর্মের অবগতিই উদ্দেশ্য। কাজেই এখানে শৈথিল্য প্রদর্শনই যথার্থ। যেমন ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

اذَا رَوَيْنَا فِى الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ تَشَدَّدْنَا وَ اذَا رَوَيْنَا فِى الْفَضَائِلِ تَسَاهَلْنَا

"যখন আমরা হালাল-হারাম বিষয়ক বর্ণনা করি, তখন যাচাই-বাছাইয়ে কঠোরতা অবলম্বন করি; কিন্তু ফাযাইলের বিষয় বর্ণনায় এ ব্যাপারে নমনীয়তা অবলম্বন করি।"

মোটকথা, হাদীসের প্রমাণ সূত্রের সহীহ ও দুর্বল হওয়ার বিষয়টি নির্ধারণ করার যে মানদণ্ড এবং যে নিয়মাবলী আহকাম বা আইন-কানুন সম্পর্কিত হাদীস বাছাইয়ে অনুসরণ করা হয়, তা-ই মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) এবং সীরাতের হাদীসেও যথার্থতা

নির্ণয়ের একই নীতি অনুসরণ করা হয়। একই মানদণ্ডে সব ধরনের হাদীসই যাচাই-বাছাই করা হয় এবং তদনুযায়ী হাদীসের সহীহ্ বা দুর্বল অবস্থা চিহ্নিত করা হয়।

যেই মুহাদ্দিসগণের হাদীস সংকলন সহীহ্ বলে খ্যাত, তার সব ধরনের হাদীস—চাই তা আইনবিধি সংক্রান্ত হোক অথবা যুদ্ধ বিষয়ক কিংবা ফযীলত বা গুণাবলী। এগুলোর বিশুদ্ধতা যাচাই করেই তারা সংকলন করেছেন। যেমন সহীহ্ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সহীহ্ ইবন খুযায়মা, মুন্‌তাকা ইবন জরূদ, সহীহ্ ইবন হিব্বান। এ কিতাবসমূহে সীরাত এবং মানাকিবের এক বড় ভাণ্ডার বিদ্যমান এবং এর সবই সহীহ্ তথা বিশুদ্ধ।

আর যে সকল মুহাদ্দিস নিজেদের সংকলন গ্রন্থকে সহীহ্ বলে দাবি করেননি তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যাতে হাদীস ভাণ্ডার জমা হয়ে যায় এবং মহানবী (সা) থেকে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তা একবার সংরক্ষিত হয়ে যাক। তাতে পরবর্তীতে এভাবে বাছ-বিচার করা হবে যে, সনদ যখন বিদ্যমান তখন এ সম্পর্কিত নির্ধারিত কষ্টিপাথরে তা যাচাই-বাছাই করা জটিল কোন বিষয় হবে না। মোটকথা, এ মণীষীগণ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করার ব্যাপারে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেছিলেন এবং চেষ্টা করেছিলেন যাতে কোন হাদীস বাদ না যায়।

সম্মানিত মুহাদ্দিসগণ একদিকে হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের মূল নীতিসমূহ নির্ধারণ করেন–যাতে কোন জাল কথা নবী (সা)-এর প্রতি আরোপিত না হয়। নবী (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ স্বেচ্ছাকৃত না হলেও তবুও তা মিথ্যা এবং অবশ্যই ভ্রান্ত বলে গণ্য হবে। অপরদিকে তাঁরা একইভাবে যা কিছু সনদসহ মহানবী (সা)-এর প্রতি আরোপিত হয়েছে, তা-ই একত্রিত করেছেন যাতে নবী (সা)-এর কোন বিষয়, কোন বাক্য অজানা থেকে না যায়, হারিয়ে না যায় যা তাঁর পবিত্র মুখ নিঃসৃত। এর কোনটির সনদ সুসংবদ্ধ না থাকলেও, সম্ভাবনা থাকে যে, ভিন্ন কোন সনদে এ হাদীস পাওয়া যাবে। তখন সনদ বর্ণনাকারীর সংখ্যা ইত্যাদি দেখে পরবর্তী আলিমগণ নিজেরাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে, এ হাদীস কোন্ পর্যায়ের হতে পারে। অনেক সহীহ্ রিওয়ায়েতই বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে ধারাবাহিক ও প্রসিদ্ধির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কাজেই যে মুহাদ্দিসগণ হাদীস যাচাই-বাছাই ছাড়াই সব ধরনের রিওয়ায়েত একত্র করেছেন, তাঁরা দায়িত্বহীনভাবে নয়, বরং "আমার একটি বাক্য শুনলে তাও অপরের কাছে পৌঁছে দাও"(بَلِّغُوا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً) মহানবী (সা)-এর এই নির্দেশের দিক থেকে সঠিক কাজই করেছেন। কোন যঈফ হাদীসের শব্দ দ্বারাও সহীহ্ হাদীসের মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব হয় এবং উক্ত সহীহ্ হাদীসে ব্যবহৃত একাধিক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হওয়াতে যঈফ হাদীসের শব্দটি হাদীসের সঠিক অর্থ নিরূপণে সহায়ক হয়। ফলে নবী (সা)-এর বক্তব্যের লক্ষ্য সঠিকভাবে নির্ণীত হয়। পরন্তু ঐ শ্রদ্ধেয় মুহাদ্দিসগণ হাদীসসমূহ সংকলনে নিজেদের জ্ঞান-বিবেককে কখনও প্রাধান্য দেন নি; বরং পরস্পর বিরোধী রিওয়ায়াত যেভাবে পেয়েছেন, হুবহু সেভাবেই লিপিবদ্ধ করেছেন; যেন বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী দু'টি রিওয়ায়াতের

মধ্যে সামঞ্জস্যদানের জন্য কোন সময় কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ দীনের বুঝ দিলে তাঁর দ্বারা এ বিরোধ দূরও হয়ে যেতে পারে। তিনি তখন ঐ দু' রিওয়ায়াতকে আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রজ্ঞার নূরে পৃথক দেখে তার পৃথক ব্যাখ্যাদানে সক্ষম হবেন। ফলে, যিনি দীর্ঘকাল যাবত এই দু' রিওয়ায়াতকে পরস্পর বিরোধী ভাবতেন, তখন আল্লাহ্ প্রদত্ত নূরে তার অন্তর্চক্ষু খুলে যাওয়াতে এ দু' রিওয়ায়াতের পার্থক্য তার দৃষ্টিতে ধরা পড়বে। অতঃপর দেখা যাবে, আসলে যাবতীয় পার্থক্য ও বৈপরীত্য ছিল আমাদের বুঝেই; হাদীসের মধ্যে পার্থক্য ও বৈপরীত্য আদৌ ছিল না।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম (র) তাঁর الوجوبة الكاملة গ্রন্থে বলেন ঃ

"হাদীসের কিতাব তিন প্রকার। প্রথম প্রকার এই যে, সংকলক নিজ কিতাবে এ শর্ত আরোপ করেন, সহীহ ছাড়া কোন হাদীস তিনি বর্ণনা করবেন না। যেমন সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ইত্যাদি। এর উদাহরণ ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মত যে, এতে যা বলা হয়েছে তা রোগীর জন্য উপকারী।

অপর এক প্রকার, যাতে সহীহ্-যঈফ সব ধরনের হাদীস সংকলন করা হয়। এরপর মন্তব্যে সহীহকে সহীহ এবং যঈফকে যঈফ উল্লেখ করা হয়। যেমন তিরমিযী শরীফ, এতে কোন হাদীস লিখে তিনি বলেন, হাদীসটি সহীহ আর কোন হাদীসকে যঈফ বলা হয়। এর উদাহরণ হলো অধিকাংশ চিকিৎসার পুস্তক, এতে একক ও সমষ্টিগতভাবে উপকারী ও ক্ষতিকর সব বিষয়ই লিপিবদ্ধ থাকে যে এটি উপকারী— ঐটি ক্ষতিকর। কাজেই কোন নির্বোধও ঐ কবিরাজী বই দেখে ক্ষতিকর ঔষধ ব্যবহার করে না। অনুরূপভাবে যঈফ হাদীস কিতাবে দেখে একে দলীল হিসেবে উদ্ধৃত করা কোন জ্ঞানীর[১] কাজ নয়।

তৃতীয় পদ্ধতি হলো, সংকলক নিজ সংকলনে মাওযূ এবং যঈফ উভয় হাদীস একত্রিত করলেন। উদ্দেশ্য এটাই যে, জনসাধারণ যেন এগুলো অনির্ভরযোগ্য বিবেচনায় দীনী ব্যাপারে এর উপর আমল করা থেকে বিরত থাকেন। এ পদ্ধতির সংকলনও এরূপ : যেমন যে কোন চিকিৎসক নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি বিস্তারিত লিখে রোগীকে দেন যাতে সে আগামী দিনে ধোঁকায় না পড়ে। ইবনুল জাওযী প্রমুখ রচিত কিতাবগুলো এ ধরনেরই।[২]

যুদ্ধ এবং অভিযানের কারণ ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে যদি কোন বর্ণনা পাওয়া যেত, তাও অবশ্য গ্রহণ করেছেন কিন্তু এতে নিজের মতামত ও রায়কে এর অন্তর্ভুক্ত করেন নি, যাতে করে তা মূল বর্ণনার সাথে মিশে না যায়। আল্লাহ্ না করুন, যদি এ বুযুর্গগণ ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের মত উদ্দেশ্য ও প্রসঙ্গ নিয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হতেন, তা হলে সে রিওয়ায়াত রিওয়ায়াতই থাকতো না; বরং তাদের ধারণা ও

১. প্রকৃতপক্ষে যিনি চিকিৎসক এবং ঔষধের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব সম্বন্ধে অবগত ।

২ আল-আজওয়িবাতুল কামিলা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সমষ্টিতে পরিণত হতো। পরবর্তী আলিমগণ এ জমাকৃত ভাণ্ডার থেকে যাচাই বাছাই করে বলে দিয়েছেন যে, অমুক রিওয়ায়াত সহীহ্, অমুকটি মওযূ। যে ব্যক্তি 'উয়ূনুল আখবার', 'যাদুল মা'আদ' এবং যারকানী প্রণীত 'শরহে মাওয়াহিব' অধ্যয়ন করবেন, তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করবেন মুহাদ্দিসগণ তাঁদের যাচাই বাছাইয়ে একই ধরনের প্রক্রিয়া বহাল রেখেছেন। নিজেদের বাছাই প্রক্রিয়া কেবল আহ্কাম তথা আইন-বিধি সংক্রান্ত হাদীসসমূহের সাথে নির্দিষ্ট করেন নি। আজকাল এক বিদয়াতী প্রথার উদ্ভব হয়েছে—যা দ্বারা প্রকৃত রিওয়ায়াত হারিয়ে যাচ্ছে। লেখক নিজ ধারণা থেকে সিদ্ধান্ত বহাল করেন আর এটাকে তিনি রিওয়ায়াতের আকারে উপস্থাপন করেন। অথচ তা রিওয়ায়াত ও ঘটনা নয়; বরং তার নিজ রায় ও ধারণা।

আল্লামা সুহায়লী, হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম ও আল্লামা যারকানী ঘটনা ও অবস্থা ছাড়াও সুযোগমত গুপ্ত রহস্য, আহকাম, উপমা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়াদিও বর্ণনা করেছেন যাতে সীরাতের স্বাদ দ্বিগুণ হয়েছে।

এ অধমও ঐ মনীষীগণের ইলমের মুখপাত্র এবং খাদিম। এ সংক্ষিপ্ত সীরাত গ্রন্থে যদ্দুর সম্ভব সংগ্রহ এবং রিওয়ায়াতসমূহ গ্রহণযোগ্য ও সনদযুক্ত হওয়ার দাবি করে। এতে কিছু গুপ্ত রহস্য এবং আহকামও সন্নিবেশ করা হয়েছে—যা ইনশা আল্লাহ্ উপকারী ও লাভজনক প্রমাণিত হবে। এ সীরাত গ্রন্থে যত জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা ও সংগ্রহের ভাণ্ডার দেখবেন, এ সবই সম্মানিত মুহাদ্দিসগণের এবং তাঁরাই এর অধিকারী। এ অধম তাঁদের এক নগণ্য গোলাম ও তুচ্ছ খাদিম–যার কাজ শুধু এতটুকুই যে, তাদের মণি-মাণিক্যগুলো সুতোয় গেঁথে জ্ঞান পিপাসু ও ক্রয়কারীদের সামনে উপস্থাপন করা এবং যে খনিসমূহ থেকে এ মোতিগুলো আহরণ করা হয়েছে, সাথে সাথে তার সন্ধানও বলে দেয়া। স্বর্ণকারের কাজ তো এতটুকু যে, সিন্দুকসমূহ ভর্তি অলঙ্কার সামনে রেখে দেয়া। এরপর এর ধরন, প্রকার, মান ও বর্ণ পৃথক করে সুবিন্যস্তভাবে রাখা তো ভৃত্য এবং খাদিমদের কাজ। এ কারণেই পূর্ববর্তী আলিমদের সংগৃহীত জ্ঞান সুবিন্যস্ত নয়, বরং স্বর্ণকারের মত এলোমেলো ও অবিন্যস্ত হয়। যেহেতু এ শাস্ত্রে শ্রদ্ধেয় মুহাদ্দিসগণ আমাদের শিক্ষক এবং আমাদের ও নবী করীম (সা)-এর মধ্যে তাঁরাই মাধ্যম, এজন্যেই তাঁদের মূলনীতি ও পদ্ধতির অনুসরণ গ্রহণযোগ্য ও আবশ্যকীয় মনে করছি। যেমন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

"সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে কি আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন, এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি?" (সূরা কাহ্ফ : ৬৬)

এজন্যেই আপনি ইনশা আল্লাহুল আযীয এ কিতাবের কোন স্থানেই সম্মানিত মুহাদ্দিসগণের মূলনীতির বিরোধী কিছু পাবেন না। অনুরূপভাবে কুরআনে বর্ণিত

পিতৃপুরুষ, যাদের—"না কোন জ্ঞান আছে, আর না তারা হিদায়তপ্রাপ্ত।" অনুসরণ করা হয়েছে। সূরা বাকারা : ১৭০ আয়াতে যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে :

لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ

তবে যাদের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক পিতৃপুরুষরা জ্ঞানী ও সঠিক পথপ্রাপ্ত, তাদের অনুসরণ উত্তম, এমনকি অত্যাবশ্যক হওয়াতে কোন আপত্তি থাকতে পারে কি? এই যুগে সীরাতের ওপর ছোট বড় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে কিন্তু এগুলোর লেখক সংকলকগণ অধিকতর আধুনিক দর্শন এবং ইউরোপীয় দার্শনিকদের প্রতি হীনমন্যতাবশত তারা আয়াত ও হাদীসের অনুবাদে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করে আধুনিক শিক্ষিতদের বিশ্বাস করাতে চায় যে, মহানবী (সা)-এর কোন বাণী ও কর্ম পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান-দর্শনের পরিপন্থি ছিল না। (নাউযু বিল্লাহ)।

এ কারণেই যখন মু'জিযা ও কারামতের বর্ণনা আসে, তখন যতদূর সম্ভব তা হালকা করে বর্ণনা করা হয়। যদি কোথাও বর্ণনাকারীর বর্ণনায় হাদীস বিচারের মানদণ্ডে সামান্যতম ব্যতিক্রম দেখা দেয়, তখন তো তাকে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণে চেষ্টার কমতি থাকে না। রিজালশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ থেকে সমালোচনার বাক্যসমূহ উদ্ধৃত করা হলেও প্রামাণ্য ও সমর্থনসূচক বক্তব্যসমূহ উদ্ধৃত করা হয় না—যা স্পষ্ট খেয়ানত ও অবিশ্বস্ততা এবং قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَ تُخْفُوْنَ كَثِيْرًا -এর[১] সত্যায়নকারী। আর যে বর্ণনাকারীদের সমালোচনা তথা প্রমাণ রীতির ত্রুটির অবকাশ থাকে না, সেখানে সূফী ও অভিজ্ঞদের ভঙ্গিমায় এসব ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়, যাতে করে আয়াত ও হাদীসের উদ্দেশেরই পরিবর্তন ঘটে।

এমনিভাবে যখন আল্লাহদ্রোহীদের সাথে জিহাদ ও যুদ্ধের প্রসঙ্গ আসে, তখন খুবই অস্বস্তি অনুভব করে এবং একে ইসলামের চেহারায় একটি কলঙ্ক দাগ মনে করে তা ধুয়ে মুছে ফেলার চেষ্টা করে। কারণ আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আয়াত এবং হাদীসসমূহকে তো অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না; এজন্যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় যে, যুদ্ধ প্রতিরোধ اعلاء كلمة الله তথা আল্লাহর বাণীর শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরা, আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর আইন জারী করার জন্য ছিল না; ছিল নিজের আত্মরক্ষা ও জীবন বাঁচানো এবং দুশমনকে প্রতিহত করার জন্য। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, মুসলমানগণ মুনাফিকদের বলত تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا —"এসো, তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো। অথবা (দুশমনদের) প্রতিরোধ করো।" (সূরা আলে ইমরান : ১৬৭)

---

১. "কাগজের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে তার কিছু অংশ তোমরা প্রকাশ কর এবং এর বহুলাংশ তোমরা গোপন কর।" (সূরা আন'আম ঃ ৯১)

এতে প্রতীয়মান হয় যে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এক জিনিস আর দুশমনদের প্রতিহত করা অন্য জিনিস। শেষটিতে মু'মিন ও মুনাফিক সব এক সমান। পার্থক্য হলো মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করে আর মুনাফিক কেবল নিজেদের রক্ষা ও দুশমন প্রতিহত করার জন্য লড়াই করে। কেবল শত্রু প্রতিহত করাই যদি জিহাদের তাৎপর্য হতো, তা হলে কুরআন ও হাদীসে এর গুরুত্ব দানের কোন প্রয়োজন ছিল না। দুশমনকে প্রতিহত করার আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতা বিবেকসিদ্ধ, স্বভাব ও প্রকৃতিগত দাবি, কোন বুদ্ধিমানই এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবে না। খুলাফায়ে রাশিদীনের সকল জিহাদই কি একমাত্র শত্রু প্রতিহত করার উদ্দেশে ছিল? এর মধ্যে কোনোটিই কি ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা মানবতার কল্যাণ ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আক্রমণাত্মক ছিল না ?

এজন্যে অধম ইচ্ছে করেছে যে, সীরাত বিষয়ক এমন একটি কিতাব লিখা হোক, যাতে একদিকে দুর্বল সনদবিশিষ্ট, অপ্রামাণ্য রিওয়ায়তসমূহ হতে বিরত থাকা হবে, অপরদিকে কোন ডক্টর বা দার্শনিকের মন রক্ষায় কোনো রিওয়ায়াত গোপনও রাখা হবে না, আর তাদের খাতিরে হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেরও আশ্রয় নেয়া হবে না। হাদীসের বর্ণনাকারীদের দুর্বলতা প্রমাণ করে এ হাদীসকে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণের চেষ্টা থেকে বিরত থাকা হবে। এ অধমের উদ্দেশ্য এটাই, যা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হলো।

فاش می گویم واز گفتهء خود دل شادم بندهء عشقم وازهر دو جهاں آز ادم

"খোলামেলা বলছি আমি, আর এ কথায় আমার মন আনন্দিত, আমি প্রেমের গোলাম এবং উভয় জগত থেকে আমি মুক্ত।"

জিহাদ, দাসপ্রথা ও জিযয়ার মাসয়ালার ব্যাপারে আল্লাহর দুশমনদের চেঁচামেচি, প্রতিবাদ এবং পর্দা বা হিজাবের ব্যাপারে যৌনলিপ্সুদের প্রতিবাদই প্রমাণ করে দেয় যে, এসব আইনের যথার্থই দরকার রয়েছে। তাদের প্রতিবাদই ঐসব বিধানের যথার্থতার প্রমাণ :

وَاِذَا اَتَكَ مَذَمَّتِىْ مِنْ نَاقِصٍ فَهِىَ الشَّهَادَةُ لِىْ بِاَنِّىْ كَامِلُ

"তোমার কাছে যখন স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষ থেকে আমার প্রতি দোষারোপ পৌঁছে তা হলে বুঝবে যে, এটাই আমার পরিপূর্ণতার প্রমাণ।"

যেভাবে বেকুফদের বিরোধিতা জ্ঞানীর জন্য প্রমাণ, সেভাবেই বাতিল পন্থীদের বিরোধিতা হকপন্থীদের পক্ষে দলীল।

যখন তুমি এই উম্মী নবীকে আল্লাহ্ প্রেরিত রাসূল হিসেবে মান্য কর এবং তাঁর সমস্ত কথা, কাজ আর মৌনতায় তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত নিষ্পাপ বলে গণ্য কর, তা হলে তাঁর হাদীস শোনার পর কোন ডক্টর এবং দার্শনিক কী বললো

সেদিকে কেন ঝুঁকে পড় এবং তাদের প্রতি লক্ষ্য করে কেন আয়াত ও হাদীসের বিশ্লেষণ কর ?

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ   فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ

"সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। সুতরাং ওরা কুরআনের পরিবর্তে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে ?" (সূরা মুরসালাত : ৪৯-৫০)

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلاَّ الضَّلاَلُ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ

"সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী থাকে ? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হচ্ছ ?" (সূরা ইউনুস : ৩২)

نخواهم جزتویك ساعت تفكر درد گر كردن

كه در هر دو جهاں جاناں ندر ام جزتو دلداری

"আমি চাই না যে, তুমি ছাড়া এক মুহূর্তও অন্য চিন্তা করি। কেননা উভয় জগতে তুমি ছাড়া আর কোন প্রেমাস্পদ নেই।"

হ্যাঁ, এ অধিকার তোমাদের অবশ্যই আছে যে, গ্রহণ করার পূর্বে যথেচ্ছ যাঁচাই বাছাই করে দেখ যে হাদীসটি সত্য, না কি জাল। তবে শর্ত এটাই যে, সত্যানুসরণই উদ্দেশ্য হতে হবে, পলায়নপর ও একপেশে উদ্দেশ্য হবে না।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

"আল্লাহই ভাল জানেন কে হিতকারী আর কে অনিষ্টকারী।"

(সূরা বাকারা : ২২০)

এবারে আমি এ ভূমিকা শেষ করব, যাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য শুরু করতে পারি এবং আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানাই যে, হে পরওয়ারদিগারে আলম ! আপনি আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবূল করুন, আমার জন্য একে অব্যাহত কল্যাণ ও পরকালের সম্বলে পরিণত করুন।

گرچه یه هدیه نه میرا قابل منظور هے

پرجو هر مقبول كيا رحمت سے تيری دور

"যদিও আমার এ হাদিয়া গ্রহণের উপযুক্ত নয়, যতটুকু গ্রহণ করেন তা আপনার অনুগ্রহ থেকে দূরে নয়।"

ربنا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

اٰمِيْنُ يَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

আর হে পরওয়ারদিগারে আলম! এই সঙ্গে আপনি তাদের প্রতিও অনুগ্রহ করুন, যারা এ দু'আর সাথে সাথে আমীন বলেছে। চাই তা আস্তে বলুক বা জোরে, তাদেরকে ক্ষমা করুন, যারা হাত তুলে এ অধমকে দু'আ ও মাগফিরাতের মাধ্যমে স্মরণ করেছে এবং সূরা ফাতিহা ও কমপক্ষে দু' তিন আয়াত مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ (কুরআন থেকে যতটুকু সম্ভব) পাঠ করে দু'আ করে।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِه وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِه اَجْمَعِيْنَ

"ওরা যা বলে, তা থেকে আপনার মহাসম্মানিত আল্লাহ পবিত্র, মহান। আর সালাম সকল প্রেরিত রাসূলের প্রতি। সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। হে প্রভু, প্রতিপালক ! আমাদের দোয়া কবূল করুন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক শোনেন এবং অধিক জানেন। আমাদের তাওবা কবূল করুন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক তাওবা কবূলকারী। দরূদ ও সালাম আমাদের নেতা, সর্দার শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা), তাঁর বংশধর, তাঁর সাহাবাগণ, তাঁর সহধর্মিণীগণ ও সন্তানগণের প্রতি।"

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পবিত্র নসবনামা

মহান আল্লাহ্ বলেন :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنفسِكُمْ

"তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট একজন রাসূল আগমন করেছেন (সূরা তাওবা : ১২৮)।

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَرَاءَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفَسِكُمْ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَقَالَ اَنَا اَنْفَسَكُمْ نَسَبًا وَصَهْرًا وَحَسَبًا لَيْسَ فِيْ اٰبَائِ مِنْ لَدُنْ اٰدَمَ سِفَاحٌ كُلُّنَا نِكَاحٌ

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفَسِكُمْ এই আয়াতের ফা অক্ষরে যবর দিয়ে তিলাওয়াত করে ইরশাদ করেন : বংশ লতিকার দিক দিয়ে আমি তোমাদের থেকে উত্তম ও সম্ভ্রান্ত। আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে আদম (আ) থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কোন যিনা নেই, বরং সবাই বিবাহিত। ইবন মারদুবিয়াহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

—যারকানী, শারহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া, ১খ. পৃ. ৬৭

হযরত ইবন আব্বাস (রা) এবং ইমাম জুহরী (র) مِنْ اَنْفَسِكُمْ-এর ফা অক্ষরে যবর দিয়ে পড়তেন এবং এর তাফসীরে مِنْ اَفْضَلِكُمْ وَاَشْرَفِكُمْ (তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সম্ভ্রান্ত) বর্ণনা করতেন—হাদীসটি অনুবাদে আমরা যার প্রতি ইঙ্গিত করেছি। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে মহানবী (সা)-এর পিতামাতা পর্যন্ত বংশপরম্পরায় পিতামহ প্রপিতামহ কিংবা মাতামহী পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রত্যেকেই সৎ ও সাধ্বী তথা নেককার এবং পবিত্র ছিলেন, ব্যভিচারের দ্বারা কেউ কখনই কলঙ্কিত হননি।[১]

সৎকর্মশীল বান্দা, যাঁদেরকে মহান আল্লাহ তাআলা নবুওয়াত ও রিসালাতের জন্য নির্বাচন করেন, তাঁদের বংশপরম্পরা এমনটিই পবিত্র হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা

---

১. এটা একটা হাদীসের সার-সংক্ষেপ, যেটি ইমাম তিরমিযী হযরত আলী (রা) থেকে মরফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাফিয হায়সামী বলেন, একজন ছাড়া হাদীসটির সব বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তবে হাকিম তাঁকেও নির্ভরযোগ্য বলেছেন।—যারকানী, ১খ. পৃ. ৬৭।

সবসময় পবিত্র পুরুষের মাধ্যমে পবিত্র নারীর গর্ভে তাঁদেরকে প্রেরণ করেন। নির্বাচিত ও মনোনীতরূপে আল্লাহ তা'আলা যাঁকে গ্রহণ করবেন, সৃষ্টির পূর্বে অবশ্যই তার বংশকে নির্বাচিত করবেন, খাঁটি ও নির্মল করবেন, করবেন সর্বোত্তম নিষ্কলুষ। নবূওয়াত ও রিসালাতের জন্য আল্লাহ তা'আলার নির্বাচিত ও মনোনীত বান্দাদের যে বিষয়ে যে সীমা পর্যন্ত সম্পর্কযুক্ত হতে পারে, সে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত নির্বাচন ও মনোনয়নের জন্য পসন্দ করা হয়ে থাকে।

মহানবী (সা)-কে হেয় এবং ইসলামের অগ্রগতি ব্যাহত করার জন্য মুনাফিকরা যখন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করেছিল, তখন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সিদ্দীক কন্যা সিদ্দীকার শানে সূরা নূরের দশটি আয়াত নাযিল করেছেন—যার মধ্যে একটি আয়াত এও ছিল মহানবী (সা) ও মুসলিম সৈনিকরা এক রণাঙ্গণ থেকে সওয়ারীসহ ফিরে আসার সময় হযরত আয়েশা (রা) কে সঙ্গে আনতে ভুলে যান। তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাওয়ার ফাঁকে কাফেলা রওয়ানা দিয়ে চলে আসে। পথিমধ্যে স্মরণ হলে পরে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসা হয়। এতেই মুনাফিকরা কথা রটনা করতে থাকে।

وَلَوْ لاَ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا - سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ

“আর তোমরা যখন এটা শুনলে, তখন কেন বললে না যে, সুবহানাল্লাহ ! এটা এক কঠিন অপবাদ।” (সূরা নূর : ২১)

এ বিষয়ে আমরা মন্তব্য করতে পারি না।

অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! এ ঘটনা শোনামাত্রই তোমাদের বলা উচিত ছিল, সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহর, এতো চরম অপবাদ ! এ ধরনের কল্পনা থেকেও আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি, পয়গাম্বরের স্ত্রী কিরূপে পাপিষ্ঠা হতে পারেন ! তাঁরা তো নেককার ও পবিত্রই হবেন।

ইবন মুনযির হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ ما بغت امراة النبى قط অর্থাৎ “কোন পয়গাম্বরের স্ত্রী কখনই ব্যভিচার করেন নি।”

ইবন জুরায়জ বলেন, নবূওয়াতের মর্যাদা ও সম্মাননার বৈশিষ্ট্যই এটা নয় যে, কোন নবীর স্ত্রী পাপ কাজে লিপ্ত হবেন। ইবন আসাকির আশরাজ খুরাসানী থেকে মরফূ রিওয়ায়াত করেন যে, নবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ কোন পয়গাম্বরের স্ত্রী কখনই ব্যভিচার করেন নি।[১] হাফিয ইবন কাসীর স্বীয় তাফসীরে হযরত ইবন

---

১. দুররে মানসূর, ৬খ. পৃ. ১৪৫।

আব্বাস (রা)-এর উক্তি ما بغت امراة النبى قط -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, হযরত ইকরামা, সাঈদ ইবন জুবায়র, যাহ্হাক প্রমুখ (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[১]

যখন পয়গম্বরগণের স্ত্রীর পক্ষে পাপাচারী হওয়া নবূওয়াতের মর্যাদার পরিপন্থি, তখন তাঁদের মাতা-মাতামহী প্রমুখ নারীগণেরও পাপাচারী হওয়া নবূওয়াত মর্যাদার পরিপন্থি। কারণ সন্তানের জন্য পিতৃ আওতা থেকে মাতৃ কর্তৃত্ব অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে। কাজেই নবীগণের জন্ম ও লালন পালন (আল্লাহ্ মাফ করুন) দুষ্কর্মে কলুষিত কোনো পরিবারে হওয়া অসম্ভব।

یہ غیر ضروری تذکرہ ہے جو امکانیت کا شبہ جنم دیگا

হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে মহানবী (সা) পর্যন্ত যত নবী-রাসূল গত হয়েছেন, কারো বংশ সম্বন্ধেই কোন সমালোচক কোন কথা বলতে পারেননি। কেবল ইয়াহূদীরা (লা'নাতুল্লাহ্ আলাইহিম) মহান আল্লাহ্র অতুলনীয় ক্ষমতার নিদর্শন ঈসা (আ)-এর সতী-সাধ্বী মাতা মরিয়ম (আ)-এর উপর অপবাদ আরোপ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাবে সপ্রশংস ভাষায় হযরত মরিয়ম (আ) প্রসঙ্গে এবং হযরত ঈসা (আ)-এর গৌরবময় জন্ম সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন এবং সেই সাথে ইয়াহূদীদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন।

যা দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেল, মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত ও প্রেরিত কোনো পয়গাম্বরের বংশধারায় এক মুহূর্তের জন্যও কোন সন্দেহ সংশয় প্রকাশ করার অবকাশ কোনো খবিসের জন্য রাখা হয়নি।

রোমের সম্রাট যখন আবূ সুফিয়ানের নিকট নবী মুহাম্মদ (সা)-এর বংশ সম্পর্কে এ প্রশ্ন করলেন : كيف نسبه فيكم "তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ মর্যাদা কিরূপ ?" সহীহ বুখারীর এ বাক্যে আছে, আবূ সুফিয়ান জবাব দিলেন : هو فينا ذو نسب "তিনি আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয়।"

হাফিয আসকালানী বলেন, বাযযার এর বর্ণনায় এরূপ রয়েছে : هو فى حسب مالا يفضل عليه احد قال هذه الاية "অর্থাৎ বংশ মর্যাদা ও খান্দানের দিক দিয়ে কেউ তাঁর চেয়ে ঊর্ধ্বে নয়।" রোম সম্রাট বললেন, এটাও একটা নিদর্শন (ফাতহুল বারী, কিতাবুত তাফসীর)।[২]-[৩] অর্থাৎ নবী হওয়ার অন্যতম নিদর্শন এটাও যে, নবী (সা)-এর খান্দান সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ছিল। সহীহ্ বুখারীর রিওয়ায়াতে এ বাক্য রয়েছে

---

১. তাফসীরে ইবন কাসীর, ৮খ. পৃ. ৪১৯।

২ কিতাবুত তাফসীরের বর্ণনা এজন্যে দেয়া হয়েছে যে, হাফিয আসকালানী বাযযার-এর মুসনাদ থেকে এ বর্ণনা কেবল এ স্থানেই উদ্ধৃত করেছেন। বাদাউল ওহী, কিতাবুল জিহাদ, মাগাযী প্রভৃতিতে বর্ণনা করেন নি।

৩. ফাতহুল বারী, মিসরে মুদ্রিত, ১৩০১ হি., ৮খ. পৃ. ১৬৩।

যে, আবূ সুফিয়ানের জবাব শুনে সম্রাট বললেন : وكذلك الرسل تبعث فى احسب قومها "অর্থাৎ পয়গাম্বরগণ সর্বদা সম্ভ্রান্ত বংশেরই হয়ে থাকেন।"[১]

আমাদের নবী আকরাম হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বংশ লতিকা, যা সারা বিশ্বের সম্ভ্রান্ত বংশ লতিকা থেকে উন্নত অগ্রগামী এবং সবচেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। তা এরূপ ঃ

সাইয়্যেদুনা মাওলানা মুহাম্মদ ইবন আবদিল্লাহ্ ইবন আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিম ইবন আবদে মানাফ ইবন কুসাই ইবন কিলাব ইবন মুররা ইবন কা'ব ইবন লুআই ইবন গালিব ইবন ফিহ্‌র ইবন মালিক ইবন নাযর ইবন কিনানা ইবন খুযায়মা ইবন মুদরিকা ইবন ইলিয়াস ইবন মুযার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান। [বুখারী শরীফ, বাবু মাবআসুন নবী (সা)]

হাফিয আসকালানী বলেন, ইমাম বুখারী স্বীয় জামে সহীহতে এ পবিত্র বংশ পরম্পরা কেবল আদনান পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন কিন্তু স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে হযরত ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন যা নিম্নরূপ ঃ

আদনান ইবন আদু ইবন মুকাওইম ইবন তারিহ্ ইবন ইয়াশজাব ইবন ইয়ারাব ইবন সাবিত ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম (আ)।[২]

আদনান পর্যন্ত বংশ পরম্পরা সকল বংশ বিশেষজ্ঞের নিকট গ্রহণযোগ্য। এতে কারো মতপার্থক্য নেই এবং আদনানের পূর্বপুরুষ ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর হওয়াটাও সবার নিকটই গ্রহণযোগ্য।[৩]

মতপার্থক্য কেবল এ ব্যাপারে যে, আদনান থেকে হযরত ইসমাঈল (আ) পর্যন্ত কত পুরুষ ছিল ? এটা কেউ ত্রিশ বলেছেন আর কেউ বলেছেন চল্লিশ। আল্লাহ্ই ভালো জানেন। আর তাঁর জানাটা পরিপূর্ণ ও সুবিজ্ঞোচিত।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন নবী (সা) তাঁর পবিত্র বংশ লতিকা বর্ণনা করতেন, তখন আদনান থেকে উর্ধ্বে বর্ণনা করতেন না, বরং আদনান পর্যন্ত পৌঁছে থেমে যেতেন এবং বলতেন : كذب النسابون "বংশ লতিকা বর্ণনাকারীরা মিথ্যা বলেছে।"[৪]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) প্রথমে এ আয়াত তিলাওয়াত করতেন :

وَ عَادًا وَ ثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ

"আদ ও সামূদ এবং তাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছিল, আল্লাহ্ তো বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করতে চান না।" (সূরা মুমিন : ৩১)

---

১. বুখারী শরীফ, ১খ.।

২. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১২৫।

৩. জাদুল মা'আদ, ১খ. পৃ. ১৫।

৪. ইবন সা'দ, তাবাকাতুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২৮।

এরপর বলতেন كذب النسابون "বংশ লতিকা বর্ণনাকারীরা মিথ্যা বলেছে।" অর্থাৎ তাদের এ দাবি যে, সমস্ত বংশ লতিকা সম্পর্কে আমরা অবহিত—এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বরং আল্লাহ ছাড়া এ জ্ঞান কারো নেই। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ২৮)

আল্লামা সুহায়লী বলেন, ইমাম মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, কোন ব্যক্তির বংশ পরম্পরা হযরত আদম (আ) পর্যন্ত পৌঁছানো কিরূপ ? এটা শুনে তিনি অপছন্দ করলেন। প্রশ্নকারী তখন হযরত ইসমাঈল (আ) পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তাও তিনি অপছন্দ করলেন এবং বললেন ঃ من يخبر- "কে তাকে খবর দিয়েছে ?"[১]

মাতার দিক থেকে বংশ লতিকা

উপরে যে বংশ লতিকা বর্ণনা করা হয়েছে, তা পিতা ও দাদার দিক থেকে ছিল। তাঁর মাতার দিক থেকে বংশ লতিকা এরূপ :

মুহাম্মদ (সা) ইবন আমিনা বিনতে ওহাব ইবন আবদে মানাফ ইবন যুহরা ইবন কিলাব ইবন মুররা।[২] কিলাব পর্যন্ত পৌঁছে পিতা ও মাতা উভয়ের বংশ লতিকা একত্রিত হয়ে যায়।

যদি এখানে বংশ লতিকার পিতা-পিতামহের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হয়, তা হলে সম্ভবত তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আদনান : কায়দার ইবন ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর। আবূ জাফর ইবন হাবীব স্বীয় তারীখ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলতেন যে, আদনান, রবীয়াহ, খুযাইমা, আসাদ এসব গোত্র ইবরাহীম (আ)-এর বংশোদ্ভূত, কল্যাণকর ও উত্তমভাবে এদের উল্লেখ করো। আর যুবায়র ইবন বাক্কার মরফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ মুযার ও রবীয়াহ গোত্রকে মন্দ বলো না, এরা ইসলামের উপর ছিল। হযরত সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রা) বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীস এরই সমার্থক।[৩]

মা'আদ : মীম অক্ষরে জবর এবং দাল অক্ষরে তাশদীদ দিয়ে উচ্চারণ হবে। কেউ কেউ বলেন, মা'আদ ইফসাদ অর্থাৎ বিপর্যয়-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত যিনি খুব বাহাদুর এবং যোদ্ধা ছিলেন, সারা জীবন বনী ইসরাঈলের সঙ্গে যুদ্ধ এবং সংঘাতে কেটেছে। প্রতিটি যুদ্ধে জয়ী এবং সাহায্যপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর উপনাম ছিল আবূ নাযযার।[৪]

---

১. রাউযুল উনূফ, মিসরে মুদ্রিত, ১৩৩২ হি. ১৯১৪, ১খ. পৃ. ১১০।

২ ইবন সা'দ, তাবাকাতুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৩১।

৩. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১২৫।

৪. যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৯।

ইমাম তাবারী বলেন, মা'আদ ইবন আদনান বুখত নাসর-এর সময়ে দ্বাদশ বর্ষীয় বালক ছিলেন। তৎকালীন পয়গাম্বর আরমিয়াঁ ইবন হালকিয়াঁর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ মর্মে ওহী নাযিল হয় যে, বুখত নাসরকে জানিয়ে দাও, আমি তাকে আরবের শাসনকর্তা মনোনীত করেছি এবং তুমি মা'আদ ইবন আদনানকে স্বীয় বোরাকে আরোহণ করাও যাতে সে কোন ব্যথা না পায়। এটা এজন্যে যে,

فانی مستخرج من صلبه نبیا کریما اختم به الرسل

"আমি তার থেকে এক সম্মানিত নবী পয়দা করতে যাচ্ছি, যার মাধ্যমে পয়গাম্বরের ধারাবাহিকতায় সমাপ্তি ঘটাবো।"

এজন্যে হযরত আরমিয়াঁ মাআদ ইবন আদনানকে নিজ বাহন বোরাকে আরোহণ করিয়ে সিরিয়ায় নিয়ে যান। সেখানে পৌঁছে মা'আদ বনী ইসরাঈলদের মাঝে বেড়ে উঠেন (যেমন আর-রাওযুস সুহায়লী, ১খ. পৃ. ৮-এ বর্ণিত হয়েছে)। এজন্যেই মা'আদ ইবন আদনানের বংশধারা আহলি কিতাব আলিমদেরও জানা ছিল।

ইবন সা'দ স্বীয় তাবাকাতে আবূ ইয়াকূব তাদমূরী থেকে বর্ণনা করেন যে, বুরখ ইবন নারিয়া—যিনি হযরত আরমিয়াঁ (আ)-এর লেখক এবং সচিব ছিলেন—তিনি মা'আদ ইবন আদনানের যে বংশ লতিকা বর্ণনা করেছেন, তা আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। (তাবাকাত, ১খ. পৃ. ২৮)

নিযার : নিযার শব্দটি 'নযর' থেকে গৃহীত, যার অর্থ স্বল্প (বিরল)। আবুল ফারয ইসবাহানী বলেন, নিযার যেহেতু সমকালীন যুগে একক ব্যক্তিত্ব ছিলেন অর্থাৎ তাঁর সমকক্ষ খুব কমই ছিল, এজন্যেই তাঁর নাম নিযার হয়েছে।

(ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১২৫)

আল্লামা সুহায়লী বলেন, যখন নিযার জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁর ললাটে নূরে মুহাম্মদী (সা) চমকাচ্ছিল। এটা দেখে তাঁর পিতা খুবই খুশি হন। খুশিতে তিনি সবাইকে দাওয়াত করেন এবং বলেন, هذا كله نذر لحق هذا المولود فسمى نذار لذلك "এ সব কিছুই এই নবজাতকের মুকাবিলায় খুবই নগণ্য, এজন্যে তাঁর নাম নিযার রাখা হয়েছে।"[১]

তারীখুল খামীসে আছে, নিযার তাঁর সমকালীন সবচেয়ে সুন্দর, সুঠাম, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন (انه خرج اجمل اهل زمانه واكبرهم عقلا)।

আর কারো মতে নিযার অর্থ কৃশ ও রোগা-পাতলা। যেহেতু তিনি কৃশ ও রোগা পাতলা ছিলেন, এজন্যে তাঁর নাম নিযার ছিল।

মদীনা মুনাওয়ারার সন্নিকটে যাতুল জায়শে তাঁর কবর আছে।[২]

---

১. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ৮।

২ যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৯।

মুযার : মুযারের প্রকৃত নাম ছিল আমর আর উপনাম ছিল আবূ ইলয়াস। মুযার ছিল তাঁর উপাধি। মুযার শব্দটির মূল মাযির, যার অর্থ কঠোর মেজাজ। তিনি কিছুটা কঠোর স্বভাববিশিষ্ট হওয়ায় তাঁর উপাধি মুযার হয়ে যায়।[১] তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। তাঁর জ্ঞানগর্ভ বাণীর মধ্যে কয়েকটি এরূপ ঃ

مِنْ يَزْرَعُ شَرًا يَحْصُدُ نَدَامَةً وَخَيْرَ الْخَيْرِ اَعْجَلُهُ فَاَحْمِلُوْا اَنفُسَكُمْ عَلٰى مَكْرُوْهِهَا وَاصْرِفُوْهَا عَنْ هَوَاهَا فَلَيْسَ بَيْنَ الصَّلَاحِ وَالْفَسَادِ الاَّ الصَّبْرُ

"যে অমঙ্গল বপন করবে, সে লজ্জার ফসল কর্তন করবে। আর কল্যাণের মধ্যে উত্তম হলো তাই, যা দ্রুত অর্জিত হয়। কাজেই নিজের আত্মাকে অপসন্দনীয় বস্তু থেকে নিবৃত্ত রাখো এবং আত্মাকে কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করো, ভাঙ্গা ও গড়ার মধ্যে ধৈর্য ছাড়া কোন অন্তরায় নেই।"[২]

তিনি সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। দ্রুত উট চালনার হুদী তাঁরই উদ্ভাবিত ছিল। (রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ৮)

ইবন সা'দ স্বীয় তাবাকাতে আবদুল্লাহ ইবন খালিদ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন "মুযারকে মন্দ বলো না, কেননা তিনি মুসলমান ছিলেন।"[৩]

ইবন হাবীব তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আদনান, তাঁর পিতা, তার পুত্র সাদ, রবীয়াহ, মুযার, কায়স, তামীম, আসাদ এবং রাযাইয়াহ ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মমতের অনুসরণ করে মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন।[৪]

ইলয়াস : হযরত ইলয়াস (আ)-এর নামানুসারে এ জন্যে এ নাম রাখা হয় যে, তিনিই প্রথম পবিত্র বায়তুল্লা হতে কুরবানীর পশু প্রেরণের প্রচলন করেন। বলা হয়ে থাকে যে, ইলয়াস ইবন মুযার স্বীয় পৃষ্ঠদেশ থেকে নবী (সা)-এর হজ্জের তালবিয়া শ্রবণ করতেন। এটাও বলা হয় যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন : ইলয়াসকে মন্দ বলো না, কারণ তিনি মু'মিন ছিলেন।[৫]

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১২৫।

২. যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৯।

৩. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত এ আসার হাফিয আসকালানী বিস্তারিতভাবে বাবুল মানাকিবে বর্ণনা করেন এবং মাররাআসে নবী (সা) অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত করেন, যেমনটি আমরা পরে আলোচনা করব।

৪. ইবন সা'দ, তাবাকাতুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৩০।

৫. ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ৮৪।

আল্লামা যারকানী বলেন, এ হাদীসটির অবস্থা সম্পর্কে আমার জানা নেই যে, এটি প্রামাণ্য লতিকার কোন্ পর্যায়ের।[১]

মুদরিকা : প্রসিদ্ধ আলিমগণের বক্তব্য অনুযায়ী মুদরিকার নাম ছিল আমর। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, তাঁর নাম ছিল আমর।[২] আর মুদরিকা ছিল উপাধি যা ইদরাক শব্দ থেকে উদ্ভূত। যেহেতু সব ধরনের সম্মান ও মর্যাদা তিনি অর্জন করেছিলেন, এজন্যে তাঁর উপাধি মুদরিকা হয়েছিল।[৩]

খুযায়মা : হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, খুযায়মা ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মাদর্শের উপর ইনতিকাল করেন।[৪]

কিনানা : আরবে তাঁকে প্রভাবশালী ও সম্ভ্রান্ত মনে করা হতো। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন তাঁর নিকট আগমন করতো।[৫]

নয্র : নাযারাতুন মূল ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ চাকচিক্যময়, চির সতেজ। সৌন্দর্য ও সুঠাম দেহের কারণে তাঁকে এ নামে ডাকা হয়। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল কায়স।[৬]

মালিক : তাঁর নাম ছিল মালিক এবং উপাধি ছিল আবুল হারিস। ইনি সমসাময়িক আরবে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।[৭]

ফিহ্র : তাঁর নাম ছিল ফিহ্র, উপাধি ছিল কুরায়শ। কেউ কেউ বলেন, কুরায়শ ছিল নাম আর ফিহ্রই ছিল উপাধি। তাঁর বংশধরগণকে কুরায়শী বলা হয়। আর যে ব্যক্তি ফিহরের বংশধর নয়, তাকে বলা হয় কিনানী। কতিপয় আলিম বলেন, কুরায়শ ছিলেন নযর ইবন কিনানার বংশধর। হাফিয ইরাকী তাঁর আইফয়া-ই-সীরাত গ্রন্থে বলেন :

اما قريش فلا صح فهر جماعها والاكثرون النضر

“বিশুদ্ধ তথ্য এই যে, ফিহ্রই কুরায়শ, তিনিই কুরায়শকে সংগঠিত করেন; অবশ্য অধিকাংশের মতে এ কাজটি করেছেন নয্র।”

হাফিয আলাঈ বলেন, এটাই সত্য। আর মুহাক্কিক আলিমদের বক্তব্য হলো নয্র ইবন কিনানার সন্তান ছিলেন কুরায়শ। কিছু কিছু মরফূ‘ হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম শাফিঈ (র)-এর বক্তব্যও এটাই যে, কুরায়শ ছিল নয্র ইবন কিনানার সন্তানের নাম।

---

১. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ৮।
২ যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৯।
৩. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১২৫।
৪. যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৮।
৫. যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৮।
৬ যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৭।
৭. যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৬।

কিছু কিছু হাদীসের হাফিয বলেন, ফিহ্‌রের পিতা মালিক ফিহ্‌র ছাড়া আর কোন সন্তান রেখে যাননি। এ কারণে যে ব্যক্তি ফিহ্‌রের বংশধর, তিনি নয্‌রেরও বংশধর। কাজেই কুরায়শ চিহ্নিতকরণে যে বিভিন্ন বক্তব্য ছিল, আল্লাহর শোকর, তা একীভূত হয়ে গেল।

কুরায়শ নামকরণের কারণ : কুরায়শ একটি সামুদ্রিক প্রাণীর নাম, যে স্বীয় শক্তি দ্বারা অন্যান্য প্রাণীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। সে যে প্রাণীকে ইচ্ছা হয় খেয়ে ফেলে, কিন্তু একে কেউ খেতে পারে না। অনুরূপভাবে কুরায়শও নিজেদের শক্তি ও বীরত্ব দ্বারা সবার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে, কারো নিকট পরাজিত হয়নি। এজন্যে তারা কুরায়শ নামে আখ্যায়িত হয়ে যায়। ইবন নাজ্জার স্বীয় তারিখ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, একবার হযরত ইবন আব্বাস (রা) হযরত মুআবিয়া (রা)-এর নিকট আগমন করেন। সেখানে হযরত আমর ইবনুল আস (রা) ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইবন আব্বাস (রা) কে সম্বোধন করে বলেন, কুরায়শদের ধারণায় তুমিই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম। ভাল কথা, এবার তুমি বল, কুরায়শ নামকরণের কারণ কি? কুরায়শকে কেন কুরায়শ বলা হয়? হযরত ইবন আব্বাস (রা) কুরায়শ নামকরণের ঐ কারণ বর্ণনা করেন যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত আমর ইবনুল আস (রা) এবারে বলেন, আচ্ছা, যদি এ প্রসঙ্গে তোমার কোন কবিতা স্মরণে থাকে তো শুনিয়ে দাও। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, কবি শামরুখ ইবন আম্‌র হিময়ারী বলেন :

وقريش هى التى تسكن البحر   بهٖا سُمِيَّتْ قريش قريشا
تاكل الغث والسمين ولا تترك   لذى الجنا حين ريشا
هكذا فى البلاد حى قريش   يأكلون البلاد لكلا لميشا
ولهم اخر الزمان نبى   يكثر القتل فيهموا والخموشا

"কুরায়শ এক জন্তুর নাম যা সমুদ্রে থাকে। এ থেকেই কুরায়শের নাম কুরায়শ রাখা হয়। ঐ জন্তু যে দুর্বল ও শক্তিশালী সব জন্তুকে খেয়ে ফেলে, এমনকি পালকও ফেলে না। অনুরূপভাবে কুরায়শ সম্প্রদায়কে শৌর্য-বীর্যের সাথে স্মরণ করা হয়। আর এ সপ্রদায়ের মধ্যেই শেষ যামানায় এক নবী প্রকাশ পাবেন, যিনি—আল্লাহর নাফরমান বান্দাদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধে অধিকাংশ নাফরমানের প্রাণ হরণ তাঁর হাতেই ঘটবে।"[১]

হাফিয বদরুদ্দীন আইনী (র) কুরায়শকে কুরায়শ বলার পনেরটি কারণ বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হলে শরহে সহীহ বুখারী, উমদাতুল কারী, ৭খ. পৃ. ৪৮৬ মানাকিবে কুরায়শ অধ্যায় দেখে নিন।

---

১. যাবকানী, ১খ. পৃ. ৭৫; ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ৩৮৮; মানাকিবে কুরায়শ অধ্যায়ে কবিতাটি বর্ণিত হয়েছে।

কা'ব : জুমু'আর দিন (যার পূর্বনাম ছিল ইয়াওমুল আরূবা) লোকজনকে একত্রিত হওয়ার পদ্ধতি সর্বপ্রথম কা'ব ইবন লুয়াই প্রচলন করেন। কা'ব ইবন লুয়াই জুমু'আর দিন লোকজনকে একত্রিত করে খুতবা দিতেন। এতে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করতেন যে, আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য সবকিছু আল্লাহরই সৃষ্টি, এরপর জনগণকে বিভিন্ন সদুপদেশ দান করতেন। পরোপকারকে উৎসাহ দিতেন। আর বলতেন, আমার বংশে একজন নবী আসবেন, যদি তোমরা ঐ সময় বেঁচে থাকো, তা হলে তাঁর অনুসরণ করো। এরপর তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করতেন

يا ليتنى شاهد فحواء دعوته   اذا قريش تبغى الحق خذلانا

"আহ্ ! যদি আমি তাঁর ঘোষণা ও দাওয়াতের সময় উপস্থিত থাকতাম, যখন কুরায়শগণ তাঁকে সাহায্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে।"

ইমাম ফাররা ও সালাব বলেন, এর পূর্বে ইয়াওমুল জুমু'আকে ইয়াওমুল আরূবা বলা হতো। সর্ব প্রথম কা'ব ইবন লুয়াই এ দিনের নাম জুমু'আ রাখেন। হাফিয ইবন কাসিরও স্বীয় তারিখে কা'ব ইবন লুয়াই-এর খুতবার উল্লেখ করেছেন।[১]

মুররা : শব্দটি মারারাত থেকে গৃহীত, যার অর্থ তিক্ত। যে ব্যক্তি শক্তিশালী ও বীরত্বব্যঞ্জক হতেন, আরবে এরূপ ব্যক্তিকে মুররা বলা হতো। তারা এজন্যে এরূপ ব্যক্তিকে মুররা বলতো যে, এ ব্যক্তি নিজ শত্রুদের জন্য খুবই তিক্ত। مرة শব্দটির ة অক্ষরটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক নয়, বরং مبالغه জ্ঞাপক, যদ্দরুন এর অর্থ খুবই তিক্ত। হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত তালহা (রা) তাঁরই বংশধর ছিলেন।[২]

কিলাব : কালব শব্দের বহুবচন। কোন ব্যক্তি আবুর রাকিশ আরাবীকে প্রশ্ন করেছিল, এরূপ করার কারণ কি যে তোমরা তোমাদের সন্তানদের জন্য কালব (কুকুর), যি'ব (নেকড়ে) এ ধরনের খারাপ নাম আর ভৃত্যদের জন্য মারযূক (রিযকপ্রাপ্ত), রাবাহ (উপকারপ্রাপ্ত) এ ধরনের উত্তম নাম গ্রহণ কর ? আবুর রাকিশ আরাবী জবাব দিলেন যে, আমরা সন্তানদের নাম দুশমনদের জন্য এবং ভৃত্যদের নাম আমাদের জন্য রাখি। অর্থাৎ ভৃত্য তো কেবল আমাদের সেবার জন্য রাখা হয়, এর বিপরীতে সন্তানগণ শত্রুর সামনে বুক পেতে যুদ্ধ করে। এজন্যে তাদের নাম এরূপ নির্ধারণ করা হয়, যাতে এ ধরনের নাম শুনেই শত্রুরা ভীত হয়। কিলাবের প্রকৃত নাম হাকিম কিংবা উরওয়া অথবা মুহাযযাব ছিল। নানা মত অনুযায়ী কিলাব শিকারে আগ্রহী ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি শিকারী কুকুর পুষতেন। ফলে তিনি কিলাব নামে আখ্যায়িত হন।[৩]

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ.৭৪; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২খ. পৃ. ২৪৪।

২ প্রাগুক্ত।

৩. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১২৪।

কুসাই : কুসাইয়ের নাম ছিল মুজমি' বা একত্রকারী, যা জমা শব্দ থেকে উদ্ভূত। কুসাই যেহেতু কুরায়শের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত গোত্রগুলোকে একত্র করেছিলেন, এজন্যে তাঁকে মুজমি' বা একত্রকারী বলা হতো। কুরায়শরা প্রথমে বিক্ষিপ্ত ছিল এবং এক স্থানে বসবাসরত ছিল না। কেউ ছিল পাহাড়ে, কেউ ময়দানে, কেউ উপত্যকায়, কেউ নির্দিষ্ট কোন জায়গায় আর কেউ ছিল গুহায়। কুসাই সব গোত্রকে মক্কার আশ্রয়ে একত্রিত করেন এবং প্রত্যেকের পৃথক পৃথক আবাসের জন্য স্থান চিহ্নিত করে দেন —এভাবে তিনি সবাইকে একত্রিত করেন। তখন থেকেই তাঁকে মুজমি' বলে সম্বোধন করা হতে থাকে। যেমনটি জনৈক কবি বলেন :

ابوكم قصى كان يدعى مجمعا   به جمع الله القبائل من فهر

"তোমাদের পিতা কুসাইকে মুজাম্মি' বলে সম্বোধন করা হতো এ জন্যে যে, তার মাধ্যমে আল্লাহ্ ফিহর সম্প্রদায়কে একত্রিত করেছেন।"

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) ইমাম শাফিঈ (র) থেকে বর্ণনা করেন, কুসাইয়ের নাম ছিল যায়দ।[১]

কুসাই খুব বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি ইতর জনকে সম্মান করে, সেও ইতর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। নিজের মর্যাদা অপেক্ষা যে বেশি চায়, সে বঞ্চনার শিকার হয়, আর হিংসুক গুপ্ত শত্রু।"

অন্তিমকালে তিনি স্বীয় পুত্রদের এই নসীহত করেন :

اجتنبوا الخمر فانها تصلح الابدان و تفسد الاذهان

"মদ্যপান থেকে বিরত থাকবে, কারণ তা শরীরকে ঠিক রাখে; কিন্তু মস্তিষ্ককে বিকৃত করে দেয়।" (যেমনটি মক্কা মুকাররামার মুফতী যায়নি যাহলান রচিত সীরাতুন-নববী, ১খ. পৃ. ৮-এ উল্লেখ করেছেন)।

কুসাই আরবে বিশেষ নেতৃত্বে আসীন হন। সমস্ত লোক তাঁর অনুগত ও আজ্ঞাবহ ছিল। কুসাই 'দারুন নাদওয়া' নামে একটি পরামর্শ সভা প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সব কাজের পরামর্শ করা হতো। বিবাহ, পারিবারিক এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে ঐ সভায় পরামর্শ করা হতো। বাণিজ্যের যে কাফেলা যাত্রা করতো, তারাও এখান থেকেই যাত্রা শুরু করতো। ভ্রমণ শেষে প্রত্যাবর্তনকালেও প্রথমে দারুন নাদওয়াতে উপস্থিত হতো, যেন দারুন নাদওয়া আরববাসীর প্রশাসনিক ভবন ও পার্লামেন্ট ছিল। কাবায় গিলাফ পরানো, হাজীদের পানি পান করানো, সাহায্য এবং পরামর্শ এসব কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত ব্যক্তিত্ব ছিলেন কেবল কুসাই এবং তিনিই এ

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৩।

সর্বপ্রকারের গুরুত্বপূর্ণ সেবাকার্যের যিম্মাদার ছিলেন। তাঁর পর এসব সেবা ও পদবী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্টিত হয়।[১]

এছাড়া কুরায়শদের আরো দায়িত্ব-কর্তব্য ছিল, যেমনটি আল্লামা হাফিয আইনী উমদাতুল কারী, শরহে বুখারী, মানাকিবে কুরায়শ অধ্যায় (৭খ. পৃ. ৪৮৬)-তে বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করেছেন যা আমরা পাঠকদের জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উপস্থাপন করছি :

১. **হিজাবাত :** আল্লাহর ঘরের পাহারা এবং মসজিদের খিদমত—এ খিদমতের ভার বনী আবদেদ্দারকে দেয়া হয়েছিল, যা হযরত উসমান ইবন তালহা (রা) আনজাম দেন।

২. **সিকায়াত :** হাজীদেরকে যমযমের পানি পান করানো—বনী হাশিমকে এ খেদমতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। বনী হাশিমের পক্ষে হযরত আব্বাস (রা) এ খেদমত আনজাম দেন।

৩. **রিফাদাত :** ফকীর-মিসকীন, হাজী ও মুসাফিরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা—এ উদ্দেশ্যে অভাবীদেরকে সাহায্যের জন্য চাঁদা তুলে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছিল। এ তহবিল পরিচালনার দায়িত্ব ছিল বনী নওফেলের পক্ষে ওয়ারিস ইবন আমের-এর উপর।

৪. **ইমারত :** মসজিদুল হারাম ও বায়তুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ, নির্মাণ ও মেরামতের দায়িত্ব বনী হাশিমের পক্ষে হযরত আব্বাস (রা)-এর উপর ছিল।

৫. **সাফারাত :** দু'পক্ষের বিরোধের সময় দুতিয়ালী করা—এ খিদমতের দায়িত্ব বনী আদীর পক্ষে হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) পালন করতেন।

৬. **নাদওয়া :** পরামর্শ সভা—এ সভার আমীর ছিলেন ইয়াযীদ ইবন জামআ ইবন আসওয়াদ।

৭. **কুব্বা :** যুদ্ধের সময় সেনা ছাউনীর ব্যবস্থা করা—এ দায়িত্ব বনী মাখযূমের উপর ন্যস্ত ছিল। বনী মাখযূমের পক্ষে হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা) এ দায়িত্ব পালন করতেন।

৮. **লিওয়া :** পতাকা বহন, একে উকাবও বলা হয়—এ দায়িত্ব বনী উমায়্যা পালন করতো, যা তাদের পক্ষে আবূ সুফিয়ান উমূবী [হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর পিতা] পালন করতেন।

৯. **আইন্না :** যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ঘোড়দৌড়ের সময় ঘোড়া ও সওয়ারীর দেখাশোনা করা—এ খিদমতও বনী মাখযূমের পক্ষে হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা) পালন করতেন। এটা এজন্যে যে, তিনি জাহিলী যুগেও যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতেন এবং خيـاركم في الجـاهلية خيـاركم في الاسلام —"তোমাদের মধ্যে যে জাহিলী যুগে উত্তম ছিল, সে ইসলামী যুগেও উত্তম"—এ বাক্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন।

---

১. ইবন সা'দ, তাবাকাতুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৩৯।

১০. ইশনাক : গোত্রসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে দিয়ত, জরিমানা ইত্যাদি আদায় করা, যে ব্যক্তির দিয়ত পরিশোধের সামর্থ্য নেই, তাকে সাহায্য-সহায়তা করা—এ দায়িত্ব বনী তায়মের পক্ষে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উপর ন্যস্ত ছিল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যে কাজের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতেন, কুরায়শ গোত্র তাঁর পক্ষ নিত এবং জান-প্রাণ দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করতো। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ছাড়া অন্য কেউ এ নেতৃত্ব গ্রহণ করলে কুরায়শ তাকে সাহায্য করতো না।

১১. আমওয়ালে মুহাজ্জারা : দানকৃত সম্পদ, যা দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করা হতো, বনী সাহম-এর পক্ষে হারিস ইবন কায়স এ সম্পদের মুতাওয়াল্লী ছিলেন।

১২. আইসার ওয়া আযলাম : তীর নিক্ষেপের দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা ও যাত্রার শুভাশুভ চিহ্নিত করা—বনী খাযরাজের পক্ষে সাফওয়ান ইবন উমায়্যা এ ভাগ্য নির্ণয়ের পরিচালক ছিলেন।

আবদে মানাফ : ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, আবদে মানাফের নাম ছিল মুগীরা। তিনি দেখতে খুবই সুঠাম ও সুন্দর ছিলেন। এজন্যে তাঁকে 'কামারুল বাতহা'ও বলা হতো।[১]

মূসা ইবন উকবা বর্ণনা করেন, কোন কোন প্রস্তরখণ্ডে এ ধরনের লিখাও পাওয়া গেছে :

انا المغيرة بن قصى امر بتقوى الله وصلة الرحم

"আমি কুসাই পুত্র মুগীরা আল্লাহকে ভয় করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিচ্ছি।"[২]

হাশিম : ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, হাশিমের নাম ছিল আমর। মক্কায় তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল, হাশিম ঝোলের মধ্যে টুকরা করা রুটি মক্কাবাসীকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এজন্যে তাঁর নাম দেয়া হয় হাশিম। হিশম অর্থ চূর্ণ করা এবং এর اسم فاعل বা কর্তৃবাচক বিশেষ্য হলো হাশিম।

عمر والعلا هشم الثريد لقومه و رجال مكة مسنتون عجاف

"উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আম্‌র নিজ সম্প্রদায় এবং সমস্ত মক্কাবাসীকে সরীদ প্রস্তুত করে খাইয়েছেন; আর (এ সময়) মক্কার লোকজন দুর্ভিক্ষের কারণে দুর্বল ও অসমর্থ ছিল।"

একবার নয়, বরং বারবার তিনি মক্কাবাসীর খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তাঁর দস্তরখান ছিল খুবই প্রশস্ত। সব ধরনের লোকের জন্য তাঁর দস্তরখান ছিল উন্মুক্ত। গরীব মুসাফিরকে উট দান করতেন। খুবই সুঠামদেহী ও

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৩; রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ৬।

২ যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৩।

সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। নবূওয়াতের নূর তাঁর কপালে চমকাতো। বনী ইসরাঈল আলিমগণ যখন তাঁকে দেখতো, সিজদায় লুটিয়ে পড়তো ও তাঁর হস্ত চুম্বন করতো।

আরবের গোত্রসমূহ ও বনী ইসরাঈলের আলিমগণ বিয়ে করার জন্য নিজেদের কন্যাদের হাশিমের সামনে পেশ করতো। এমনকি একবার রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস হাশিমকে পত্র লিখলেন যে, আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও ঔদার্যের খবর আমার কাছে পৌঁছেছে। আমি অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী আমার শাহজাদীকে আপনার সাথে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছে করি। আপনি এখানে চলে আসুন যাতে আমি আমার ইচ্ছে পূর্ণ করতে পারি। হাশিম শাহজাদীকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন। রোম সম্রাটের উদ্দেশ্য ছিল যে, ঐ নবূওয়াতের নূর, যা হাশিমের কপালে চমকাতো একে নিজের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া। বলা হয়ে থাকে যে, মৃত্যুকালে হাশিমের বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর।[১]

হাশিমই প্রথমে কুরায়শদের মধ্যে এ প্রথা চালু করেন যে, বাণিজ্য কাফেলা বছরে মাত্র দু'বার যাত্রা করবে, গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার দিকে এবং শীতকালে ইয়েমেনের দিকে। এ প্রথা অনুযায়ী প্রতি মৌসুমে কাফেলা যাত্রা করতো। নিথর প্রান্তর, শুষ্ক মরুভূমি ও জল-স্থল অতিক্রম করে শীত মৌসুমে ইয়েমেন এবং আবিসিনিয়া পর্যন্ত পৌঁছতো। আবিসিনিয়ার শাসক নাজ্জাশী হাশিমকে আতিথেয়তা করতেন এবং উপঢৌকন দিতেন। আর গ্রীষ্ম মৌসুমে সিরিয়া, গাযা ও আঙ্কারা (যা তৎকালে রোম সম্রাটের রাজধানী ছিল) পর্যন্ত পৌঁছতেন। রোম সম্রাটও হাশিমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন ও উপঢৌকনাদি প্রদান করতেন। তাবাকাতে ইবন সা'দ-এ (১খ. পৃ. ৪৩) একটি কবিতা বর্ণিত আছে :

سفرين سنها له ولقومه سفر الشتاء ورحلة الاصياف

"হাশিম নিজ সম্প্রদায়ের জন্য দু'টি সফরের প্রথা চালু করেন, এক সফর শীতকালীন এবং দ্বিতীয় সফর গ্রীষ্মকালীন।" —মা'আলিমুত তানযীল

হাশিম ইয়েমেন ও রোম শাসকের নিকট থেকে এ বাণিজ্য কাফেলার জন্য বাণিজ্য সহযোগিতা ও নিরাপত্তার নির্দেশনামা সংগ্রহ করেন। আরবের পথঘাট যেহেতু সাধারণত নিরাপদ ছিল না, তাই তিনি পথিপার্শ্বের গোত্রগুলোর সাথে এ মর্মে চুক্তি করেন যে, আমরা তোমাদের প্রয়োজন মেটাবো, বিনিময়ে তোমরা আমাদের বাণিজ্য কাফেলার ক্ষতি করতে পারবে না। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ৪৫)

হাশিমের এ প্রচেষ্টার ফলে সমস্ত পথঘাট নিরাপদ হয়ে গিয়েছিল। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরায়শকে এ পুরস্কারের কথা এ বলে স্মরণ করিয়ে দেন :

لِإِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝ اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

১. যারকানী, ১খ. পৃ.৭২।

"যেহেতু কুরায়শের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের, ওরা ইবাদত করুক এই গৃহের রক্ষকের, যিনি ওদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে ওদের রক্ষা করেছেন।" (সূরা কুরায়শ : ১-৪)

যখন হজ্জের সময় এসে পড়তো, হাশিম হাজীদেরকে গোশত রুটি, খেজুর, ছাতু ইত্যাদি খাওয়াতেন এবং যমযমের পানি পান করাতেন। মিনা, মুযদালিফা ও আরাফাতেও তিনি এভাবেই খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করতেন।

উমায়্যা ইবন আবদুশ শামস হাশিমের এ মান-মর্যাদা ও সমগ্র আরবে তাঁর আধিপত্য অসহনীয় ও কঠিন মনে করলেন। তিনিও হাশিমের মত জনগণকে খাদ্যদানের চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রাচুর্য ও দৌলতের স্বল্পতাহেতু উমায়্যা হাশিমের মুকাবিলা করতে সক্ষম হননি। বনী হাশিমের সাথে বনী উমায়্যার শত্রুতার সূচনা এখান থেকেই হয়।

একবার হাশিম বাণিজ্য কাফেলার সাথে যাত্রা করেন। পথে মদীনা মুনাওয়ারায় যাত্রা বিরতি করেন। সেখানে বাজারে একটি স্ত্রীলোক তাঁর চোখে পড়ে। অপূর্ব সুন্দরী হওয়া ছাড়াও তার চেহারায় আভিজাত্য, নিষ্কলুষতা ও বুদ্ধিমত্তার ছাপ বিদ্যমান ছিল। হাশিম খোঁজ নিলেন স্ত্রীলোকটি বিবাহিত না অবিবাহিত। জানা গেল সে আসীহা ইবন জাল্লাহ-এর স্ত্রী ছিল। সে গর্ভে উমর এবং মাব'আদ নামক দু'টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পরে আসীহা তাকে তালাক দেয়।

হাশিম তাকে বিয়ের প্রস্তাব করেন। হাশিমের আভিজাত্য ও আত্মসম্মান লক্ষ্য করে স্ত্রীলোকটি তার প্রস্তাব গ্রহণ করে; ফলে বিয়ে হয়ে যায়। স্ত্রীলোকটির নাম ছিল সালমা বিনতে আম্‌র। তারা ছিল বনী নাজ্জার গোত্রভুক্ত। বিয়ের পর হাশিম ভোজের আয়োজন করেন, যাতে সমগ্র কাফেলার লোক অংশগ্রহণ করে। এছাড়া খাযরাজ গোত্রের কিছু লোককেও দাওয়াত দেয়া হয়।

বিয়ের পর হাশিম কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করেন। আর সালমা গর্ভবতী হয়ে যান। যার ফলে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর তার মাথায় একটি চুল সাদা ছিল, ফলে তার নাম শায়বা (বৃদ্ধ) রাখা হয়। হাশিম কাফেলার সাথে গাযা রওনা হন। গাযায় পৌঁছে তিনি ইনতিকাল করেন এবং তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়।[১]

আবদুল মুত্তালিব : আবদুল মুত্তালিবের নাম ছিল শায়বাতুল হামদ। নামটি পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে একটি ঘটনা। হাশিমের ইনতিকালের পর আবদুল মুত্তালিবের মাতা দীর্ঘদিন পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারায় স্বীয় গোত্র বনী খাযরাজের সাথে অবস্থান করেন। যখন পুত্র শায়বা একটু বড় হন, তখন তার চাচা মুত্তালিব তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মক্কা থেকে মদীনা আসেন। যখন তাকে নিয়ে ফিরে যান তখন মক্কায় প্রবেশের সময় শায়বা স্বীয় পিতৃব্য মুত্তালিবের পিছনে উটের পিঠে বসা ছিলেন। তার

১. ইবন সা'দ, তাবাকাতুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৪৫-৪৬।

পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল ময়লা ও ধূলিমলিন। চেহারা থেকে অসহায়ত্বের ভাব ফুটে উঠছিল। লোকজন মুত্তালিবকে জিজ্ঞেস করলো ছেলেটি কে ? তিনি লজ্জাবশত জবাব দিলেন, এটি আমার গোলাম, যাতে লোকজন এটা বলতে না পারে যে ভ্রাতুষ্পুত্রের পোশাকাদি এতো নোংরা। এ কারণে শায়বাতুল হামদ আবদুল মুত্তালিব নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। মুত্তালিব মক্কায় পৌঁছে ভ্রাতুষ্পুত্রকে উত্তম পোশাক বানিয়ে দিলেন এবং সকলের কাছে প্রকাশ করলেন যে, এটি আমার ভাই-পো।[১]

তিনি দৃষ্টিকাড়া সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। কবি বলেন :

على شيبة الحمد الذى كان وجهه يضيئى ظلام الليل كالقمر البدرى

"পূর্ণিমার চাঁদের মতো শায়বাতুল হামদ-এর চেহারা, অন্ধকার রাতকে করে আলোকিত।"

ইবন সা'দ স্বীয় তাবাকাত গ্রন্থে বর্ণনা করেন, সমস্ত কুরায়শের মধ্যে আবদুল মুত্তালিব সবচে' সুন্দর সবচে' বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী, সবচে' বেশি ধৈর্য ও সহ্যশক্তির অধিকারী, সবচে' বেশি দাতা ও দয়ালু এবং খারাপ কাজ ও ঝামেলা থেকে বেশি দূরে অবস্থানকারী ছিলেন, আর তিনি ছিলেন কুরায়শদের মনোনীত সর্দার।[২]

আবদুল মুত্তালিবের দয়া-দাক্ষিণ্য তাঁর পিতা হাশিমের চেয়ে বেশি ছিল। তাব মেহমানদারী মানুষের পর্যায় অতিক্রম করে পশু-পাখি পর্যন্ত পৌঁছায়। এ কারণে আরববাসী তাঁকে 'ফাইয়্যায' (পরম দাতা) ও مطعم طير السماء (আকাশের পাখিদের খাদ্যদানকারী) উপাধি দ্বারা স্মরণ করতো। মদ্যপানকে তিনি নিজের জন্য হারাম করে নেন। পবিত্র রমযান মাস এলে তিনি ফকীর-মিসকীনকে খাদ্যদানের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতেন। হেরা গুহায় নির্জন ইবাদতের সূচনা আবদুল মুত্তালিবই করেছিলেন।[৩]

যমযমেব কূপ এবং আবদুল মুত্তালিবের স্বপ্ন

জুরহুম গোত্রের প্রকৃত বাসস্থান ছিল ইয়েমেন। তাদের দুর্ভাগ্যবশত ইয়েমেনে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ কারণে বনী জুরহুম উপার্জনের সন্ধানে বের হয়। ঘটনাক্রমে চলার পথে হযরত ইসমাঈল (আ) ও তাঁর মাতা হযরত হাজেরা (আ)-এর সাথে যমযম কূপের নিকট সাক্ষাত ঘটে। বনী জুরহুমের জায়গাটি পছন্দ হয় এবং তারা সেখানেই বসবাস শুরু করে। এর কিছুদিন পর ঐ গোত্রের মেয়ের সাথেই ইসমাঈল (আ)-এর বিয়ে হয়। তিনি নবী হিসেবে আমালিকা, জুরহুম ও ইয়েমেনবাসীর প্রতি প্রেরিত হন। একশত ত্রিশ বছর বয়সে ইসমাঈল (আ) ইনতিকাল করেন। হাতীমে তার মাতার কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়। তার ইনতিকালের পর ওসীয়ত অনুযায়ী তার পুত্র কায়দার কাবাগৃহের মুতাওয়াল্লী হন। এভাবেই ইসমাঈল (আ)-এর

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১২৪।

২ আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৫১।

৩. যারকানী, ১খ. পৃ. ৭১।

বংশ থেকে কাবাগৃহের মুতাওয়াল্লী হতে থাকে। দীর্ঘকাল পরে ইসমাঈল বংশধর ও বনী জুরহুমের মধ্যে মতানৈক্য ও বিবাদের সূচনা হয়। অবশেষে বনী জুরহুম বিজয়ী হয় ও মক্কার কর্তৃত্ব তাদের হাতে এসে যায়। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর জুরহুম শাসকগণ জনগণের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন শুরু করে। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইসমাঈলের বংশধরগণ মক্কা ছেড়ে এর চতুষ্পার্শ্বে দূরে গিয়ে বসবাস শুরু করে। জুরহুমের অন্যায়-অত্যাচার, পাপাচারিতা এবং কাবার অসম্মানকরণ যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন মক্কার চারপাশের সমস্ত আরব গোত্র তাদের সাথে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হয়। অগত্যা জুরহুমগণকে মক্কা ত্যাগ করে পলায়ন করতে হয়। কিন্তু যখন তারা মক্কা ত্যাগ করা শুরু করে, তখন কা'বার মূল্যবান দ্রব্যাদি যমযম কূপে নিক্ষেপ করে এবং যমযম কূপকে মাটি ভরাট করে এভাবে বন্ধ করে যে যমীন সমান হয়ে যায়। এমনকি যমযমের চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল না।

বনী জুরহুম মক্কা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর বনী ইসমাঈল পুনরায় মক্কায় ফিরে আসে এবং বসতি স্থাপন করে। কিন্তু যমযম কূপের প্রতি কেউ নজর দেয় নি। কালের আবর্তনে এর নাম-নিশানা পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমনকি যখন মক্কার শাসনভার ও নেতৃত্ব আবদুল মুত্তালিবের হাতে আসে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় ঐদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় যে, যমযম কূপ যা দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ রয়েছে এবং যার নাম-নিশানাও মুছে গেছে একে দৃশ্যমান করা হোক। তখন সত্য স্বপ্ন দ্বারা আবদুল মুত্তালিবকে ঐ জায়গা খননের নির্দেশ দেয়া হয়। জায়গার চিহ্ন ও আলামতসমূহও স্বপ্নে দেখিয়ে দেয়া হয়। যেমনটি আবদুল মুত্তালিব বলেছেন :

"আমি হাতীমে ঘুমিয়ে ছিলাম। এমন সময় দেখলাম এক আগন্তুক আমার নিকটে এলো এবং স্বপ্নে আমাকে বললো, احفر برة। অর্থাৎ 'কূপটি খনন কর।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কূপটি ? ততক্ষণে ঐ লোকটি চলে গেলো। পরদিন আবার ঐ জায়গায় ঘুমালাম। স্বপ্নে দেখলাম ঐ ব্যক্তি এসে বললো, احفر المضنونة। 'মাযনূনা খনন কর।' আমি প্রশ্ন করলাম, মাযনূনা কি ? কিন্তু লোকটি চলে গেল। তৃতীয় দিন পুনরায় একই জায়গায় ঘুমালাম। দেখলাম, ঐ ব্যক্তি এসে বললো, احفر طيبة। –'পবিত্র স্থান খনন কর।' আমি শুধালাম, তায়্যেবা কি ? কিন্তু লোকটি চলে গেল। চতুর্থ দিন ঠিক একই জায়গায় স্বপ্নে দেখলাম, ঐ ব্যক্তি এসে বলছে, احفر زمزم। 'যমযম খনন কর।' আমি শুধালাম, যমযম কি ? সে বললো, لا تنزف ابدا ولا تزم تسقى الحجيج الاعظم 'এটি পানির একটি কূপ, যার পানি কখনো নষ্টও হয় না আর কমেও না। অসংখ্য হাজীর পিপাসা নিবৃত্ত করে।"

অতঃপর তিনি সেই স্থানটির কিছু নিদর্শন ও চিহ্ন বলে দিয়ে সেই স্থান খুঁড়তে বলে। এভাবে বারবার স্বপ্নে দেখানো এবং নিদর্শন দেখানোর ফলে আবদুল মুত্তালিবের বিশ্বাস হলো যে এটা সত্য স্বপ্ন।

তিনি কুরায়শদেরকে নিজের স্বপ্নের কথা বলেন এবং এও বলেন যে, আমি ঐ জায়গা খুঁড়ে দেখতে চাই। কুরায়শরা এর বিরোধিতা করে। কিন্তু আবদুল মুত্তালিব এ বিরোধিতার পরোয়া করলেন না, বরং কোদাল ইত্যাদি নিয়ে নিজ পুত্র হারিস সহ ঐ স্থানে পৌঁছলেন এবং চিহ্নিত স্থান খুঁড়তে শুরু করলেন। তিনি নিজে খুঁড়ছিলেন এবং পুত্র হারিস মাটি তুলে দূরে ফেলছিলেন। তিনদিন খোঁড়ার পর এর চিহ্ন দেখা গেল। আবদুল মুত্তালিব খুশিতে 'আল্লাহু আকবর' বলে তাকবীর ধ্বনি দিলেন এবং বললেন : هذا طوى اسماعيل "এটাই ইসমাঈল (আ)-এর কূপ।"

এরপর আবদুল মুত্তালিব যমযমের নিকটে কিছু হাউয নির্মাণ করালেন—যাতে হাজীদের পান করানোর জন্য পানি ভরে রাখা হতো। কিছু দুষ্কৃতকারী অপকীর্তি শুরু করলো। তারা রাতে এসে হাউযগুলো নোংরা করে রেখে যেত। যখন প্রভাত হতো, আবদুল মুত্তালিব সেগুলো পরিষ্কার করতেন। অবশেষে অতীষ্ঠ হয়ে এ ব্যাপারে আল্লাহর নিকট দু'আ করেন। তখন স্বপ্নযোগে তাঁকে বলা হয়, তুমি এ দু'আ করো : اللهم انى لا احلها المغتسل ولكن هى لشارب حل "হে আল্লাহ্ আমি এ যমযমের পানিতে লোককে গোসলের অনুমতি দিই না, শুধু পান করার অনুমতি দিই।"

সকালে উঠেই আবদুল মুত্তালিব এটা ঘোষণা করে দেন। এরপর যে কেউ এ হাউজ নষ্ট করার ইচ্ছা করতো, সেই কঠিন অসুখে পতিত হতো। যখন বারবার এ ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকলো, তখন দুষ্কৃকারীরা আবদুল মুত্তালিবের হাউজের বিরোধিতা করা ছেড়ে দিল। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ইবন সা'দ-এর তাবাকাতে (পৃ. ৪৯-৫০); খাসাইসুল কুবরায় (১খ. পৃ. ৪৩-৪৪); যারকানী (১খ. পৃ. ৯৪) এবং ইবন কাসীর-এর আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (২খ. পৃ. ২৪৪) উল্লিখিত আছে।

আবদুল মুত্তালিবের মান্নত

যমযমের কূপ খননকালে একমাত্র হারিস ছাড়া আবদুল মুত্তালিবের আর কোন সন্তান-সন্তুতি ছিল না। এজন্যে তিনি মান্নত করলেন যে, আল্লাহ যদি আমাকে দশটি পুত্র সন্তান দান করেন, আর তারা যদি জাওয়ান হয়ে আমার বল বৃদ্ধি করে, তা হলে আমি তাদের মধ্য থেকে একজনকে আল্লাহর নামে কুরবানী করবো। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর এ ইচ্ছা পূর্ণ করলেন এবং দশটি পুত্রই যুবা বয়সে উপনীত হলো, তখন একদিন তিনি কাবাঘরের সামনে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন, يا عبد المطلب اوف بنذرك لرب هذا البيت "হে আবদুল মুত্তালিব ! এ গৃহের মালিকের উদ্দেশে তোমাব মান্নত পূর্ণ কর।"

আবদুল মুত্তালিব জাগ্রত হয়ে তাঁর সব পুত্রকে ডাকলেন এবং নিজ মান্নতের কথা ও স্বপ্নের কথা তাদেরকে বললেন। তখন সব পুত্র একবাক্যে বললেন, اوف بنذرك وافعل ما شئت "আপনার মান্নত আপনি পূর্ণ করুন, যা ইচ্ছে হয় করুন।"

আবদুল মুত্তালিব তাঁর সব পুত্রের নামে লটারী করলেন। প্রসঙ্গক্রমে আবদুল্লাহর নামই উঠলো—যাকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। তিনি আবদুল্লাহর হাত ধরে কুরবানীর স্থানের দিকে নিয়ে চললেন, হাতে ছুরিও ছিল। এ অবস্থা দেখে আবদুল্লাহর বোনেরা কান্নাকাটি শুরু করলো। ওদের এক বোন বললো, বাবা আপনি দশটি উট ও আবদুল্লাহর মধ্যে লটারী করুন। যদি দশ উটের পক্ষে লটারী উঠে তা হলে দশটি উট কুরবানী করুন আর আমাদের ভাইকে ছেড়ে দিন। সে সময়ে হত্যার বিনিময়ে দিয়াত হিসেবে দশটি উট নির্ধারণ করা হতো।

লটারী করা হলেও এতে আবদুল্লাহর নামই উঠলো। আবদুল মুত্তালিব দশটি দশটি করে উট বাড়িয়ে লটারী করতেই থাকলেন, কিন্তু প্রতিবারই আবদুল্লাহর নামই উঠতে থাকলো। এমনকি এভাবে যখন একশ' উট পূর্ণ হলো, তখন আবদুল্লাহর পরিবর্তে উটের নাম উঠলো। আবদুল্লাহ সহ উপস্থিত সবাই 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। বোনেরা ভাইকে তুলে নিয়ে গেল। আবদুল মুত্তালিব সাফা মারওয়া পাহাড়েব মধ্যবর্তী স্থানে নিয়ে একশত উট কুরবানী করলেন।[১]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, প্রথমে দিয়াতের পরিমাণ ছিল দশটি উট। আবদুল মুত্তালিবই সর্বপ্রথম কুরায়শ এবং আরব জাহানে একশত উট দিয়াত প্রথার প্রচলন করেন। আর নবী করীম (সা) ও এ প্রথা চালু রাখেন। এ ঘটনার পর থেকে আবদুল্লাহকে 'যবীহ' উপাধি দেয়া হয়, আর নবী করীম (সা) কে 'ইবনুয-যবীহায়েন' অর্থাৎ দু'যবীহ-এর সন্তান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[২]

হযরত মুআবিয়া (রা) বলেন, একবার আমরা মহানবী (সা)-এর খিদমতে উপবিষ্ট ছিলাম, ইত্যবসরে এক বেদুঈন এলো এবং নবী (সা)-কে এভাবে সম্বোধন করলো, يا ابن الذبيحين 'হে দু'যবীহ-এর পুত্র !' এতে তিনি মুচকি হাসলেন। হযরত মুআবিয়া যখন এ হাদীস বর্ণনা সমাপ্ত করলেন, তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে কেউ প্রশ্ন করলো, ঐ দু'যবেহ কোনটি ? তখন হযরত মুআবিয়া (রা) আবদুল্লাহর ঐ ঘটনাটি বর্ণনা করে বললেন, এক তো আবদুল্লাহ আর দ্বিতীয়জন হচ্ছেন হযরত ইসমাঈল (আ)।[৩] (হাকিম এবং ইবন জারীর এটি বর্ণনা করেছেন)।

আল্লামা যারকানী বলেন, কুরায়শগণ যখন বাৎসরিক দুর্ভিক্ষের মৌসুমে পড়তো তখন আবদুল্লাহকে সাবীর পাহাড়ে নিয়ে যেত এবং তাঁর উসীলায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতো। কোন কোন সময় এমনও হয়েছে যে, কুরায়শদের সমস্যা আবদুল মুত্তালিবের উসীলায় সমাধান হয়ে যেত।

---

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২খ. পৃ. ২৪৪।

২ হযরত ইসমাঈল (আ) ও পিতা আবদুল্লাহ।

৩. হাকিম ও ইবন জুবায়রের উদ্ধৃতিসহ খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৪৫।

সাধারণ আরব থেকে তাঁর বৈশিষ্ট্যই ছিল আলাদা। নিজ সন্তানদের তিনি অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতেন এবং উত্তম চরিত্র গঠনে উৎসাহিত করতেন, তাদের নিম্ন ও নিকৃষ্ট কাজ থেকে বিরত রাখতেন।

আবদুল মুত্তালিব মান্নত পুরা করার প্রতি গুরুত্ব দিতেন এবং মুহরিম (যেমন, বোন ফুফু খালা ইত্যাদি) স্ত্রীলোককে বিয়ে করতে বারণ করতেন। মদ্যপান, ব্যভিচার, কন্যা সন্তান হত্যা এবং উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে বাধা দিতেন। তিনি চোরের হাত কাটার বিধান দিতেন (যারকানী, ১খ. পৃ. ৮২)। আর এগুলো সবই এমন কর্ম, (পরবর্তীকালে) কুরআন ও হাদীসেও যার সমর্থনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই সীরাতে হালবিয়া গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল জাওযী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুল মুত্তালিব থেকে যে সব কর্মের কথা বর্ণিত হয়েছে, এর অধিকাংশই কুরআন ও হাদীসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ মান্নত পুরা করা, মুহরিমকে বিয়ে নিষিদ্ধ করা, চোরের হাত কাটা, কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দেয়ায় নিষেধাজ্ঞা, মদ্যপান ও ব্যভিচারে নিষেধাজ্ঞা, নগ্নাবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফে নিষেধাজ্ঞা, পরিশেষে এ ঘটনাবলী ও বিষয়াবলী পাঠ করতে গিয়ে স্বভাবতই এ সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠে যে, নবূওয়াতের সময় যতই নিকটবর্তী হচ্ছিল ততই উত্তম চরিত্র, সুন্দর শিষ্টাচার, বরকতের নূর এবং চাহিদার উপজীব্যের প্রকাশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বিশেষত আবদুল মুত্তালিবের জীবনে সত্য স্বপ্ন, যা পর্যায়ক্রমে দেখানো হচ্ছিল, এটা নবূওয়াতের সূচনা ও প্রারম্ভিকতার মতই। আবদুল মুত্তালিবের সামনে যখনই কোন সমস্যা দেখা দিত, তখনই সত্য স্বপ্ন কিংবা 'ইলহাম' দ্বারা তা সমাধানের পথ-নির্দেশ করা হতো।

সহীহ মুসলিমে হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে বনী কিনানাকে নির্বাচন করেছেন, আর বনী কিনানার মধ্যে কুরায়শকে এবং কুরায়শের মধ্যে বনী হাশিমকে আর বনী হাশিমের মধ্যে আমাকে নির্বাচিত ও মনোনীত করেছেন। হযরত ইবন সা'দ (রা) বর্ণিত অনুরূপ একটি মুরসাল হাদীসে "বনী হাশিমের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবকে" বাক্যটি অতিরিক্ত আছে।

এরূপ বলার মধ্যে নবী করীম (সা)-এর আত্মগর্ব প্রকাশের উদ্দেশ্য কোনক্রমেই ছিল না, বরং প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরাই ছিল উদ্দেশ্য—যাতে জনগণ তাঁর অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। অধিকন্তু আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু প্রদত্ত এ নিয়ামতের বর্ণনা প্রকাশই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, রাব্বুল আলামিনের লক্ষ লক্ষ শুকরিয়া, তিনি আমাকে একটি মনোনীত ও পছন্দনীয় বংশ থেকে প্রেরণ করেছেন।

নিজের অহমিকা প্রকাশ ও অপরের কুৎসাকে অহংকার বলে। নিজের সম্মান ও যথার্থ মূল্যায়নের লক্ষ্যে অপরের যিল্লতির প্রকৃত অবস্থা তথ্য হিসেবে তুলে ধরাকে গর্ব বা অহংকার বলা হয় না। এছাড়া নবী ও ওলীদের মধ্যে পার্থক্য হলো, ওলীর জন্য নিজের কোন কৃতিত্ব প্রকাশ করা আবশ্যকীয় নয়, এমনকি ওলীর নিজের

বিলায়তের প্রকাশও আবশ্যকীয় নয়। হ্যাঁ, তবে যদি কোন সময়ে দীনী কোন বিষয়ে এটা ঘোষণা করা দরকার হয় (তবে তা স্বতন্ত্র)। এর বিপরীতে নবীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এটাই যে, নিজ নবূওয়াত ও রিসালাতের মতই তাঁরা আল্লাহ্ প্রদত্ত কামালাতেরও প্রচার করেন, যাতে উম্মত তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং তাঁর কামালাত থেকে উপকৃত হতে পারে এবং কোনো কারণে তাঁর মর্যাদা ও গুণাবলীতে কারো বিন্দুমাত্রও সন্দেহের সৃষ্টি না হয়। কারণ আল্লাহ্ না করুন, এরূপ বদ ধারণা কোন দুর্ভাগার ঈমান বিনষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। মোটকথা কেউ তাঁর নবূওয়ত ও রিসালাতের উপর যেমনিভাবে ঈমান এনেছে, ঠিক তেমনিভাবে যেন তাঁর মুস্তফা, মুজতবা সহ সর্বপ্রকারের পসন্দনীয় গুণাবলীর উপরও ঈমান আনতে পারে। এজন্যেই হাদীসে এসেছে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন : انا سيد ولد ادم ولا فخر "আমি সমস্ত বনী আদমের সর্দার, এটা গর্ব করে বলছি না (বরং বাস্তব অবস্থা জানাবার জন্য বলছি)।"

এ জন্যে যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ হলো :

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ –

–"হে রাসূল ! যা তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর। যদি না কর, তা হলে তুমি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলে না।" (সূরা মায়িদা : ৬৭)

তাই নবূওয়াত ও রিসালাতের স্বার্থেই এই নির্দেশের ভিত্তিতে স্বীয় মর্যাদার কথা প্রচার করাও অত্যন্ত জরুরী। এটা অহংকার প্রকাশের জন্য নয়।

এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, জিবরাঈল (আ) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত জমি চষে বেড়িয়েছি; কিন্তু বনী হাশিম অপেক্ষা উত্তম কাউকেই পাইনি। হাদীসটি ইমাম আহমদ ও তিবরানী উদ্ধৃত করেছেন। হাফিয আসকালানী বলেন, হাদীসটিতে সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার সমুদয় শর্তই বিদ্যমান।[১]

হাকিম তিরমিযী বলেন, জিবরাঈল (আ) পবিত্র আত্মার সন্ধানে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু যুগটা যেহেতু জাহিলিয়াতের ছিল, সেহেতু জিবরাঈল (আ) মানুষের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের প্রতি দৃষ্টি দেননি; বরং প্রকৃতি ও স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি দেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণভাবে আরববাসী এবং বিশেষভাবে বনী হাশিম থেকে উত্তম কাউকে পাননি। এই সময়ে তারা পৃথিবীর অপরাপর জাতিগোষ্ঠী থেকে কতিপয় বিষয়ে এমন মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল যে, আর কোন সম্প্রদায় এর সমমানসম্পন্ন এবং সমপর্যায়ের ছিল না।

---

১. যারকানী, ১খ, পৃ. ৬৮।

বংশ পরিচিতি : আরবে বংশ পরিচিতি অতীব গুরুত্ববহ ছিল। সেখানে মানুষ তো বটেই, ঘোড়ার পর্যন্ত বংশ পরিচিতিও স্মরণ রাখা হতো। এটাও স্মরণ রাখা হতো যে, কে স্বাধীন নারীর গর্ভজাত আর কে বাঁদীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী। কে সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের দুধপান করেছে আর কে নিম্ন কৃষ্টির অনুসারী বংশীয় স্ত্রীলোকের দুধপান করেছে। যেমনটি ইবনুল আকওয়া (রা)-এর বক্তব্য থেকে অনুধাবন করা যায়। তিনি বলেছিলেন : انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع "আমি আকওয়ার পুত্র, আর আজ বুঝা যাবে যে, কে সম্ভ্রান্ত স্বাধীন স্ত্রীলোকের স্তন্য পান করেছে আর কে দাসীর দুধ পান করেছে।"

অনুরূপ জাহিলী যুগের এক কবি নিজ বংশ পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেন, যদিও তা অহংবোধ-দুষ্ট। যেমন :

لو كنت من مازن لم تستبح ابلى   بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا

"যদি আমি মাযিন গোত্রের সন্তান হয়ে থাকি, তা হলে যুহল ইন শায়বান গোত্রের লোক রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা মহিলার পুত্র কক্ষণই আমার উট ধরতে পারবে না।"

প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তাকে 'বনী লাকীত' তথা 'রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা' শব্দদ্বারা আখ্যায়িত করেছে। অর্থাৎ সে কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান নয়।

বীরত্ব : তাদের বীরত্ব ও সাহসিকতা এমন ছিল, যে সময় সমগ্র পৃথিবী যখন পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের অনুগত ও আজ্ঞাবহ ছিল, সে সময়ও আরবগণ তাদের দৈন্যদশা সত্ত্বেও কারো অধীন ছিল না। সাহসিকতার অবস্থা এমন ছিল যে একজন তুচ্ছ ফকীরও পরাক্রমশালী বাদশাহর সামনে ভীত-সন্ত্রস্ত হতো না।

দানশীলতা ও অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দান : আরবদের দানশীলতার অবস্থা এমন ছিল যে, একজন মেহমানের জন্য তারা আস্ত একটা উট যবেহ করে ফেলতো। তারা নিজেরা ক্ষুধার্ত থাকাটা মামুলী ব্যাপার; কিন্তু মেহমানের অভুক্ত থাকাটা অসম্ভব অবমাননাকর মনে করতো।

স্মরণশক্তি ও তীক্ষ্ণ মেধা : আরবদের স্মরণশক্তি ও তীক্ষ্ণ মেধার কথা পৃথিবীজোড়া। শত শত কবিতা ও কাসীদা তারা একবার শুনেই মনে রাখতে পারতো।

আত্মসম্মান ও সম্ভ্রমবোধ : তাদের আত্মসম্মান ও সম্ভ্রমবোধের অবস্থা এরূপ ছিল যে, তাদের নিজের অথবা নিজ সম্প্রদায়ের সর্বনিকৃষ্ট সদস্যটির অপমানের প্রতিবাদেও তারা নিজেদের জানমাল পানির মতো ব্যয় করতো। মাত্রাতিরিক্ত আত্মমর্যাদাবোধ থেকেই তাদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহ বেশিরভাগ সংঘটিত হতো।

ভাষার প্রাঞ্জল্য ও বিশুদ্ধতা প্রাঞ্জল্য ও বিশুদ্ধতায় কোন ভাষাই আরবীর ধারেকাছেও ছিল না। ভাষার প্রাঞ্জল্যের উপর তো কোন ভাষায় পৃথক কোন পুস্তকই

নেই। যদি কিছু থেকে থাকে, তা আরবী ভাষা থেকেই গৃহীত ও ধারণকৃত। প্রকৃতি তাদের স্বভাব চরিত্রে, সৃষ্টি আধিপত্যে পরিপূর্ণতার এই মণি-মাণিক্য দান করেছিল, কিন্তু মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে এটা কেবল অপাত্রে ব্যবহৃত হতো। অতঃপর যখন প্রভু প্রদত্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ দ্বারা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল, তখন এই সম্প্রদায় যারা কর্মে পশু থেকেও নিকৃষ্ট ছিল, তারা ফেরেশতাতুল্য উত্তম ও উন্নত চরিত্রের হয়ে গেল। আর এই সপ্রদায়, যারা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিল, যখন আল্লাহর পথে জীবনোৎসর্গ ও মস্তকদানের জন্য দাঁড়িয়ে গেল, তখন আসমানের ফিরিশতাগণও শ্বেত উত্তরীয় ও কৃষ্ণ পাগড়ী বেঁধে তাদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতেন। মোটকথা, আরববাসীগণ যদিও অনেকক্ষেত্রে ক্রিয়াকর্মের দিক থেকে তখন উত্তম ছিল না; কিন্তু চরিত্র,[১] প্রতিভা, স্বভাব-প্রকৃতি এবং যোগ্যতার দিক দিয়ে খুবই অগ্রগামী ছিল। কর্মের পরিশুদ্ধি সহজতর, কিন্তু স্বভাব-চরিত্র এবং অভ্যাস বদলে ফেলা অসম্ভব। এজন্যে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু নিজের নবূওয়াত ও রিসালাতের জন্য এই বংশকে নির্বাচন করেন যাতে করে এই সম্প্রদায়ে যে নবী পয়দা হবেন, তিনি পরিপূর্ণ চরিত্র, উত্তম স্বভাব, উৎকৃষ্ট আচরণবিশিষ্ট হবেন। তাই নবীর জন্য পরিপূর্ণ চরিত্রবান হওয়া একান্তই আবশ্যক যাতে অন্যরা তা দেখে নিজেদের সংশোধন করতে পারে।

আবদুল্লাহ্ : হাফিয আসকালানী বলেন, নিঃসন্দেহে এটা নবী (সা)-এর পিতার নাম।[২] এটা ঐ নাম, যা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। যেমনটি হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ "ঐ দু'টি নাম আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়, একটি আবদুল্লাহ্ এবং দ্বিতীয়টি আবদুর রহমান" (মুসলিম)। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্ শব্দটি ইসমে আযম—যেমনটি ইমাম আবূ হানীফা (নুমান) (র) থেকে বর্ণিত আছে, যা ইমাম তাহাবী স্বীয় মুশকিলুল আসার গ্রন্থে (১খ. পৃ. ৬৩) নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন :

اسم اعظم هست الله العظيم   جان جان و محيى اعظم رميم

"ইসমে আযম আল্লাহুল আযীম আমার প্রাণের প্রাণ, যা আমাকে করে মর্যাদাবান।"

সমস্ত সুন্দর নাম ইসমে আযম আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর অধীন। আল্লাহ্ নামের পর রাহমান নামের মর্যাদা অনুভূত হয়, যেমন আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী ঐদিকে ইঙ্গিত দান করে : قُلْ اَدْعُ اللّٰهَ اَوادْعُوا الرَّحْمٰنُ (হে নবী !) "আপনি বলে দিন, তাঁকে আল্লাহ্ নামে ডাকো অথবা রাহমান নামে ডাকো।" এ কারণে ঐ দু'টি নাম সব চেয়ে প্রিয়। প্রথমটি আবদুল্লাহ্ যা ইসমে আযমের সাথে সম্বন্ধযুক্ত এবং দ্বিতীয়টি আবদুর রহমান যা রাহমান নামের সাথে সম্পর্কিত; যার মর্যাদা ইসমে আযমের পরেই।

---

১. হাফিয ইবন তাইমিয়া বলেন ঃ ليس فضل العرب فقريش فبنى هاشم بمجردكون النبى صلعم منهم وان كان هذا من الفضل بل هم فى انفسهم افضل الى باعتبار الاخلاق الكرام والخصال الحميدة واللسان العربى وبذلك يثبت النبى صلعم انه افضل نفسا ونسها والا الزم الدور যারকানী, ১খ. পৃ. ৬৯

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১২৪।

আশ্চর্যের কিছু নেই যে, হযরত আবদুল্লাহর জন্মকালীন সময়ে আবদুল মুত্তালিবের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে জাগরুক করে দেয়া হয়েছিল যে, এ পুণ্যময় সন্তানটির এমন একটি নাম রাখো, যা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়।

হযরত আমিনার সাথে আবদুল্লাহর বিবাহ

আবদুল মুত্তালিব যখন পুত্র আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে মান্নত আদায় সম্পন্ন করলেন, অতঃপর তাঁর বিয়ের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। বনী যোহরা গোত্র সম্ভ্রান্ত বংশীয় হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ গোত্রের ওহাব ইবন আবদে মানাফের কন্যা, যার নাম ছিল আমিনা—যিনি স্বীয় পিতৃব্য উহায়ব ইবন আবদে মানাফের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তাঁর সাথে পুত্র আবদুল্লাহর বিয়ের পয়গাম পাঠালেন আর নিজে উহায়বের কন্যা, যার নাম ছিল হালা, তার সাথে স্বীয় বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। একই মজলিসে দু'টি বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। হযরত হামযা ছিলেন তাঁরই গর্ভজাত যিনি সম্পর্কের দিক দিয়ে আবদুল্লাহর চাচাও হতেন, আবার দুধভ্রাতাও।[১]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, যখন আবদুল মুত্তালিব পুত্র আবদুল্লাহকে বিয়ে করানোর জন্য যাত্রা করেন, পথিমধ্যে এক ইয়াহূদী স্ত্রীলোককে অতিক্রম করেন যার নাম ছিল ফাতিমা বিনতে মুররা। সে তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদিতে অভিজ্ঞ ছিল। আবদুল্লাহর চেহারায় নবূওয়াতের নূর দেখে সে তাকে নিজের কাছে ডেকে নিল এবং প্রস্তাব করলো যে, আমি তোমাকে একশত উট উপহার দেব। হযরত আবদুল্লাহ তার জবাবে এ কবিতা আবৃত্তি করেন :

اما الحرام فالممات دونه   والحل لاحل فاستبينه

فكيف بالامر الذى تبغينه   يحمى الكريم عرضه ودينه

"হারাম গ্রহণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। আর এমন কাজ মোটেও হালাল নয় যা প্রকাশ করা যায় না। যে অবৈধ কর্মে তুমি আগ্রহী তা আমা দ্বারা সম্ভব নয়। আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষ তো নিজের আব্রু এবং নিজের দীনের হিফাযত ও সংরক্ষণ করে।

অতঃপর আবদুল্লাহ যখন আমিনাকে বিয়ের পর প্রত্যাবর্তন করছিলেন, পথে পুনরায় ঐ স্ত্রীলোকটির সাথে সাক্ষাত হলো। তখন সে বলল, হে আবদুল্লাহ! তুমি এখান থেকে যাওয়ার পর কোথায় ছিলে? হযরত আবদুল্লাহ বললেন, এ সময়ের মধ্যে আমি ওহাব ইবন আবদে মানাফের কন্যা আমিনাকে বিয়ে করেছি। এরপর সেখানে তিনদিন অবস্থান করেছি। এ কথা শুনে ঐ ইয়াহূদী স্ত্রীলোকটি বলল, আল্লাহর কসম, আমি কোন অসৎ চরিত্রা স্ত্রীলোক নই। তোমার চেহারায় নবূওয়াতের নূর দেখে ইচ্ছে করেছিলাম যে, ঐ নূর আমা থেকে প্রকাশিত হোক। কিন্তু আল্লাহ্ যেখানে চেয়েছেন, সেখানেই ঐ নূর গচ্ছিত রেখেছেন।

---

১. তাবাকাতুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৫৮।

এই রিওয়ায়াত দালাইলে আবূ নুআইমে[১] চার পদ্ধতিতে এবং তাবাকাতে ইবন সা'দ[২] -এ তিন পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে—যাতে কিছু কিছু বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্যতার প্রামাণ্য মানদণ্ডে দুর্বলও। কিন্তু যে রিওয়ায়াত এ ধরনের বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে, যদি ধরে নেয়া হয় যে, এর প্রতিটি সনদের এক এক রাবী দুর্বল, তবুও হাদীসবিদদের নিকট এ ধরনের হাদীস গ্রহণযোগ্য।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হওয়ার দরুন তা حسن لغيره-এর পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তাই যে রিওয়ায়াতের কেবল কোন কোন বর্ণনাকারী দুর্বল এবং এটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত, তা গ্রহণযোগ্য ও অনুসরণীয় হতে দোষ কোথায়? বিশেষ করে এ রিওয়ায়াত তারিখে তাবারীতে (২খ. পৃ. ১৭৫) ও সনদসহ বর্ণিত হয়েছে, যার অধিকাংশ বর্ণনাকারী সহীহ বুখারীর বর্ণনাকারী।

হযরত আবদুল্লাহ বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমন করেন। পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লে মদীনায় যাত্রাবিরতি করেন। বাণিজ্য কাফেলা যখন মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে তখন আবদুল মুত্তালিব জিজ্ঞেস করলেন আবদুল্লাহ কোথায়? কাফেলার লোকজন জবাব দিল, অসুস্থতার কারণে তিনি মদীনায় তার মাতুল গোষ্ঠী বনী নাজ্জারে রয়ে গেছেন। আবদুল মুত্তালিব তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হারিসকে দ্রুত মদীনায় প্রেরণ করেন। মদীনায় পৌঁছে তিনি জানতে পান, হযরত আবদুল্লাহ ইনতিকাল করেছেন। একমাস রোগ ভোগের পর তিনি ইনতিকাল করেন এবং মদীনায় 'দারে নাবিগায়' তাঁকে দাফন করা হয়। হারিস ফিরে এসে পিতা আবদুল মুত্তালিব এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনকে এ দুঃখজনক খবর জানান। যাতে সবাই খুবই দুঃখিত ও বিষণ্ন হয়ে পড়েন।[৩]

হযরত কায়স ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হযরত নবী করীম (সা) মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই আবদুল্লাহ ইনতিকাল করেন। হাকিম বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ; ইমাম যাহবী তা সমর্থন করেছেন।[৪]

ইনতিকালের সময়ে আবদুল্লাহর বয়স মতভেদে ৩০, ২৫, ২৮ কিংবা ১৮ ছিল। হাফিয আলাঈ এবং আসকালানী বলেন, বিশুদ্ধ মত এটাই যে, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর এবং আল্লামা সুয়ূতীও এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[৫] মৃত্যুকালে আবদুল্লাহ পরিত্যাক্ত সম্পদ হিসেবে রেখে যান পাঁচটি উট, কয়েকটি ছাগল এবং একটি বাঁদী যার উপনাম ছিল উম্মে আয়মান আর মূল নাম ছিল বরকত।

১. দালাইলে আবূ নুআইম, ১খ. পৃ. ৩৮।
২. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ৫৯।
৩. যারকানী, ১খ. পৃ. ১০৯।
৪. মুস্তাদরাকে হাকিম, ২খ. পৃ ৬০৫।
৫. যারকানী, ১খ. পৃ. ১০৯।

আসহাবে ফীল-এর ঘটনা

রাসূলে করীম (সা)-এর জন্মগ্রহণের পঞ্চাশ অথবা পঞ্চান্ন দিন পূর্বে আসহাবে ফীল-এর ঘটনা সংঘটিত হয়—যা জীবন চরিত ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত হয়ে আছে। আর কুরআন মজীদে এ ঘটনার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। বিস্তারিত ঘটনা তাফসীর গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে। সংক্ষেপে তা এই

আফ্রিকার আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে আবরাহা নামক এক ব্যক্তি ইয়েমেনের শাসনকর্তা ছিল। সে যখন দেখল যে, সমস্ত আরববাসী হজ্জ করার জন্য মক্কা মুকাররামায় চলে যায় এবং কা'বাগৃহ তাওয়াফ করে। তখন সে ইচ্ছে করলো যে, খ্রিস্টধর্মের নামে একটি বিরাট ইমারত তৈরি করবে যা খুবই মূল্যবান পাথর দিয়ে পরিশ্রম করে বানানো হবে; যাতে আরববাসীগণ সাদামাটা কা'বাঘর ছেড়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত ঘরটির তাওয়াফ শুরু করে। সুতরাং সে ইয়েমেনের রাজধানী সানআয় একটি সুন্দর গীর্জা নির্মাণ করালো। যখন এ খবর আরবে ছড়িয়ে পড়লো, তখন কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তি সেখানে যায় এবং আবরাহার নির্মিত ঘরটিতে মলত্যাগ করে পালিয়ে এলো। এটা হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত।

কেউ কেউ বলেন, আরবের যুবকরা ঐ গীর্জার নিকটবর্তী স্থানে আগুন জ্বালালে আগুনের ফুলকি উড়ে গিয়ে গীর্জায় পড়ে এবং তা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আবরাহা ক্রোধভরে শপথ নিল যে, কা'বাগৃহকে ধ্বংস ও মিসমার না করে সে দম ফেলবে না। এ উদ্দেশে আবরাহা মক্কার দিকে সেনা অভিযান পরিচালনা করে। পথিমধ্যে যে সব আরব গোত্র বাধা দান করে, তাদেরকে পর্যুদস্ত করে মক্কায় পৌঁছে যায়। এ বাহিনীর সাথে হাতিও ছিল। মক্কার উপকণ্ঠে মক্কাবাসীদের গবাদিপশুর চারণ ভূমি ছিল। আবরাহার বাহিনী পশুগুলোকে লুট করে নেয়, যেগুলোর মধ্যে মহানবী (সা)-এর সম্মানিত পিতামহ আবদুল মুত্তালিবেরও দু'শো উট ছিল। ঐ সময়ে তিনি কুরাইশ গোত্রের সর্দার ও কাবাগৃহের মুতাওয়াল্লী ছিলেন। আবরাহার আগমনের খবর শুনে তিনি সমস্ত কুরায়শকে একত্র করে বললেন ভয় পেয়ো না, তোমরা মক্কা খালি করে দাও, কা'বাঘর কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। এটা আল্লাহর ঘর এবং তিনিই এর হিফাযত করবেন। এরপর আবদুল মুত্তালিব কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কুরায়শসহ আবরাহার সাথে সাক্ষাত করতে যান। ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলো। আবরাহা আবদুল মুত্তালিবকে জাঁকজমকপূর্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। আল্লাহ তা'আলা আবদুল মুত্তালিবকে নযীরবিহীন রূপ-সৌন্দর্য, আশ্চর্যজনক শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী ও প্রাঞ্জলভাষী করেছিলেন, যা দেখে প্রতিটি ব্যক্তিই ভক্তি গদগদ হয়ে পড়তো। আবরাহাও তাঁকে দেখে ভক্তি গদগদচিত্ত হয়ে পড়লো এবং খুবই শ্রদ্ধা ও বিনয়সহ সামনে এলো। এটা তো সম্ভবপর মনে হয়নি যে, তাকে নিজ আসনে একসাথে বসতে দেয়। অবশ্য এতটুকু সম্মান করেছিল যে, নিজে আসন থেকে নেমে এসে কুরায়শদের সাথে কার্পেটে বসে তাদেরকেও নিজের সাথে বসায়। কথা প্রসঙ্গে আবদুল মুত্তালিব তাঁর

উটগুলো ফেরত দেয়ার প্রস্তাব করলেন। আবরাহা অবাক হয়ে বলল, বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, তুমি আমার সাথে নিজের উটগুলো ফেরত পাওয়ার জন্য আলোচনা করছ; অথচ কা'বাগৃহ, যা তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় ভিত্তি, সে ব্যাপারে তো একটি কথাও বললে না! আবদুল মুত্তালিব উত্তর দিলেন আমি উটগুলোর মালিক, এজন্যে সেগুলো ফেরত পাওয়ার আগ্রহ করছি। আর কা'বাঘরের মালিক তো আল্লাহ্; তিনি অবশ্যই তা রক্ষা করবেন। আবরাহা কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আবদুল মুত্তালিবের উটগুলো ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিল। আবদুল মুত্তালিব উটগুলো নিয়ে ফিরে এলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি কুরায়শদের মক্কা ত্যাগ করতে পরামর্শ দিলেন। উটগুলো কা'বাগৃহের উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন এবং কয়েকজন ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে কা'বার দরজায় উপস্থিত হয়ে মুনাজাতের মাধ্যমে কান্নায় ভেঙে পড়লেন আর এ কবিতার মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করলেন

لاهم ان المرء يمنع   رحنه فا منع رحالك
وانصر على ال الصليب   وعابديه اليوم الك
لا يغلبن صليبهم   ومحالهم ابدا محالك
جروا جميع بلادهم   والفيل كي يسبوا عيالك
عمدوا حماك بليدهم   جهلا وما رقبوا جلالك

"হে আল্লাহ, বান্দা তার জায়গার হিফাযত করে, তুমি নিজ গৃহের হিফাযত কর। ক্রুশের অধিকারী এবং ক্রুশের উপাসনাকারীদের মুকাবিলায় তোমার অনুসারীদের সাহায্য কর। ওদের ক্রুশ এবং ওদের প্রচেষ্টা তোমার ইচ্ছার উপর কখনই বিজয়ী হতে পারবে না। সৈন্য-সামন্ত ও হাতি নিয়ে ওরা এসেছে তোমার (ঘরের) প্রতিবেশিদের গ্রেফতার করতে। ওরা এসেছে তোমার হেরেমকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে; মূর্খতার কারণেই তারা এ সংকল্প করেছে; তোমার বড়ত্ব , মহত্ব ও শক্তিমত্তার প্রতি তারা আদৌ ভ্রুক্ষেপও করছে না।"

প্রার্থনা শেষে আবদুল মুত্তালিব নিজ সঙ্গী-সাথীসহ পাহাড়ে আরোহণ করলেন। এদিকে আবরাহা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কা'বাগৃহ ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হলো। মুহূর্তের মধ্যেই ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট ছোট পাখি দৃষ্টিগোচর হলো। প্রতিটি পাখির ঠোঁটে ও দু'পায়ের থাবায় ছিল ছোট ছোট পাথর—যা ক্ষণে ক্ষণে সৈন্যদের উপর পতিত হতে লাগলো। আল্লাহর কি মহিমা ! ঐ ছোট ছোট পাথরই বন্দুকের নিক্ষিপ্ত গুলীর মত কাজ করতে লাগলো। এগুলো আবরাহা বাহিনী ও তাদের সওয়ারীর মাথায় পড়ে দেহ ভেদ করে বের হতে শুরু করলো। ঐ পাথর যার উপর পড়তো, সাথে সাথেই সে মৃত্যুবরণ করতো। মোটকথা, এভাবেই আবরাহার সৈন্য-সামন্ত ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আবরাহার শরীরে দেখা দিল বসন্তের গুটি। ফলে তার

সমস্ত শরীর পচে গেল এবং শরীর থেকে রক্ত ও পুঁজ গড়াতে থাকলো। এরপর তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক এক করে খসে পড়তে শুরু করলো। সবশেষে তার দেহের অভ্যন্তর থেকে কলিজা ফেটে বেরিয়ে পড়লো আর সাথে সাথে আবরাহা মৃত্যুর হিম শীতল কোলে ঢলে পড়লো। সবাই যখন ছিন্নভিন্ন দেহে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো, তখন মহাশক্তিধর আল্লাহ এক ভারী বর্ষণে ধ্বংসাবশেষের সবকিছু ধুয়ে মুছে সাগরে পৌঁছিয়ে দিলেন।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"তিনি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মূল উৎপাটন করে ফেললেন। এ জন্যে রাব্বুল আলামিন আল্লাহ্‌রই সকল প্রশংসা।"[১]

ইরহাস

এ আসমানী নিদর্শন ছিল শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনেরই অদৃশ্য ঘোষণা ও গায়বী নিদর্শন। কুরায়শদের প্রতি এ অদৃশ্য সাহায্য-সহায়তার কারণ একমাত্র এটাই ছিল যে, পৃথিবীতে শেষ নবীর আগমন অত্যাসন্ন। আবদুল মুত্তালিবের এ সম্প্রদায় ও পরিবার তারাই আর তারাই আল্লাহর ঘরের মুতাওয়াল্লী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, এজন্যে অলৌকিকভাবে আল্লাহ্ তাদের এ সাহায্য করেছেন। অন্যথায় ধর্মীয় দিক থেকে আবিসিনিয়ার সম্রাট ও ইয়েমেনের শাসক মক্কার কুরায়শ অপেক্ষা উত্তম ছিল। কেননা তখন সাধারণ কুরায়শগণ ছিল মূর্তি পূজক, পক্ষান্তরে ইয়েমেন ও আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা আহলি কিতাব ও খ্রিস্টান ছিল (তখনও যার বাতিল হওয়ার ঘোষণা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসেনি)। ফলে জানা গেল যে, কুরায়শের প্রতি এ অদৃশ্য সাহায্য এবং বায়তুল্লাহর অস্বাভাবিক হিফাযত, এ সব কিছুই মহানবী (সা)-এর জন্মের অলৌকিক ও বরকতপূর্ণ সুসংবাদ।

নবী হিসেবে ঘোষিত হবার পর নবীর দ্বারা যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, একে 'মু'জিযা' বলে। আর যে সব অলৌকিক ঘটনা নবী জন্মের প্রাক্কালে ঘটে, তাকে 'ইরহাস' বলা হয়। ইরহাস অর্থ বুঁনিয়াদ বা ভিত্তি। যেহেতু এ ধরনের ঘটনা নবী জন্মের সূচনা বা প্রারম্ভিক অবস্থায় ঘটেছে, এজন্যে একে ইরহাস বলা হয়েছে।

আবরাহার বায়তুল্লাহ বিরোধী সেনা অভিযান এবং অতঃপর তার ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনা মুহররম মাসে সংঘটিত হয়। তখন রাসূল (সা)-এর শুভ জন্মের দিনক্ষণ খুবই সন্নিকটে পৌঁছেছিল। তখন এ ধরনের যত অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে, সবই ছিল নবী (সা)-এর জন্মের পূর্বাভাস ও আলামত। আবরাহার ঘটনার পঞ্চাশ অথবা পঞ্চান্ন দিন পর এ ধূলির ধরায় রহমতরূপে মহানবী (সা)-এর আবির্ভাব ঘটে।

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৮৩-৩৯০।

আল্লামা মাওয়ারদী তদীয় গ্রন্থ 'ইলামুন-নবুওয়াত' গ্রন্থে বলেছেন :

واذا اختبرت حال نسبه ﷺ وعرفتَ طهارة مولده علمت انه سلالة اباء كرام ليس فيهم مسترذل بل كلهم سادة قادة وشرف النسب وطهارة المولد من شروط النبوة انتهى

"ওহে, যখন তুমি মহানবী (সা)-এর পবিত্র বংশধারার অবস্থা জেনে নিয়েছ এবং তাঁর পবিত্র বংশপরম্পরাকে সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছ, তা হলে অবশ্যই এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে যে, নবী মুহাম্মদ (সা)-এর সম্মানিত পিতা, শ্রদ্ধেয় পিতামহ ছিলেন উন্নত ও সম্ভ্রান্ত। তাঁর বংশের কেউই নীচ, হীন ও ইতর প্রকৃতির লোক ছিলেন না; বরং সবাই সর্দার ও আরব সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন আর নবী বংশের জন্য ভদ্র সম্ভ্রান্ত ও পবিত্রতা শর্ত।"

নবী মুহাম্মদ(সা)-এর পিতা ও পিতামহের সবাই স্ব-স্ব যামানায় বিজ্ঞ ও সৌভাগ্যবান নেতা ছিলেন। তাদের চেহারা সুরত দৃষ্টি আকর্ষণীয়, সুন্দর ও উন্নত চরিত্র, প্রশংসনীয় কাজকর্ম, ধৈর্য সবর, দান ও মেহমানদারী সর্বক্ষেত্রেই তাঁরা স্ব-স্ব যামানায় ছিলেন অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রত্যেকেই সম্মান, আভিজাত্য, নেতৃত্ব ও সম্ভ্রম-এর অধিকারী ছিলেন। নবী (সা)-এর পূর্বপুরুষদের প্রসঙ্গে শতাধিক বক্তব্য তো কেবল মরফূ' হাদীস ও সাহাবা কিরামের 'আসার' থেকে জানা গেছে যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ্র প্রেমে মহাত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী নবী ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর (যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে)। আর যেসব হাদীসে তাঁর ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর হওয়ার বিষয় উল্লেখ নেই, এতে তাঁর সুস্থ সঠিক স্বভাব-চরিত্র ও সুন্দর প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যের কথা তো সরাসরি বর্ণিত আছে।

শুভাগমন

সারওয়ারে দো আলম, বনী আদমের সর্দার হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা (সা) হস্তী বাহিনীর ঘটনার পঞ্চাশ অথবা পঞ্চান্ন[১] দিন পর ৮ই রবিউল আউয়াল[২] সোমবার মুতাবিক ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এক সুবহে

১. প্রসিদ্ধ বক্তব্য এটাই যে, মহানবী (সা) হস্তী বাহিনীর ঘটনার পঞ্চাশ দিন পর জন্মগ্রহণ করেন আর এ বক্তব্যই আল্লামা সুহায়লী গ্রহণ করেছেন। মুহাম্মদ ইবন আলী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পঞ্চান্ন দিন পর জন্মগ্রহণ করেন। এ বক্তব্য আল্লামা দিময়াতী গ্রহণ করেছেন। যারকানী, ১খ্. পৃ. ১৩০।

২ প্রসিদ্ধ আলিমদের বক্তব্য এটাই যে, মহানবী (সা) রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লামা ইবনুল জাওযী এটাই আলিমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি রবিউস সানী মাসে, কেউবা সফর মাসে, কেউবা রজব মাসে আবার কেউ বলেন, তিনি রমযানুল মুবারকে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এ সমুদয় বর্ণনাই দুর্বল। যারকানী, ১খ. পৃ. ১৩০

সাদিকে[১] আবূ তালিবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শুভ জন্মের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ বক্তব্য তো এটাই যে, রাসূল (সা) ১২ই রবিউল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদদের নিকট প্রসিদ্ধ ও অনুমোদিত বক্তব্য হলো এই যে, রাসূল (সা) ৮ই রবিউল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ও হযরত জুবায়র ইবন মুতইম (রা) থেকে এ বর্ণনাই পাওয়া যায় আর এ বক্তব্যই আল্লামা কুতুবুদ্দীন কাসতাল্লানী গ্রহণ করেছেন।[২]

১. হযরত উসমান ইবন আবুল আস[৩] (রা)-এর মাতা ফাতিমা বিনতে আবদুল্লাহ

---

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সা) সোমবার সুবহে সাদিকের সূচনাকালে জন্মগ্রহণ করেন (যারকানী, ১খ. পৃ. ১৩৩)। এ বর্ণনা যদিও সনদের দিক থেকে দুর্বল তবুও এর দ্বারা অন্যান্য বর্ণনা সমন্বয় ও মিটমাট হয়ে যায়। এজন্যে যে, কিছু কিছু বর্ণনায় জানা যায়, তিনি দিবাভাগে জন্মগ্রহণ করেন আর কিছু বর্ণনায় জানা যায়, তাঁর জন্ম হয়েছিল রাত্রিকালে। কিন্তু সুবহে সাদিকের বর্ণনা দ্বারা এটা বলা যায় যে, তিনি পূর্বরাত্রেই জন্মগ্রহণ করেছেন অথবা এটাই বলা যায় যে, তিনি পরবর্তী দিন অর্থাৎ সোমবার দিবাভাগের (প্রারম্ভে) জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই যেসব বর্ণনায় তিনি সোমবার দিনে জন্মগ্রহণ করেছেন বলা হয়েছে, এটা যেমন সহীহ, ঠিক তেমনি তিনি পূর্ববতী রাত্রে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা-ও তেমনি সহীহ। এছাড়া এটাও বলা যায় যে, যদিও তিনি সুবহে সাদিকে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু এর সূচনা হয়েছিল পূর্ববতী রাত্রে। ইবন আসাকির ও যুবায়র ইবন বুকার মারূফ ইবন খারলুয থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) সোমবার ফজর উদয়কালে জন্মগ্রহণ করেন (খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৫১)। ইবন হিব্বান মারূফ ইবন খারলুযের বক্তব্যকে সত্যায়ন করেছেন। আবূ হাতিম বলেন, ইবন খারলুযের হাদীস উল্লেখ করার মত, যেমনটি খুলাসাতুত-তাহযীব গ্রন্থে বর্ণিত আছে, সত্য ও হিদায়াতের সূর্য উদিত হওয়ার জন্য সুবহে সাদিকই উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, যার মধ্যাহ্ন চল্লিশ বছর পর হবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

২. যারকানী, ১খ. পৃ. ১৩১।

৩. এ হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এতে ইয়াকূব ইবন মুহাম্মদ যুহরী অগ্রহণযোগ্য এবং আবদুল আযীয ইবন আবদুর রহমান ইবন আউফ মিথ্যা বলেন। আমি বলবো, যদিও ইয়াকূব ইবন মুহাম্মদ যুহরী আছেন, তবুও আহমদ ও আবূ যুর'আ হাজ্জাজ ইবন শাইর ইবন সা'দ ও আবূ হাতিম থেকে বর্ণনা করেছেন যারা নির্ভরযোগ্য। অধিকন্তু, এ হাদীসটি ইবন মাজাহ ও বুখারীতে মুআল্লাক সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে, যেমনটি হাফিয শফীউদ্দিন প্রণীত খুলাসাহতে বলা হয়েছে। আর আবদুল আযীয ইবন উমর ইবন আবদুর রহমান তৎকালীন আলিমদের মধ্যে খোলাখুলি বর্ণনাকারীদের নিকট যঈফ ছিলেন না। তার মিথ্যাবাদী হওয়ার খবরও অজ্ঞাত। এ হাদীসটি হাফিয আসকালানী তাঁর ফাতহ-এ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কোন মন্তব্য করেন নি। এরপর বলেছেন, হযরত ইরবায ইবন সারিয়্যা (রা) বর্ণিত হাদীসটি –যা আহমদ বর্ণনা করেছেন এবং ইবন হিব্বান ও হাকিম সত্যায়ন করেছেন। সুতরাং যঈফ যখন সহীহ-এর অনুগামী হয়, তখন আর যঈফ থাকে না– আল্লাহই ভাল জানেন। হযরত উসমান ইবন আবুল আস সাকাফী (রা) বনী সাকীফ-এর প্রতিনিধি দলের সাথে নবী (সা)-এর খিদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। হুযূর (সা) তাঁকে তায়েফ-এর শাসক নিযুক্ত করেন। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল থাকেন। ১৫ হিজরীতে উমর (রা) তাঁকে তায়েফ ছাড়াও আম্মান এবং বাহরায়নের শাসক নিযুক্ত করেন। সাকীফ সম্প্রদায়কে ধর্মচ্যূত

বলেন, হযরত নবী (সা)-এর জন্মের সময় আমি আমিনার কক্ষে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম যে, সমস্ত গৃহ উজ্জ্বল আলোতে ভরে গেছে। দেখলাম আসমানের তারকারাজি নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এমনকি আমার মনে হচ্ছিল যে, নাজানি এসব আমার উপর পতিত হয়।[১]

২. হযরত ইরবায ইবন সারিয়্যা (রা)[২] থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শুভ জন্মগ্রহণকালীন সময় তাঁর মাতা এক নূর দেখেন, যাতে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে যায়। এই বর্ণনা মুসনাদে আহমদ ও মুস্তাদরাকে হাকিম গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। ইবন হিব্বান এ রিওয়ায়াতটি সহীহ বলেছেন। অনুরূপ অর্থে মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে (ফাতহুল বারী, আলামাতুন নবূওয়াত ফিল ইসলাম অধ্যায়) হায়সামী বলেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন, এর সনদ হাসান এবং এর পক্ষে শক্তিশালী সাক্ষ্য রয়েছে। তিবরানীও এটি বর্ণনা করেছেন।

৩. অপর এক বর্ণনায় বসরার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

বিশ্লেষণ তারকারাজি যমীনে ছিটকে পড়া বলতে এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, অচিরেই যমীন থেকে কুফর ও শিরকের অন্ধকার দূরীভূত হবে এবং হিদায়েতের জ্যোতি আরও উজ্জ্বল আলোকে ভরপুর হয়ে যাবে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ - يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَه سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِه

"অবশ্যই তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নূর, হিদায়াত এবং একটি আলোকিত কিতাব এসেছে, যাদ্বারা আল্লাহ তা'আলা এমন লোকদের হিদায়াত করেন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও শান্তি-পথসমূহের প্রত্যাশী। তিনি নিজের ক্ষমতা দ্বারাই তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যান।" (সূরা মায়িদা : ১৬-১৭)

হওয়ার হাত থেকে তিনিই রক্ষা করেন। তিনি তখন সাকীফ সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেন : হে সাকীফ সম্প্রদায়! তোমরা সবশেষে ইসলাম গ্রহণ করেছ। কাজেই সবার আগে ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ো না। শেষ বয়সে তিনি বসরায় বসবাস করেন এবং মুআবিয়া (রা)-এর শাসনামলে ৫১ অথবা ৫৫ হিজরীতে বসরায় ইনতিকাল করেন।

১. ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ৪২৬।

২ হযরত ইরবায ইবন সারিয়্যা (রা) প্রসিদ্ধ সাহাবী ও সুফফার অধিবাসী ছিলেন। ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم আয়াতটি তাঁকে কেন্দ্র করেই অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিককালে মুসলমান হয়েছিলেন। সুনান চতুষ্টয়ে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি ইনতিকাল করেন।

কা'ব আহবার[১] থেকে বর্ণিত আছে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর প্রশংসা এভাবে করা হয়েছে :

محمد رسول الله مولده بمكة ومهاجره بيثرب وملكه بالشام

"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর জন্ম হবে মক্কায়, হিজরত হবে মদীনায় এবং শাসন কর্তৃত্ব হবে শাম (সিরিয়া)-এর উপর।"

অর্থাৎ মক্কা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সমগ্র এলাকা তাঁর ইনতিকালের পূর্বেই ইসলামের অনুসারী হয়ে পড়বে। কাজেই সিরিয়া তাঁর জীবদ্দশায় বিজিত হয়েছিল। এটা আশ্চর্য নয় যে, এ জন্যেই তাঁর শুভ জন্মলগ্নে সিরিয়ার প্রাসাদগুলো দেখানো হয়েছিল। আর ঐ দেশের একটি বিশিষ্ট শহর বসরাকে এজন্যে বিশেষভাবে দেখানো হয়েছিল যে, সিরিয়া এলাকার যে ভূখণ্ডটিতে সর্ব প্রথমে হিদায়াতের নূর পৌঁছবে, তা হলো বসরা।

এটাও আশ্চর্য নয় যে, সিরিয়া এজন্যে দেখানো হয়েছিল যে, চল্লিশজনের মধ্যে ত্রিশজন আবদাল, যাঁরা সবাই ইবরাহীম (আ)-এর প্রচারিত তাওহীদী দীনের উপর একনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের সবারই অবস্থানস্থল ছিল সিরিয়া। এ সম্পর্কের কারণেই সিরিয়ার উপর হিদায়াতের নূর ও আলোক শিখার প্রকাশকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল। এ কারণে সিরিয়ার মহলসমূহ দেখানো হয়ে থাকবে – যাতে এদিকে ইঙ্গিত ছিল যে, এ রাষ্ট্রে নবুওয়াতের নূর প্রকাশের বিশেষ স্থান হবে আর এজন্যেই মিরাজে তাঁকে মক্কা থেকে সিরিয়ায় অর্থাৎ মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল। যেমন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ

"মহাপবিত্র ঐ সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত রাতের সামান্যতম অংশে ভ্রমণ করিয়েছেন; যার চতুষ্পার্শ্ব আমি বরকতময় করে রেখেছিলাম।" (সূরা বানী ইসরাঈল : ১)

যা দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায় যে, সিরীয় রাজ্য, যা মসজিদে আকসার চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত, সেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ বরকত ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর হযরত ইবরাহীম (আ) যখন ইরাক থেকে হিজরত করেছিলেন, তখন সিরিয়ার দিকেই হিজরত করেছিলেন এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসা ইবন

---

১. কা'ব আহবার ছিলেন বনী ইসরাঈলের বিশিষ্ট আলিম। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যামানা পেয়েছিলেন কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) অথবা হযরত উমর (রা)-এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাবী হিসেবে নির্ভরযোগ্য ছিলেন। সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত ইবন আব্বাস (রা), হযরত মুয়াবিয়া (রা) প্রমুখ এবং তাবিঈগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন (তাহযীবুত তাহযীব, পৃ. ১২) যেমনটি হাকিম তিরমিযী কর্তৃক 'আনওয়ারুল উসূলে' বর্ণিত হয়েছে, পৃ, ৬৯।

মরিয়ম (আ)-এর আসমান থেকে অবতরণ ঐ সিরিয়ারই দামেশক জামে মসজিদের মিনারে সংঘটিত হবে। নবী করীম (সা)ও কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সিরিয়ায় হিজরতের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন (হাকিম ও ইবন হিব্বান)।

৪. হযরত ইয়াকূব ইবন হাসান হযরত আয়েশা (রা) থেকে উত্তম সনদে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ইয়াহূদী ব্যবসা উপলক্ষে মক্কায় অবস্থান করতো। যে রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) জন্মগ্রহণ করলেন, এরপর ঐ ইয়াহূদী কুরায়শদের এক সভায় উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এ রাতে কোন্ ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে? কুরাইশরা বললো, আমরা তো জানি না। ইয়াহূদী বললো, একটু খবর নিয়ে দেখ। কেননা আজ রাতে এ উম্মতের নবী জন্মলাভ করেছেন। তাঁর দু'বাহুর মাঝখানে একটি চিহ্ন (মোহরে নবূওয়াত) আছে। তিনি দু'রাত পর্যন্ত দুধপান করবেন না—এজন্যে যে, জনৈক জিন্নগ্রস্ত তাঁর মুখে অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়েছিল। লোকজন দ্রুত ঐ সভা থেকে উঠে অনুসন্ধান শুরু করলো। জানা গেল যে, আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিবের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। ইয়াহূদী বললো, আমাকেও নিয়ে গিয়ে দেখাও। ইয়াহূদী যখন তাঁর দু'বাহুর মাঝখানে ঐ চিহ্ন (মোহরে নবূওয়াত) দেখলো, তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। হুঁশ ফিরে আসার পর সে বললো, নবূওয়াত বনী ইসরাঈল থেকে চলে গেছে। হে কুরাইশ, আল্লাহর শপথ ! এই নবজাতক তোমাদের উপর এমনই আক্রমণ[১] করবে, যার খবর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। হাফিয আসকালানী এ হাদীসটির সনদ[২] হাসান বলেছেন। এছাড়া হাদীসটির দ্রষ্টা, শ্রোতা ও সাক্ষীর সংখ্যা দীর্ঘ এবং এর ব্যাখ্যাও সুদীর্ঘ।[৩]

পারস্য সম্রাটের প্রাসাদের চৌদ্দটি গম্বুজ ধসে পড়া এবং সাওয়া নহর শুষ্ক হয়ে যাওয়া

৫. ঐ রাতে এ ঘটনাও সংঘটিত হলো যে, পারস্য সম্রাটের প্রাসাদে ভূ-কম্পন হলো এবং প্রাসাদের চৌদ্দটি গম্বুজ ধসে পড়লো আর পারস্যের হাজার বছর ধরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডটি নিভে গেল এবং রাজকীয় অনুষ্ঠানাদি প্রদর্শন বন্ধ করা হলো। অবশেষে উযীরগণ ও রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সভার আয়োজন করা হলো। ঐ দরবারেই এ সংবাদ পৌঁছলো যে, অগ্নিকুণ্ডটি নিভে গেছে। সম্রাটের পেরেশানী এতে বৃদ্ধি পেল। এদিকে এক সভাসদ দাঁড়িয়ে বললো, গত রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি

---

১. আক্রমণ দ্বারা মক্কা বিজয় বুঝানো হয়েছে।

২ হাফিয ইয়াকূব ইবন সুফিয়ান ফারিসী হাফিযে হাদীসের মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব, সত্য ও গঠনমূলক কাজ করতেন। কা'ব, সুলায়মান ইবন হারব ও আবূ নুয়াঈম থেকে ইলম হাসিল করেন। ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ২৭৭ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। (দ্র. যারকানী, ১খ. পৃ. ১২০)।

৩. ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ৪২৫।

যে, দুর্দান্ত উট আরবী ঘোড়ার দলকে হাঁকিয়ে নিয়ে দজলা নদী পার হয়ে সমগ্র রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সম্রাট তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি ? সভাসদ বললো, সম্ভবত আরবের দিক থেকে কোন বিরাটকায় ঘটনা প্রকাশ হতে যাচ্ছে। সম্রাট শান্তি এবং স্বস্তির জন্যে নুমান ইবন মুনযিরের নামে ফরমান পাঠালেন যে, কোন বিজ্ঞ আলিমকে আমার নিকট প্রেরণ কর, যে আমার প্রশ্নাবলীর জবাব দিতে পারবে।

নু'মান ইবন মুনযির তৎকালীন জগতশ্রেষ্ঠ আলিম আবদুল মসীহ্ গাসসানীকে দরবারে প্রেরণ করলেন। আবদুল মসীহ দরবারে উপস্থিত হলে সম্রাট বললেন, আমি যে বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করতে চাচ্ছি, সে বিষয়ে আপনি কিছু জানেন কি ? আবদুল মসীহ জবাব দিলেন আপনি প্রশ্ন করুন, যদি আমার জানা থাকে তো বলে দেব, অন্যথায় কোন বিজ্ঞ লোকের নিকট প্রেরণ করবো। বাদশাহ তখন সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করলেন। আবদুল মসীহ্ বললেন, এর ব্যাখ্যা সম্ভবত আমার মামা সাতীহ্ দিতে পারবেন, যিনি বর্তমানে সিরিয়ায় বসবাস করছেন।

সম্রাট তাকে নির্দেশ দিলেন যে, আপনি স্বয়ং আপনার মামার কাছে গিয়ে এগুলোর ব্যাখ্যা নিয়ে আসুন। আবদুল মসীহ যখন তাঁর মামা সাতীহ-এর নিকট পৌঁছলেন, তখন তার অন্তিম সময় উপস্থিত। কিন্তু হুঁশ তখনো অবশিষ্ট ছিল। আবদুল মসীহ্ গিয়ে তাকে সালাম দিলেন এবং কয়েক পংক্তি কবিতা আবৃত্তি করলেন। আবদুল মসীহ-এর আবৃত্তি শুনে সাতীহ্ তার দিকে ফিরলেন এবং বললেন, আবদুল মসীহ দ্রুতগামী উটে চড়ে সাতীহ-এর নিকট এমন সময় পৌঁছলো যখন সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। তোমাকে সাসানীয় সম্রাট তার প্রাসাদে ভূমিকম্প, অগ্নিকুণ্ডের নিভে যাওয়া এবং সভাসদের স্বপ্নের কারণে এখানে পাঠিয়েছেন। শক্তিশালী উট আরবীয় ঘোড়াকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং দজলা নদী পার হয়ে সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়ছে। হে আবদুল মসীহ ! মনযোগ দিয়ে শোন, যখন আল্লাহর বাণী বেশি বেশি তিলাওয়াত হতে থাকে, যষ্ঠিধারী প্রকাশ পায়, আসমানী প্রশস্ততা প্রকাশ পায়, সাওয়া নহর শুষ্ক হয়ে যায় এবং পারস্যের অগ্নিকুণ্ড নিভে যায়, তখন সাতীহ-এর জন্য সিরিয়া সিরিয়া থাকবে না; সাসানীয় বংশের কিছু পুরুষ ও কিছু স্ত্রীলোক কেবল গম্বুজের পরিমাণ বাদশাহী করবে। আর যে বস্তু আগমনকারী, তা সম্ভবত এসে গেছে।

এ কথা বলেই সাতীহ মৃত্যুবরণ করলেন। আবদুল মসীহ ফিরে এলেন এবং সমুদয় বিবরণ সম্রাটকে শোনালেন। সম্রাট তা শুনে বললেন, চৌদ্দজন সম্রাট অতিক্রান্ত হতে তো দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।

কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হতে আর কত দেরী ? তাদের দশজন সম্রাট তো কেবল চার বছরেই গত হয়েছেন। আর অবশিষ্ট চার সম্রাট তো হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত শেষ হয়েছেন।

হাফিয ইবন সায়্যিদুন নাস এ ঘটনাটি স্বীয় উয়ূনুল আসার গ্রন্থে বিস্তৃত সনদের সাথে[১] বর্ণনা করেছেন। সনদটি নিম্নরূপ ঃ

اخبرنا الشيخ ابو الحسن على بن محمد الدمشقى بقراتى عليه قلت له اخبركم الشيخان ابو عبد الله محمد بن نصر بن عبد الرحمن بن محمد بن محفوظ القرشى والامير سيف الدولة ابو عبد الله محمد بن غسان بن غافل بن نجار الانصارى قراءة عليهما وانت حاضر فى الرابعة قالا انا الفقيه ابوالقاسم على بن الحسن الحافظ قراءة عليه ونحن نسمع قال انا المشايخ ابو الحسن على بن مسلم بن محمد بن الفتح بن على الفقيه وابو الفرج غيث بن على بن عبد السلام بن محمد بن جعفر الارمنازى الصورى الخطيب وابو محمد عبد الكريم بن حمزة لخضر بن العباس الوكيل بدمشق قالوا انا ابوالحسن احمد بن عبد الواحد بن محمد بن احمد بن عثمان بن ابى الحديد السلمى انا جدى ابو بكر محمد بن احمد قال انا ابوبكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل الخرايطى ثنا على بن حرب ثنا ابو ايوب يعنى بن عمران من آل جرير بن عبد الله البجلى قال حدثنى مخزوم بن هانىء المخزومى عن ابيه وانت له خمسون ومنه سنة قال لما كانت ليلة ولد رسول الله ﷺ ارتجس ايوان كسرى الى اخر الحديث

আর এ রিওয়ায়াত ইবন জারীর তাবারীর ইতিহাস গ্রন্থে একই সনদে বর্ণিত আছে :

حدثنا على بن الحرب الموصلى قال حدثنا ابو ايوب يعلى بن عمران البجلى قال حدثنى مخزوم بن هانى المخزومى عن ابيه واتت له مائة وخمسون سنة قال لما كانت ليلة ولد فيها رسول الله ﷺ ارتجس ايوان كسرى وسقطت منه اربعة شرفة الى اخر الحديث

(তারীখে তাবারী, ২খ. পৃ.১৩১)

আর ইবন সাকানও এ রিওয়ায়াতকে এ সনদেই বর্ণনা করেছেন। কাজেই হাফিয আসকালানী তাঁর গ্রন্থ ইসাবায় বলেন

واخرج ابن السكن من طريق يعلى بن عمران البجلى اخبرنى مخزوم بن هانى عن ابيه وكان اتت عليه مائة وخمسون سنة قال لما كانت ليلة مولد رسول ﷺ

১. উয়ূনুল আসার, ইবন সায়্যিদুন নাস, ১খ. পৃ. ২৯।

ارتجس ايوان كسرى وسقطت منه اربعة عشرة سرافة وغاضت بحيرة ساوة الحديث

আবূ মাখযূম হানীর সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আবুল ওলীদ দাব্বাগ তাঁকে সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন[১] এবং হাফিয ইবন কাসীর এ হাদীসটিকে এ সনদেই আবূ বকর খারাইতীর উদ্ধৃতি দিয়ে আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়ার ارتجس ايوان অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।[২] আন আল্লামা সুয়ূতীর খাসাইসুল কুবরা দেখুন।[৩] অধিকন্তু, এ রিওয়ায়াতটি অপর একটি সনদেও বর্ণিত হয়েছে, যার সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য। (তা হলো :)

عن سعيد بن مزاحم عن معروف بن خربوذ عن بشير بن تيم قال لما كانت ليلة مولد رسول الله ﷺ رائ مؤبذان كسرى خيلا وابلا قطعت دجلة القصر بطولها رواه عبدان فى كتاب الصحابة

হাফিয আসকালানী এ বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, এটি মুরসাল রিওয়ায়াত এবং ইবন আবি শায়বা বাশীর ইবন শায়বাকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন (ইসাবা, ১খ. পৃ. ১৮০) বাশীর ইবন তামীম-এর জীবনী।[৪]

এ সনদের প্রথম বর্ণনাকারী সাঈদ ইবন মুযাহিম, যাঁর থেকে আবূ দাঊদ এবং নাসাঈ রিওয়ায়াত করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনাকারী মারূফ ইবন খারবূয, যাঁর থেকে বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ প্রমুখ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম বুখারী কিতাবুল ইলম, 'বাবু মান খাস্‌সা বিল ইলমি কাউমান দূনা কাউমিন' (পৃ. ২৪)-এ মারূফ ইবন খারবূয-এর রিওয়ায়াত হযরত আবুত-তুফায়ল আমের ইবন ওয়াসিলা (রা) থেকে স্বীয় জামিউস সাহীহতে উদ্ধৃত করেছেন।

সাহাবাদের মধ্যে সর্বশেষ সাহাবী হযরত আবুত-তুফায়ল (রা) ১০০ হিজরীতে মক্কা মুকাররামায় ইনতিকাল করেন। মারূফ ইবন খারবূয মক্কা মুকাররামায় বসবাসকারী কনিষ্ঠতম তাবিঈ ছিলেন। সহীহ বুখারীতে তাঁর থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৫]

মোটকথা, এ বর্ণনাটি যদিও মুরসাল পর্যায়ের, তবুও এর সনদ সহীহ। এছাড়া মুরসাল হাদীস ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-এর প্রসিদ্ধ বর্ণনানুযায়ী প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য। যেমনটি উসূলে হাদীসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। হাফিয আসকালানী তাঁর ইসাবা গ্রন্থে হাদীসটিকে মুরসাল

---

১. আল ইসাবা, ১খ. পৃ. ৫৯৭।
২ আল ইসাবা, ১খ. পৃ. ২৬৮।
৩. আল ইসাবা, ১খ. পৃ. ৫১।
৪. আল ইসাবা, ১খ. পৃ. ১৮০।
৫. ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ১৯৯।

বলেছেন এবং শরহে বুখারীতে এ হাদীসটি বর্ণনা করে নিশ্চুপ থেকেছেন, যা দ্বারা মনে হয় যে হাফিযে হাদীসগণের নিকট এ হাদীসটি মওযূ ও ভিত্তিহীন তো নয়ই; আর হাফিয আসকালানীর শরহে বুখারীতে কোন হাদীস বর্ণনার পর মন্তব্য না করে নিশ্চুপ থাকা আলিমগণের নিকট হাদীসটির সহীহ ও হাসান হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যেমনটি হাফিয আসকালানী স্বয়ং ফাতহুল বারীর ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা শিবলী তাঁর সীরাতুন নবী (১খ. পৃ. ৩১) তে লিখেছেন, যে পরিমাণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ বৃদ্ধি পায়, সে পরিমাণ সন্দেহযুক্ত রিওয়ায়াত কমতে থাকে। উদাহরণত এ রিওয়ায়াতটি, যখন রাসূলে করীম (সা) পৃথিবীতে এসেছেন তখন পারস্য সম্রাটের প্রাসাদের চৌদ্দটি স্তম্ভ ভেঙ্গে পড়ে, পারস্যের অগ্নিকুণ্ড নিভে যায়, সাওয়া নহর শুষ্ক হয়ে যায়। বায়হাকী, আবূ নুয়ায়ম, খারাইতী, ইবন আসাকির এবং ইবন জাবীর ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন; কিন্তু সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং সিহাহ সিত্তার কোন কিতাবেই এর পাত্তা নেই। সুবহান আল্লাহ্! এ হাদীসটির মওযূ' হওয়ার প্রমাণটি আশ্চর্যজনক। কোন হাদীস বুখারী, মুসলিম এবং সিহাহ সিত্তায় বিদ্যমান না থাকাটাই কি এর মওযূ' ও যঈফ হওয়ার প্রমাণ হতে পারে ? ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উদাহরণত নিঃসন্দেহে সহীহ হাদীসসমূহ সংগ্রহ করার দাবি করেছেন, কিন্তু সমাপ্ত ও শেষ বলে দাবি করেননি। আর কেই বা তা করতে পারে ? ইমাম বুখারী প্রমুখ এ দাবিও করেন নি যে, সহীহায়ন ও সিহাহ সিত্তাহ ছাড়া কোন হাদীস সহীহ ও গ্রহণযোগ্য নয়। বরং রসূলের কিতাবসমূহে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম থেকে এর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে :

قال البخارى اوردت فى كتابى هذا الا ما صح ولقد تركت كثيرا من الصحاح
وقال المسلم الذى اوردت فى هذا الكتاب من الاحاديث صحيح ولا اقول ان ما
تركت صعيف

"ইমাম বুখারী বলেন, আমি আমার এই কিতাবে সহীহ ছাড়া কোন হাদীস গ্রহণ করিনি এবং অনেক সহীহ হাদীসও ছেড়ে দিয়েছি। আর ইমাম মুসলিম বলেন, আমি যে সমস্ত হাদীস এই কিতাবে উল্লেখ করেছি, এর সবই সহীহ। তবে আমি এটা বলি না যে সব হাদীস আমি গ্রহণ করিনি, তার সবই যঈফ।"

এর দ্বারা বুঝা যায়, কোন হাদীস সিহাহ সিত্তায় না থাকাটাই কোন আলিমের নিকট হাদীসটির মওযূ' হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। আল্লামা শিবলী তাঁর সীরাতুন নবী গ্রন্থে শতাধিক এমন রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন যার কোনটি না সহীহ বুখারীতে, না সহীহ মুসলিমে আর না সিহাহ গ্রন্থসমূহে আছে। জানা গেল যে, এ মূলনীতি খোদ আল্লামার নিকটই অনুসরণীয় ও গ্রহণযোগ্য নয়; তবে না জানি কেন তিনি এ হাদীসকে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করলেন। বিনা প্রমাণে কোন রিওয়ায়াতকে অস্বীকার করার নামই কি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ?

৬. তাবারানী, আবূ নুয়ায়ম এবং ইবন আসাকির বিভিন্ন সনদে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সম্মান ও মর্যাদার মধ্যে এটাও যে, আমি খাতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছি, আমার গুপ্তাঙ্গ কেউ দেখেনি।

হাফিয যিয়াউদ্দীন মাকদিসী তাঁর মুখতারা গ্রন্থে হাদীসটি সহীহ বলেছেন। আল্লামা যারাকশী বলেন, হাফিয মাকদিসীর সহীহ বলা হাকিম-এর সহীহ বলা অপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন। আর হাফিয মুগালতাঈ এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন এবং আবূ নুয়ায়ম হাদীসটি হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।[১]

৭. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) খাতনাকৃত ও নাড়ী কাটা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল মুত্তালিব এটা দেখে আশ্চর্যবোধ করেন এবং বলেন, আমার এ সন্তান বড়ই সৌভাগ্যশালী হবে। আর হয়েছিলও তাই।

এ বর্ণনা তাবাকাতে ইবন সা'দ (১খ. পৃ. ৬৪) প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, যার সনদ অত্যন্ত শক্তিশালী।

৮. হযরত ইসহাক ইবন আবদুল্লাহ হযরত আমিনা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) জন্মগ্রহণকালে খুবই পাক পবিত্র ছিলেন। পবিত্র শরীরে কোন প্রকার অপবিত্র বস্তু ছিল না।[২]

আকীকা ও নামকরণ

জন্মের সপ্তম দিনে[৩] আবদুল মুত্তালিব তাঁর আকীকা করেন। সাথে সাথে সমস্ত কুরাইশকে সাধারণ দাওয়াত দেন এবং তাঁর জন্য মুহাম্মদ নামটি নির্বাচন করেন। কুরাইশগণ বললো, হে আবুল হারিস (আবুল হারিস ছিল তাঁর উপনাম)! এ নামটি আপনি কিভাবে নির্বাচন করলেন, যে নাম আপনার পূর্বপুরুষ কিংবা আপনার সম্প্রদায়ের কেউ কোনদিন রাখেনি ? আবদুল মুত্তালিব বললেন, এ নাম আমি এজন্যে রেখেছি যে, যাতে আল্লাহর সমস্ত সৃষ্ট জীব এ নবজাতকের প্রশংসা করে।[৪]

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ১২৪; ৫খ. পৃ. ২৪৪।

২. সমুদয় ঘটনা আল্লামা যারকানী শরহে মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ৪খ. পৃ. ২৭১-এ হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর ভাষ্যে হাফিয ইবন আবদিল বার-এর আল ইসতিয়াবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। কিন্তু হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় কেবল আকীকার উল্লেখ আছে, এতে এক সপ্তাহের কিংবা দাওয়াতের বর্ণনা নেই। এ দু'টি বিষয় আল্লামা সুয়ূতী বায়হাকী ও ইবন আসাকির-এর বরাতে তাঁর খাসাইসুল কুবরায় (১খ. পৃ. ৫০) উল্লেখ করেছেন। হাফিয আসকালানী বলেন, এ পবিত্র জন্মের পর পর আবদুল মুত্তালিব এক সাধারণ দাওয়াত করেন। পানাহারের পর লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আবদুল মুত্তালিব ! এ সৌভাগ্যবান শিশুটির নাম কি রেখেছ ? হাদীসের শেষ পর্যন্ত। ফাতহুল বারী, ৭ খ. পৃ. ১২৪, মহানবী (সা)-এর জন্ম অধ্যায়।

৩. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ.৬৩।

৪. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১২৪।

আবদুল মুত্তালিব নবী (সা)-এর জন্মের পূর্বে একটি স্বপ্ন দেখেন যা তাঁর এ নাম রাখার কারণ ছিল। তিনি দেখেন, তাঁর পিঠ থেকে একটি শিকল বের হয়েছে—যার একটি মাথা আসমানে, একটি মাথা যমীনে, একটি মাথা পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত এবং একটি মাথা পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কিছুক্ষণের মধ্যে ঐ শিকলটি একটি বৃক্ষে পরিণত হয়। যার প্রতিটি পাতা সূর্যের আলোর চেয়ে সত্তর গুণ বেশি আলোকোদ্ভাসিত ছিল। পূর্ব ও পশ্চিমের জনগণ ঐ বৃক্ষের ডালের সাথে জড়িয়ে ছিল। কুরাইশের কিছু লোকও কিছু কিছু ডাল আকড়ে ধরে ছিল আর কুরাইশের কিছু লোক বৃক্ষটি কাটার ইচ্ছা করছিল। তারা যখন এ উদ্দেশ্যে বৃক্ষের নিকটবর্তী হচ্ছিল, তখন খুবই সুন্দর সুঠাম এক যুবক এসে তাদের সরিয়ে দিচ্ছিল।

স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারগণ এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন যে, আপনার বংশে এমন এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবেন, পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত মানুষ তাঁর অনুসরণ করবে এবং আসমান ও যমীনের অধিবাসীরা তাঁর প্রশংসা-স্তুতি জ্ঞাপন করবে। এ কারণে আবদুল মুত্তালিব তাঁর নাম 'মুহাম্মদ' রাখেন।[১] এ স্বপ্নের কারণে আবদুল মুত্তালিবের মনে তাঁর নাম মুহাম্মদ রাখার আগ্রহ জাগে। অপরদিকে নবীজীর মাতাকে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে এটা বলা হয়েছিল যে, তুমি সৃষ্টির সেরা, উত্তম চরিত্রের অধিকারী জাতির নেতাকে গর্ভে ধারণ করেছ, তাঁর নাম রাখবে 'মুহাম্মদ'। অপর এক রিওয়ায়াতে 'আহমদ' বলা হয়েছে। যেমনটি উয়ূনুল আসার[২] গ্রন্থে হযরত বারীদা ও হযরত ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তাঁর নাম মুহাম্মদ ও আহমদ রাখবে।[৩]

মোটকথা, ইলহাম, সত্য স্বপ্ন, সবকিছু দ্বারা পর্যায়ক্রমে তাঁর মা, দাদা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবার মুখ থেকেই ঐ নাম নির্বাচন করে দেয়া হয়, যে নাম দ্বারা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ ঐ উম্মী নবীর সুসংবাদ দিয়ে আসছিলেন। যেমন আবদুল মুত্তালিবের সকল পুত্রের মধ্যে কেবল নবীজীর পিতার জন্য এমন নাম নির্বাচন করা, যা আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়; অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ' নামটি রাখা, এটা মহান প্রভু কর্তৃক প্রদত্ত ছিল। একইভাবে তাঁর নাম মুহাম্মদ ও আহমদ রাখাটাও নিঃসন্দেহে দয়াময় প্রভুর নির্দেশ ছিল। যেমন আল্লামা নববী শরহে মুসলিমে ইবনুল ফারিস ও অন্যান্যের থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর গৃহবাসীদের ইলহাম করেন, যার ফলে তাঁর এ নাম রাখা হয় [শরহে মুসলিম, আসমাউন নবী (সা) অধ্যায়, ২খ. পৃ. ২৬] তাঁর এ দু'নামই আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। যেমন : محمد رسول الله "মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।" আর احمد। আহমদ :

---

১. রাউযুল উনূফ,১খ. পৃ. ১০৫; যারকানী, শরহে মুয়াত্তা, ৪খ. পৃ. ২৭০।

২ ১খ. পৃ. ৩০।

৩. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৪২।

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِىْ اسْرَائِيْلَ انِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ

"আর যখন ঈসা ইবন মরিয়ম বললো, হে বনী ইসরাঈল ! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত রাসূল এবং আমার প্রতি অবতীর্ণ তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং পরবর্তীতে আগমনকারী এক রাসূলের সুসংবাদদাতা, যার নাম হবে 'আহমদ'।" (সূরা সাফ ঃ ৬)

মুহাম্মদ শব্দের ধাতু-মূল হামদ। প্রকৃতপক্ষে প্রশংসনীয় চরিত্র, পসন্দনীয় গুণসম্পন্ন, পরিপূর্ণ মানবতা-সম্পন্ন, ফযীলতসমৃদ্ধ, প্রকৃতি এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত বিষয়ের সমাহারকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে বর্ণনাকে হামদ বলে। আর তাহমীদ, যা থেকে 'মুহাম্মদ' শব্দ গৃহীত, তা تفعيل বাবের مصدر (শব্দমূল) যার ব্যবহার কেবল পরিপূর্ণতা ও পুনরাবৃত্তির জন্য হয়ে থাকে। কাজেই মুহাম্মদ শব্দটি তাহমীদ শব্দের কর্মকারক। ফলে এর অর্থ হবে, ঐ পবিত্র ও গুণসম্পন্ন সত্তা, যার প্রকৃতি ও স্বকীয় পরিপূর্ণতা এবং সৌন্দর্যের কারণে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে বারবার উচ্চারণ করা হয় :

اللهم صلى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم

"হে আল্লাহ্ ! মুহাম্মদ; তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের প্রতি দরূদ বর্ষণ করুন, আর তাঁদেরকে বরকত ও শান্তি-সালামে ভূষিত করুন।"

আর কেউ কেউ বলেন, মুহাম্মদ শব্দের অর্থ হলো, যার মধ্যে প্রশংসনীয় অভ্যাস, প্রশংসনীয় গুণাবলী এবং উচ্চ পর্যায়ের পরিপূর্ণতা বিদ্যমান।

ইমাম বুখারী তাঁর তারিখে সাগীর-এ হযরত আলী ইবন যায়দ থেকে বর্ণনা করেছেন, আবূ তালিব এই কবিতা আবৃত্তি করেন :

وَشَقَّ لَه مِنْ اسْمِه لِيُجِلَّه فَذُو الْعَرْشِ محمُوْدٌ وَهٰذَا مُحَمَّدٌ

[ফাতহুল বারী, ماجاء فى اسماء رسول الله ﷺ অধ্যায়, ৬খ. পৃ. ৪০৪]।

কবিতাটি হযরত হাসসান ইবন সাবিত (রা)-এর দিওয়ানে উল্লিখিত আছে। সম্ভবত উভয়ে একই কবিতা তৈরি করেছিলেন অথবা হযরত হাসসান (রা) আবূ তালিবের কবিতাকে নিজের দিওয়ানে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। (যারকানী, শরহে মুয়াত্তা)

'আহমদ' 'ইসমে তাফযীলে'র শব্দ। কারো কারো নিকট 'ইসমে মাফউলে'র অর্থজ্ঞাপক এবং কারো কারো মতে 'ইসমে ফায়িলে'র অর্থে ব্যবহৃত।

যদি ইসমে মাফউলের অর্থ গ্রহণ করা হয়, তা হলে অর্থ হবে 'সর্বাপেক্ষা প্রশংসিত'। আর সৃষ্টিলোকের মধ্যে তিনি যে সর্বাপেক্ষা প্রশংসিত এতে কোন সন্দেহ নেই। আর তাঁর চেয়ে বেশি প্রশংসা আর কারো করা হয়নি।

আর যদি 'ইসমে ফায়িলে'র অর্থ নেয়া যায়, তা হলে আহমদ শব্দের অর্থ হবে সৃষ্টজীবের মধ্যে 'সবচেয়ে বেশি আল্লাহর প্রশংসাকারী'। এটাও অত্যন্ত সত্য ও সঠিক কথা। পৃথিবীতে কেবল তিনি এবং তাঁর উম্মতগণ আল্লাহ্ তা'আলার যে প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করেন, অন্য কেউ তেমনটি করেনি। এজন্যে পূর্ববর্তী নবীগণ তাঁর আগমনের সংবাদ আহমদ শব্দ দ্বারা প্রদান করতেন আর তাঁর উম্মতের পরিচয়ে 'হাম্মাদিন' (প্রশংসাকারী) উপাধি ব্যবহার করতেন। এটা খুবই সঠিক কথা, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সূরা ফাতিহা দান করেছেন এবং পানাহার, ভ্রমণ শেষে ফিরে আসার পর এবং সর্বপ্রকার দু'আর পর তাঁর ও তাঁর উম্মতের জন্য প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আখিরাতে শাফায়াতের সময় তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর এরূপ প্রশংসার বাক্য ব্যবহার করবেন, যা কোন প্রেরিত নবী-রাসূল কিংবা কোন শাসককে জানানো হয়নি। এজন্যে কিয়ামতের দিন তাঁকে 'মাকামে মাহমূদ' এবং 'লিওয়ায়ে হামদ' নামক পতাকা দান করা হবে। ঐ সময় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ, যারা হাশর ময়দানে জমা হবে, তারা সবাই তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করবে। মোট কথা, হামদ শব্দের সমস্ত অর্থ এর শাখা ও প্রকার সবই তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং নবীগণের বক্তব্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এটাই অনুমিত হয় যে, আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি সব কাজ সমাপ্তির পর পসন্দনীয় ও দৃষ্টিনন্দন হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহর বাণী :

وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"তাদের মধ্যে হক্বের ফয়সালা করে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের।" (সূরা যুমার ৭৫)

وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"জান্নাতবাসীগণের শেষ দু'আ হবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের।"
(সূরা ইউনুস ১০)

"অত্যাচারীদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে; সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের।" (সূরা আন'আম : ৪৫)

পানাহারের পর দু'আ ও প্রশংসা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই বলেছেন ঃ كُلُوْا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ "তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত রিযক খাও এবং তাঁর শোকর কর।"

আর নবী করীম (সা) শোকরের ব্যাখ্যা হামদ শব্দের দ্বারা করেছেন। কাজেই হাদীস শরীফে اَفْضَلُ الشُّكْرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (উত্তম কৃতজ্ঞতা হলো আলহামদু লিল্লাহ বলা) এবং পানাহারের পর আলহামদু লিল্লাহ বলার জোর নির্দেশ এসেছে। যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তিনি (সা) বলতেন : آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ "আমরা

আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী এবং স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসাকারী।"

সালাত আদায় শেষে তিনি এ আয়াত পাঠ করতেন :

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

মোটকথা, এই সমস্ত কুরআনের আয়াত এবং পবিত্র বাক্যাবলী দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, কোন বস্তু সমাপ্তির পরই প্রশংসা করা হয়ে থাকে। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাম মুহাম্মদ এবং আহমদ রেখেছেন যাতে ওহীর পূর্ণতা এবং নবী-রাসূল আগমনের সমাপ্তি এর দ্বারা বুঝা যায়।

হযরত রাসূল (সা)-এর এই দুই নাম মুহাম্মদ ও আহমদ-এর এই সমুদয় ব্যাখ্যা আল্লামা সুহায়লী ও হাফিয আসকালানীর বক্তব্য থেকে গৃহীত হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত জুবায়র ইবন মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি মাহী অর্থাৎ কুফর দূরকারী, আমি হাশির, কিয়ামতে লোকদের হাশর আমার দু'পায়ের উপর হবে। অর্থাৎ সর্বপ্রথম আমিই কবর থেকে উঠব। এর অর্থ হলো ঐ দিন তিনি সকলের নেতা ও সর্দার হবেন আর সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী হবে। এবং আমি আকিব অর্থাৎ সকল নবীর শেষে আগমনকারী।[1]

বুখারী ও তিরমিযীতে রয়েছে, انا عاقب الذى ليس بعدى نبى। "আমি আকিব, অর্থাৎ আমার পরে কোন নবী নেই।"

ইমাম মালিক আকিব শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন : الذى ختم الله به الانبياء "যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নবীর ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করেছেন।"[2] সুফিয়ান সাওরী বলেন, আকিব অর্থ সর্বশেষ নবী।[3]

মহানবী (সা)-এর আরো অনেক নাম আছে। কিন্তু হাদীসে এই পাঁচটি নাম নির্দিষ্ট করার কারণ হলো, সাবেক নবীদের প্রতি প্রেরিত কিতাবসমূহে এ পাঁচটি নামই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

---

১. আল্লামা সুহায়লী রাউযুল উনূফ, শরহে সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১০৬-এ উল্লেখ করেছেন এবং হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ৪০৩ আসমাউন নবী অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন। হাফিয আসকালানী বলেন, যে সব রিওয়ায়াতে আকিব-এরপর الذى ليس بعده نبى এসেছে, ঐ সব রিওয়ায়াতে الذى ليس بعده। লিখিত হওয়ার অবকাশ আছে। কিন্তু তিরমিযীর বর্ণনায় الذى ليس بعدى نبى (অর্থাৎ উত্তম পুরুষে) نبى -এর সাথে লিখিত হওয়ার অবকাশ নেই। –দ্র. ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ৪০৬, 'মা জাআ ফী আসমায়ি রাসূল (সা)' অধ্যায়।

২. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী, আল-মুসাফফা, শরহে মুয়াত্তা, ২খ. পৃ. ২৮৫।

৩. যারকানী, শরহে মুয়াত্তা, ৪খ. পৃ. ২৭২।

হাফিয ইবন সায়্যিদুন নাস 'উয়ূনুল আসার' গ্রন্থে (১খ. পৃ. ২১) বলেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহু আরবী ও আজমী সবার অন্তরে ও জিহ্বায় মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছিলেন যে, মুহাম্মদ বা আহমদ নাম রাখা কারো ধারণায়ই উদয় হয়নি। এজন্যে কুরায়শগণ আশ্চর্য হয়ে আবদুল মুত্তালিবকে প্রশ্ন করেছিল, আপনি এ ধরনের নূতন নাম কেন নির্ধারণ করলেন, যা আপনার কওমের কেউ কোনদিন রাখেনি ? কিন্তু শুভ জন্মের কিছুদিন পূর্বে লোকেরা যখন বনী ইসরাঈল আলিমদের মুখে শুনলো যে, শীঘ্রই মুহাম্মদ ও আহমদ নামে একজন নবী জন্মগ্রহণ করতে যাচ্ছেন, তখন কিছু লোক আশার বশবর্তী হয়ে নিজেদের সন্তানের নাম মুহাম্মদ রাখে। কিন্তু আল্লাহর অপার মহিমা ও কুদরত যে, কেউ নিজেদের নবী বলে দাবি করেনি যাতে মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা (সা)-এর নবূওয়াত ও রিসালাতে কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ না হয়। বিস্তারিত জানার জন্য ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ৪০৪-৪০৫ দেখা যেতে পারে।

مقام تو محمود نامت محمد   بدنیان مقامی ونامی که دارد

"তোমার পদমর্যাদা প্রশংসিত, আর তোমার নাম মুহাম্মদ যে মর্যাদা এবং সুনাম বিশ্বসেরা।"

উপনাম

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সবচেয়ে বড়, প্রসিদ্ধ ও প্রচারিত উপনাম ছিল আবুল কাসিম, যা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কাসিম-এর নামানুসারে।

দ্বিতীয় উপাধি আবূ ইবরাহীম। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যখন মারিয়া কিবতিয়া (রা)-এর গর্ভ থেকে ইবরাহীম জন্মালেন, তখন জিবরাঈল (আ) রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বলেন السلام عليك يا ابا ابراهيم! "হে ইবরাহীমের পিতা ! আপনার প্রতি সালাম।"[১]

খাতনা

খাতনার ব্যাপারে তিনটি বক্তব্য রয়েছে। প্রথমটি হলো, হুযূর (সা) খাতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। হাকিম বলেন, তাঁর খাতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণের ব্যাপারে অনেক মুতাওয়াতির হাদীস রয়েছে।

দ্বিতীয় বক্তব্য হলো, তার জন্মের পর সপ্তম দিনে দাদা আবদুল মুত্তালিব আরবের প্রথা অনুযায়ী তাঁর খাতনা করান। হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সুন্নত হিসেবে তারা নবজাতকের জন্মের সপ্তম দিনে খাতনা করাতেন।

তৃতীয় বক্তব্য হলো, দুধমাতা হযরত হালিমার আশ্রয়ে আসার পর তাঁর খাতনা করানো হয়েছে; তবে এটা দুর্বল বক্তব্য; প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বক্তব্য হলো প্রথম দু'টি। আর এ দু' বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয়ও সম্ভব এভাবে যে, হুযূর (সা) খাতনাকৃত

---

১. মুস্তাদরাকে হাকিম, ২খ. পৃ. ৬০৪।

অবস্থায়ই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আবদুল মুত্তালিব তাঁর জন্মের সপ্তম দিনে এ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা পালন করেন।

লালন-পালন ও দুধপান

শুভ জন্মের পর তিন-চারদিন তাঁর মাতা তাঁকে দুধপান করান। অতঃপর চাচা আবূ লাহাবের আযাদকৃত দাসী সুয়াযবা তাঁকে দুধপান করান। সুয়ায়বা যখন তাঁর জন্ম সংবাদ চাচা আবূ লাহাবকে শোনান, তখনই আবূ লাহাব আনন্দে তাঁকে মুক্ত করে দেন। তাঁর পূর্বে সুয়ায়বা নবীজীর আপন চাচা হযরত হামযাকে দুধপান করান। এজন্যে হামযা তাঁর দুধভ্রাতা ছিলেন। তাঁর পর সুয়ায়বা আবূ সালমাকে দুধপান করান (যারকানী, ১খ. পৃ. ১৩৭)।

সহীহ্ বুখারী শরীফে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আরয করলাম যে, আমি শুনলাম আপনি আবূ সালমার কন্যা দুররাকে বিয়ে করার ইচ্ছে করেন। এতে তিনি আশ্চর্য হয়ে বলেন, উম্মে সালমার কন্যার সাথে ? যে আমার তত্ত্বাবধানে আছে, যদি দুররা আমার রাবীবাহ[১] নাও হতো, তবুও সে আমার জন্য বৈধ হতো না। কেননা সে আমার দুধ সম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী। আমাকে ও তার পিতা আবূ সালমাকে[২] সুয়ায়বা দুধপান করিয়েছে।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম (সা) সমীপে আরয করেন, যদি আপনি হামযা (রা)-এর কন্যাকে বিয়ে করতেন, তা হলে কেমন হতো ? জবাবে তিনি ইরশাদ করেন, সে আমার দুধ সম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী।

সুয়ায়বার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। হাফিয আবূ মিনযাহ্ সুয়ায়বাকে মহিলা সাহাবীগণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন (ফাতহুল বারী, কিতাবুন নিকাহ্, ৯খ. পৃ. ১২৪)।

নবী করীম (সা) সুয়ায়বাকে খুবই সম্মান করতেন। হযরত খাদীজা (রা)-এর সাথে তাঁর বিয়ের পর সুয়ায়বা তাঁর খিদমতে হাযির হতেন। হিজরতের পরেও রাসূল (সা) মদীনা থেকেও সুয়ায়বার জন্য উপহার প্রেরণ করতেন। যখন মক্কা মুকাররমা বিজিত হলো, তিনি সুয়ায়বা ও তার পুত্র মাসরুহ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। যখন জানতে পেলেন যে, তারা দু'জনই মৃত্যুবরণ করেছেন, তখন তাদের নিকটাত্মীয় কাউকে তালাশ করেন, যাতে তার প্রতি অনুগ্রহ করতে সক্ষম হন। জানা গেল, তার কোন আত্মীয়-কুটুম্বও জীবিত নেই।

---

১. রাবীবাহ ঃ আপন স্ত্রীর ঐ কন্যা সন্তানকে বলা হয়, যে স্ত্রীর পূর্বস্বামীর ঔরসজাত।

২ আবূ সালমা উম্মু সালমার প্রথম স্বামী ছিলেন। তার ওফাতের পর উম্মু সালমা মহানবী (সা)-এর স্ত্রীগণের অন্তর্ভুক্ত হন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, ২খ. পৃ. ২৬৪)।

আবূ লাহাবের মৃত্যুর পর কেউ[১] তাকে স্বপ্ন দেখল যে, সে খুবই দুরবস্থার মধ্যে আছে। জিজ্ঞেস করা হলো, কি অবস্থায় আছো ? আবূ লাহাব বললো, আমি তোমাদের অপেক্ষা আরামপ্রদ অবস্থা দেখিনি। কেবল এটুকু যে, সুয়ায়বাকে মুক্ত করে দেয়ার কারণে অঙ্গুলী পরিমাণ পানি পান করতে দেয়া হচ্ছে (বুখারী)। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্মের খবর শুনে যে অঙ্গুলীর ইশারায় তাকে মুক্ত করেছি, ঐ পরিমাণ পানিই পান করতে দেয়া হচ্ছে।

আল্লামা সুহায়লী (র) বলেন, একবার হযরত আব্বাস (রা) আবূ লাহাবকে স্বপ্নে দেখেন যে, সে খুবই খারাপ অবস্থায় আছে এবং বলছে যে, আমি তোমাদের থেকে বিদায়ের পরে কোন শান্তি দেখি নাই। অবশ্য প্রতি সোমবার শাস্তি লাঘব করা হয় (ফাতহুল বারী, ৯খ. পৃ. ১২৪)।

হালিমা সাদিয়া

সুয়ায়বার পর হালিমা সাদিয়া তাঁকে দুধপান করান। আরবের প্রচলিত নিয়ম ছিল, সম্ভ্রান্ত বংশীয়রা নিজেদের দুগ্ধপোষ্য সন্তানদের শুরুতেই গ্রামে এ জন্যে প্রেরণ করতেন যাতে গ্রামের নির্মল আলো-বাতাসে শিশু বেড়ে উঠতে পারে, শিশুর ভাষা যাতে শুদ্ধ হয় এবং আরবের আসল তমদ্দুন ও খাঁটি আরবীয় স্বভাব থেকে বিচ্যুত না হয়। যেমন হযরত উমর (রা)-এর বাণী : تمعددو او تمعزروا واخشوشنوا "মা'আদ ইবন আদনানের বেশ গ্রহণ করো। অর্থাৎ অনারবীয় পোশাক ও আকৃতি গ্রহণ করো না। আর কাঠিন্যে ধৈর্য ধারণ করো। মোটা কাপড় পরিধান করো অর্থাৎ আরামপ্রিয় হয়ো না।"[২]

একবার হযরত আবূ বকর (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার কথা অত্যন্ত বিশুদ্ধ। জবাবে তিনি বললেন, প্রথমত আমি কুরায়শ বংশীয়, অধিকন্তু আমি সাদ গোত্রের দুধপান করেছি।[৩]

এ প্রথা অনুসারে বনী সা'দের স্ত্রীলোকগণ দুগ্ধপোষ্য শিশুর সন্ধানে প্রতি বছর মক্কায় আগমন করতো। হালিমা (রা) বলেন, আমি গোত্রের অন্যান্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে দুগ্ধপোষ্য শিশুর সন্ধানে মক্কায় আগমন করলাম। আমার সাথে আমার স্বামী এবং নিজের দুগ্ধপোষ্য একটি শিশু ছিল। বাহন হিসেবে সঙ্গে একটি দুর্বল ও কৃশ গর্দভ আর এমন একটি উটনী ছিল যার ওলান থেকে এক ফোঁটা দুধও বের হতো না। ক্ষুধার কারণে রাত্রে আমাদের ঘুম আসতো না। নিজ শিশুটির অবস্থাও এমন ছিল যে,

---

১. এ স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন হযরত আব্বাস (রা)। এটা আবূ লাহাবের মৃত্যুর এক বছর পরের ঘটনা। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২খ. পৃ. ২৭৩)।

২. হাফিয ইবনুল আসীর হযরত উমর (রা)-এর এ বাণীর এ অর্থই গ্রহণ করেছেন যা আমরা উপরে প্রকাশ করেছি। হাফিয সাহেব বলেন, হযরত উমর (রা)-এর এ গুরুত্বপূর্ণ বাণীটি তিবরানী আবূ হাদর আসলামী থেকে মরফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন; অর্থাৎ এ বাণী মহানবী (সা)-এর অনুমোদিত (আন-নিহায়া)।

৩. রাওযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১০৯।

ক্ষুধার তাড়নায় সেও সারারাত কাঁদতো আর চেঁচামেচি করতো। আমার স্তনে এ পরিমাণ দুধও ছিল না, যাতে শিশুটি পরিতৃপ্ত হতে পারে। কোন স্ত্রীলোক এমন ছিল না যে, যার সামনে শিশু নবী (সা)-কে উপস্থিত করা হয়নি। তারা যখনই শুনতো যে, শিশুটি ইয়াতীম, তৎক্ষণাৎ তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করতো। কারণ যার পিতাই নেই, তার লালন পালনের বিনিময়ে কী-ই বা এমন পাওয়া যাবে ! অথচ তখন এটা কারুরই জানা ছিল না যে, তিনি ইয়াতীম নন; বরং ইয়াতীমের লালনকারী এবং ইনি সেই পবিত্র শিশু, যার হাতে রোম ও পারস্য সম্রাটের ধন ভাণ্ডারের চাবিগুলো সোপর্দ করা হবে। পৃথিবীতে যদিও তাঁর কোন ওলী, অভিভাবক ও লালন-পালনের পারিশ্রমিক দেয়ার কেউ নেই, কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, যার কুদরতী হাতে আছে পৃথিবী এবং আসমানের অগণিত ভাণ্ডার, তিনিই এই ইয়াতীমের ওলী, অভিভাবক, আর এ শিশুর লালন-পালনকারীকে মুহূর্তে ধারণাতীত পারিশ্রমিকসহ অনেক কিছু দিতে সক্ষম।

সব স্ত্রীলোকই দুগ্ধপোষ্য শিশু পেয়ে গেল, কেবল হালিমাই পেলেন না। এদিকে ফিরে যাওয়ার সময় হলো। খালি হাতে ফিরে যাওয়া হালিমার নিকট কষ্টকর মনে হলো। অদৃশ্যলোক থেকে তখন হালিমার অন্তরে ঐ ইয়াতীম শিশুটি গ্রহণের বলিষ্ঠ যুক্তি ও অত্যন্ত আগ্রহের সৃষ্টি হলো। তিনি গিয়ে স্বামীকে বললেন:

والله لاذهبن الى ذلك اليتيم فلاخذنه قال لا عليك عسى الله ان يجعل لنا فيه بركة

"আল্লাহর শপথ ! আমি অবশ্যই ঐ ইয়াতীম শিশুটির নিকট যাব এবং অবশ্যই তাকে নিয়ে আসব। স্বামী বললেন, যদি তুমি এমনটি কর, তা হলে কোন ক্ষতি নেই। আশা করা যায় আল্লাহ তাকেই আমাদের জন্য কল্যাণ ও বরকতের নিমিত্তে পরিণত করবেন।"

অভিধান অনুযায়ী বরকত আল্লাহ প্রদত্ত প্রাচুর্য ও কল্যাণের নাম। অর্থাৎ ঐ কল্যাণ ও মঙ্গলের নামই বরকত, যা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়। আর বাহ্যিক কোন বস্তু এতে অংশীদারিত্ব থাকে না (ইমাম রাগিবকৃত আল-মুফরাদাতে এমনটিই বলা হয়েছে)। একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ "বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি তার সাথে সে অনুযায়ী আচরণ করি।"

হালিমা এরূপ বরকতের প্রত্যাশা নিয়েই ইয়াতীম শিশু মুহাম্মদকে নিয়ে আসেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও তাঁর বাসনা অনুযায়ী তাঁর প্রতি বরকতের দরজা উন্মুক্ত করে দিলেন। বনী সাদ-এর অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ সৃষ্টের প্রতি আশা পোষণ করে, আর হালিমা স্রষ্টার প্রতি আস্থা স্থাপন করলেন। হালিমা বললেন, শিশুটিকে মাত্র কোলে নিয়েছি, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার শুষ্ক স্তন দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। দুধ এতই বৃদ্ধি

পেল যে, তিনি (সা) পান করে পরিতৃপ্ত হলেন এবং তাঁর দুধভ্রাতাও তৃপ্ত হলো। উটনীর দুধ দোহনের সময় দেখা গেল, দুধে উটনীর স্তনও পরিপূর্ণ। আমি এবং আমার স্বামী দুধপান করে পরিতৃপ্ত হলাম। রাত্রিটা খুবই আরামে কাটলো। সকাল হলে স্বামী বলল : تَعَلَّمِى وَاللهِ يَا حَلِيْمَةُ لَقَدْ اَخَذْتِ نَسَمَةً مُبَارَكَةً "ওহে হালিমা ! বুঝে নাও, আল্লাহর কসম, তুমি এক মুবারক সন্তান গ্রহণ করেছো।"

জবাবে হালিমা বললেন : وَاللهِ اَنِّىْ لَاَرْجُوْ ذٰلِكَ "আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই আল্লাহর নিকট এমনটিই আশা করেছিলাম।"

এবার কাফেলার ফিরে যাওয়ার পালা, আর কাফেলার সবাই সওয়ার হয়ে যাত্রা শুরু করেছে। হালিমাও এ ভাগ্যবান শিশুটি নিয়ে ঐ কৃশ ও দুর্বল উটটিতে সওয়ার হলেন—যাকে এর পূর্বে চাবুক মেরে চালাতে হতো, সেটি এখন বিদ্যুৎ গতিসম্পন্ন, কোনক্রমেই থামতে চায় না। কারণ এখন তো সে একজন নবীর বাহনে পরিণত হয়েছে। সঙ্গী স্ত্রীলোকগণ জিজ্ঞেস করলো হালিমা, এটা কি সেই সওয়ারী ? আল্লাহর কসম! এখন তো এর মর্যাদাই আলাদা! এভাবেই আমরা বনী সা'দ গোত্রে পৌঁছলাম। ঐসময় বনী সা'দ গোত্র এলাকা সবচাইতে অধিক দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকা ছিল। আমার বকরিগুলো যখন চারণভূমি থেকে ফিরে এলো, তখন সেগুলো দুধে পরিপূর্ণ ছিল। আর অন্যেরগুলো ক্ষুধার্ত ও শুষ্ক স্তন নিয়ে ফিরে এলো, যাতে একফোঁটা দুধও ছিল না।

ফলে তারাও নিজেদের রাখালদের ঐ চারণভূমিতে বকরি চরাতে বললো, যেখানে হালিমার বকরীগুলো চরানো হয়। তাদের রাখালরা তাই করলো। এ সত্ত্বেও এমন হলো যে, সন্ধ্যায় হালিমার বকরীগুলো পরিতৃপ্ত ও দুধে ভরপুর অবস্থায় ফিরে আসতো আর অন্যদেরগুলো আসতো খালি পেটে এবং ওদের স্তনে একফোঁটা দুধও থাকতো না। হালিমা বলেন,[১] আল্লাহ তা'আলা এভাবেই আমাদের প্রতি কল্যাণ ও বরকত প্রদর্শন করতে থাকেন আর আমরা তা প্রত্যক্ষ করতে থাকি। এভাবে যখন দু'বছর পূর্ণ হলো তখন আমি তাঁকে দুধ ছাড়ালাম।

যখন দু'বছর পূর্ণ হলো, তখন হালিমা শিশু মুহাম্মদ (সা) কে নিয়ে মক্কায় এলেন। উদ্দেশ্য, মা আমিনার হাতে তাঁর আমানত প্রত্যার্পণ করা। কিন্তু তাঁর কারণে আল্লাহ তা'আলা হালিমাকে যে বরকত ও কল্যাণ দান করেছিলেন, এজন্যে তিনি মা আমিনার কাছে আবদার রাখলেন যে, এ ভাগ্যবান ইয়াতীম শিশুটিকে যেন আরো

---

১. হযরত হালিমার এ সমুদয় ঘটনা সীরাতে ইবন হিশামে বর্ণিত আছে। কেবল বাক্য বিন্যাসে পরিবর্তনসহ অপরাপর বর্ণনাও পাওয়া যায়– যা আল্লামা সুয়ূতী তাঁর খাসাইসুল কুবরা গ্রন্থে (১খ. পৃ. ৫৪) মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, তাবারানী ও বায়হাকী থেকে বর্ণনা করেছেন। ঐ বাক্যটি ছিল ঃ فلم يزل الله يرينا البركة و لعترفها আর সীরাতে ইবন হিশামে আছে ঃ فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير আমরা এ দু'টো মিলিয়ে অনুবাদ করেছি। হাফিয ইবন কাসীর বলেন, এ হাদীস বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং সীরাত ও মা'গাযী লেখকগণের নিকট প্রসিদ্ধ। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২খ. পৃ. ২৭৫; সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৫৬; মাজমুয়াউয যাওয়াইদ, ৮খ. পৃ. ২২১।

কিছুদিনের জন্য তার কাছে রাখা হয়। তখন মক্কায় মহামারী দেখা দিয়েছিল। এদিকে হালিমার অসাধারণ আগ্রহে মা আমিনা তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং আরো কিছুদিন শিশুকে তাঁর কাছে রাখার অনুমতি দিলেন। হালিমা আনন্দচিত্তে তাঁকে নিয়ে বনী সাদ গোত্রে ফিরে এলেন। কয়েক মাস পর তিনিও দুধ ভাইদের সাথে জংগলে বকরী চরানো শুরু করলেন।

বক্ষ বিদারণ (شق صدر)

একদিনের ঘটনা, তিনি তার দুধ ভাইদের সাথে জংগলে বকরি চরাতে গেছেন, এক পর্যায়ে দুধ ভাইয়েরা দৌড়ে এসে তাঁর সম্পর্কে খবর দিল যে, সাদা পোশাকধারী দু'ব্যক্তি আমাদের কুরায়শী ভাইকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তাঁর পেট চিরে ফেলেছে; এখন পেট সেলাই করছে। এ ঘটনা শুনে হালিমা ও তার স্বামী দিশেহারা হয়ে পড়লেন, পড়ি কি মরি করে উভয়ে ঘটনাস্থলে দৌড়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, শিশু মুহাম্মদ এক জায়গায় নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পবিত্র চেহারা ফ্যাকাসে বর্ণ। হালিমা বলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁকে নিজের বুকে জড়িয়ে নিলাম। এরপর তাঁর দুধ পিতাও তাঁকে বুকে তুলে নিলেন। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ঘটনা কি হয়েছিল ? তখন তিনি পুরো ঘটনা খুলে বললেন (এটি আবূ ইয়ালা ও তাবারানী বর্ণিত; বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)।[১]

বক্ষ বিদারণের ঘটনা নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনে চারবার ঘটেছিল। প্রথমবার শৈশবকালে, যখন তিনি হালিমা সাদিয়ার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল চার বছর। একদা তিনি জঙ্গলে ছিলেন, এমন সময় দু'জন ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল ও হযরত মিকাঈল (আ) সাদা পোশাকধারী মানুষের বেশে একটি বরফে ভর্তি স্বর্ণের তশতরি নিয়ে আগমন করেন এবং তাঁর পেট চিরে পবিত্র কলব বের করেন। এরপর তা ফাঁড়েন এবং এর ভেতর থেকে এক অথবা দু' টুকরা জমাট রক্ত বের করে বললেন, এই টুকরো দু'টি শয়তান প্রভাবিত। এরপর ঐ তশতরির বরফে পেট ও কলব ধৌত করেন। পরে তা যথাস্থানে রেখে সেলাই করে দেন এবং দু'বাহুর মধ্যখানে একটি মোহর অংকিত করে দেন।

হালিমা সাদিয়ার এখানে হাঁটা শেখা অবস্থায় তাঁর বক্ষ বিদারণের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি বিভিন্ন সাহাবা থেকে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম রিওয়ায়াত হচ্ছে হযরত উতবা[২] ইবন আবদ (রা)-এর। এটি মুসনাদে আহমদ এবং তাবারানীর 'মু'জাম'-এ উল্লিখিত আছে। উতবা (রা)-এর এ রিওয়ায়াত

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৫৬; মজমুয়াউয যাওয়াইদ, ৮খ. পৃ. ২২১।

২ হাদীসে উতবা ইবন আবদ সুলামী (রা), যা আহমদ, তাবারানী ও অন্যরা বর্ণনা করেন, তা হলো ঃ انه سال رسول الله كيف كان بده إمرك فذكر القصة فى ارتضاعه فى بنى سعد وفيه ان الملكين لما شقا صدره قال احدهما الاخر خطه فخاطه وختم عليه يخاتم النبوة ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ৪০৯, খাতামুন নবূওয়াত অধ্যায়।

'মুস্তাদরাকে হাকিম'-এও (২খ. পৃ. ৬১৬) বর্ণিত আছে। হাকিম বলেন, উতবা বর্ণিত এ হাদীসটি[১] ইমাম মুসলিমের প্রামাণ্য শর্তানুযায়ী সহীহ। হাফিয যাহবী হাকিমের মতামতের ব্যাপারে কোন বিরূপ মন্তব্য করেননি। আল্লামা হায়সামী হযরত উতবার এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, আহমদ ও তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটির ইমাম আহমদ বর্ণিত সনদটি 'হাসান'।[২]

দ্বিতীয় রিওয়ায়াত, এটি হযরত আবূ যর (রা) থেকে, যা মুসনাদে বাযযার দারিমী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। আল্লামা যারকানী বলেন, হযরত আবূ যর (রা) বর্ণিত এ হাদীসটিতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা হাফিয যিয়াউদ্দীন মাকদিসী তাঁর 'মুখতারা' নামক গ্রন্থে এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আর আলিমগণের অভিমত হলো, হাফিয মাকদিসীর বিশুদ্ধ বলাটা হাকিম-এর অনুরূপ মন্তব্য থেকে অধিক গ্রহণযোগ্য।[৩] হযরত আবূ যর (রা)-এর এ হাদীসটি 'দালাইলে আবূ নুয়াইম'-এও বর্ণিত হয়েছে। আর হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারী-তে (৬খ. পৃ. ৪০৯) বলেন, হযরত আবূ যর (রা) বর্ণিত এ হাদীস মুসনাদে আহমদ ও দালাইলে বায়হাকীতে উল্লেখ আছে।

তৃতীয় রিওয়ায়াতটি হচ্ছে, হযরত আনাস ইবন মালিক (রা)-এর।[৪] এটি 'তাবাকাতে ইবন সা'দ'-এ বর্ণিত আছে। রিওয়ায়াতটি হলো :

اخبرنا يزيد بن هارون و عفان بن مسلم قالانا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضه بن مالك ان رسول الله ﷺ كان يلعب مع الصبيان فاتا ات فاخذه فشق

---

১. এ রিওয়ায়াতের সনদে এক বর্ণনাকারী হলেন বাকিয়া ইবনুল ওয়ালিদ, যার কারণে কোন কোন গ্রন্থকার এ হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হওয়াকে অস্বীকার করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইয়াহিয়া ইবন মুঈন, আবূ যুরআ আজালী ও ইবন সাদ বলেন, বাকিয়া ইবনুল ওয়ালিদ ব্যক্তিগতভাবে নির্ভরযোগ্য। যদি তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করে থাকেন, তবে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় নয় । ইমাম নাসাঈ বলেন, বাকিয়া ইবনুল ওয়ালিদ যদি حدثنا কিংবা اخبرنا। দ্বারা বর্ণনা করে থাকেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যদি عن দ্বারা বর্ণনা করেন তবে তা গ্রহণ করা যাবে না (তাহযীব, ১খ. পৃ. ৪৭৪-৪৭৫)। এটা খুবই স্মরণীয় যে, উক্ত বর্ণনাটি যদিও বিশ্লেষণে عن-এর মর্যাদা দেয়া হয়েছে কিন্তু মুস্তাদরাকে حدثنا ও اخبرنا। দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنى بحير بن سعيد عن خالدبن معدان عن عتبة بن عبد السلمى অর্থাৎ বাকিয়া এটি গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে গ্রহণ করেছেন, কোন অজ্ঞাত কিংবা দুর্বল বর্ণনাকারী থেকে গ্রহণ করেন নি। এজন্যে যে, বুহায়র ইবন সাঈদ, যার থেকে বাকিয়া বর্ণনা করেছেন, আহমদ ইবন হাম্বল, আজালী, ইবন সাদ, নাসাঈ, আবূ হাতিম এবং ইবন হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তাহযীব, ১খ. পৃ. ৪২১।

২ আল্লামা যারকানীর বর্ণনা এরূপ ঃ قلت لا شك فى صحة اسناده فقد صححه ايضاء وقد قال العلماء ان تصحيحه اعلى من تصحيح الحاكم —যারকানী, ১খ. পৃ. ২১।

৩. যারকানী, ১খ. পৃ. ১৬০-১৬১।

৪. তাবাকাতে ইবন সা'দ, 'বাবু আলামাতুন নবূওয়াত কাবলাল ইসলাম', ১খ. পৃ. ৯৭।

بطنه فاستخرج منه علقة فرمى بها وقال هذا صدره النصيب الشيطان منك ثم غسل في طست من ذهب.من ماء زمزم ثم لائمه فاقبل الصبيان الى ظره قتل محمد فاستقبلت رسول الله ﷺ وقدانتقع لونه قال انس فلقد كنا نرى اثر المخيط فى صرره

যার সমস্ত বর্ণনাকারীই বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য।[১]

চতুর্থ রিওয়ায়াতটি হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যা উদ্ধৃতি সহ আল্লামা সুয়ূতী 'বায়হাকী'তে এবং ইবন আসাকির তাঁর 'খাসাইসে' উল্লেখ করেছেন।[২]

পঞ্চম রিওয়ায়াত, এটি হযরত শাদ্দাদ ইবন আবুস (রা) থেকে বর্ণিত, যা হাফিয আসকালানী তাঁর 'ফাতহুল বারী'তে খাতামুন নবূওয়াত অধ্যায়ে এবং আল্লামা যারকানী তাঁর 'শারহে মাওয়াহিবে' (১খ. পৃ. ১৫০) 'মুসনাদে আবূ ইয়ালা' এবং' দালাইলে আবূ নুয়াইম'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন।[৩]

ষষ্ঠ রিওয়ায়াতটি হচ্ছে, তাবিঈ হযরত খালিদ ইবন মা'দান (র)-এর। এটি তাবাকাতে ইবন সা'দ (১খ. পৃ. ৯৬) 'মুরসাল' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের সনদ সূত্রে বর্ণিত যে, খালিদ ইবন মাদান কিলাঈ বলেন, একদল সাহাবী আমাকে শৈশবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্ষ বিদারণ সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন।[৪] সীরাতে ইবন হিশামে (১খ. পৃ. ৫৬, ১৭৫) হাফিয ইবন কাসীর মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন "এর সনদ উত্তম ও শক্তিশালী।"[৫]

হযরত ইবন আব্বাস (রা), শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) এবং খালিদ ইবন মাদান (র)-এর বর্ণনায় কিছু কিছু বর্ণনাকারী 'যঈফ' হওয়ার দরুন, যদিও এ সমস্ত বর্ণনায়

১. মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮খ. পৃ. ২২২।

২ যারকানী, ১খ. পৃ. ১৬, ১৬১; ৬খ. পৃ. ৪০৯।

৩. প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ৯৭; খাসাইসুল কুবরা, পৃ.৫৫।

৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এ হাদীসটি হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারীতে (৩ খ.) ما جاء فى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما অধ্যায়ে উল্লেখ করেন।

৫. হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা, যা দালাইলে আবূ নুয়াইমে বর্ণিত আছে, এতে দু'জন বর্ণনাকারী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রয়েছে। এদের একজন ইয়াযীদ ইবন ইয়ানবুস। আবূ হাতিম বলেন, তিনি অজ্ঞাত বর্ণনাকারী। অথচ দারে কুতনী তাঁর সম্বন্ধে দোষের কিছু নেই (لا بأس به) বলেছেন এবং ইবন হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মধ্যে শামিল করেছেন (তাহযীব, ১১খ. পৃ. ৩১৬)। হাফিয মিযযী তাঁর তাহযীবুল-কামাল-এ বলেন ঃ تكره ابن حبان فى الثقات وروى له البخارى فى الادب و ابو داؤد والترمذى فى الشمائل والنسائ (তাহযীবুল কামাল, ৭খ. পৃ. ২২১)। অপর বর্ণনাকারী দাউদ ইবনুল নযর, যাকে কোন কোন আলিম মিথ্যাবাদী বলেছেন। কিন্তু ইয়াহিয়া ইবন মুঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য (ثقة), মিথ্যাবাদী নন। আবূ দাঊদও তাঁকে নির্ভরযোগ্য কিন্তু যঈফ বলেছেন। নাসাঈও তাঁকে যঈফ বলেছেন। -তাহযীব, ৩খ. পৃ. ১৯৯।

এক এক ব্যক্তি যঈফ—আর প্রথমত বর্ণনাকারীর আধিক্যের দরুন যঈফের দোষ হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়তঃ যে যঈফ হাদীস বিভিন্ন সাহাবী থেকে ভিন্ন ভিন্ন সনদে প্রাপ্ত, নিঃসন্দেহে তা সহীহ্ হওয়ার দাবিদার। কারণ দুর্বল বর্ণনাকারীর আধিক্যে হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়।

বাকী থাকলো মি'রাজের ঘটনায় শৈশবের বক্ষ বিদারণের বর্ণনার প্রসঙ্গ, অথবা পুনরায় বক্ষ বিদারণ সম্পর্কিত বর্ণনা না হওয়া। কতিপয় বর্ণনায় এ বক্ষ বিদারণের উল্লেখ নেই। কিন্তু এটা অগ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। উল্লেখ না করাটা ঘটনা না ঘটার প্রমাণরূপে ধরে নেয়া যৌক্তিক দিক থেকে ঠিক নয়। মি'রাজ সংক্রান্ত হাদীসগুলো পর্যালোচনা করে দেখুন যে, এ হাদীসসমূহ প্রায় পঞ্চাশ জন সাহাবা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রত্যেক সাহাবীর বর্ণনায় এমন কিছু ঘটনার বিবরণ রয়েছে যা অপর সাহাবীর বর্ণনায় নেই। কাজেই ধরে নিন যে, বর্ণনাকারী কোন বর্ণনায় কেবল বক্ষ বিদারণের বর্ণনা করেছেন, কোন স্থানে কেবল শৈশবকালীন বক্ষ বিদারণের বর্ণনা করেছেন, আর কোন জায়গায় উভয়টি একত্রে বর্ণনা করেছেন। আর প্রত্যেকটি বক্ষ বিদারণের সময় ও স্থান ভিন্ন ভিন্ন এবং ঘটনাও পৃথক পৃথক। কাজেই একটি ঘটনার বর্ণনা দ্বিতীয় ঘটনা সংঘটিত না হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না।

দ্বিতীয়বার বক্ষ বিদারণের ঘটনাটি রাসূল (সা)-এর দশ বছর বয়সে ঘটেছিল। এটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনায়[১] সহীহ্ ইবন হিব্বান, দালাইলে আবূ নুয়াইম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এ হাদীস হাফিয মাকদিসী তাঁর 'মুখতারা'য় এবং আবদুল্লাহ ইবন আহমদ 'যাওয়ায়েদে মুসনাদে' সনদসহ বর্ণনা করেছেন। আল্লামা যারকানী বলেন, যাওয়ায়েদে মুসনাদে বর্ণিত হাদীসের সনদভুক্ত বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য (رواه عبد الله و رجاله ثقات وثقهم ابن حبان)।[২] সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে আর ফাতহুল বারীতে علامات النبوة فى الاسلام অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

---

১. প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসের সনদে لا بأس به বলায় নির্ভরযোগ্যতার মাপকাঠিতে কোনক্রমেই দুর্বল বলা যায় না। যখন আবূ দাউদ তায়ালিসী বর্ণিত সনদ এর সাথে মিলিত করা হয়, তবে তা আরো শক্তিশালী হয়। এ জন্যে হাফিয ইবন মুলাক্কিন এবং হাফিয আসকালানী প্রামাণ্য শব্দ দ্বারা এর ব্যাখ্যা করেছেন। আর হাফিয ইবন মুলাক্কিনের বর্ণনা হচ্ছে ঃ ثبة شق الصدر ايضا عند البعثت كما اخرجه ابو نعيم فى الدلائل এ ছাড়া শরহে বুখারীতে (৭খ. পৃ. ৩৮৭) এবং আসকালানীর বর্ণিত বাক্যাবলীও এর নিকটবর্তী–বরং এরূপই।

২ সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৫৬; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২খ. পৃ. ২৭৫; যারকানী, ১খ. পৃ. ১৮৩।

তৃতীয়বার এ ঘটনা নবূওয়াত লাভের প্রাক্কালে সংঘটিত হয়। যেমনটি 'মুসনাদে আবূ দাউদ তায়ালিসী' (পৃ. ২১৫) এবং 'দালাইলে আবূ নুয়াইম' (১খ. পৃ.৬৯)-এ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাফিয ইবন মুলাক্কিন[১] 'শরহে বুখারী'তে এবং হাফিয আসকালানী 'ফাতহুল বারী'তে ما جاء فى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما শীর্ষক অধ্যায়ে নবূওয়াত প্রাপ্তির প্রাক্কালে বক্ষ বিদারণের ঘটনা সমর্থন করেছেন। অধিকন্তু, এ ঘটনা 'মুসনাদে বাযযার'-এ হযরত আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

আল্লামা হায়সামী বলেন, হযরত আবূ যর (রা) বর্ণিত এ হাদীসটি তাঁরই বর্ণিত ঐ হাদীসের অতিরিক্ত। এটি তিনি ইসরা ও মিরাজ সম্পর্কে বর্ণনা করেছিলেন। হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য এবং বুখারীর বর্ণনাকারী। তবে ঐ সনদের এক ব্যক্তি, জাফর ইবন আবদুল্লাহ ইবন উসমান আল-কাবীরকে আবূ হাতিম রাযী এবং ইবন হিব্বান নির্ভরযোগ্য বললেও উকায়লী এতে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

চতুর্থবার মি'রাজের সময় বক্ষ বিদারণের ঘটনাটি সংঘটিত হয়। যেমনটি বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ হযরত আবূ যর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীস ধারাবাহিক এবং প্রসিদ্ধ।[২]

সার কথা

এই চারবার বক্ষ বিদারণের ঘটনা তো বিশুদ্ধ বর্ণনা ও নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কোন কোন বর্ণনায় পাঁচবার বক্ষ বিদারণের কথাও এভাবে উল্লেখ আছে যে, কুড়ি বছর বয়সেও রাসূল (সা)-এর একবার বক্ষ বিদারণ করা হয়েছিল কিন্তু এ রিওয়ায়াত মুহাদ্দিসীনের ঐকমত্য দ্বারা গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণিত নয়।

বক্ষ বিদারণের তাৎপর্য

আল্লামা কাসতাল্লানী 'মাওয়াহিব' গ্রন্থে এবং আল্লামা যারকানী 'শরহে মাওয়াহিবে' বলেন :

ثم ان جميع ما ورد من شق الصدر استخراج القلب وغير ذلك من الامور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقة لصلاحية القدرة فلا يستحيل شئ من ذلك هكذا فاله القرطبى فى المفهم والطيبى والتور بشتى والحافظ فى الفتح والسيوطى وغيره ويويده الحديث الصحيح انهم كانوا يرون

১. হাফিয ইবন মুলাক্কিনের লিখিত শরহে বুখারীর কপি হায়দরাবাদের (দাক্ষিণাত্য) আসফিয়া কুতুবখানায় আছে। (মাজমুয়াউয যাওয়াইদ, ৮খ. পৃ. ২৫৫)।

২ যারকানী, শরহে মাওয়াহিব, ৬খ. পৃ.২৪।

اثر المحيط فى صدره قال السيوطى وما وقع من بعض جهلة العصر من انكار ذلك وحمله على الامر المعنوى فهو جهل صريح وخطاء قبيح نشاء من خذلان الله تعالى لهم وعكوفهم على العلوم الفلسفة وبعدهم عن دقائق السنة عاقفا الله من ذلك انتهى

"এ পর্যন্ত যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, বক্ষ বিদারণ এবং পবিত্র কলব বিদীর্ণকরণ ইত্যাদি বিষয়াদির বর্ণনা এভাবে মেনে নেয়াই উচিত– ঠিক যেভাবে উপরে বর্ণিত হয়েছে। এসব বিষয়কে নিজ চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেয়া উচিত নয়। আল্লাহর অপরিসীম কুদরতের কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। ইমাম কুরতুবী, আল্লামা তায়বী, হাফিয তুরবাশতী, হাফিয আসকালানী, আল্লামা সুয়ূতী সহ অপরাপর বিশিষ্ট আলিমগণও এটাই বলেন যে, সিনাচাক স্বপ্রকৃতিতেই মহীয়ান। সহীহ হাদীসসমূহ হচ্ছে এর প্রত্যয়নকারী। যেমন, হাদীসে এসেছে সাহাবা কিরাম (রা) স্বচক্ষে রাসূল (সা)-এর বক্ষে সেলাইয়ের চিহ্ন দেখেছেন। আল্লামা সুয়ূতী বলেন, কতিপয় অজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সিনাচাক অস্বীকার করা এবং প্রকৃত অবস্থার পরিবর্তে এর রূপক অর্থের উপর নির্ভর করা চরম অজ্ঞতা। (যেমন এ যুগের কিছু কিছু লেখক বলেছেন, সিনাচাক প্রকৃতপক্ষে আক্ষরিক অর্থে বক্ষ বিদারণ নয়, বরং অন্তর উন্মুক্ত করার অর্থে) বস্তুত এটা মারাত্মক ভ্রম– যা এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার অক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিতবহ। সুন্নতের জ্ঞান থেকে দূরে থাকার ফলেই এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ ধরনের উদ্ভট কল্পনা থেকে নিরাপদ রাখুন। আমিন।"

সার কথা হলো, شق صدر-এর দ্বারা বক্ষ বিদারণই বুঝায়। বক্ষ বিদারণ থেকে 'অন্তর উন্মুক্ত করার' অর্থ গ্রহণ নিঃসন্দেহে মহাভ্রান্তি। কেননা বক্ষ বিদারণ হচ্ছে রাসূল (সা)-এর এক বিশেষ মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা যা নবীর জন্যই প্রযোজ্য। আর অন্তর উন্মুক্ত করা যে কারও ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে, যেমন হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা)-এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত সৎকর্মশীল আলিমদের অন্তরে হয়ে আসছে। অধিকন্তু, সিনাচাক তথা বক্ষ বিদারণ দ্বারা যদি রূপকার্থে অন্তর উম্মুক্তকরণের অর্থ নেয়া হয়, তা হলে ঐ হাদীসের অর্থ কি হবে, যাতে সাহাবা কিরাম (রা) স্বচক্ষে রাসূল (সা)-এর পবিত্র বক্ষে সেলাইয়ের চিহ্ন দেখেছেন ? অন্তর উন্মুক্ত করার দ্বারা কি সেলাইয়ের চিহ্নের সৃষ্টি হয় ? লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

বক্ষ বিদারণের রহস্য

প্রথমবারে হযরত হালিমা সাদিয়ার গৃহে অবস্থানকালীন সময়ে বক্ষ বিদারণ করে যে কৃষ্ণবর্ণের খণ্ডটি হযরতের দেহ থেকে বের করে ফেলা হয়, সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে পাপ ও অন্যায় প্রবণতার উৎস, যা থেকে তাঁর কলবকে পবিত্র ও মুক্ত করে দেয়া

হলো। বস্তুটি বের করার পর খুব সম্ভব এ জন্যেই কলবকে ধৌত করা হয়েছিল, যাতে পাপ প্রবণতার শেষ চিহ্নমাত্র পবিত্র কলবে অবশিষ্ট না থাকে। আর বরফ দিয়ে এজন্যে ধৌত করা হয়েছে যে, পাপের প্রকৃতি উষ্ণ—যেমনটি শায়খ আকবর 'ফুতুহাত' নামক কিতাবে লিখেছেন, পাপের মূলকে নিভিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বরফ ব্যবহার করা হয়েছে যাতে পাপরূপ উষ্ণতার নাম-নিশানাও অবশিষ্ট না থাকে। আর কুরআন-হাদীস থেকেও এটাই প্রমাণিত হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا

"অবশ্যই যে ব্যক্তি ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে, প্রকৃতপক্ষে সে অগ্নি দ্বারাই নিজ পেট ভর্তি করে।"

এ আয়াত দ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হয় যে, হারাম সম্পদ যদিও বস্তুগত দৃষ্টিতে শীতল, আখিরাত তথা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এর প্রকৃতি অগ্নি থেকেও উষ্ণ কম নয়। যেমন ধৈর্যের প্রকৃতি। এ বস্তু জগতে হানযাল অপেক্ষাও তিক্ত, কিন্তু আখিরাতে তা মধু অপেক্ষা মিষ্ট। উদাহরণত একটি হাদীস এখানে উল্লেখ্য

الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار

"সদকা গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমনটি পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।" [আহমদ ও তিরমিযী, হযরত মুয়ায ইবন জাবাল (রা) থেকে]

অপর এক হাদীসে এসেছে :

ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار انما يطفا النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا

"ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে আর শয়তানকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে (এর ফলে ক্রোধ আগুন নিঃসৃত)। আর আগুন অবশ্যই পানি দিয়েই নেভাতে হয়। এজন্যে কেউ যদি রাগান্বিত হয়ে পড়ে, সে যেন উযূ করে।" (আবূ দাউদ)

ইমাম গাযালী (র) বলেন, উযূ কিংবা গোসল ঠাণ্ডা পানি দিয়ে কর। কেননা আগুনের দু'টি ধর্ম আছে। একটি হলো তাপ ও দহন শক্তি, আর দ্বিতীয়টি উপরের দিকে উঠা। এজন্যে নবী করীম (সা) আগুনের প্রথম ধর্মকে নির্বাপন করার জন্য ক্রোধে এ চিকিৎসা দিয়েছেন যে, উযূ কর এবং ক্রোধের আগুনকে পানি দিয়ে নিভিয়ে দাও। আর দ্বিতীয় ধর্ম উপরের দিকে উঠার প্রেক্ষিতে তিনি শেষোক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা দিয়েছেন :

اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع

"যার ক্রোধের উদ্রেক হয়, সে যদি দাঁড়িয়ে থাকে, তা হলে বসে পড়বে; এতে যদি ক্রোধ উপশম হয় তো ভাল, আর তা না হলে সে যেন শুয়ে পড়ে।" [আহমদ ও তিরমিযী, হযরত আবূ যর (রা) থেকে]।

ক্রোধ মানুষের এক ধরনের অহংকার ও বড়ত্ববোধের অভিব্যক্তি, এর প্রতিষেধক হলো বিনয় ও নম্রতা। এ জন্যে হুজুর (সা) ইরশাদ করেন ঃ "ক্রোধের উদ্রেক হলে দ্রুত মাটিতে বসে পড় অথবা শুয়ে পড়। আর চিন্তা কর যে, আমাকে এ মাটি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই আগুনের গোলক তৈরি হওয়ার প্রয়োজনটা কি" ? বুখারী, মুসলিম ও অপরাপর সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহে এসেছে, নবী করীম (সা) নামাযে সানা পাঠ করার পর এ দু'আও পাঠ করতেন :

اللهم اغسل خطايای بماء الثلج والبرد

"হে আল্লাহ ! আমার পাপরাশিকে বরফ শীতল পানি দ্বারা ধুয়ে দিন।"

এ দু'আ দ্বারা নবী করীম (সা) দু'টি বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন :

১. গুনাহের নাপাকী, যা ধুয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন করেছেন। কারণ, নাপাকীকেই পানি দিয়ে ধৌত করতে হয়, পবিত্র জিনিস ধুতে হয় না।

২. তিনি পাপের উষ্ণতা ও গরমকে বরফযুক্ত পানি দ্বারা ধৌত করার আবেদন করেছেন। তা এজন্যে যে, গুনাহের মধ্যে যদি কেবল নাপাকী থাকে, উষ্ণতা না থাকে, তাহলে সম্ভাবনা ছিল যে নবী করীম (সা) বরফ ছাড়া শুধু পানি অথবা গরম পানি দিয়ে গুনাহরাশি ধুয়ে দেয়ার আবেদন করতেন। কিন্তু গুনাহের মধ্যে নাপাকীর সাথে উষ্ণতাও থাকে বলেই তিনি আল্লাহ্র কাছে নাপাকী থেকে পবিত্র করার আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে শীতলীকরণ ও উষ্ণতা নিবারণের জন্যেও প্রার্থনা করেন। গরম পানি দ্বারা যদি নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জিত হয়, তা হলে শীতলীকরণ ও প্রশান্তির উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনের জন্য বরফ শীতল পানি দ্বারাই তা সম্ভব। এজন্যেই নবী করীম (সা) গরম পানির পরিবর্তে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে পাপসমূহ ধৌত করে দেয়ার প্রার্থনা করেছেন। এ কারণেই ইমাম নাসাঈ হাদীসটি দ্বারা এ মাসয়ালা বের করেছেন যে, নামাযের জন্য গরম পানি অপেক্ষা ঠাণ্ডা পানি দ্বারা উযূ করা উত্তম। এটা এ জন্যে যে, উযূ এবং নামায আদায়ের উদ্দেশ্যই হলো গুনাহের আগুন নেভানো। যেমনটি হযরত আবূ যর (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা (যা ক্রোধের চিকিৎসা হিসেবে উপরে বর্ণিত হয়েছে) বুঝা যায় আর আল্লামা তাবারানীর 'মু'জাম'-এ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন "প্রত্যেক নামাযের সময় একজন ঘোষণাকারী আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই বলে ঘোষণা দেন যে, হে আদম সন্তান! উঠ এবং ঐ আগুন নির্বাপিত করো যা তোমরা নিজেদের জন্য প্রজ্বলিত করেছ। এতে ঈমানদারগণ উঠেন এবং উযূ করে নামায আদায় করেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমা করে দেন।"

যেভাবে উল্লিখিত আয়াতে কুরআন এবং হাদীসে নববী (সা) থেকে গুনাহের প্রকৃতি উষ্ণ বলে প্রতীয়মান হয়, একইভাবে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও ভালবাসার প্রকৃতিও স্নিগ্ধ শীতল বলেই অনুভূত হয়। হাদীস শরীফে আছে, মহানবী (সা) এরূপ দু'আ করতেন :

اللهم اجعل حبك احب الى من نفسى واهلى ومن الماء البارد

"হে আল্লাহ ! আপনার মহব্বত আমার কাছে আমার জীবন, আমার পরিজন এবং ঠাণ্ডা পানি অপেক্ষা প্রিয়তর বানিয়ে দিন।"

ঠাণ্ডা পানির প্রভাব তো ঠাণ্ডাই, পরিজনের প্রকৃতিও তো শীতলই হয়। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নির্দিষ্ট বান্দাদের প্রার্থিত এ দু'আটি উল্লেখ করেছেন:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ

"হে আল্লাহ! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতিদেরকে আমাদের জন্য চক্ষু শীতলকারীরূপে পরিণত করুন।" (সূরা ফুরকান ঃ ৭৪)

অর্থাৎ তাদেরকে আপনার আনুগত্যের দৃষ্টিতে দেখতে চাই এবং আপনার বিরুদ্ধাচরণ ও পাপাচারে দেখতে চাই না। এ জন্যে যে, মুমিনের দৃষ্টি আল্লাহর আনুগত্যের দ্বারাই শীতল হয়। এতে জানা গেল যে, আল্লাহর আনুগত্যের স্বভাব বা প্রকৃতি হয় শীতল এবং গুনাহের প্রকৃতি গরম হয়। কেননা গুনাহের সম্পর্ক হচ্ছে জাহান্নামের সাথে। এজন্যেই রাসূল (সা) একইসঙ্গে স্বীয় পরিবারভুক্তদের সম্পৃক্ত করে দু'আ করেছেন যে, "আয় আল্লাহ ! আত্মীয়-পরিজনকে আমার কাছে ঠাণ্ডা পানির মত আরামদায়ক শীতল করে দিন, প্রিয় বানিয়ে দিন; আমীন।"

আরবী ব্যাকরণের আলিমদের নিকট যদিও 'মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহ'-এর মধ্যে সম্পর্ক জরুরী নয়, কেননা এ বস্তু এর বিতর্ক থেকে বাইরে, কিন্তু ভাষাবিদদের মতে এতে সমন্বয় আবশ্যকীয়। অতএব এটা অসম্ভব যে, নবী করীম (সা)-এর ন্যায় আরব-আযমে সর্বাপেক্ষা শুদ্ধভাষী ব্যক্তির বক্তব্য উচ্চ মানের বিশুদ্ধতম হবে না। যেভাবে এ কুরআনী আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা অপরাধ চরিত্রের উষ্ণ হওয়া এবং আনুগত্য চরিত্রের শীতল হওয়া অনুভূত হয়। এভাবেই এটাও অনুমিত হয় যে, মুবাহ-এর প্রকৃতি হবে মধ্যম মানের—না উষ্ণ না শীতল। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

আর দ্বিতীয়বার বক্ষ বিদারণ হয়েছিল দশ বছর বয়সে। ঐ বয়সে তা এজন্যে করা হয়েছিল, যাতে করে তাঁর পবিত্র কলব অপেক্ষাকৃত স্থূল কর্ম খেল-তামাশার আকর্ষণ থেকে পবিত্র থাকে। কেননা খেল-তামাশা আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে ফেলে।

তৃতীয়বারে নবূওয়াত প্রাপ্তির প্রাক্কালে যে বক্ষ বিদারণ করা হয়েছিল, তা এজন্যে যে, পবিত্র কলব যাতে ওহীর রহস্য ও আল্লাহর ইলম গ্রহণ ও বহনে সক্ষম হয়।

আর চতুর্থবার মি'রাজের সময় বক্ষ বিদারণ করার উদ্দেশ্য ছিল যে, রাসূল (সা)-এর পবিত্র কলব যাতে ফেরেশতা জগতে ভ্রমণ, আল্লাহর তাজাল্লী, আল্লাহর নিদর্শন পর্যবেক্ষণ ও আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতার অধিকারী হয়। মূলত বার বার বক্ষ বিদারণ হয়েছে আর প্রত্যেক বারেরই লক্ষ্য, তাৎপর্য ও হিকমত আলাদা রয়েছে। বার বার বক্ষ বিদারণের উদ্দেশ্য এটাই ছিল, যাতে পবিত্র

কলব পবিত্রতা ও দীপ্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গকে এজন্যে 'ফাতহুল বারী' শীর্ষক গ্রন্থের মি'রাজ অধ্যায়ে মনোনিবেশ করতে অনুরোধ জানাই।

বক্ষ বিদারণের পর মোহরে নবূওয়াত কেন লাগানো হলো

যখন কোন বস্তু হিফাযত করার ইচ্ছা করা হয়, তখন তাতে মোহরাঙ্কিত করা হয়। যাতে এর ভিতরের বস্তু বের হতে না পারে। হীরা-জহরত, মণি-মুক্তা থলিতে ভরে তাতে মোহর লাগানোর উদ্দেশ্য, যাতে এগুলো থলি থেকে বের হয়ে না পড়ে। অনুরূপভাবে তাঁর অন্তরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা পূর্ণ করে দু'বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে মোহর লাগানোর উদ্দেশ্য হলো ঐ পূঞ্জীভূত সম্পদের কোন কিছু নষ্ট হয়ে না যায়।[১]

অধিকন্তু, বক্ষ বিদারণের মাধ্যমে যেভাবে অন্তরের অভ্যন্তরভাগ শয়তানের চিহ্ন প্রভাব থেকে পবিত্র করা হয়েছে। অনুরূপভাবে দু'বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে কলবের বিপরীতে বামদিকে মোহরটি লাগানো হয়েছে যাতে কলব শয়তানের ওয়াস ওয়াসা এবং বাইরের প্রভাব থেকে সুরক্ষিত হয়ে যায়। কারণ শয়তান ঐ স্থান দিয়ে কুমন্ত্রণা প্রবেশ করায়। হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয (র) থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে এই বলে আরয করলো যে, হে রাব্বুল আলামিন ! মানবদেহে শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রবেশের পথটি আমাকে দেখিয়ে দিন, যে পথ দিয়ে সে মানব মনে কুমন্ত্রণা প্রবেশ করায়। তখন তাকে আল্লাহর তরফ থেকে দু'বাহুর মধ্যবর্তী কলবের বিপরীতে বাম পার্শ্বের স্থানটি দেখানো হয় যে, শয়তান এ পথেই আগমন করে আর বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন সে দ্রুত পিছু হটে।[২]

সার কথা এই যে, যেভাবে পবিত্র কলবের অভ্যন্তর ভাগ সিনাচাকের মাধ্যমে শয়তানী চক্রের মূল থেকে পবিত্র করা হয়েছে, একইভাবে পিছন দিকে মোহর লাগিয়ে বহির্ভাগ থেকেও শয়তানের আগমনের পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

মোহরে নবূওয়াত কখন লাগানো হয়েছে

কেউ কেউ বলেন, মোহরে নবূওয়াত তাঁর জন্মকাল থেকেই ছিল। বনী ইসরাঈলের আলিমগণ তাঁকে এ চিহ্ন দ্বারাই চিনেছিলেন। আর কারও মতে এ মোহর বক্ষ বিদারণের পর লাগানো হয়েছিল। প্রথম বক্তব্যটি অধিক শুদ্ধ এবং খ্যাত। যেমন কতিপয় রিওয়ায়াত দ্বারা সরাসরি বুঝা যায় যে, মোহরে নবূওয়াত নিয়েই তাঁর জন্ম হয়েছিল। আর এটা অসম্ভবও নয় যে, বক্ষ বিদারণের পর মোহর লাগানোর কথা যে সব রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, সেটা ছিল পূর্ববর্তী মোহরের নবায়ন এবং পুনরাবৃত্তি। এভাবে সমুদয় বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সাযুজ্য আনয়ন সম্ভব।[৩]

১. খাওয়াতিমুল হুমূম, পৃ. ১৫২।

২ রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১১।

৩. যারকানী, ১খ. পৃ. ১৬০।

বক্ষ বিদারণের ঘটনার পর হযরত হালিমার মনে জাগলো যে, এ শিশুকে কোনরূপ ব্যথা দেয়া চলবে না। কাজেই তিনি তাঁকে সাথে নিয়ে মক্কায় হযরত আমিনার নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং সকল ঘটনা খুলে বললেন। এ সব ঘটনা শুনে হযরত আমিনা খুব একটা বিস্মিত হলেন না; বরং তাঁকে গর্ভধারণ ও প্রসবকালীন সময়ে নূরের আভার সেই ঝলকানি এবং এর কল্যাণ ও বরকতময় যেসব ঘটনা ঘটেছিল, সেসব স্মরণ করে বললেন, আমার এ পুত্রের মর্যাদা খুবই বেশি হবে। জন্ম থেকেই তার প্রতি শয়তানের প্রভাব ও শ্যেনদৃষ্টি পড়েছিল। তুমি নিশ্চিন্ত থাক একে কোন বিপদ স্পর্শ করবে না। হালিমা নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন আর শিশু মুহাম্মদ (সা) নিজ মাতার কাছেই রয়ে গেলেন। যখন তাঁর বয়স ছয় বছর হযরত আমিনা তাঁকে সাথে নিয়ে মদীনা গমন করলেন। উম্মে আয়মানও তাঁদের সহযাত্রী ছিলেন। এক মাস তাঁরা নিজ আত্মীয়-স্বজনের সাথে মদীনায় অবস্থান করলেন। এরপর মক্কার পথে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে আবওয়া নামক স্থানে হযরত আমিনা ইনতিকাল করলেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।[1]

আবদুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে

উম্মে আয়মান তাঁকে নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন এবং তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের নিকট সোপর্দ করলেন। আবদুল মুত্তালিব তাঁকে সব সময় সঙ্গে রাখতেন। তিনি যখন কাবাগৃহে গমন করতেন, কাবার ছায়ায় তার জন্য মসনদসহ একটি বিশেষ ফরাস বিছানো হতো। অন্য কারো সাধ্য ছিল না যে, তাতে পা রাখে। এমনকি আবদুল মুত্তালিবের পুত্রগণও ঐ ফরাসের আশপাশে ও কিনারেই উপবেশন করতেন। তিনি (সা) যখন আসতেন, অবলীলায় ঐ ফরাসে গিয়ে বসে পড়তেন। এ বয়সে ছেলের ওখানে বসা বেমানান ভেবে তাঁর চাচা তাঁকে ঐ আসন থেকে সরিয়ে দিতে উদ্যত হলে আবদুল মুত্তালিব পূর্ণ আনন্দের সাথে বলতেন, আমার এ সন্তানকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম, তার মধ্যে নতুনতরো কিছু বৈশিষ্ট্যের আভাস পাচ্ছি। অতঃপর সরে গিয়ে নিজের কাছে টেনে বসাতেন আর তাঁর প্রতি তাকিয়ে আনন্দিত হতেন। সীরাতে ইবন হিশাম,[2] 'উয়ূনুল আসার' ও 'মুস্তাদরাকে হাকিম'-এ কিনদীর ইবন সাঈদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, জাহিলী যুগে আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হজ্জের উদ্দেশে মক্কায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, এক ব্যক্তি তাওয়াফরত, সে মুখে এ কবিতা আবৃত্তি করছে :

---

১. প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ১৬৩।

২ হাফিয সুয়ূতী বলেন, এ ঘটনা সীরাতে মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, দালাইলে বায়হাকী এবং দালাইলে আবূ নুয়াইমে বর্ণিত আছে। আবূ নুয়াইমে ভিন্ন একটি সনদে এ ঘটনা হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে ইবন সাদ ও ইবন আসাকির, জুহরী, মুজাহিদ এবং নাফি হযরত ইবন জুবায়র থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। (খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৮১)।

رد الى راكبى محمدا   يارب رده واصطنع عندى يدا

"হে আল্লাহ, আমার সওয়ার মুহাম্মদকে ফিরিয়ে দিন এবং আমার প্রতি সর্বোত্তম[১] অনুগ্রহ করুন।"

আমি লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কে ? তারা বলল, তিনি আবদুল মুত্তালিব, নিজ দৌহিত্রকে হারানো উট খুঁজতে পাঠিয়েছেন। কেননা যে কাজে তাঁকে পাঠানো হয়, তাতে তিনি অবশ্যই সফলকাম হন। তিনি অনেকক্ষণ পূর্বে গেছেন। এজন্যে আবদুল মুত্তালিব অস্থির হয়ে এ কবিতা পাঠ করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ফিরে আসেন এবং উটটি তাঁর পিছনে ছিল। দেখামাত্র আবদুল মুত্তালিব তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, বৎস, আমি তোমার জন্য খুবই পেরেশান ছিলাম। এখন থেকে আমি আর কখনো তোমাকে আমা হতে পৃথক হতে দেব না। হাকিম বলেন, এ রিওয়ায়াত মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। হাফিয যাহবীও বর্ণনাটি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ হওয়াকে সমর্থন করেছেন।[২]

আবদুল মুত্তালিবের ইনতিকাল

দু'বছর পর্যন্ত তিনি (সা) স্বীয় পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে থাকেন। বয়স যখন আট বছর হলো, তখন আবদুল মুত্তালিবও এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ৮২, ৮৫, ৯৫, ১১০ অথবা ১২০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন এবং তাকে জহুন-এ দাফন করা হয়। আবূ তালিব যেহেতু হযরত আবদুল্লাহর সহোদর ভাই ছিলেন, এজন্যে মৃত্যুকালীন সময়ে আবদুল মুত্তালিব তাঁকে আবূ তালিবের হাতে সোপর্দ করেন এবং ওসীয়ত করেন যে, স্বচ্ছন্দচিত্তে পরিপূর্ণ ভালবাসা দিয়ে তার অভিভাবকত্ব ও লালন-পালন করবে।[৩]

উম্মে আয়মান বলেন, যখন আবদুল মুত্তালিবের জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে তার পিছু পিছু যাচ্ছিলেন।[৪]

একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আবদুল মুত্তালিবের ইনতিকালের কথা কি আপনার স্মরণ আছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঐ সময় আমার বয়স ছিল আট বছর।[৫]

আবূ তালিবের তত্ত্বাবধানে

আবদুল মুত্তালিবের ইনতিকালের পর তিনি তাঁর নিজ চাচা আবূ তালিবের তত্ত্বাবধানে আসেন। আবূ তালিব তাঁকে নিজ সন্তানদের চেয়েও বেশি স্নেহ করতেন

---

১. يدا -এর দু'জবর সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২ মুস্তাদরাক, ২খ. পৃ. ৬০৩।

৩. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ.৪০।

৪. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ৭৪-৭৫।

৫. দালাইলে আবূ নুয়াইম, ১খ. পৃ. ৫১।

এবং আনন্দ ও আগ্রহের সাথে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর লালন-পালন ও অভিভাবকত্বের হক পুরোপুরি আদায় করেন। পরিতাপের বিষয় যে, এত মহব্বতের সাথে তাঁকে লালন-পালন করা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে তিনি বঞ্চিতই থেকে গেলেন। একবার মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে লোকজন আবূ তালিবকে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে অনুরোধ করে। তিনি একদল লোকের সাথে ভবিষ্যত নবী ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ (সা)-কেও সঙ্গে নিয়ে কাবাগৃহে গমন করেন এবং কাবাগৃহের দেয়ালের সাথে তাঁর পিঠ ঠেকিয়ে দেন। অতঃপর একান্ত অনুনয় বিনয়ের সঙ্গে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করেন, যেখানে মেঘের কোনই চিহ্ন ছিল না। তিনি ইঙ্গিত করামাত্র চারিদিক থেকে মেঘ ছুটে এল এবং এত বৃষ্টিপাত হলো যে, সমস্ত নালা-খালে পানি প্রবাহিত হলো। এ উপলক্ষে আবূ তালিব বলেন—

و ابيض يستسقى الغمام بوجهه   ثمال اليتامى عصمة للار امل

"তাঁর চেহারা এতই উজ্জ্বল ও আলোকময় যে, ঐ চেহারার বরকতে আল্লাহর নিকট থেকে বৃষ্টি চাওয়া হয়। যিনি ইয়াতীমের আশ্রয়স্থল এবং বিধবাদের অবলম্বন ও সহায়।"[১]

সিরিয়ায় প্রথম সফর এবং বাহীরা[২] দরবেশের কাহিনী

তাঁর বয়স বার বছরে পৌঁছেছিল। এ সময় আবূ তালিব কুরায়শ কাফেলার সাথে সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে যেতে মনস্থ করলেন। সফরের বিপদাপদের কারণে তাঁকে সাথে নেয়ার ইচ্ছা আবূ তালিবের ছিল না। কিন্তু যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর চেহারায় দুঃখের ছায়া দেখতে পেয়ে অবশেষে তাঁকে সাথে নিলেন (সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৬১; উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৪১)। রওয়ানা হয়ে যখন কাফেলা বসরা শহরের নিকটে পৌঁছলো, সেখানে এক খ্রিস্টান দরবেশ বাস করতেন যার নাম ছিল জারজীস। কিন্তু তিনি বাহীরা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি শেষ নবীর আগমন সংক্রান্ত আসমানী কিতাবসমূহের বর্ণনা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। কাজেই মক্কার এই কাফেলা যখন বাহীরা দরবেশের আস্তানার পাশে অবতরণ করলো, তখন তিনি রাসূল (সা)-এর চেহারা মুবারক দেখামাত্র তাঁকে চিনে ফেললেন যে, তিনিই সেই শেষ নবী, যাঁর সম্পর্কে পূর্বতন আসমানী কিতাবসমূহে বলা হয়েছে। তিনি এসে তাঁর হাত ধরলেন (দ্র. যারকানী, ১খ. পৃ. ১৯৪; জামে তিরমিযী, নবূওয়াত, ২খ. পৃ. ২০৪)। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার আবূ তালিব কুরায়শ নেতৃবৃন্দের

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ১৯০।

২. বাহিরা ب অক্ষরে যবর, ح অক্ষরে ى সাকিন ر-এ যের; আর কারো কারো মতে মদ্দ সহ উচ্চারিত হয়। দ্র. যারকানী, ১খ. পৃ. ৯৫ (ফায়েদা)। গবেষকগণের মতে বাহীরা একেশ্বরবাদী ছিলেন, তিনি মুশরিক এবং মূর্তিপূজক ছিলেন না। আর কারো কারো মতে তিনি যে লাত ও উযযার কসম দিয়েছিলেন, তা ছিল পরীক্ষামূলক।

সাথে সিরিয়ায় গেলেন। সিরিয়ায় যেখানে তিনি অবতরণ করলেন, সেখানে এক দরবেশ বাস করতেন। ঐ দরবেশের আস্তানার পাশ দিয়ে এর পূর্বেও তারা একাধিকবার গমন করেছিলেন, কিন্তু দরবেশ কখনো তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। কিন্তু এবারে যখন সেখানে কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলা অবতরণ করলো, দরবেশ নিয়ম-নীতিবহির্ভূতভাবে নিজের আস্তানা থেকে বের হলেন এবং কাফেলার ব্যক্তিবর্গের প্রতি এক এক করে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত হুযূর (সা)-এর হাত ধরলেন এবং বললেন :

هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين

"তিনিই বিশ্বনেতা, তিনি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল, যাঁকে আল্লাহ গোটা বিশ্বের জন্যে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন।"

কুরায়শ নেতৃবৃন্দ দরবেশকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা আপনি কিভাবে বুঝলেন ? তখন দরবেশ বললেন, যখন আপনারা নিজ অবস্থান থেকে বের হলেন, তখন পথিপার্শ্বের গাছপালা, তরুলতা ইত্যাদি নতশীরে তাঁকে সম্মান জানিয়েছে। আর এসব বস্তু কেবল নবীদেরকেই এভাবে সম্মান জানায়। এছাড়া মোহরে নবূওয়াত দেখেও তাঁকে চেনা যায়, যা তাঁর দু'বাহুর মাঝখানে একটি আপেলের মত দৃশ্যমান। দরবেশ এটুকু বলেই প্রস্থান করলেন এবং কেবল তাঁরই সৌজন্যে সমগ্র কাফেলার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করলেন। খাবার গ্রহণের জন্য সবাই উপস্থিত হলে এতে তিনি (সা) ছিলেন না। দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন তিনি কোথায় এবং জানতে পেলেন যে তিনি উট চরাতে গিয়েছেন। তখন লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনলেন। চারণভূমি থেকে আসার সময় একটি মেঘখণ্ড তাঁকে ছায়া দিয়ে আসছিল। তিনি কাফেলার নিকট পৌঁছে দেখতে পেলেন, সেখানে তাঁর পৌঁছার আগেই বৃক্ষের ছায়ার সবটুকুর নিচে মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। আর কোন জায়গা ছায়ার নিচে অবশিষ্ট নেই। হযরত (সা) একপাশে বসে পড়লেন। তিনি বসামাত্রই গাছের ছায়া তাঁর দিকে প্রসারিত হলো। দরবেশ সবাইকে বললেন, আপনারা বৃক্ষের ছায়ার প্রতি লক্ষ্য করে দেখুন, কিভাবে ছায়াটি সম্প্রসারিত হলো। এরপর দরবেশ দাঁড়িয়ে কসম করে বললেন, আপনারা কখনই তাঁকে রোমের দিকে নিয়ে যাবেন না। রোমবাসীরা তাঁকে দেখলে, তাঁর গুণাবলী ও লক্ষণসমূহ দেখে তাঁকে চিনে ফেলবে এবং তাঁকে হত্যা করবে। কথাবার্তা বলার ফাঁকেই দরবেশ হঠাৎ দেখলেন, একদিক থেকে সাতজন রোমবাসী কোনকিছুর সন্ধানে এদিকেই আসছে। দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি উদ্দেশে বের হয়েছ? জবাবে তারা বললো, আমরা ঐ নবীর সন্ধানে বের হয়েছি, তাওরাত এবং ইনজিলে যাঁর আগমনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং যিনি এ মাসেই এদিকে সফরে আসার কথা। এজন্যে চারদিকেই আমরা লোক প্রেরণ করেছি। দরবেশ বললেন, তা হলে তোমরা বল যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা ইচ্ছা করেন তা কি কখনও কেউ রুখতে পারে ? রোমবাসী নাগরিকরা বলল, না। এরপর দরবেশের নিকট তারা ওয়াদা

করলো, আমরা আর ঐ নবীর সন্ধানে ইচ্ছুক নই। অতঃপর ঐ সাত ব্যক্তি বাহীরা দরবেশের নিকটই রয়ে গেল। কেননা তারা যে উদ্দেশে বের হয়েছিল, এখানেই সে উদ্দেশ বদলে গেল। এখান থেকে ফিরে গেলে তাদের উপর উল্টা ফল ফলতে পারে আশঙ্কায় তারা না যাওয়ার সিদ্ধান্তটি নেয়। দরবেশ কুরাইশ কাফেলাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে এ বালকটির অভিভাবক কে? লোকেরা আবূ তালিবের দিকে ইঙ্গিত করলো। দরবেশ আবূ তালিবকে বললেন, আপনি তাঁকে শীঘ্রই ফেরত পাঠিয়ে দিন। আবূ তালিব তাঁকে আবূ বকর ও বিলালের সাথে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। দরবেশ তাঁদের পথের খাবার হিসেবে রুটি ও যয়তুন তেল দিয়ে দিলেন। (ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান। হাকিম বলেন, এ বর্ণনা বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ)।

বায়হাকীর এক বর্ণনায় আছে যে, বাহীরা উঠে গিয়ে তাঁর পিছনে তাকালেন এবং যে অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন, দু'বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে মোহরে নবূওয়াত দেখতে পেলেন। ইমাম বায়হাকী বলেন, মাগাযী লিখকদের কাছে এ ঘটনা প্রসিদ্ধ। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন, এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী অনেক, যা এর সত্যতা প্রমাণ করে। আর আমি শীঘ্রই এ প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ পেশ করছি।[১]

হাফিয আসকালানী তাঁর গ্রন্থ 'ইসাবায়' বলেন, এ রিওয়ায়াতের সমস্ত বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য এবং সহীহ বুখারীর রাবী। বুখারীর রাবীদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবন গাযওয়ানও আছেন। হাদীসের হাফিয ও আলিমদের এক বিরাট জামায়াত আবদুর রহমানকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। হাফিজ সাখাবী বলেন, আমি কোথাও আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে সমালোচনা পাইনি।

এ বর্ণনায় কেবল আবূ বকর ও বিলালকে তাঁর সঙ্গে প্রেরণের তথ্যটি ভুলক্রমে লিখিত হয়েছে। কাজেই এ কথা বলা যায় যে, কেবল আবূ বকর ও বিলালকে তাঁর সঙ্গে প্রেরণের বিষয়টিই বিতর্কিত। আর একটিমাত্র বাক্য বিতর্কিত থাকার দরুন পুরো হাদীসটি যঈফ হতে পারে না। কেননা এ হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য।[২] আর হাদীসটি ইমাম বাযযারের মুসনাদেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এখানে বিলালের নামটি উল্লেখ নেই, বরং বিলালের স্থলে 'রাজুলান' (জনৈক ব্যক্তি) উল্লেখ আছে।[৩] ইমাম জাযারী বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ এবং এর সমস্ত রাবীই সহীহ বুখারীর রাবী। কেবল আবূ বকর ও বিলাল-এর বর্ণনা ছাড়া সমস্ত বর্ণনা একইরূপ।[৪] হাফিয আসকালানী স্বীয় 'ফাতহুল বারী' নামক তাফসীর গ্রন্থে বলেন, তিরমিযীর হাদীসের সনদ শক্তিশালী। বর্ণনার ধারাবাহিকতায় এটি একটি ভিন্ন বর্ণনা বলে অনুভূত হয়।

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৮৪।

২. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৪৩।

৩. যাদুল মা'আদ, ১৭খ. পৃ. ৭১।

৪. মিরকাত, ৫খ. পৃ. ৪৭২।

তা হলো—হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) কুড়ি বছর বয়সে সিরিয়ার দিকে ভ্রমণ করেন। ঐ সফরে আবূ বকর (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। আবূ বকরের বয়স এ সময় ছিল আঠার বছর। এ সফরেও বাহীরা দরবেশের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল। হাদীসটি ইবন মানদা ইসবাহানী উল্লেখ করেছেন। এর সনদ যঈফ। হাফিজ আসকালানী তাঁর 'ইসাবা' গ্রন্থে বলেন, যদি এ বর্ণনা সহীহ হয়, তবে এটা ছিল তাঁর ভিন্ন একটি সিরিয়া সফর, পূর্ব বর্ণিত সফর নয়। বর্ণনাকারীর এ বর্ণনায় সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, দু'টি বর্ণনা নিকটতর হওয়ার দরুন ঘটনায় বিভ্রম ঘটেছে এবং এতে আবূ বকর (রা)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।[১]

আল্লামা শিবলী এ বর্ণনার সমালোচনা করে 'সীরাতুন নবী' (১খ. পৃ. ১৩১) গ্রন্থে লিখেন, এ বর্ণনা ধর্তব্য নয়। এর শেষোক্ত বর্ণনাকারী হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা); ঐ ঘটনার তিনি অংশীদার নন। বর্ণনার শেষ পর্যায়ে তিনি বলেন, জানা উচিত যে, কোন সাহাবী যদি এমন ঘটনা বর্ণনা করেন যাতে তিনি স্বয়ং সংশ্লিষ্ট নন, তা হলে ঐ হাদীসকে মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে 'মুরসালে সাহাবা' বলা হয়, যা মুহাদ্দিসগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য। অন্যথায় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) এবং কনিষ্ঠ সাহাবাগণ, যাঁরা ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন না, তাঁদের সকল বর্ণনাকেই অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল সাব্যস্ত করতে হয়। কোন হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তা সাহাবা পর্যন্ত পৌঁছতে যে ক'জন বর্ণনাকারী রয়েছেন, তাঁদের সবাই নির্ভরযোগ্য হবেন। সাহাবাগণ রাসূল (সা) থেকে যা কিছুই বর্ণনা করুন, তা প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকেই গৃহীত হবে। হাফিজ সুয়ূতী স্বীয় গ্রন্থ 'তাদরীবুর রাবী' (পৃ. ৭১)-তে লিখেছেন, সিহাহ গ্রন্থসমূহে এ ধরনের বর্ণনা অসংখ্য। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, নবূওয়াত প্রাপ্তির বর্ণনায় তিনি নিজেই এ মূলনীতি গ্রহণ করেছেন। কাজেই আল্লামা স্বীয় 'সীরাতুন নবী' (১খ. পৃ. ১৪৮) গ্রন্থের টিকায় লিখেছেন, এ বর্ণনা হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত—যদিও তিনি ঐ সময়ে জন্মগ্রহণ করেননি। মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে এ ধরনের বর্ণনাকে 'মুরসাল' বলে। আর সাহাবা কিরামের এ ধরনের বর্ণনা মুহাদ্দিসগণের নিকট দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। কেননা এর ছেড়ে দেয়া বর্ণনাকারীও নিঃসন্দেহে সাহাবীই হবেন।

জানি না, এই আল্লামা এ মূলনীতি কেন পরিহার করলেন। এখানে এসে এই আল্লামা ক্রুশ পূজারীদের সমালোচনায় এতোটা প্রভাবিত হয়ে ছিলেন যে, অনুসন্ধানের জোশ আর সমালোচনার জযবায় হাফিজ ইবন হাজারকেও বর্ণনা পূজারী বলেছেন; অর্থাৎ আল্লাহ না করুন হাফিজ ইবন হাজারও ক্রুশ পূজারীর মত রাবী পূজারীর শিরকে জড়িত আছেন। যদিও তিনি কুফরের উপর কুফর ও জুলুমের উপর জুলুমের মত পোষণকারী কিন্তু শিরকের বিরোধী ছিলেন। কোন মুহাদ্দিসের উপর কোন

১. ইসাবা, ১খ. পৃ. ১৭৭।

মুহাদ্দিসকে প্রাধান্য দেয়া আলিমগণের নিকট জায়েয; কিন্তু কোন মুহাদ্দিসের শানে অবজ্ঞাকর উক্তি করা নাজায়েয। হকের আদব রক্ষা করা আল্লাহ্ পাকের একটি বিরাট নিয়ামত। হাফিজ ইরাকী তার 'আলফিয়াতুস সিয়ার' গ্রন্থে লিখেন :

وكان يدعى بالامين ورحل مع عمه بالشام حتى اذ وصل

بصرى راى منه بحيرا الراهب ما دل انه النبى العاقب

محمد نبى هذه الامة فرده تخوفا من ثمه

من ان يرى بعض اليهود امره وعمره اذ ذاك ثنتا عشره

"তাঁকে আমীন বলে অভিহিত করা হতো, যখন তিনি তাঁর চাচার সাথে সিরিয়া সফর করেন। তিনি যখন বসরায় উপনীত হন, তখন দরবেশ (বাহিরা) তাঁকে নিশানা দ্বারা শেষ নবী বলে চিনতে পারেন। বাহীরা ভীত হয়ে তাঁকে বাড়িতে ফেরত পাঠাতে বললেন, যাতে কতিপয় ইয়াহূদী তাঁকে চিনতে না পারে। এ সময় তাঁর বয়স ছিল বার বছর।"

হারবুল ফুজ্জার

আরবে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছিল। হস্তী বাহিনীর ঘটনার পর যে প্রসিদ্ধ যুদ্ধের ঘটনা সামনে আসে, তা হারবুল ফুজ্জার নামে খ্যাত। এ যুদ্ধ কুরায়শ এবং বনী কায়স গোত্রের মধ্যে সংঘটিত হয়। প্রথমদিকে বনী কায়স কুরায়শের উপর প্রাধান্য লাভ করে। পরে কুরায়শ বনী কায়সের উপর জয়লাভ করে। সব শেষে সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। কোন কোন দিন কিশোর মুহাম্মদ (সা)-ও চাচাদের নির্দেশের কারণে অংশগ্রহণ করেন কিন্তু যুদ্ধে লিপ্ত হননি। আল্লামা সুহায়লী বলেন :

وانما لم يقاتل رسول الله ﷺ مع اعمامه وكان ينبل عليهم وقد كان بلغ من القتال لانها كانت حرب الفجار وكانوا ايضا كلهم كفارا ولم ياذن الله لمؤمن ان يقاتل الا تكون كلمت الله هى العليا

"এ যুদ্ধে নবী করীম (সা) নিজ চাচাদের সঙ্গে শরীক হননি। অথচ এ সময় তিনি যুদ্ধে যাওয়ার বয়সে উপনীত হয়েছেন। তিনি নিজ পিতৃব্যদেরকে তীর উঠিয়ে দিতেন; তিনি স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন না। কেননা এ যুদ্ধ হারবুল ফুজ্জার অর্থাৎ আল্লাহ্র অবাধ্য মানুষদের যুদ্ধ ছিল। এটি এমন মাসে সংঘটিত হয়েছিল, যে মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল অপরাধ অন্যায়, এমনকি হারাম। এ যুদ্ধকে 'হারবুল ফুজ্জার' এজন্যে বলা হয়। এতে উভয়পক্ষই আল্লাহ্র অবাধ্য ছিল। অন্যথায় মুমিনদেরকে যুদ্ধ-জিহাদের অনুমতি তো শুধু আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার এবং আল্লাহর কালেমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যেই দেয়া হয়েছিল।"[১]

---

১. রাওযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১২০।

ইবন হিশাম বলেন, এ সময়ে হযরতের বয়স চৌদ্দ অথবা পনর বছর ছিল। আর মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, এ সময়ে হযরতের বয়স ছিল বিশ বছর।

(সীরাতে ইবন হিশাম)

নবী করীম (সা)-এর হিলফুল ফুযূলে অংশগ্রহণ

যুদ্ধ-বিগ্রহ আরব ভূ-খণ্ডে দীর্ঘদিন যাবত চলে আসছিল। কিন্তু তা কতদূর বরদাশ্‌ত করা যায়? ফুজ্জার যুদ্ধের পরে কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তির অন্তরে এ ভাব জাগলো যে, পূর্ববর্তী জামানায় যুদ্ধ বিগ্রহ ও ধ্বংসলীলার অবসানকল্পে যেমনভাবে ফযল ইবন ফুযালা, ফযল ইবন উদায়া এবং ফুযায়ল ইবন হারিস একটি শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাদের নামানুসারে সেই শান্তিচুক্তি 'হিলফুল ফুযুল" নামে খ্যাত ছিল, শান্তির লক্ষ্যে অনুরূপভাবে দ্বিতীয়বার চুক্তিটি পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন। যুবায়র ইবন আবদুল মুত্তালিব তার কিছু কিছু কবিতায় এ চুক্তির উল্লেখ করেছিলেন। যেমন :

ان الفضول تحالفوا وتعاقدوا الا يقيم ببطن مكة ظالم
امر عليه تعاهدوا وتواثقوا فالجار والمعتر فيهم سالم

"ফযল ইবন উদায়া, ফযল ইবন ফুযালা এবং ফুযায়ল ইবন হারিস সবার থেকে ঐ কাজের উপর শপথ নিয়েছিলেন যে, মক্কায় কোন অত্যাচারী থাকতে পারবে না। সবাই এর উপর দৃঢ় শপথ নিল। কাজেই মক্কার প্রতিবেশী এবং অভ্যাগতরা সবাই নিরাপদ হয়ে গেল।" (সীরাতে ইবন হিশাম; রাউযুল উনূফ, পৃ. ৯০)

শাওয়াল মাসে যখন হারবুল ফুজ্জারের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেল। অতঃপর যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাস যিলহজ্জ শুরু হলো, তখন ঐ হিলফুল ফুযুলের নবায়ন শুরু হলো এবং সর্বপ্রথম যুবায়র ইবন আবদুল মুত্তালিব ঐ শপথ ও চুক্তির নবায়নের লক্ষ্যে বনী হাশিম ও বনী তায়মকে আবদুল্লাহ ইবন জুদআনের গৃহে সমবেত করলেন। আবদুল্লাহ ইবন জুদআন সবার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করালেন। ঐ সময় তারা নির্যাতিত মযলুমদের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানে অঙ্গিকারবদ্ধ হলেন। আত্মীয়-অনাত্মীয়, নিজ গোত্র, ভিন্ন গোত্র, দেশী-বিদেশী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের সাহায্য ও নিরাপত্তাদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন।[১]

নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন : " সে সময় আমিও আবদুল্লাহ ইবন জুদআনের গৃহে উপস্থিত ছিলাম। ঐ শপথের পরিবর্তে যদি আমাকে লালবর্ণের উটও দেয়া হতো, তাও আমি অপসন্দ করতাম। এখন ইসলামী যুগেও যদি অনুরূপ একটি শপথনামা (চুক্তি)-র জন্য আমাকে আহ্বান করা হয়, তা হলে আমি অবশ্যই তা কবূল করবো।"

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ৮২।

এই আবদুল্লাহ ইবন জুদআন ছিলেন হযরত আয়েশা (রা)-এর চাচাত ভাই। একবার হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আবদুল্লাহ ইবন জুদআন অত্যন্ত মেহমানদারী করতেন। লোকজনকে খানা খাওয়াতেন। তার এ সৎকাজ কি কিয়ামতের দিন নিজের কোন উপকারে আসবে? তিনি জবাব দিলেন, না। কেননা সে এ কথা বলেনি যে, رب اغفرلی خطیئتی یوم الدین "হে প্রভু ! আমার গুনাহগুলোকে প্রতিদান দিবসে মাফ করে দিন" (মুসলিম)। অর্থাৎ সে কখনো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে নিজের গুনাহসমূহ মাফের জন্য আবেদন করেনি। ইবন কুতায়বা তাঁর 'গারীবুল হাদীসে' উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ "গরমকালে আমি কখনো চলতে চলতে আবদুল্লাহ ইবন জুদআনের কবরের ছায়ায় দাঁড়াতাম।" (রাউযুল উনূফ, পৃ. ৯২)। অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবন জুদআনের কবর এত দীর্ঘ ছিল যে, তার ছায়ায় একজন লোক দাঁড়াতে পারতো। যেন তা وجفان كالجواب -এর[১] একটি উদাহরণ ছিল।

ব্যবসায় আত্মনিয়োগ এবং 'আমীন' উপাধি লাভ

দাউদ ইবন হাসীন[২] থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা বলেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ শান-শওকতের সাথে যুবক অবস্থায় পৌঁছলেন যে, তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাহসী, সর্বাপেক্ষা সচ্চরিত্র, সঙ্গী-সাথীদের সর্বাধিক খোঁজ-খবরকারী, সর্বাপেক্ষা সহনশীল, সর্বাধিক সত্যবাদী ও আমানতদার এবং ঝগড়া-বিবাদ, কটু কথা, অশ্লীলতা ও বাজে কথা থেকে সর্বাধিক দূরে অবস্থানকারী ছিলেন। যদ্দরুন তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে 'আমীন' উপাধিতে ভূষিত করে (ইবন সা'দ ও ইবন আসাকির, খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৯১)।

আবদুল্লাহ ইবন আবুল হামসা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে নবী করীম (সা)-এর সাথে কোন ব্যাপারে আমার কিছু দেনা ছিল। আমি তাঁকে বললাম, অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আসছি। কিন্তু ঘটনাক্রমে ঘরে এসে বিষয়টি আমি বেমালুম ভুলে যাই। তিনদিন পর হঠাৎ বিষয়টি আমার স্মরণ হলে আমি দ্রুত ঐ জায়গায় গিয়ে দেখতে পাই, তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। তিনি কেবল আমাকে এটুকু বললেন যে, তুমি আমাকে খুবই কষ্ট দিয়েছ; তিনদিন যাবত আমি এখানেই অপেক্ষা করছি। (সুনানু আবূ দাউদ, ইদ্দাতু মিন কিতাবিল আদাব)।

---

১. যেমনভাবে জিন্নেরা হযরত সুলায়মান (আ)-এর নির্দেশে হাউয সদৃশ্য বড় বড় পেয়ালা বানাতো। সূরা সাবা-র বর্ণনা অনুসারে।

২ ইয়াহিয়া ইবন মুঈন ও ইমাম নাসাঈ দাউদ ইবন হাসীনকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, যিনি ১৩৫ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন। বুখারী তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। (খুলাসা, ৮খ. পৃ. ১০৯)।

আবদুল্লাহ ইবন সায়িব[১] বলেন, জাহিলী যুগে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যবসার অংশীদার ছিলাম। তিনি যখন মদীনা আগমন করলেন, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ কি ? আমি আরয করলাম, কেন নয় ?

كنت شريكى فنعم الشريك لاتدارى ولاتـمارى

"আপনি তো আমার ব্যবসায়ের অংশীদার ছিলেন। কত উত্তম অংশীদার ! না কোন কটুভাষী ছিলেন, না কোন বিষয়ে ঝগড়া করেছেন।"

কায়স ইবন সায়িব মাখযূমী[২] বলেন, জাহিলী যুগে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এ ব্যবসায়ের অংশীদার ছিলাম।

আর তিনি[৩] وكان خير شريك لايـمارى ولايشارى "ছিলেন ব্যবসায়ের উত্তম অংশীদার। না তিনি ঝগড়া করেছেন আর না দর কষাকষি করেছেন।" (ইসাবা, কায়স ইবন সায়িব-এর জীবন চরিত)।

নবী (সা) কর্তৃক বকরি চরান

যেভাবে তিনি হযরত হালীমা সাদিয়ার গৃহে শৈশবকালে তাঁর দুধ ভ্রাতাদের সাথে বকরি চরাতেন, অনুরূপভাবে যুবা বয়সেও বকরি চড়িয়েছেন। হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যাহ্‌রান নামক স্থানে আমি নবী করীম (সা)-এর সাথে ছিলাম। আমি সেখানে পিলু ফল ছিঁড়ছিলাম। তিনি বললেন, কালো কালো দেখে ছেঁড়ো, এগুলো সুস্বাদু হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি বকরি চড়াতেন (যে কারণে আপনি এটা জেনেছেন) ? তিনি বললেন "হ্যাঁ, এমন কোন নবী নেই যিনি ছাগল চড়াতেন না।"[৪]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ "এমন কোন নবী নেই যিনি বকরি চড়াতেন না।" সাহাবাগণ আরয করলেন, আপনিও ? তিনি ইরশাদ করলেন : "হ্যাঁ, আমিও কয়েক কীরাতের বিনিময়ে

---

১. আবদুল্লাহ ইবন সায়িব (রা) মক্কায় বাস করতেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর খিলাফতকালে মক্কায়ই ইনতিকাল করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) তাঁর জানাযা পড়ান (ইসাবা)।

২. তিনি মুজাহিদের আযাদকৃত দাস ছিলেন। যখন কায়স ইবন সায়িবের বয়স ১২০ বছর হলো এবং তাঁর রোযা রাখার শক্তি থাকলো না, তখন وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ আয়াতটি নাযিল হয়। কাজেই যখন রমযান আসতো, তিনি বলতেন, আমার পক্ষ থেকে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে এক সা' করে খাদ্য দান কর। আবূ হাতিম বলেন, আমার ধারণা মতে কায়স ইবন সায়িব আবদুল্লাহ ইবন সায়িবের ভ্রাতা ছিলেন। কায়স ইবন সায়িব বলেছেন, নবী করীম (সা) পূর্বাকাশ অন্ধকার থাকতে ফজর নামায এবং সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পব জোহরের নামায পড়তেন (ইসাবা)।

৩. আল্লামা সুয়ূতীকৃত 'তালখীস'।

৪. সহীহ বুখারী, কিতাবুল আতইমা।

মক্কাবাসীদের বকরি চরিয়েছি।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইজারা, ১খ. পৃ.৩০১)। হাফিয তুরবাশতী (র) 'শরহে মাসাবীহ' গ্রন্থে বলেন, কতিপয় মুতাকাল্লিমীন বকরি চড়ানোর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ নবীর শানের বিরোধী মনে করে এ মতামত দিয়েছেন যে, এ হাদীসে কীরাত অর্থ কয়েকটি মুদ্রা নয়, বরং কীরাত একটি স্থানের নাম, যেখানে তিনি বকরি চড়াতেন। মুতাকাল্লিমদের এ বক্তব্য সরাসরি বাস্তবতা বর্জিত ও সত্যের অপলাপ। কেননা দীনের তাবলীগ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দাওয়াতের বিনিময় এবং পারিশ্রমিক গ্রহণ নিঃসন্দেহে নবীর শানের বিরোধী, কিন্তু জীবিকা নির্বাহের জন্য পারিশ্রমিক ও বিনিময় গ্রহণ কোনক্রমেই নবীর শানের বিরোধী নয়, বরং নবী (আ) গণের সুন্নত ও কর্ম এবং তাওয়াক্কুল তাঁদের বাস্তবতা; বরং এ কর্ম নবূওয়াতের সাথে সংগতিশীল। অধিকন্তু, কীরাতকে স্থানের নাম হিসেবে বর্ণনা অনির্ভরযোগ্য ও অসত্য বর্ণনা। এ বর্ণনাকারীর পূর্বে কোন বর্ণনাকারীই এমন পাওয়া যায়নি যিনি কীরাতকে স্থানের নাম হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিজ আসকালানী বলেন, প্রসিদ্ধ বর্ণনা এটাই যে, কারারীত কীরাত শব্দের বহুবচন, এটা কোন স্থানের নাম নয়। মক্কাবাসী কারারীত নামক স্থানের ব্যাপারে অবগত নন। ইমাম নাসাঈ নাসর ইবন খাযন থেকে বর্ণনা করেন, একবার উটের মালিকগণ বকরির মালিকদের উপর গর্ব করতে থাকলে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, মূসা (আ)-কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনি বকরি চরাতেন; দাঊদ (আ)-কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনিও বকরি চড়াতেন। আর আমাকেও নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, আমিও 'আজইয়াদ' নামক স্থানে আমার গৃহবাসীদের বকরি চরিয়েছি।[১]

সার কথা হলো, নবী (আ)গণের বকরি চড়ানো নিজ উম্মতের দেখাশোনা করার পূর্বাভাস ও ভূমিকা ছিল। উট এবং গরু চড়ানো এতটা কঠিন নয় যেমনটা বকরি চড়ানো কঠিন। বকরি কখনো এক চারণভূমিতে যায়, কখনো আরেক চারণভূমিতে। এ মুহূর্তে যদি এ প্রান্তে থাকে, তবে পর মুহূর্তে দ্বিতীয় প্রান্তে দৌড়াতে দেখা যায়। দলের কিছু বকরি যদি এদিকে দৌড়ায়, তো কিছু ওদিকে দৌড়ায়। রাখালকে চারদিকেই দৃষ্টি রাখতে হয় যে, কোন নেকড়ে কিংবা শার্দুল তো শিকারের ধান্দা করছে না, রাখাল চাইবে সব বকরি একত্রে থাকুক। এবং এমনটি না হয় যে, একটি বকরি দলছুট হয়ে যাক আর নেকড়ে তাকে ধরে নিয়ে যাক। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাখাল এ চিন্তায় ওগুলোর পিছনে হয়রান পেরেশান হয়ে থাকে। নবী (আ)গণের অবস্থা নিজ উম্মতদের সাথে এমনটিই হয়ে থাকে। তাদের কল্যাণ ও সাফল্যের চিন্তায় তাঁরা দিনরাত পেরেশান থাকতেন। উম্মতের একাকীত্ব তো নেকড়ে ও বকরিব মত তাদেরও এদিক সেদিক তাড়িত করে। আর নবী (আ)গণ বুদ্ধিমত্তা ও দ্রুততার সাথে তাদেরকে সতর্কতার সঙ্গে নিজের দিকে আহ্বান করেন। উম্মতের এ ধরনের

১. ফাতহুল বারী, ৪খ. পৃ. ৪৬৪।

কাজের দরুন নবী (আ)গণের কষ্ট ও আঘাত লাগে, এর উপর তাঁরা ধৈর্য ধারণ ও সহ্য করেন। অধিকন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁরা কোন সময়েই তাবলীগ ও তা'লীম থেকে বিতৃষ্ণ হন না কিংবা দমে যান না। যেমনভাবে বকরির পাল নেকড়ে এবং হিংস্র পশুর হামলা থেকে উদাসীন থাকে, তেমনিভাবে উম্মতও নাফস ও শয়তানের আকস্মিক হামলায় উদাসীন হয়ে থাকে। আর নবী (আ)গণ সবসময় এদিকে সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখেন যেন আকস্মিকভাবে নাফস ও শয়তান তাকে পথচ্যুত করতে সক্ষম না হয়। উম্মতের কল্যাণ ও উম্মতের জন্য নবী (আ)গণ যেমন সার্বক্ষণিক চিন্তাযুক্ত থাকেন, উম্মত তার দশভাগের একভাগ চিন্তাও করে না। উম্মতের তো নিজের ধ্বংস ও বরবাদীর খেয়ালই থাকে না। অথচ নবী (আ)গণ এ চিন্তায় থাকেন সদা সন্ত্রস্ত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ اَلاَّ يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

"সম্ভবত ওরা ঈমান আনে না বলে আপনি মনোকষ্টে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বেন।" (সূরা শু'আরা : ৩)

ইরশাদ হয়েছে : اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنفسِهِمْ

"নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজ সত্তা থেকেও ঘনিষ্টতর।" (সূরাআহযাব : ৬)

আর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে : وهو اب لهم অর্থাৎ নবীগণ তাদের রূহানী পিতা হয়ে থাকেন।

হে আল্লাহ্ ! আপনি আপনার অসংখ্য রহমত, অগণিত বরকত সাধারণভাবে সকল নবী (আ)গণের উপর এবং বিশেষভাবে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর বর্ষণ করুন, যাঁর পবিত্র বাণী আমাদের মত নির্বোধ বান্দাদেরকে আপনার সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে। আমীন, ইয়া রাব্বুল আলামীন।

সিরিয়ায় দ্বিতীয় সফর এবং নাস্তুরা দরবেশের সাথে সাক্ষাত

হযরত খাদীজা (রা) আরবের সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ধনী মহিলা ছিলেন। তাঁর উচ্চ বংশ মর্যাদা এবং নম্রতা ও পবিত্রতার জন্য জাহিলী এবং ইসলামী উভয় যুগের জনগণই তাঁকে 'তাহিরা' নামে সম্বোধন করতো। কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলা রওয়ানা হলে খাদীজাও তাদের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাণিজ্যে শরীক থাকতেন। এক খাদীজার পণ্য সামগ্রী সমগ্র কাফেলার পণ্য সম্ভারের সমান হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বয়স যখন পঁচিশ বছরে উপনীত হলো তখন ঘরে ঘরে তাঁর দায়িত্ববোধ ও আমানতদারীব সুনাম পৌঁছে গেল। এমনকি মক্কায় এমন কোন লোক ছিল না, যে তাঁকে 'আমীন' নামে সম্বোধন করতো না, খাদীজা তখন প্রস্তাব পাঠালেন যে, তিনি যদি তাঁর পণ্যসামগ্রী নিয়ে সিরিয়া গমন করেন, তবে অন্যদের মতই তাঁকে পারিশ্রমিক ও

সম্মানী দেয়া হবে। তিনি স্বীয় পিতৃব্য আবূ তালিবের আর্থিক সংকটের প্রেক্ষিতে এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং হযরত খাদীজার দাস 'মায়সারা'র সাথে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হলেন। বসরা পৌঁছে তিনি একটি ছায়াদার বৃক্ষের নিচে উপবেশন করেন। সেখানে 'নাস্তুরা' নামে এক দরবেশ বাস করতেন। দরবেশ তাঁকে দেখে কাছে এলেন এবং বললেন, ঈসা ইবন মরিয়ম[1] (আ)-এর পর আপনি ছাড়া আর কোন নবীই এখানে অবতরণ করেন নি। এরপর মায়সারাকে বললেন, তাঁর দু' চোখে ঐ রক্তিম আভা দেখতে পাচ্ছি। মায়সারা বলল, এ রক্তিম আভা তাঁর চোখ থেকে কখনো পৃথক হয় না। দরবেশ বললেন : هو هو وهو نبى وهو اخر الانبياء "তিনিই তিনি, ইনিই নবী, ইনিই শেষ নবী।"

এর পর বেচাকেনা শুরু হলে এক ব্যক্তি তাঁর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হলো এবং তাঁকে বললো, আপনি লাত-উযযার কসম করে বলুন। নবী (সা) বললেন, আমি কখনো লাত-উযযার কসম খাইনি। আর ঘটনাক্রমে আমার সামনে লাত-উযযার প্রসঙ্গ এসে গেলে আমি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতাম অথবা কৌশলে পাশ কাটিয়ে সেখান থেকে চলে যেতাম। এ কথা শুনে লোকটি বলল, নিঃসন্দেহে এ তো আপনারই কথা অর্থাৎ সত্যবাদীর সত্য কথা। এরপর ঐ ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্র কসম, তিনিই ঐ ব্যক্তি, যাঁর শান ও গুণের বিষয় আমাদের আলিমগণ আপন ধর্মীয় গ্রন্থে লিখিত পেয়েছেন।

মায়সারার বর্ণনা হলো, যখন দুপুর হয় এবং প্রচণ্ড গরম পড়ে, তখন আমি দু'জন ফেরেশতাকে দেখতাম তারা তাঁর মাথার উপর ছায়া বিস্তার করে রাখতেন। তিনি যখন সিরিয়া থেকে রওয়ানা দেন, তখন ছিল দ্বিপ্রহর আর দু'জন ফেরেশতা তাঁর উপর ছায়া দিচ্ছিলেন। হযরত খাদীজাও স্বীয় বালাখানা থেকে তাঁর এ মর্যাদা প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তিনি আশপাশের প্রত্যেক স্ত্রীলোককে এ দৃশ্য দেখালেন। সকল স্ত্রীলোকই এতে আশ্চর্য হয়ে যায়। এরপর মায়সারা[2] এ সফরের সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করলো এবং বাণিজ্য লব্ধ সমস্ত সম্পদ খাদীজার নিকট সোপর্দ করলো। নবী (সা)-এর বরকতে এবারে খাদীজার বাণিজ্যে এত অধিক মুনাফা অর্জিত হয় যে,

---

১. ইবন সা'দ-এর বর্ণনায় 'ঈসার পরে' শব্দটি নেই। এ বর্ণনাটি যারকানী উদ্ধৃত করেছেন। এ বাক্যের অর্থ এই, যা আমরা উল্লেখ করেছি যে, হযরত মসীহ (আ)-এর পর তাঁর পূর্বে এ বৃক্ষের নিচে আর কেউ অবতরণ করেননি। আল্লামা সুহায়লী 'রাউযুল উনুফ' গ্রন্থে এ অর্থই করেছেন। আর দ্বিতীয় অর্থ, যা ইমাম ইবন জুমা'আ বলেছেন, তা এই যে, সম্ভবত হযরত মসীহ (আ)-এর পরে এ বৃক্ষের নিচে কোন নবী কিংবা সাধারণ কোন ব্যক্তিই অবতরণ করেননি। তিনি ছাড়া কেউ সেখানে অবতরণ না করাও একটি ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য বৈকি, যা কোন কোন রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য যারকানী, ১খ. পৃ. ১৯৮ দ্র.।

২ প্রসিদ্ধ আছে যে, মায়সারা মহানবী (সা)-এর নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে। হাফিজ আসকালানী 'ইসাবা' গ্রন্থে বলেন, কোন সহীহ বর্ণনা দ্বারাই মায়সারার সাহাবী হওয়া প্রমাণ হয়নি। (যারকানী, ১খ. পৃ. ১৯৮)।

ইতোপূর্বে কোনবারেই এ পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হয় নি। হযরত খাদীজা তাঁকে যে পরিমাণ পারিশ্রমিক দিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে দিয়ে দেন।[১]

এ ঘটনার বর্ণনা কেবল ওয়াকিদীই নন, বরং মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ও ইবনুস সাকানও একই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ওয়াকিদী জমহূর আলিমগণের নিকট যঈফ, আর মুহাম্মদ ইবন ইসহাক তাবিঈ এবং জমহূর আলিমগণের নিকট গ্রহণযোগ্য। ইমাম আহমদ বলেন, মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের হাদীস আমার নিকট হাসান। আর ওয়াকিদী যদিও মুহাদ্দিসগণের নিকট অগ্রহণযোগ্য, তবুও হাদীসের কোন কিতাবই ওয়াকিদীর বর্ণনা থেকে খালি নেই। হাফিয ইবন তাইমিয়া 'আস-সারিমুল মাসলূল' গ্রন্থে (পৃ. ৯৬) বলেন, ওয়াকিদী যদিও দুর্বল, তবুও তাঁর মাগাযী বা যুদ্ধ সংক্রান্ত বর্ণনা সর্বজনগ্রাহ্য হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ইবন হাম্বল প্রমুখ তাঁর কিতাবসমূহের উপর নির্ভর করেন। মোট কথা, উদ্দেশ্য এটাই যে, এ রিওয়ায়াত মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ও ওয়াকিদী উভয় থেকেই বর্ণিত এবং মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের বর্ণনা মুহাদ্দিসগণের নিকট উল্লেখযোগ্য ও 'হাসান' রিওয়ায়াতের মর্যাদার নিচে নয়। আর ওয়াকিদীর বর্ণনা যদিও 'যঈফ' কিন্তু 'হাসান' হাদীসের জন্য নিঃসন্দেহে সমার্থক ও সাক্ষী হতে পারে।

মায়সারার কিসসার সত্যতা যাচাই ও পর্যবেক্ষণ এবং সীরাতের তিন ইমামের বর্ণনা ও এর উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত

মায়সারার ঘটনা যেহেতু মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ও ওয়াকিদী উভয় থেকেই বর্ণিত হাদীসের যাচাই বাছাইতে যাদের সম্পর্কে আলিমগণের আলোচনা-সমালোচনা দীর্ঘ; এ জন্যে তিনজন সীরাত বিশেষজ্ঞের কিছু বর্ণনা ও অবস্থা আমরা পাঠকদের জন্য উপহার স্বরূপ উপস্থাপন করতে চাচ্ছি। যাঁরা মাগাযী লেখকদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ : ১. মুহাম্মদ ইবন উকবা, ২. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক এবং ৩. ওয়াকিদী—যাতে এ সীরাত বিশেষজ্ঞদের রিওয়ায়াত সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা জানা যায়।

১. মূসা ইবন উকবা মূসা ইবন উকবা মদীনার অধিবাসী। তিনি হযরত জুবায়র ইবন আওয়াম (রা)-এর আযাদকৃত দাস এবং তাবিঈ, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী নির্ভরযোগ্য রাবী। কেউই তাঁকে অগ্রহণযোগ্য বলেননি। ইমাম মালিক, সুফিয়ান ইবন উয়ায়না এবং আবদুল্লাহ ইবন মুবারক তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ১৪১ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। ছয়জন সিহাহ লিখকের প্রত্যেকেই তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম মালিক মূসা ইবন উকবার মাগাযী প্রসঙ্গে বলতেন যে, এটা নির্ভরযোগ্য মাগাযী গ্রন্থ। কিন্তু মূসা ইবন উকবার মাগাযী গ্রন্থের

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ৮৩; খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৯১; উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৪৯।

কোন কপি বিদ্যমান নেই। পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে তাঁর কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত রিওয়ায়াত পাওয়া যায়।

২. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন ইয়াসার মাতলিবী মদীনাবাসী তাবিঈ। তিনি সীরাত ও মাগাযীর ইমাম। জমহূর আলিমগণ তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইমাম মালিক (র) তাঁর সমালোচনা করেছেন। হাফিয যাহবী 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ব্যক্তিগতভাবে সত্যবাদী ও গ্রহণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর হাদীস সহীহ স্তর থেকে নিমোনের। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) তাঁর হাদীসকে হাসান পর্যায়ের বলেছেন। আলী ইবন মাদিনী বলতেন যে, মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের হাদীস আমার নিকট সহীহ। ইমাম নাসাঈ বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীসের সনদ শক্তিশালী। দারু কুতনী বলেন, তাঁর রিওয়ায়াত প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম মালিক তাঁকে দাজ্জাল বলেছেন। অর্থাৎ দাজ্জাল সম্প্রদায়ভুক্ত হাদীসের আমীরুল মু'মিনীন ছিলেন। ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে তাঁর থেকে সরাসরি কোন রিওয়ায়াত গ্রহণ করেননি। অবশ্য তা'লিক সূত্রে রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। সুনান বিশেষজ্ঞগণ মুহাম্মদ ইবন ইসহাক থেকে রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন আর ইমাম মুসলিম অপরের মাধ্যমে তাঁর রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। তিনি ১৫১ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। ইবন ইসহাক রচিত মাগাযী গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। অবশ্য সীরাতে ইবন হিশামের যে সংস্করণ বর্তমানে বিদ্যমান, তা প্রকৃতপক্ষে সীরাতে ইবন ইসহাকেরই সংস্করণ, যা তিনি নতুনভাবে বিন্যস্ত করেছেন।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক সম্পর্কে দু'টি সমালোচনা করা হয়। একটি হলো তিনি রিওয়ায়াতে তাদলীস করতেন। দ্বিতীয়ত তিনি খায়বর ইত্যাদি প্রসঙ্গে বর্ণিত ঘটনাগুলো খায়বরের ইয়াহূদী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় কারণটির সমালোচনা আবশ্যিক নয়। অন্যান্য প্রমাণের পর অতিরিক্ত নির্ভরযোগ্যতার জন্য ইয়াহূদীর বর্ণনা দ্বারা ঘটনার সত্যায়ন করা তেমন সমালোচনাযোগ্য নয়। তবে শুধু কোনো ইয়াহূদীর উপর নির্ভর করা এবং তাদের বর্ণনা দ্বারাই শরীয়তের বিধান প্রমাণ করা বৈধ নয়। কিন্তু দুনিয়ার কোন মুসলমান এমন বক্তব্যের প্রবক্তা নয় এবং এটা প্রমাণিতও নয় যে, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক খায়বরের ইয়াহূদীদের থেকে নাফি' এবং যুহরীর মত বর্ণনা করেছেন তেমনি তিনি কাসিম ও আতার মত খায়বরের ইয়াহূদীদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন বলেও কোনো প্রমাণ নেই। কোন সাধারণ মুসলমানও কাফির থেকে রিওয়ায়াত করতে বা তাদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করতে পারে না। যারা এরূপ মনে করে তারা ভুল করে।

বাকী রইল 'তাদলীস'-এর ব্যাপারটি। খোদ হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, عن عن তথা অমুক থেকে তমুক থেকে বর্ণিত 'তাদলীস'কৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না বর্ণনাকারী ও শ্রোতার প্রত্যক্ষ শ্রবন প্রমাণিত হয়।

৩. ওয়াকিদী : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন উমর ওয়াকিদ আল ওয়াকিদী ছিলেন মদীনার অধিবাসী। তিনি সীরাত ও মাগাযীর ইমাম ও প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। ইমাম মালিক, সুফিয়ান সাওরী, মুয়াম্মার ইবন রাশীদ এবং ইবন আবূ যি'ব-এর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যেমনটি তারীখে ইবন খাল্লিকান (১খ. পৃ. ৬৪০) এবং তার শিষ্য রাশীদ মুহাম্মদ ইবন সা'দ তাবাকাত প্রণেতা সুফিয়ান ইবন উয়ায়নার শিষ্যভুক্ত ছিলেন (পূ. গ্র. পৃ. ৬৪২)। ওয়াকিদী ১৩০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৭ হিজরীতে ইনতিকাল করেন (মিযানুল ই'তিদাল, ৩খ. পৃ. ১১১)।

ওয়াকিদীর ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের বক্তব্য বিভিন্ন। ইমাম শাফিঈ ও ইমাম মুহাম্মদ ওয়াকিদীকে অসত্যভাষী এবং তার কিতাবকে অসত্য, অনির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম তার হাদীসকে 'পরিত্যজ্য' বলেছেন। আলী ইবন মাদিনী ও নাসাঈ তাকে 'ওয়াজিউল হাদীস' বা হাদীস জালকারী বলে মন্তব্য করেছেন। আর হাদীস বিশেষজ্ঞদের একটি দল তাকে 'যঈফ' বলেছেন। অর্থাৎ ওয়াকিদী দুর্বল বর্ণনাকারী, মিথ্যাবাদী নন। ইয়াহিয়া ইবন মুঈন বলেন, ওয়াকিদী নির্ভরযোগ্য নন। দারু কুতনী বলেন, তিনি যঈফ রাবী। আলিমদের একটি ক্ষুদ্র দল ওয়াকিদীকে নির্ভরযোগ্য ও তার বর্ণনাকে সহীহ্ বলেছেন। ইয়াযিদ ইবন হারুন বলেন, ওয়াকিদী নির্ভরযোগ্য। আবূ উবায়দ ও ইবরাহীম হুযালীও তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। দারাওয়ার্দী বলেন, ওয়াকিদী হাদীসের আমীরুল মু'মিনীন। হাফিয ইবন সায়্যিদুন নাস তাঁর 'উয়ূনুল আসার'-এর ভূমিকায় বিভিন্ন বক্তব্য উদ্ধৃত করার পর ওয়াকিদীর নির্ভরযোগ্য হওয়ার বিষয়টি প্রাধান্য দেন। হাফিয ইবন হাজার 'ফাতহুল বারী'তে বলেন :

وقد تعصب مغلطائ للواقدى فنقل كلام من قواه ووثقه وسكت عن ذكر من وهاه واتهمه وهم اكثر عددا واشد اتقانا واقوى مرفة به من الاولين ومن جملة ماقواه به ان الشافعى روى عنه وقد اسند البيهقى عن الشافعى انه كذبه كذا فى انهاء السكن مقدمة

"হাফিয মুগালতাঈ ওয়াকিদীর সমর্থনে পক্ষপাতিত্ব করেছেন যে, যারা ওয়াকিদীকে গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী বলেছেন, তাদের বক্তব্য তো উদ্ধৃত করেছেন, আর যারা তাকে দুর্বল ও অপবাদযোগ্যরূপে চিহ্নিত করেছেন, তাদের ব্যাপারে মুগালতাঈ নিশ্চুপ থেকেছেন। অথচ ওয়াকিদীর সমালোচনাকারীর সংখ্যা তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার বর্ণনাকারীর সংখ্যার চেয়ে বেশি। উপরন্তু, তারা স্মরণশক্তি আল্লাহভীতি ও আধ্যাত্মিক বিদ্যায় ছিলেন বড়। তারা ওয়াকিদীর বর্ণনা শক্তিশালী হওয়ার স্বপক্ষে এ দলীল উপস্থাপন করেছেন যে, ইমাম শাফিঈ তার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। অথচ বায়হাকী নিজ সনদের সাথে ইমাম শাফিঈ থেকে এ উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ইমাম শাফিঈ ওয়াকিদীকে অসত্যবাদী বলতেন।" (ইলাউস সুনানের ভূমিকা, ইনহাউস সাকান, পৃ. ৭৫)।

হাফিয ইবন হাজার-এর সিদ্ধান্ত এই যে, কোন রাবীর ব্যাপারে যখন আলোচনা-সমালোচনা, নির্ভরযোগ্যতা ও দুর্বলতা একত্রিত হয়, তখন অধিকাংশের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। কাজেই ওয়াকিদীর সমালোচনাকে তার গ্রহণযোগ্যতার উপর প্রাধান্য দিতে হবে। এ জন্যে যে, তাঁর সমালোচনাকারীর সংখ্যা তাঁর বর্ণনা গ্রহণকারীর সংখ্যার চেয়ে বেশি। হাফিয মুগালতাঈর রায় এটাই যে, মতভেদেও ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতা ও ইনসাফকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত, যদিও এ মতের সপক্ষের ব্যক্তিদের সংখ্যা কম হয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে আলিমদের মধ্যে, বিশেষত সোনালী যুগের কোন বর্ণনাকারী ফাসিক প্রমাণিত না হওয়ার প্রেক্ষিতে তারা গ্রহণযোগ্য। ঐ পর্যায়ে তাদের রিওয়ায়াত রদ করা যায় না। সন্দেহের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হচ্ছে :

اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا

"যদি কোন ফাসিক তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসে, তবে সে বিষয়ে তোমরা যাচাই বাছাই কর।" (সূরা হুজুরাত : ৬)

অপর এক কিরআতে فَتَبَيَّنُوْا স্থলে فَتَثَبَّتُوْا এসেছে। অর্থাৎ ফাসিক কোন খবর নিয়ে এলে তা প্রমাণিত করো এবং সে সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করো, সাবধানতার সাথে কাজ করো; প্রত্যাখ্যান কিংবা গ্রহণে দ্রুততার সাথে কাজ করো না। আর تَبَيَّنُوْا এবং تَثَبَّتُوْا -এর হুকুম হচ্ছে ঐ বর্ণনাকারীর সংবাদের ব্যাপারে, যার ফাসিকী প্রমাণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন : ان جاءكم فاسق "যদি কোনো ফাসিক সংবাদ নিয়ে আসে" কাজেই যার ফাসিকীই প্রমাণিত হয়নি, তার ব্যাপারে মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত নিতে তো আরো কঠোর সাবধানতার সাথে কাজ করতে হবে। এরই ভিত্তিতে হাফিয মুগালতাঈ ওয়াকিদীর ব্যাপারে কঠোরতার সাথে নয়, বরং ইনসাফের সাথে কাজ করেছেন যে, তার গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরতার বিষয়টি অনুসরণ করেছেন। তিনি সমালোচনাকারী ও বিরোধিতাকারীদের প্রতি গুরুত্ব দেন নি; বরং ফকীহদের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ কোন রাবীর ব্যাপারে যদি গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়, তবে মুহাদ্দিসগণের নিকট অধিকাংশের মতকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর ফকীহদের মতে গ্রহণযোগ্য হওয়ার পক্ষে মত প্রদান করতে হবে। যদিও অগ্রহণযোগ্য মত প্রদানকারীর সংখ্যা গ্রহণযোগ্য মত প্রদানকারী অপেক্ষা অধিক হয়। আর গ্রহণেই সতর্কতার দাবি পূরণ হয়, তা বাতিল করে দেয়া বিবেচনাবিরুদ্ধ। হাফিয বদরুদ্দীন আইনী শরহে বুখারী ও শরহে হিদায়ায় এবং ইবন হুমামের শরহে হিদায়ায় এটাই গৃহীত হয়েছে যে, নির্ভরযোগ্যতাকে দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্যতার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলেরও এটাই সিদ্ধান্ত যে, যখন পর্যন্ত কোন রাবীকে বর্জনের ব্যাপারে সমস্ত আলিম একমত না হন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে বর্জন করতেন না। তিনি স্বীয় মুসনাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত

১. আত-তাহযীব, ৫খ. পৃ, ৩৭৭।

এ নীতিই অনুসরণ করেছেন। আবূ দাঊদ এবং নাসাঈও একই নীতি অনুসরণ করেছেন। এতে জানা গেল যে, হাফিয মুগালতাঈ-এর অনির্ভরযোগ্যতার উপর নির্ভরযোগ্যতাকে প্রাধান্য দান এই মূলনীতির উপর নির্ভরশীল, স্থগিতের উপর নির্ভরশীল নয়। ওয়াকিদীর ব্যাপারে যে বিভিন্ন মন্তব্য উদ্ধৃত করা হলো, এ সবই হাফিয যাহবীর মিযানুল ই'তিদাল (২খ. পৃ. ১১০) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ওয়াকিদীর ব্যাপারে হাদীসবিদদের এ সমস্ত মতপার্থক্য হাফিয যাহবীর সামনে। আর সব শেষে হাফিয যাহবী বলেন : واستقر الاجماع على وهن الواقدى "ওয়াকিদীর ব্যাপারে আলিমগণের ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে।" অথচ এ ধরনের মতপার্থক্যের বিষয়ে ইজমার দাবি সঠিক নয়।

হাফিয ইবন তাইমিয়া 'আস-সারিমুল মাসলূল' গ্রন্থে বলেন :

مع مافى الواقدى من ضعف لا يختلف اثنان ان الواقدى اعلم الناس بتفاصيل امور المغازى واخبر باحوالها وقد كان الشافعى واحمد وغيرهما يستفيدون علم ذلك من كتبه

"ওয়াকিদী যঈফ, তবে পৃথিবীর কোন ব্যক্তিই এ ব্যাপারে মতপার্থক্য করেন না যে, ওয়াকিদী সর্বাধিক মাগাযী অভিজ্ঞ এবং মাগাযীর অবস্থা ও বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কিত তার অবগতি সর্বাধিক। ইমাম শাফিঈ, আহমদ এবং অপরাপর আলিমগণ তার কিতাবসমূহ থেকে উপকৃত হতেন।"

আর দুনিয়ার সীরাত, মাগাযী ও 'রিজাল শাস্ত্রে'র কোন কিতাব এমন নেই যা ওয়াকিদীর বর্ণনা থেকে মুক্ত। ফাতহুল বারী, যুরকানী, শরহে মাওয়াহিব ওয়াকিদীর রিওয়ায়াত দ্বারা ভরপুর। আর আল্লামা শিবলী স্বয়ং ওয়াকিদীর পুস্তকাবলী থেকে উপকৃত এবং সাহায্য গ্রহণ করেছেন। সীরাতুন নবীর বিভিন্ন অধ্যায়ে তাবাকাতে ইবন সাদ-এর ঐ সব রিওয়ায়াত গ্রহণ করা হয়েছে, যার প্রথম বর্ণনাকারীই ওয়াকিদী। আল্লামা শিবলী তাবাকাত গ্রন্থের খণ্ড এবং পৃষ্ঠা সংখ্যার উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। কিন্তু ঐ অধ্যায়সমূহে তিনি এটা বলেন নি যে, এ বর্ণনার প্রথম রাবীই ওয়াকিদী, যাকে তিনি কাহিনীকার ও অনুল্লেখযোগ্য মনে করেন। আর কোন কোন স্থানে অনুল্লেখযোগ্য শব্দ দ্বারা তাকে স্মরণ করেছেন। কিন্তু যখন তিনি ঐ প্রসিদ্ধ কাহিনীকারের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, তখন তার নাম উল্লেখ করেননি। অবশ্য ঐ প্রসিদ্ধ কাহিনীকারের সুবোধ শিষ্য অর্থাৎ ইবন সা'দ-এর নামে রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন, যিনি সেই গল্পকারেরই শিষ্য !

ওয়াকিদীর বর্ণনায় সীরাতুন-নবী (সা)

এক্ষণে ওয়াকিদীর বর্ণনার কিছু নমুনা পাঠকদের জন্য হাদিয়া স্বরূপ উপস্থাপন করছি, যা আল্লামা শিবলী তাঁর সীরাতুন নবী গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

১. কুসাই মৃত্যুকালে পবিত্র কা'বাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণের উত্তরাধিকার স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুদ্দারকে হস্তান্তর করেন (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ৪১; সীরাতুন-নবী, ১খ. পৃ. ১৫৪)। আল্লামা শিবলী এ ঘটনা তাবাকাতে ইবন সা'দ থেকে উদ্ধৃত করেছেন– যা শুধু ওয়াকিদী থেকে বর্ণিত।

২. মৃত্যুকালে আবদুল্লাহ উট, কিছু বকরী এবং একজন দাসী রেখে যান, যার নাম উম্মে আয়মান (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ৬২; সীরাতুন-নবী, ১খ. পৃ. ১৫৮)। এ ঘটনাও তাবাকাতে শুধু ওয়াকিদী থেকে বর্ণিত; ওয়াকিদীর পরে সনদে আর কারো উল্লেখ নেই।

৩. ইবন সা'দ তাবাকাতে (১খ. পৃ. ৭১) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, "আমি তোমাদের মধ্যে সব চেয়ে বিশুদ্ধ ভাষী। কেননা আমি কুরায়শ বংশীয় এবং আমার ভাষা বনী সা'দ-এর ভাষা।" (সীরাতুন-নবী, ১খ. পৃ. ১৬২)। এরও বর্ণনাকারী মুহাম্মদ উমর ওয়াকিদী।

৪. হিলফুল ফুজুলের ঘটনা সীরাতুন-নবী (১খ. পৃ. ১৭০)-তে তাবাকাতে ইবন সা'দ (১খ. পৃ. ৮২) থেকে বর্ণিত। এ ঘটনাও তাবাকাতে ওয়াকিদী থেকে উদ্ধৃত।

৫. আল্লামা শিবলী সীরাতুন নবী (১খ. পৃ. ৪৪০)-তে খায়বরের যুদ্ধ প্রসঙ্গে লিখেন—রাসূলুল্লাহ (সা) সাধারণ ঘোষণা দেন যে, لا يخرجن معنا الا راغب فى الجهاد "আমাদের সাথে তারাই আসবে, যারা জিহাদে অনুপ্রাণিত" (ইবন সা'দ)। এ বর্ণনাও তিনি ইবন সা'দ-এর উদ্ধৃতি থেকে গ্রহণ করেছেন, যা ওয়াকিদী থেকে বর্ণিত।

সার কথা

সার কথা এটাই যে, নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ ও সত্যের নিকটতর বর্ণনা হলো, ওয়াকিদী যঈফ, ধোঁকাবাজ ও গল্প রচনাকারী নন। ওয়াকিদীর বর্ণনার হুকুম এটাই, যা একজন যঈফ বর্ণনাকারীর ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ যখন পর্যন্ত কোন সহীহ হাদীস ঐ যঈফ বর্ণনার বিপরীতে না পাওয়া যাবে, তখন পর্যন্ত ঐ হাদীসের হুকুম পরিত্যাগ করা যাবে না। বিশেষত ঐ যঈফ হাদীস যদি বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত আছে যে, যঈফ হাদীস আমার কাছে ব্যক্তি-বিশেষের মতামত থেকে অধিক প্রিয়। ইমাম আবূ হানীফার যখন কোন মাসয়ালায় কোন সহীহ হাদীস হস্তগত না হতো, তখন কিয়াসের বিপরীতে তিনি যঈফ হাদীসকে অগ্রাধিকার দিতেন। যঈফ হাদীসের অর্থ তা অধর্তব্য নয়, বরং এর অর্থ এই যে যঈফকে যঈফের মর্যাদায় রাখতে হবে। আর যখন যঈফ এবং সহীহ-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তখন সহীহকে অগ্রাধিকার দাও। আর যখন কোন হাদীস সহীহ পাওয়া না যাবে, তখন যঈফ হাদীসকে নিজের রায় থেকে অগ্রাধিকার দাও। এ জন্যে যে, রায় প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল ও কমজোর। আর হাদীসে নববী (সা) প্রকৃতিগতভাবে যঈফ নয়, বরং বর্ণনার ধারা ও সনদেব মূল্যায়নে

যঈফ–যা পদ্ধতিগত, মূল সত্তাগত নয়। আর রায়-এর মূল সত্তাই দুর্বল। এজন্যে যঈফ হাদীসকে রায়-এর উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং যঈফ হাদীস গ্রহণের শর্তাবলী উসূলে হাদীসের কিতাবাদিতে বর্ণিত আছে, সেখানে দেখে নিন। এই স্থানে এটাই আমার মত যা আমার নিকট প্রতিভাত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন এবং তাঁর ইলম পরিপূর্ণ ও শিরোধার্য।

হাফিয ইরাকী 'আলফিয়াতুস সিয়ার' গ্রন্থে বলেন :

ثم مضى للشام مع ميسرة　　فى متجر والمال من خديجة

من قبل تزويج بها فبلغا　　بصرى فباع وتقاضى ما بغى

وقد راى ميسرة المجائبا　　منه وما خص به مواهبا

وحدث السيدة الجليلة　　خديجة الكبرى فاحصت قبله

ورغبت فخطبت محمدا　　فيالها من خطبة ما اسعدا

وكان اذ زوجها ابن الخمس　　من بعد عشرين بغير لبس

ফায়েদা-১. এ বর্ণনা দ্বারা এটা জানা যায় যে, কারো কারো জন্য স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীতে ফিরিশতা দেখা সম্ভব। যেমনটি উপরোক্ত ঘটনায় মায়সারা ফিরিশতার ছায়া দেখেছেন।[১] আর হযরত মরিয়ম (আ) কর্তৃক জিবরাঈল (আ) ও অন্যান্য ফিরিশতাকে দেখার বর্ণনা কুরআন মজীদে, হযরত হাজেরা (আ) কর্তৃক ফিরিশতাকে দেখার বর্ণনা সহীহ বুখারীর কিতাবুল আম্বিয়ায় এবং হযরত ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) কর্তৃক স্বীয় কিরামান কাতিবীনকে দেখার ঘটনা 'ইসাবা' গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

ফায়েদা-২. এ যাবত বিভিন্ন বর্ণনায় এটা জানা গেল যে, নবী (সা)-এর উপর মেঘমালা ছায়াদান করতো। যেমনটি হযরত হালিমা এবং তাঁর সন্তানগণ কর্তৃক নবী (সা)-এর উপর মেঘমালার ছায়াদান প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রথম সিরিয়া সফরের সময় বহীরা দরবেশ কর্তৃক স্বয়ং তাঁর উপর মেঘের ছায়া দর্শন এবং অপরাপর ব্যক্তিকে দেখানো হযরত আবূ মূসা (রা)-এর উদ্ধৃতিতে তিরমিযী থেকে আমরা উৎকলিত করেছি। আল্লামা ইবন হাজার মক্কী 'শরহে কাসীদাতুল হামযিয়া' কিতাবে বলেন, এ ব্যাপারে তিরমিযীর বর্ণনা সর্বাপেক্ষা সহীহ। যেমন ইয ইবন জুমা'আ বলেন, যে ব্যক্তি বলবে যে, মহানবী (সা)-এর উপর মেঘমালার ছায়াদান সংক্রান্ত হাদীস মুহাদ্দিসগণের নিকট সহীহ নয়, তবে তার বর্ণনা ভিত্তিহীন ও বাতিল। হ্যাঁ, এটা বিশুদ্ধ (যেমনটি হাফিজ সাখাবী থেকে বর্ণিত) যে, মেঘমালার ছায়াদান সব সময় ছিল না। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হিজরতের সফরে যখন রাসূল (সা)-এর উপর রৌদ্র পতিত হচ্ছিল, তখন হযরত আবূ বকর (রা) স্বীয় চাদর দ্বারা তাঁর উপর ছায়া দান করেন। অনুরূপভাবে জি'রানার ঘটনায়ও তাঁর উপর চাদর দ্বারা ছায়াদানের

১. যারকানী, ১খ. পৃ ১৯৯।

ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সাহাবাগণ কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, আমরা যখন ছায়াদার বৃক্ষের নিচে অবতরণ করতাম, তখন ছায়াযুক্ত স্থানটুকু তাঁর জন্য ছেড়ে দিতাম।[১]

হযরত খাদীজার সাথে বিবাহ

ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, হযরত খাদীজা নবী (সা)-এর সফরকালীন সমুদয় অবস্থা, দরবেশের বক্তব্য, ফিরিশতাগণ কর্তৃক মাথায় ছায়াদানের ঘটনাবলী ওরাকা ইবন নওফল-এর নিকট গিয়ে খুলে বলেন। ওরাকা বললেন, খাদীজা ! যদি এ ঘটনাবলী সত্য হয় তবে অবশ্যই মুহাম্মদ এ উম্মতের নবী। আর আমি ভালভাবেই জানি যে, এ উম্মতের একজন নবীর আগমনের সময় আসন্ন। আমরা যাঁর অপেক্ষা করছি, তাঁর সময় অত্যন্ত সন্নিকটবর্তী।[২]

এ কথা শুনে হযরত খাদীজার অন্তরে তাঁকে বিবাহ করার আগ্রহ জন্মায়। কাজেই সিরিয়া থেকে ফিরে আসার দু'মাস পঁচিশ দিন পর খাদীজা (রা) স্বয়ং তাঁর সাথে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তিনি নিজ চাচার পরামর্শক্রমে এ প্রস্তাব কবূল করেন। নির্দিষ্ট দিনে তিনি নিজ চাচা আবূ তালিব, হামযা এবং বংশের অন্যান্য মুরুব্বীদের সাথে নিয়ে হযরত খাদীজার গৃহে আগমন করেন। মুবাররাদ থেকে বর্ণিত যে, হযরত খাদীজার পিতা তো হারবুল ফুজ্জারের পূর্বেই ইনতিকাল করেছিলেন। বিবাহের সময় খাদীজার চাচা আমর ইবন আসাদ উপস্থিত ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এ বিবাহের সময় খাদীজার পিতা খুয়ায়লিদ উপস্থিত ছিলেন। আল্লামা সুহায়লী বলেন, মুবাররাদের বর্ণনাই সঠিক। আর এটাই হযরত জুবায়র ইবন মুতইম, হযরত ইবন আব্বাস ও হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত।[৩]

আবূ তালিব বিবাহের খুতবা দেন। যার শেষাংশ ছিল নিম্নরূপ :

اما بعد فان محمدا ممن لا يوازن به فتى من قريش الا رجع به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا وان كان فى المال قل فانه ظل زائل وعارية مسترجعة وله فى خديجة بنت خويلد غبتة ولها فيه مثل ذلك

"অতঃপর, মুহাম্মদ তো এমন এক ব্যক্তিত্ব, কুরায়শের মাঝে যে যুবক সম্ভ্রান্ত, উচ্চ মর্যাদা, গুণপনা ও জ্ঞানে সেরা, তার সাথে তাঁকে তুলনা করা হলে তাঁরই পাল্লা অধিক ভারী হবে। সম্পদ যদিও তাঁর কম, কিন্তু ধন-সম্পদ তো এক অস্তাচলমান ছায়ামাত্র এবং এমন বস্তু, যা প্রত্যর্পণ করা যায়। তিনি খাদীজা বিনতে খুয়ায়লিদের সাথে বিবাহ বন্ধনে ইচ্ছুক এবং খাদীজাও তাঁর সাথে বিবাহে আগ্রহী।"[৪]

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ ১৪৮।

২ উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৫১।

৩. রাউযুল উনুফ, ১খ. পৃ. ১২২।

৪. প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ১২২।

বিবাহের সময় তাঁর বয়স পঁচিশ এবং হযরত খাদীজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। বিশটি উট দেনমোহর নির্ধারণ করা হয় (সীরাতে ইবন হিশাম) এবং হাফিয আবূ বিশর দুলাঈ বলেন, দেনমোহরের পরিমাণ ছিল সাড়ে বার উকিয়া; এক উকিয়ায় চল্লিশ দিরহাম হয়, কাজেই এ দেনমোহর ছিল পাঁচশত দিরহাম।[১]

এটা ছিল তাঁর প্রথম বিবাহ এবং হযরত খাদীজার তৃতীয় বিবাহ। হযরত খাদীজার বৈবাহিক জীবনের অবস্থা ইনশা আল্লাহ 'পবিত্র সহধর্মিণীগণ' শিরোনামে বর্ণনা করব।

কা'বাগৃহ নির্মাণ এবং নবী (সা)-এর সিদ্ধান্ত দান

প্রথম নির্মাণ : বিশ্ব সৃষ্টির শুরু থেকে ঐ সময় পর্যন্ত কা'বাগৃহ পাঁচবার নির্মাণ করা হয়। প্রথমবার হযরত আদম (আ) তা নির্মাণ করেন। দালাইলে বায়হাকীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা কা'বাগৃহ নির্মাণের নির্দেশসহ হযরত আদম (আ)-এর নিকট হযরত জিবরাঈল (আ)-কে প্রেরণ করেন। যখন আদম (আ) নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন, তখন আদেশ হলো, এই গৃহের তাওয়াফ করো। বলা হলো, তুমিই পৃথিবীর প্রথম মানুষ আর এ গৃহই (আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে) প্রথম নির্মিত হলো।[২]

দ্বিতীয় নির্মাণ : কিতাবুল আম্বিয়ায় মহান আল্লাহর বাণী واتخذ الله ابراهيم خليلا শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হয়েছে, হযরত নূহ (আ)-এর যামানায় যখন মহাপ্লাবন এলো, তখন এর ফলে কা'বাগৃহের নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট রইল না। ফলে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দ্বিতীয়বার কা'বাগৃহ নির্মাণের আদেশ দেয়া হয়। ভিতের চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল না। হযরত জিবরাঈল (আ) অবতরণ করে ভিতের সীমা চিহ্নিত করে দেন এবং হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ) হযরত ইসমাঈল যবীহুল্লাহ (আ)-এর সাহায্য ও সহযোগিতায় কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণ শুরু করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে। অতিরিক্ত জানার প্রয়োজন হলে ফাতহুল বারী, কিতাবুল আম্বিয়া, মহান আল্লাহর বাণী واتخذ الله ابراهيم خليلا শীর্ষক অধ্যায় এবং তাফসীরে ইবন কাসীর ও তাফসীরে ইবন জারীর দেখা যেতে পারে।

তৃতীয় নির্মাণ : তৃতীয়বার মহানবী (সা)-এর নবূওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে, যখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ বছর ছিল, কুরায়শগণ কা'বাগৃহ নির্মাণ করলো। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নির্মিত ভিতের উপর কা'বা শরীফ ছিল ছাদবিহীন। এর দেয়াল কিন্তু খুব একটা উঁচু ছিল না। হযরত আদম (আ)-এর কদ থেকে খানিকটা উঁচু অর্থাৎ নয় হাত মাত্র উঁচু ছিল। কালের আবর্তনে অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। নিম্নাঞ্চলে হওয়ার কারণে বৃষ্টির সমুদয় পানি ভিতরে প্রবেশ করতো। এজন্যে নব পর্যায়ে তা

১. যারকানী, ১খ. পৃ ২০২ঐ

২ ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ২৮৫।

পুনর্নির্মাণের ইচ্ছা কুরায়শগণের মনে জাগলো। যখন সমস্ত কুরায়শ সর্দার একমত হলেন যে, বায়তুল্লাহর কাঠামো বিলুপ্ত করে দিয়ে নতুন করে এর নির্মাণ করা হোক, তখন ওহাব ইবন আমর মাখযূমী [যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিতার মামা ছিলেন] দাঁড়ালেন এবং কুরায়শদের সম্বোধন করে বললেন, দেখ, বায়তুল্লাহ নির্মাণে যা কিছুই ব্যয় করা হবে, তা যেন বৈধভাবে উপার্জিত হয়। যিনা, চুরি, সুদ ইত্যাদির কোন পয়সাই এতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না; শুধু হালাল মালই এ নির্মাণ কাজে ব্যয় করা যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং পবিত্র আর তিনি পবিত্রতা পসন্দ করেন। তাঁর গৃহে পবিত্র অর্থই ব্যয় কর।

আর যাতে বায়তুল্লাহ নির্মাণের মত পবিত্র কাজ থেকে কেউ বঞ্চিত না হয়, এজন্যে তিনি কাবাগৃহের নির্মাণ কাজ বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন যে, অমুক সম্প্রদায় বায়তুল্লাহর অমুক অংশ নির্মাণ করবে এবং অমুক সম্প্রদায় অমুক অংশ।[১]

দরজার দিকটি বনী আবদে মানাফ এবং বনী যোহরার অংশে পড়ে। আর হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী অংশ বনী মাখযূম এবং অপর কুরায়শ গোত্রের ভাগে পড়ে। বায়তুল্লাহর পেছনের অংশ পড়ে বনী জমুহ ও বনী সাহমের ভাগে। আর হাতীম বনী আবদেদ্দার, বনী কুসাই, বনী আসাদ ও বনী আদীর ভাগে পড়ে। ইত্যবসরে কুরায়শদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যে, একটি বাণিজ্য জাহাজ জেদ্দা বন্দরে ধাক্কা লেগে টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙে গেছে। ওলীদ ইবন মুগীরা এ খবর শোনামাত্র জেদ্দায় যান এবং কা'বাগৃহের ছাদ নির্মাণের জন্য এর তক্তাগুলো নিয়ে নেন। ঐ জাহাজেই একজন রোম দেশীয় মিস্ত্রী ছিল যার নাম ছিল বাকুম। কা'বাগৃহ নির্মাণের জন্য ওলীদ তাকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন। হাফিজ আসকালানী 'ইসাবা' গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য রাবীর মাধ্যমে মুরসাল সূত্রে এ বর্ণনা পেশ করেছেন।[২] এ উদ্যোগের পর যখন পুরাতন ইমারত ভাঙার সময় এসে গেল, তখন কারো সাহস হলো না যে, বায়তুল্লাহ ধ্বংস করার কাজে দণ্ডায়মান হয়। অবশেষে ওলীদ ইবন মুগীরা গাঁইতি হাতে অগ্রসর হলেন এবং বললেন : اللهم لا نريد الا الخير "হে আল্লাহ ! উত্তম ছাড়া আমাদের কোন উদ্দেশ্য নেই।"

"আল্লাহ্ না করুন, আমাদের উদ্দেশ্য অসৎ নয়।" এ বলে হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর দিক থেকে ভাঙা শুরু করলেন। মক্কাবাসী বলল, রাত পর্যন্ত অপেক্ষা কর যে, ওলীদের উপর কোন আসমানী বালা নাযিল হয় কিনা। যদি তার উপর কোন আসমানী বালা নাযিল হয়, তবে আমরা বায়তুল্লাহকে পূর্বের মত করে দেব। আর যদি এরূপ কোন বালা তার উপর নাযিল না হয়, তা হলে আমরাও ওলীদের সাহায্যকারী হব। প্রভাত হলো, ওলীদ সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদে পুনরায়

---

১. প্রাগুক্ত, ৬খ. পৃ. ২৮৪-২৯২।

২ আল-ইসাবা, ১খ. পৃ ১৩৭।

গাঁইতি নিয়ে পবিত্র হেরেমে উপস্থিত হন। জনগণ বুঝল যে, আমাদের এ কাজে আল্লাহ তা'আলার সম্মতি আছে, তখন সবার সাহস বেড়ে গেল এবং সবাই মিলে মনেপ্রাণে এ কাজে অংশগ্রহণ করল। আর এ পর্যন্ত খনন করল যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক প্রদত্ত ভিত্তি বেরিয়ে পড়ল। এক কুরায়শী যখন ঐ ভিত্তির উপর গাঁইতি চালাল, তখন হঠাৎ করে একটা ভূকম্পন সৃষ্টি হলো, যে কারণে তারা এর অতিরিক্ত খোঁড়া থেকে বিরত থাকে এবং ঐ ভিত্তি থেকেই পুনর্নির্মাণ শুরু করা হয়। পূর্ববর্তী বন্টন অনুযায়ী প্রত্যেক সম্প্রদায়ই পৃথক পৃথকভাবে পাথর জমা করে নির্মাণ কাজ শুরু করে। যখন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলো এবং হাজরে আসওয়াদকে তার স্থানে রাখার সময় এলো, তখন ভীষণ মতবিরোধ দেখা দিল। তরবারি কোষমুক্ত করা হলো এবং লোকজন যুদ্ধ বিগ্রহ, হত্যা ধ্বংসের কাজে প্রতিজ্ঞ হলো। যখন চার পাঁচদিন এভাবে কেটে গেল এবং কোন সিদ্ধান্তই হলো না, তখন আবূ উমাইয়া ইবন মুগীরা মাখযূমী, যিনি কুরায়শদের মধ্যে ছিলেন বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং গ্রহণীয় ব্যক্তিত্ব এ রায় দিলেন যে, কাল প্রভাতে যিনি সর্বপ্রথম মসজিদে হারামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন তাকেই সিদ্ধান্ত দানকারী বানিয়ে তার দ্বারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও। সবাই এ রায় পসন্দ করল। প্রভাত হলে সমস্ত লোক মসজিদে হারামে পৌঁছে কি দেখল ? সবাই দেখল যে, সর্বপ্রথম আগমনকারী ব্যক্তি হলেন মুহাম্মদ (সা)। তাঁকে দেখে সবার মুখ থেকে অবলীলায় এ বাক্য বেরিয়ে এলো

هذا محمد الامين رضينا هذا محمد الامين

"এই তো মুহাম্মদ,আল-আমীন, আমরা সবাই তাঁকে সালিশ মানতে সম্মত; তিনিই তো মুহাম্মদ আল-আমীন।"

তিনি একটি চাদর চেয়ে নিলেন এবং হাজরে আসওয়াদকে তার উপর রেখে বললেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ এই চাদর ধরুন, যাতে এ সম্মানজনক কাজ থেকে কোন সম্প্রদায়ই বঞ্চিত না হয়। এ ফয়সালা সবাই পসন্দ করলো এবং সবাই মিলে চাদর উঠালো। যখন সবাই এ চাদর উঠিয়ে ঐ স্থানে পৌঁছলো, যেখানে তা রাখতে হবে, তখন তিনি নিজে এগিয়ে এলেন এবং স্বীয় পবিত্র হাত দ্বারা হাজরে আসওয়াদকে যথাস্থানে রেখে দেন।[১]

চতুর্থ নির্মাণ : চতুর্থবার হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি বায়তুল্লাহকে ভেঙ্গে নতুনভাবে পুনর্নির্মাণ করান।

পঞ্চম নির্মাণ : পঞ্চমবার নির্মাণ করান হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ, যার অত্যাচার-নির্যাতনের নজীর পূর্বাপর কখনো ঘটেনি। বিস্তারিত জানার জন্য ইতিহাস গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৬৫; রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১২৭; তারিখে তাবারী, ১খ. পৃ. ২০০; যারকানী, ১খ. পৃ. ২০৩-২০৬।

হাফিয ইরাকী (র) 'আলফিয়াতুস সিয়ার' গ্রন্থে বলেন :

واذ بنت قريش البيت اختلف ملاهم تنازعا حتى وقف

امرهم فيمن يكون يضع الحجر الاسود حيث يوض

اذجاء قالوا كلهم رضينا لو ضعه محمدا الامينا

فحط فى ثوب وقال يرفع كل قبيل طرفا فرفعوا

ثمه اودع الامين الحجرا مكانه وقد رضوا بما جرى

জাহিলী প্রথা থেকে খোদায়ী ঘৃণা ও অনীহা

নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে যদিও নবী-রাসূলগণ নবী-রাসূল অভিধায় আখ্যায়িত হন না, কিন্তু ঐ সময় ওলী ও সিদ্দীক অবশ্যই থাকেন। আর তাঁদের এ বিলায়েত এতটা পূর্ণ ও সম্পূর্ণ হয়ে থাকে যে, বড় বড় ওলী-আল্লাহ ও সিদ্দীকগণের বিলায়েত ও সত্যবাদিতাও তাঁদের বিলায়েতের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার যোগ্য তো নয়ই, বরং সমুদ্রের তুলনায় এক ফোটা পানি কিংবা সূর্যের তুলনায় একটি রশ্মির সাথে তুলনার মতই কেবল এটা তুলনীয়। হযরত ইবরাহীম (আ) প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِيْنَ

"আমি তো এর পূর্বে ইবরাহীমকে সৎ, সঠিক পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং তার সম্বন্ধে আমি ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত।" (সূরা আম্বিয়া ৫১)

এবং হযরত ইউসুফ (আ)-এর সমস্ত ঘটনা, বিশেষত তাঁর বাণী :

وَاِلاَّ تَصْرِفُ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ

"আর আপনি যদি ওদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করেন...।"

(সূরা ইউসুফ : ৩৩)

আর হযরত ইয়াহহিয়া (আ) প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وَاٰتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَّحَنَانًا

"আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান এবং হৃদয়ের কোমলতা...।" (সূরা মরিয়ম : ১২-১৩)

ইত্যাদি সবই এরই উপর নির্ভরশীল যে, নবী (আ)গণ নবূওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বেই উচ্চমার্গের ওলী ও সিদ্দীক হয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে মহানবী (সা)-ও প্রথম থেকেই শিরক ও মূর্তিপূজা হতে এবং সর্বপ্রকার শিরকী সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র ছিলেন। যেমনটি ইবন হিশাম বলেছেন :

فشب رسول الله ﷺ والله يكلأه ويحفظ ويحوطه من اقذار الجاهلية لما يريد به من كرامة ورسالة حتى بلغ ان كان رجلا وافضل قومه مروءة واحسنهم خلقا

واكرمهم حسبا واحسنهم جوارا واعظمهم حلما واصدقهم حديثا واعزمهم امانة وابعدهم من الفحش والاخلاق التى تدنس الرجال تنزها وتكرما ما اسمه فى قومه الامين لما جمع الله فيه من الامور الصالح

"অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এ অবস্থায় যৌবনে পদার্পণ করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হিফাযত ও দেখাশোনা করতেন এবং জাহিলিয়াতের সমস্ত নোংরামী থেকে আল্লাহ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতেন। কারণ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল, তিনি তাঁকে নবূওয়াত ও রিসালাত এবং সর্বপ্রকার ইযযত ও সম্মান দ্বারা ভূষিত করবেন। এভাবে তিনি পরিপূর্ণতা লাভ করলেন। চাল-চলন ও সুন্দর চরিত্র, বংশ মর্যাদা, সহনশীলতা ও ধৈর্য, সত্যবাদিতা ও আমানতদারীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন এবং অশ্লীলতা ও নিকৃষ্ট চরিত্র থেকে এত বেশি দূরে থাকেন যে, তাঁর নাম 'আমীন' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।" (সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৬২)

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করা হলো, আপনি কি কোন সময় কোন মূর্তির পূজা করেছেন ? তিনি ইরশাদ করলেন, "না। আর এও বলেন যে, আমি সব সময়ই এগুলোকে কুফরী মনে করতাম। যদিও সে সময় আমার কিতাব ও ঈমানের জ্ঞান ছিল না।"(আবূ নুয়ায়ম ও ইবন আসাকির)

'মুসনাদে আহমদে' হযরত উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, হযরত খাদীজার একজন প্রতিবেশী বর্ণনা করেন, আমি মুহাম্মদ (নবী করীম (সা)) কর্তৃক হযরত খাদীজাকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর কসম, আমি কখনো লাত-এর পূজা করব না; আল্লাহর কসম, আমি কখনো উযযার পূজা করব না।[১]

হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) বলেন, জাহিলী যুগে যখন মুশরিকরা কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতো, তখন আসাফ ও নায়েলা (মূর্তি)-কে[২] স্পর্শ করতো। একবার আমি নবী করীম (সা)-এর সাথে বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করি। যখন ঐ মূর্তিগুলোর নিকটবর্তী হলাম, তখন আমি তা স্পর্শ করলাম। নবী করীম (সা) আমাকে এগুলো ছুঁতে নিষেধ করেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, দেখি তো, ছুঁলে কি হয়। এ ভেবে আমি দ্বিতীয়বার স্পর্শ করলাম। এবারে তিনি একটু রূঢ়ভাবে নিষেধ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করিনি ? যায়দ বলেন, আল্লাহর কসম, এরপর আমি আর কোনদিন এগুলো স্পর্শ করিনি। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবূয়াত ও রিসালত দানে ধন্য করলেন এবং তাঁর প্রতি স্বীয় কালাম অবতীর্ণ করলেন। এ বর্ণনা 'মুস্তাদরাকে' হাকিম, 'দালাইলে আবূ নুয়াইম' ও 'দালাইলে বায়হাকী'তে বর্ণিত আছে। হাকিম বলেন, হাদীসটি সহীহ।

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৯০।

২ আসাফ ও নায়েলা দু'টি দেবতার নাম।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, কোনদিন জাহিলিয়াতের কোন সংস্কৃতির প্রতি আমার কোন খেয়াল ছিল না। কেবল দু'বার মাত্র এ খেয়াল মনে জেগেছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে তা থেকে বাঁচিয়েছেন এবং নিরাপদ রেখেছেন। এক রাতে আমি আমার বকরী চরানোর সাথীদের বললাম, আজ রাতে তোমরা আমার বকরীগুলোকে দেখে রাখবে। আমি মক্কায় গিয়ে কিছু কিসসা-কাহিনী শুনে আসি। মক্কায় প্রবেশ করে আমি এক বাড়িতে গান-বাজনার আওয়াজ শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম এখানে কি হচ্ছে ? জানা গেল, অমুকের বিবাহ হচ্ছে। আমি বসেই ছিলাম, আমার চোখে ঘুম এসে গেল। আল্লাহ আমার কর্ণদ্বয়ে মোহর লাগিয়ে দিলেন। আমি ঘুমিয়েই থাকলাম; এমন কি সকালের রোদ আমাকে জাগিয়ে দিল। ঘুম থেকে উঠে আমি আমার সঙ্গীদের কাছে ফিরে আসি। সঙ্গীগণ জিজ্ঞেস করল, কি কি দেখে এলে ? তিনি বললেন, কিছুই না। এরপর তিনি নিজের ঘুমিয়ে পড়ার ঘটনা শোনালেন।

দ্বিতীয় এক রাতে তিনি একই ইচ্ছা করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একই অবস্থার সৃষ্টি হলো। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, এরপর আর কোনদিন আমার অন্তরে এরূপ কোন খেয়াল হয়নি। তারপর তো আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর পয়গাম্বরী দানে ভূষিত করলেন। এ হাদীস 'মুসনাদে বাযযার' এবং 'মুসনাদে ইসহাক ইবন রাওয়াহ' প্রমুখ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। হাফিজ ইবন হাজার বলেন, এ হাদীসের সনদ মুত্তাসিল এবং হাসান। এ হাদীসের সমস্ত রাবীই নির্ভরযোগ্য। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কা'বাগৃহ নির্মাণের সময় নবী (সা)-ও পাথর বহনের কাজ করেছেন। তাঁর চাচা হযরত আব্বাস বললেন, বেটা, লুঙ্গি খুলে ঘাড়ে দাও যাতে পাথরের আঘাত থেকে নিরাপদ থাকতে পার। তিনি চাচার হুকুম পালন করতে গিয়ে লুঙ্গি খোলার উদ্যোগ নেয়ার সাথে সাথে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। এরপর তাঁকে কখনো উলঙ্গ দেখা যায়নি।

হযরত আবুত তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত আছে, ঐ সময় অদৃশ্য থেকে এ আওয়াজ এলো : يا محمد عورتك "হে মুহাম্মদ, নিজ সতর সম্পর্কে সতর্ক হও।" এ গায়বী আওয়াজই তাঁর প্রতি সর্বপ্রথম আওয়াজ ছিল, যা তাঁকে শোনানো হয়। আবুত তুফায়লের এ বর্ণনা দালাইলে আবূ নুয়াইম, দালাইলে বায়হাকী এবং মুস্তাদরাকে হাকিম এ উল্লেখ আছে। হাকিম বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।[১]

হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় রয়েছে, আবূ তালিব তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার কী অবস্থা হয়েছিল ? তিনি বললেন, সাদা পোশাকধারী এক ব্যক্তি দেখা গেল, আর তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ, নিজ সতর ঢাকো। হাকিম বলেন,

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৮৮।

বর্ণনাটি সহীহ। ইবন সা'দ, ইবন আদী, হাকিম, সহীহায়ন ও আবূ নুয়াইম ইকরামা....ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে এটি বর্ণিত।[১]

একবার কুরায়শ তাঁর সামনে কিছু খাদ্য রাখলো। ঐ মজলিসে যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়লও ছিলেন। তিনি খাদ্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে যায়দও অস্বীকার করলেন এবং বললেন, আমি দেবদেবীর নামে যবেহকৃত জন্তু এবং দেবদেবীর নামে উৎসর্গকৃত বস্তু আহার করি না; কেবল ঐ বস্তুই খেয়ে থাকি যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে। যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল কুরায়শদের এ কথাও বলতেন যে, বকরীকে আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহই তার জন্য ঘাস ইত্যাদি জন্মিয়েছেন। এরপর একে কেন তোমরা গায়রুল্লাহর নামে যবেহ কর? (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১০৮, যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল বর্ণিত হাদীস)।

যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর চাচাত ভাই এবং সাঈদ ইবন যায়দ (যিনি ছিলেন আশারা মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত)-এর পিতা। তিনি শিরক ও মূর্তিপূজায় নাখোশ এবং সত্য দীনের অনুসন্ধানী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবূয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে, যে সময়ে কা'বাঘরের নির্মাণ কাজ চলছিল, ঐ সময়ে তিনি ইনতিকাল করেন।[২]

ওহীর সূচনা ও নবূয়াতের সুসংবাদ

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এ কথা ভালভাবে প্রমাণিত হলো যে, নবী (আ)গণ নবী হওয়ার পূর্বেই কুফর, শিরক এবং সব ধরনের অশ্লীল, অসত্য ও অবাঞ্ছনীয় কথা ও কাজ থেকে পাক-পবিত্র থাকেন। শুরু থেকেই এ মহাত্মাগণের পবিত্র কলব তাওহীদ, আল্লাহভীতি, আল্লাহ্প্রেম ও আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর থাকে। এটা কি করে সম্ভব যে সমস্ত মহান ব্যক্তিত্ব অচিরেই কুফর ও শিরক নিশ্চিহ্ন করা এবং সমস্ত অশ্লীল ও অসত্য থেকে উদ্ধারপ্রাপ্তি এবং মানুষকে কল্যাণের প্রতি দাওয়াত দেয়ার বিরাট দায়িত্ব নিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হতে যাচ্ছেন, হতে যাচ্ছেন তাঁর পসন্দনীয় প্রিয় বান্দা, তাঁদের পক্ষে এসবে জড়ানো আদৌ স্বাভাবিক নয়। তাই খোদ মহানবী (সা)-এর পক্ষেও (নাউযুবিল্লাহ্) মহান নবূয়াতের সৌভাগ্য, সম্মান ও মর্যাদালাভের পূর্ববর্তী সময়ে কুফর ও শিরকের নাপাকীতে জড়িত হওয়া এবং অশ্লীল ও অসত্যের নোংরামীতে আচ্ছন্ন হওয়া কি করে সম্ভব? নিশ্চয়ইই এটা অবাস্তব এবং তাঁর জন্যে অসম্ভব। নবী (আ)গণ নবূয়াত ও রিসালত লাভের পূর্বে যদিও নবী-রাসূল অভিধায় আখ্যায়িত হন না, তাঁরা অবশ্যই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আউলিয়া এবং 'আরিফ' মর্যাদার

---

১. প্রাগুক্ত।

২ বিস্তারিত জানার জন্য ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ১০৮ থেকে ৭খ. পৃ. ১১০ পর্যন্ত যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল বর্ণিত হাদীস শীর্ষক অধ্যায়; ইসাবা, ১খ. পৃ. ৫৬৯, যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল-এর জীবন চরিত; তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ১০৫, আলামাতে নুবূয়াত কাবলাল বা'আসাত অধ্যায় দ্র.।

অধিকারী হয়ে থাকেন। এ মর্যাদার লোকেরা আল্লাহ্ সম্পর্কীয় জ্ঞানে অজ্ঞ থাকেন না, আর না তাঁরা আল্লাহর কোন গুণ সম্পর্কে অবাস্তব বিভ্রান্তির শিকার হন; তেমনি কোন শোবা-সন্দেহও তাঁদের স্পর্শ করে না। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ

"আমি তো এর পূর্বে ইবরাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত।" (সূরা আম্বিয়া : ৫১)

এখন দেখা যাক 'রুশদ'-এর অর্থ কি, আর রাশীদ ও রাশেদ কাকে বলা হয়। সূরা হুজুরাতের নিম্নোক্ত আয়াত এ ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দান করেছে :

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"আর জেনে রাখ, তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন, যদি তোমাদের অনেক কথাই তিনি মেনে নেন, তা হলে নিঃসন্দেহে তোমরা কষ্টে পড়তে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সে কষ্ট থেকে এভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছেন যে, ঈমান ও আনুগত্য তোমাদের অন্তরে প্রিয় ও আপন বানিয়ে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে কুফরী, ফাসিকী ও গুনাহের প্রতি ঘৃণা ঢেলে দিয়েছেন। এ শ্রেণীর লোকেরাই আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে সুপথপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা হুজুরাত ৭)

এ আয়াত দ্বারা প্রকাশ পেল যে, অন্তরে ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের মহব্বত এবং কুফরী, ফাসিকী ও গুনাহের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শনের নামই রুশদ তথা সুপথপ্রাপ্তি। আর এ সুপথপ্রাপ্তি আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে প্রথম থেকেই দান করেছিলেন, যেমনটি সূরা আম্বিয়ার উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আর 'রুশদ' শব্দটি আরবী অভিধানে পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতার বিপরীতার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ "হিদায়াত ও সুপথ নিশ্চয়ই গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতা থেকে স্পষ্ট পৃথক হয়ে গেছে।" এ থেকে পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) প্রথম থেকেই সুপথ এবং হিদায়াতের উপর ছিলেন। আল্লাহ্ না করুন, পথভ্রষ্ট ছিলেন না। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর তারকা, চন্দ্র ও সূর্যকে هذا ربى (এই আমার প্রভু) উক্তি দ্বারা সাম্প্রতিক কতিপয় লেখকের[1] এ ধোঁকায় পতিত হওয়া যে, আল্লাহ্ মাফ করুন,

---

১. আল্লামা শিবলী সীরাতুন নবী গ্রন্থে (১খ. পৃ. ১৮৭) লিখেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) নবূয়াতের পূর্বে যখন তারকারাজি দেখেন, এতে যেহেতু আলোকচ্ছটা ছিল, এতে তিনি সন্দেহে পড়েছিলেন, যখন চন্দ্র উদিত হয়, তখন আরো বেশি সন্দেহে পতিত হন। কেননা এটি পূর্বেরটির তুলনায় ছিল বেশি আলোকোজ্জ্বল। কিন্তু যখন তা অস্তমিত হলো, তখন তিনি

ইবরাহীম (আ) সম্ভবত সন্দেহ-সংশয়ে পতিত হয়েছিলেন, যখন তা অস্তমিত হতো তখন সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যেত। হযরত ইবরাহীম (আ) প্রথম থেকেই চন্দ্র-সূর্যকে আল্লাহ তা'আলার মামুলী সৃষ্টি হিসেবেই জানতেন। তাঁর সম্প্রদায় যেহেতু নক্ষত্র পূজায় লিপ্ত ছিল, এজন্যে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস রদ করার জন্যই বলেছিলেন যে, যুক্তির খাতিরে যদি কিছু সময়ের জন্য ধরেও নেয়া হয়, এ নক্ষত্ররাজি তোমাদের ধারণামতে আমার প্রভু; তা হলে খুবই ভাল কথা, একটু অপেক্ষা কর, এটার অস্তাগমন ও ডুবে যাওয়ার অপেক্ষা কর। এর নশ্বর ও ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয়টি স্বয়ং তোমাদের সামনেই প্রতিভাত হবে। ঠিক একইভাবে তিনি চন্দ্র ও সূর্যের অনতিত্ব ও ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয়ে বুঝিয়ে দেন। এ জন্যে, নক্ষত্র পূজারীদের বিশ্বাস এই ছিল যে, তারকারাজি ডুবে যাওয়ার পর এগুলোর মধ্যে ঐ বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকে না যা উদয়ের সময় থাকে। কাজেই এটা যদি খোদা হয়, তবে এর গুণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিবর্তন ও দুর্বলতা কিছুতেই আসতো না। কেননা আল্লাহ তা'আলার সত্তা এবং গুণাবলী পরিবর্তন ও দৌর্বল্য হতে পবিত্র। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সমুদয় কথাবার্তা ছিল বিতর্কমূলক ও রূপকার্থক। যেমনটি এর পরবর্তী আয়াত : ও

وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ اَتُحَاجُّوْنِيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰانِ

এ আয়াত : تِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ

সরাসরি এ কথা প্রমাণ করে যে, এর সবটাই নক্ষত্র পূজারীদের সাথে বিতর্কমূলক ও রূপক অর্থে ছিল। আর এটাই সে দলীল ও প্রমাণ, যা আল্লাহ তাঁকে বিতর্কের জন্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মূলত এ বিতর্ক ছিল হযরত খলীলুল্লাহর সত্তাগত, রূপক, চিন্তাগত ছিল না। কেননা হযরত ইবরাহীম (আ) কি এর পূর্বে চন্দ্র-সূর্য দেখেন নি ? খোদ বুখারী-মুসলিম এবং অপরাপর সহীহ হাদীস গ্রন্থে এ হাদীস বিদ্যমান আছে :

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه

"প্রতিটি শিশুই ফিতরত প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাদের মাতাপিতা তাদেরকে ইয়াহূদী, নাসারা অথবা অগ্নি পূজকে পরিণত করে।"

অজ্ঞাতসারে বলে উঠলেন ঃ انى لا احب الافلين (আমি অস্তগামীকে পসন্দ করি না)। পরিশেষে আল্লামা শিবলীর মন্তব্য এটাই ছিল যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ধোঁকায় পড়েছিলেন। আল্লাহ না করুন, হযরত নবী (আ)গণ আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর ব্যাপারে কখনো ধোঁকায় পড়েন না। আর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর তো নবী-রাসূলগণের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আসমান-যমীনের রহস্য সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান দান করেছিলেন এবং তাঁকে এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী বানিয়েছিলেন। তাঁর ভালভাবেই জানা ছিল যে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি এ সবই আল্লাহর হুকুমে পরিভ্রমণ করে। আল্লাহ না করুন, ইবরাহীম (আ) কোনরূপ ধোঁকায় পড়েন নি, বরং আল্লামাই ইসলামী আকীদার ব্যাপারে এবং আরবীর অনুবাদ করতে গিয়ে ধোঁকায় পড়েছেন।

এখানে এটা বলেন নি যে, يُسَلِّمَانِهِ অর্থাৎ "তার পিতামাতা তাকে মুসলমানে পরিণত করে।" এটা এজন্যে যে, প্রকৃতিগতভাবে সে মুসলমান হিসেবেই জন্মগ্রহণ করে। সহীহ মুসলিমে ইয়ায ইবন হাম্মাদ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : قال الله تعالى انى خلقت عبادى حنفاء

"আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দাকে প্রকৃতিগতভাবে হানীফ তথা সরল পথের অনুসারীরূপে পয়দা করেছি।"

কাজেই যখন প্রতিটি শিশু জন্ম থেকেই সহজ ও ইসলামী প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে, তা হলে যিনি নবী হবেন, সমস্ত নবীর ইমাম হবেন, সরল পথের অনুসারী সকলের মুখপাত্র হবেন, সমস্ত তাওহীদবাদীর জন্য উত্তম আদর্শ হবেন; কুফর ও শিরক-এর প্রতি অসন্তুষ্টি পোষণকারী ও এর বিরোধীদের নেতৃস্থানীয় হবেন, তিনি যে প্রথম থেকেই সরল ও সৎপথপ্রাপ্ত হবেন, তাঁর প্রকৃতি সর্বাপেক্ষা অনুগত এবং সর্বদা সোজা পথের অনুসারী হবে। কুরআন মজীদে স্থানে স্থানে হযরত নবী করীম (সা)-কে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর 'হানীফ মিল্লাতে'র অনুসরণের নির্দেশ বর্ণিত আছে। যেমন আল্লাহ বলেন :

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

"আমি তোমার প্রতি ওহী করলাম যে, তুমি এখন ইবরাহীমের হানীফ মিল্লাতের অনুসরণ কর। এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" (সূরা নাহল : ১২৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

قُلْ اِنَّنِىْ هَدَانِىْ رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

"বল, আমার প্রতিপালক আমাকে একটি সৎপথে পরিচালিত করেছেন। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, যা ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" (সূরা আন'আম : ১৬১)

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হলে প্রখ্যাত ইমাম হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবন কাসীর প্রণীত তাফসীর গ্রন্থ পাঠ করুন।

জাহিলী যুগে যখন কুফর ও শিরকের অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, সেই সময় যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল ও ওরাকা ইবন নাওফল এবং অনুরূপ কিছু তাওহীদবাদী ও সরল পথের পথিকদের অন্তরে তাওহীদের রোশনী প্রোজ্জ্বল ছিল। তাঁরা যদি তাওহীদে ইবরাহীমের প্রতিবিম্ব না হয়ে থাকেন, তবে কার প্রতিবিম্ব ছিলেন ? যায়দ এবং ওরাকার প্রকৃতি কি ইবরাহীম (আ) থেকে বেশি সুস্থ ছিল ?

কাযী ইয়ায শরহে শিফায় বলেন :

اعلم متحنا الله تعالى واياك توفيقه ان ما تعلق منه بطريق التوحيد والعلم بالله وصفاته والايمان به وبما اوحى اليه فعلى غاية المعرفة ووضوح العلم واليقين والانتفاء عن الجهل بشئ من ذلك او الشك الريب فيه والعصمة من كل ما يضاذ المعرفة بذالك واليقين هذا ما وقع عليه اجماع المسلمين عليه والايصح بالبراهين الواضحة ان يكون فى عقود الانبياء سواه

"জেনে রাখ, (আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তোমাদেরকে স্বীয় তাওহীদের নিয়ামত দান করেছেন) যে বস্তু আল্লাহর একত্ববাদ, আধ্যাত্মিকতা, ঈমান ও ওহীর সাথে তার সম্পর্ক, তা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ ও বিস্তারিতভাবে নবী (আ)গণের আয়ত্বাধীন। নবী (আ)-গণের আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত ও গুণগত গুণাবলী সম্পর্কে দৃঢ় জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। আল্লাহ না করুন, কোন বিষয় সম্পর্কে তাঁরা অনবহিত থাকেন না, আর না তাঁদের ঐ সমস্ত বিষয়ে কোন সন্দেহ-সংশয় থাকে। আর তাঁরা সে সব বিষয় সম্পর্কে নিষ্পাপ ও পবিত্র হয়ে থাকেন—যা তাঁদের জ্ঞান ও বিশ্বাসের পরিপন্থি। এর উপরই সমগ্র মুসলমান একমত। আর অকাট্য দলীল ও প্রমাণ দ্বারা এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নবীগণের বিশ্বাসে কোন ভ্রান্তি থাকে না।"[১]

সার কথা

সার কথা এই যে, মহান নবী (আ)গণের পবিত্র আত্মা শুরু থেকেই সর্বপ্রকার কুফর, শিরক এবং সব ধরনের অশ্লীল ও অসত্য থেকে পাক-পবিত্র হয়ে থাকে। শুরু থেকেই তা থাকে সরল সুপথে প্রতিষ্ঠিত আবিলতা। প্রকৃতিগতভাবেই তাঁরা সর্বপ্রকার অন্যায় ও খারাবীকে ঘৃণ্য ও অপসন্দনীয় মনে করেন। যেমন শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

فلما نشاءت بغضت الى الاوثان وبغض الى الشعر

অর্থাৎ "যখন থেকে আমি বড় হতে লাগলাম, তখন থেকেই মূর্তির প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা এবং অসার কবিতার প্রতি চরম বিতৃষ্ণা আমার অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়।"[২]

নবীদের জন্য এটা জরুরী যে, তাঁদের আপাদমস্তক সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাঁদের কথা, কাজ, নিয়্যত বা উদ্দেশ্যে কখনো মিথ্যা বা খেয়াল-খুশির অনুসরণ ও শামিল হওয়া প্রকৃতিগতভাবে আদপেই অসম্ভব। এজন্যে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

১. কাযী ইয়ায, আশ-শিফা, ২খ. পৃ. ৮৮।

২ এ বর্ণনা কানযুল উম্মালে আবূ ইয়ালা ও আবূ নুয়াইম সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

"আমি তাকে কবিতার জ্ঞান দান করিনি, আর এ জ্ঞান তার শোভনীয়ও নয়।"[১]
(সূরা ইয়াসীন : ৬৯)

যেহেতু নবূয়াত ও রিসালাতের মর্যাদা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হয়েই ছিল, এজন্য আল্লাহ তা'আলা শুরু থেকেই তাঁর পবিত্র কলবকে ঐ সমস্ত বস্তুর প্রতি বিদ্বিষ্ট ও নিস্পৃহ করে রেখেছেন, যে সমস্ত বস্তু নবূয়াত ও রিসালাতের মর্যাদার পরিপন্থি ও বিরোধী ছিল। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যৌবন ও বার্ধক্য দান করেন। নবূয়াতের সময় যখন আসন্ন হলো, তখন সত্য ও সৎ স্বপ্ন[২] তাঁকে দেখা দিতে শুরু করলো। 'নবী' শব্দটি 'নাবা' থেকে গৃহীত। আরবী অভিধানে 'নাবা' ঐ খবরকে বলা হয়, যা মর্যাদাপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ সত্য ও ঘটনার যথার্থ বর্ণনা হয়ে থাকে। সাধারণ খবরকে 'নাবা' বলা হয় না। আর নবীকে এজন্যে নবী বলা হয় যে, ওহীর দ্বারা অদৃশ্য খবর, যা নেহায়েত মর্যাদাপূর্ণ, সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তব-ভিত্তিক, কখনো যা মিথ্যা হয় না, নবীকে ওহী দ্বারা এমন খবরই দেয়া হয়ে থাকে। ইমামে রব্বানী শায়খ মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) তাঁর এক পত্রে নবূয়াতের হাকীকত সংক্ষিপ্তাকারে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

وچنانچه طور عقل درا طورحس است كه انچ بحس مدرك نشود عقل ادراك آدمى نمائد همچنين طور نبوت ورا طور عقل ست انچه بعقل مدرك نشود بتوسل نبوت بدرك مى ورايد

"জ্ঞানগত অনুভূতির পদ্ধতি যেমন ধারণাগত অনুভূতি থেকে পৃথক, যে বস্তু বাহ্যিক অনুভূতি দ্বারা বুঝা যায় না, জ্ঞান তাকে বুঝতে পারে; অনুরূপভাবে জ্ঞানের অনুভূতির বাইরে নবূয়াতের অনুভূতি। অর্থাৎ যে বিষয় অনুভবের ক্ষেত্রে জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও অপারগ, ঐ সব বিষয় নবূয়াতের জ্ঞান দ্বারাই অনুভব করা হয়। জড়বস্তু বাহ্যিক অনুভূতি দ্বারাই কেবল অনুভব করা হয়, আর জ্ঞান দ্বারা কেবল জ্ঞানগত বস্তুর ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু যেগুলো অদৃশ্য বিষয়, যা জ্ঞানানুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, সেগুলো কেবল ওহী আর নবূয়াতের মাধ্যমে পাওয়া যায়। অদৃশ্য বিষয় প্রাপ্তির মাধ্যমই হলো নবীপ্রাপ্ত ওহী। নবীগণের প্রতি কৃত ওহীর তাৎপর্য কেবল নবীগণই অনুভব করতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার অনুগ্রহে আমাদের মত অবুঝ মানুষদের বুঝানোর জন্য ওহীয়ে নবূয়াতের এক নমুনামাত্র দান করেছেন, যা দেখে মানুষ নবূয়াতের রহস্য কিছুটা উপলব্ধি করতে পারে। ওহীয়ে নবূয়াতের ঐ

---

১. কানযুল উম্মাল, ৬খ. পৃ. ৩০৫।

২. হযরত নবী (আ)-গণের স্বপ্ন সর্বদা সত্য হয়ে থাকে, মিথ্যে হয় না। অবশ্য পার্থিব দৃষ্টিতে তা কখনো সঠিক হয়, আর কখনো বেঠিক। তবে আখিরাতের বিষয়ে সর্বদা সঠিকই হয়ে থাকে। যেমন মুসীবত মুমিনদের বেলায় দুনিয়ার প্রেক্ষিতে অপসন্দনীয় এবং আখিরাতের প্রেক্ষিতে প্রিয় ও পসন্দনীয় হয়ে থাকে। –ফাতহুল বারী, কিতাবুত তাবীর, ১২খ. পৃ. ৩১১।

নমুনা হলো সত্য স্বপ্ন, যা অনুভব ও জ্ঞান ব্যতিরেকে অদৃশ্য বিষয় প্রকাশের একটা ন্যূনতম মাধ্যম।

যে সময় মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তার সমুদয় বাহ্যিক এবং গুপ্ত কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ ও অকেজো হয়ে পড়ে। ঐ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ পায়। বিস্তারিত জানার জন্য হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র) প্রণীত 'আল-মুনকিযু মিনাদ-দালাল' কিতাবটি পাঠ করুন।

সার কথা এই যে, অদৃশ্য বিষয় প্রকাশের জন্য সর্বোত্তম মাধ্যম হলো নবীপ্রাপ্ত ওহী। অনুরূপ অদৃশ্য বিষয় প্রকাশের সর্বনিম্ন মাধ্যম হলো সত্য স্বপ্ন। সত্য স্বপ্ন হচ্ছে ওহীয়ে নবূয়াতের একটি নমুনা, যার মাধ্যমে নবী (আ)গণের নবূয়াতের সূচনা হয়ে থাকে। কাজেই 'দালাইলে আবূ নুয়াইমে' 'হাসান' সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর শিষ্য আলকামা ইবন কায়স সূত্রে মুরসাল সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রথম প্রথম নবী (আ)গণকে প্রচুর সত্য স্বপ্ন দেখানো হয়। এমন কি যখন সত্য স্বপ্ন দ্বারা অন্তর স্থির হয়, তখন জাগ্রত অবস্থায় তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার ওহী নাযিল হয়।[১] যেমন হযরত ইউসুফ (আ) নবূয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁকে এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখানো হয়। তা এজন্যে যে, সৎ স্বপ্ন ওহীয়ে নবূয়াতেরই নমুনা। হাদীস শরীফে আছে, সত্য স্বপ্ন নবূয়াতের একটি অংশ। নবী (আ)গণের স্বপ্ন তো সর্বদা সত্যই হয়ে থাকে। তাঁদের স্বপ্নে মিথ্যার কোন সম্ভাবনাই নেই। অবশ্য সৎকর্মশীলদের স্বপ্নেও সত্যের প্রাধান্য থাকে। সামান্য সামান্যতম ক্ষেত্রে এটা ইলহামের বিপরীতও হয়ে থাকে। ফাসিক ও ফাজিরদের স্বপ্ন অধিকাংশ সত্যের বিপরীত হয়। সহীহ হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন

اصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا

"যে ব্যক্তি কথাবার্তায় সবচে' বেশি সত্যবাদী, তার স্বপ্নও সর্বাধিক সত্য হয়ে থাকে।"

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কার প্রকাশিত হলো যে, স্বপ্ন সত্য হওয়ার জন্য জাগ্রত অবস্থায় সত্য বলার বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান। যে ব্যক্তি যত বেশি সত্যবাদী, তিনি তত বেশি নবূয়াতের নিকটবর্তী। সত্য থেকে যে যত বেশি দূরে, সে নবূয়াত থেকেও ততটাই দূরে। এজন্যে নবী করীম (সা) কখনো বলেছেন, সত্য স্বপ্ন নবূয়াতের ছাব্বিশ ভাগের একভাগ, কখনো বলেছেন, চল্লিশ ভাগের একভাগ, এক হাদীসে আছে পঁয়তাল্লিশ ভাগের একভাগ, অপর একটি হাদীসে আছে পঞ্চাশ ভাগের একভাগ, এক হাদীসে সত্তর ভাগের একভাগ, এক হাদীসে আছে ছিয়াত্তর ভাগের একভাগ। ইমাম গাযালী (র) তাঁর ইহ্ইয়াউল উলূম গ্রন্থের 'আল-ফাকরু ওয়ায্-যুহ্দ' অধ্যায়ে বলেন, এ বিভিন্ন বক্তব্য থেকে কখনো এ কথা মনে করো না যে, এগুলো পরস্পর

১. ফাতহুল বারী, كيف كان بدء الوحى অধ্যায়, ১খ. পৃ. ৭।

বিরোধী ও বেমিল। বরং এ বিভিন্ন বক্তব্য দ্বারা এর বিপরীত মর্তবার বিভিন্নতার প্রতি ইঙ্গিত মনে করো যে, স্বপ্ন দ্রষ্টাদের অবস্থানও বিভিন্ন। সত্যবাদীদের স্বপ্নও নবূয়াতের সাথে এভাবেই সম্পর্কিত হবে, যেমন মর্যাদার তারতম্যে ছাব্বিশ ভাগের একভাগের অনুরূপ হবে। একইভাবে চল্লিশ ভাগের একভাগ, পঞ্চাশ ভাগের একভাগ, সত্তর অথবা ছিয়াত্তর ভাগের একভাগ হয়ে থাকে।[১] হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস اصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا (যা আমরা কিছু পূর্বেই বর্ণনা করেছি) তাও এই মতপার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিতবাহী অনুভূত হয়। ফলে জানা গেল, এটা এ জন্যে যে, মর্যাদাপূর্ণ কার্যক্রমের ঐ স্থানই উপযুক্ত যেখানে মরতবা ও মর্যাদা বিভিন্ন ও পর্যায়ক্রমিক মর্যাদাপূর্ণ হয়।

হাফিয ইবন কায়্যিম বলেন, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) থেকে সরাসরি বর্ণিত যে, সত্য স্বপ্ন নবূয়াতের অংশ হওয়ার ব্যাপারে যত বর্ণনা আছে, তা মতভেদে পরিপূর্ণ।[২] এবারে একটি প্রশ্ন রয়ে গেল যে, সত্য স্বপ্ন নবূয়াতের অংশ হওয়ার অর্থ কি ? সম্মানিত বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী, এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে ফাতহুল বারী কিতাব অধ্যয়ন করুন।[৩] অতঃপর নিজ ছাত্র ও শিষ্যবর্গকে বুঝান, আল্লাহ তা'আলা এ কাজের জন্য এ বুযর্গগণকে উত্তম প্রতিফল দান করবেন। উত্তম কাজের প্রতিদান পেতে এ অধমও পরওয়ারদিগারের দরবারের মুখাপেক্ষী। বর্ণনা বিস্তারিত হওয়ার আশংকায় আমরা এ আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করছি। لعل الله يحدث بعد ذلك امرا

এবারে মূল আলোচনায় ফিরে আসছি। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

اول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح

"মহানবী (সা)-এর প্রতি সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওহীর সূচনা হয়। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা প্রভাতের রশ্মির মত স্পষ্ট প্রতিভাত হতো।"

ইবন জামরাহ বলেন, সত্য স্বপ্নের সাথে প্রভাত রশ্মির উপমা এজন্যে দেয়া হয়েছে যে, ঐ সময় পর্যন্ত নবূয়াতের সূর্য উদিত হয়নি। যেভাবে প্রভাতের রশ্মি সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস, অনুরূপভাবে সত্য স্বপ্ন নবূয়াত ও রিসালতের সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ছিল।

সুবহে সাদিকরূপী সত্য স্বপ্ন এ সুসংবাদ দিচ্ছিল যে, অচিরেই নবূয়াতের সূর্য উদিত হতে যাচ্ছে। আর এভাবে প্রভাতরশ্মি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে, শেষ পর্যন্ত নবূয়াতের সূর্য ফারান পর্বতের চূড়ায় উদিত হয়। যিনি অন্তর চোখে দেখতে সক্ষম

---

১. ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ.৭।

২ প্রাগুক্ত, ১২খ. পৃ. ৩১৯-৩২৪; মাদারিজুস সালিকীন, ১খ. পৃ. ২৮।

৩. প্রাগুক্ত, ১২খ. পৃ. ৩৩১-৩৩২।

ছিলেন। যেমন হযরত আবূ বকর (রা), তিনি এগিয়ে আসেন এবং নবূয়াতের সূর্যের রশ্মি দ্বারা উপকৃত হন। আর যে চামচিকা সদৃশ্য অন্ধ ছিল, যেমন আবূ জাহল, নবূয়াতের সূর্য উদিত হতেই সে চামচিকার ন্যায় চক্ষু বন্ধ করে এবং নবূয়াত ও রিসালতের বিশ্বময় ব্যাপ্ত সূর্যরশ্মি থেকে আলোক গ্রহণে ব্যর্থ হয়।

گرنه بنید بروز شپره چشم   چشمئه افتاب راچرگناه

چهرنه آفتاب خود فاش است   ے نصیبی نصیب خفاش است

"দিনের বেলায় যদি অন্ধ দেখতে না পায়, তবে সূর্যের আলোর দোষটা কোথায়, সূর্যের চেহারা তো স্বয়ং প্রকাশিত, দুর্ভাগ্য তো কেবল চামচিকার।"

বাদ বাকী লোক আবূ বকর কিংবা আবূ জাহলের অনুসরণ করে তারা নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী আত্মার নূরের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যেকেই নবূয়াতের সূর্য থেকে উপকৃত হয়। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন : ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلوا بغار حراء "অতঃপর তিনি একাকীত্ব ও নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠেন। তিনি হেরা গুহায় নির্জন অবস্থান গ্রহণ করেন।"

উম্মুল মু'মিনীন حُبِّبَ (মাজহূল তথা কর্ম বাচ্যের শব্দ) এ জন্যে ব্যবহার করেছেন এটা জানা যায় না যে, ঐ কারণ ও উদ্দেশ্য কি ছিল, যা তাঁকে নির্জনতা ও একাকীত্ব প্রিয় বানিয়ে দিয়েছিল। এটা সম্ভবত অদৃশ্য ও গুপ্ত কোন বিষয় ছিল, যা তাঁকে নির্জনতাপ্রিয় ও একাকীত্ব প্রেমিক বানিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহই জানেন, তা কি ছিল। অন্যান্য ব্যক্তির কাছে তা সরাসরি গুপ্ত ছিল। এজন্যে উম্মুল মু'মিনীন মাজহূলের শব্দ দ্বারা তা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা যখন কোন ব্যক্তির প্রতি খাস অনুগ্রহ বর্ষণের ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন তার অন্তরে একাকীত্ব ও নির্জনতা পসন্দনীয় করে তোলেন। কাজেই আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহফের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন :

وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ الاَّ اللّٰهَ فَاْوٗا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْلَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِه وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا

"আর যখন তোমরা কাফিরগণ থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া ওদের সমস্ত উপাস্য থেকে পৃথক হয়ে যাও, তা হলে একটি গুহায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর যাতে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে পার। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের সব কাজ সহজসাধ্য করে দেবেন।" (সূরা কাহফ : ১৬)

এটা জরুরী নয় যে, নির্জনতা প্রীতি ও একাকীত্ব নবূয়াত ও রিসালত প্রাপ্তির শর্ত। কারণ নবূয়াত ও রিসালত কোন অর্জনের বিষয় নয়। আল্লাহ যাকে চান, নবী ও রাসূল মনোনীত করেন। আল্লাহই ভাল জানেন কিভাবে তিনি রিসালত দান করেছেন।

تبارك الله ما وحى بمكتسب   ولا نبى على غيب بمتهم

হ্যাঁ, যাঁকে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে নবী ও রাসূল বানাতে চান, নির্জনতা ও একাকীত্বপ্রিয়তা তাঁর রিসালতের পূর্বাভাস হয়ে থাকে। যেমনটি সত্য স্বপ্ন কেবল নবী (আ)গণের নবূয়াত ও রিসালতের সূচনা হয়ে থাকে। যে কারণে নবূয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত আল্লাহর ইলমে নির্ধারিত হয়ে আছে। এর অর্থ এটা নয় যে, সত্য স্বপ্ন ও সৎ স্বপ্ন যিনি দেখবেন, তিনি নবী হয়ে যাবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَكُلاًّ جَعَلْنَا نَبِيًّا

"যখন ইবরাহীম কাফিরগণ থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া সমস্ত উপাস্য থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন আমি ইবরাহীমকে ইসহাকের মত পুত্র ও ইয়াকূবের মত পৌত্র দান করলাম এবং প্রত্যেককেই নবী বানালাম।" (সূরা মরিয়ম : ৪৯)

এ আয়াত থেকে এটা জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নবূয়াতের মর্যাদা হযরত ইবরাহীম (আ) এর নির্জন বাসের বরকতের ফলশ্রুতি। অনুরূপভাবে মহানবী (সা)ও হেরা গুহায় গিয়ে ই'তিকাফ করতেন। এজন্যে পানাহারের দ্রব্যাদি সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং সেখানে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগী করতেন। কোন হাদীসে তাঁর এ ইবাদতের ধরন বলা হয় নি। কোন কোন আলিম বলেছেন, আল্লাহর স্মরণ, ধ্যান, চিন্তা, ধারণা এ সবই ছিল তাঁর তৎকালীন ইবাদত।[১]

এছাড়া ফাসিক, ফাজির, মুশরিক এবং কাফির থেকে আলাদা থাকাও ছিল একটা পৃথক ইবাদত। (শেষে হিজরত, যার প্রশংসা ও সুনামে সম্পূর্ণ কুরআন ভরপূর, তা বাস্তবে কি ছিল ? এটা তো ছিল আল্লাহ ও রাসূলের দুশমনদের থেকে পৃথক হওয়ারই নাম)। আর যখন খাদ্য-পানীয় শেষ হয়ে যেত, তখন গৃহে ফিরে আসতেন এবং পানাহারের দ্রব্যাদি সাথে নিয়ে ফিরে গিয়ে পুনরায় ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতেন। (যারকানী, ১খ. পৃ. ১১)

والمختار عندنا انه كان يعمل بما ظهرله من الكشف الصادق من شريعة ابراهيم وغيره

---

১. من القوسين যে ইবাদত, তা পরিবর্তিত অন্তঃকরণবিশিষ্টদের পক্ষ থেকে হয়। এ জন্যে একে আল্লামা যুরকানীর বক্তব্য দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যে প্রমাণ দ্বারা খালিস ইবাদতকারী কর্তৃক আল্লাহ তা'আলাকে দেখা উত্তম ও কল্যাণকর প্রতিদান। এই দলীল দ্বারা আল্লাহর দুশমন ও আল্লাহর অনুগতগণ কর্তৃক আল্লাহকে দেখা তাদের স্ব-স্ব গ্রহণযোগ্যতা ও অনাচারসাপেক্ষে হয়ে থাকে। হারুন ও মূসা ইবন ইমরান আর ফিরাউন, হামান এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) ও আল্লাহর দুশমন আবূ জাহল, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও মুসায়লামা কাযযাবের দেখা কি একইরূপ? অন্তরে সন্দেহ পোষণকারী ছাড়া কেউই তা অস্বীকার করবে না। আর জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

"আমাদের কাছে প্রমাণিত যে, তিনি এই আমল করতেন যা সত্য রহস্য হিসেবে তাঁর নিকট প্রকাশিত হতো হযরত ইবরাহীম (আ) ও অপরাপর নবীর শরীয়াত।" যেমনটি দুররুল মুখতারে (১খ. পৃ. ১৬৩) বর্ণিত আছে।

অর্থাৎ হানাফী ফকীহদের নিকট প্রসিদ্ধ বক্তব্য এটাই যে তাঁর নিকট প্রকাশিত রহস্য, বিশুদ্ধ ইলহাম দ্বারা যা প্রকাশিত হয়, এটা ছিল হযরত ইবরাহীম (আ) কিংবা অন্য কোন নবীর শরীয়ত, এর উপরই তিনি আমল করতেন। যেমন কোন কোন বর্ণনায় فيتحنث এর স্থলে فيتحنف শব্দ এসেছে, যার অর্থ ইবরাহীম (আ) সরল সঠিক (হানীফ) পথের উপর চলতেন। এ শব্দ এর উপর জোর দেয় যে, তিনি (সা) সরল সঠিক পথের অনুসারী সম্প্রদায়ের মত স্বীয় কাশ্‌ফ ও ইলহামের উপর আমল করতেন।

ফারান পর্বতের চূড়া থেকে রিসালাতের সূর্যোদয়

এমনকি যখন তাঁর বয়স চল্লিশ[১] বছরে পৌঁছল, নিয়মানুযায়ী একদিন তিনি হেরা গুহায় এলেন। ঘটনাক্রমে এক ফিরিশতা গুহার ভিতরে এলেন এবং তাঁকে সালাম দিলেন। এরপর বললেন, اقراء পড়ুন। তিনি বললেন, ما انا بقارى আমি পড়তে জানি না। [নবী (সা) বলেন] এতে ঐ ফিরিশতা আমাকে কঠিনভাবে আলিঙ্গন করলেন যে, আমার কষ্টের[২] কোন অন্ত ছিল না। এরপর ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, اقراء পড়ুন। আমি পুনরায় জবাব দিলাম ما انا بقارى আমি পড়তে জানি না।

কাজের কথা

ما انا بقارى এর বাহ্যিক অর্থ আমি পড়া জানি না, নিরক্ষর। কিন্তু এ অর্থে সমস্যা এই যে, কিরাআত অর্থাৎ (মুখস্থ) পড়াটা নিরক্ষরতা বিরোধী নয়। নিরক্ষর ব্যক্তিও অপরের শিক্ষাদান ও অনুশীলনের দ্বারা পড়তে ও মুখস্থ করতে পারে। বিশেষত বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও বৈয়াকরণিক জ্ঞান তার আয়ত্বে। নিরক্ষতা লিখতে জানার বিপরীত। নিরক্ষর ব্যক্তি লিখিত বিষয় পড়তে পারে না। কিন্তু মৌখিক শিক্ষায় মুখে মুখে উচ্চারণ করে বাক্য বলতে পারে। কাজেই জিবরাঈল (আ) যদি লিখিত কোন বক্তব্য নিয়ে এসে থাকতেন, যাতে ঐ আয়াতগুলো লিখিত ছিল এবং এ প্রসঙ্গে বলতেন যে,

---

১. চল্লিশ বছর বয়সে ওহীপ্রাপ্ত হওয়া হযরত ইবন আব্বাস (রা) ও হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে জুবায়র ইবন মুতইম, আতা, সাঈদ ইবন মুসায়্যেব (র) থেকেও বর্ণিত আছে। (উয়ূনুল আসার ও যারকানী, ১খ. পৃ. ২০৭)।

২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (র) বাদাউল ওহী, কিতাবুত তাবীর ও কিতাবুত তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। حتى بلغ منى الجهد শীর্ষক বাক্যটি বাদ্উল ওহী অধ্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয়বার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কিতাবুত তাফসীর ও কিতাবুত তাবীরে বাক্যটি তৃতীয়বারেও উল্লিখিত আছে।

اقراء অর্থাৎ লিখিত বক্তব্যটি পড়ুন। আর এর জবাবে ما انا بقارى আমি পড়তে জানি না বলাটা প্রকাশ্য ও সমীচীন ছিল। যেমন কিছু কিছু বর্ণনায়[১] আছে যে, জিবরাঈল (আ) একটি লিখিত পুস্তিকা নিয়ে আসেন যা মণিমুক্তা সজ্জিত ছিল। ঐ পুস্তিকা নবী (সা)-এর হাতে দেন এবং বলেন, اقـراء অর্থাৎ এই লিখিত পুস্তিকাটি পাঠ করুন। জবাবে তিনি বললেন, ما انا بقارى অর্থাৎ আমি নিরক্ষর, এ লিখিত বক্তব্য পাঠ করতে সক্ষম নই।

কতিপয় মুফাসসিরের বক্তব্য হলো, الم ذلك الكتاب لا ريب فيه-তে ঐ পুস্তিকার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যা জিবরাঈল (আ) এনেছিলেন। আর যদি জিবরাঈল (আ) কোন লিখিত পুস্তিকা না এনে থাকেন এবং اقـراء দ্বারা ঐ লিখিত বস্তু পাঠের উদ্দেশ্য না হতো, এবং শুধু মুখে উচ্চারণ ও আবৃত্তি উদ্দেশ্য হতো, তা হলে এ অবস্থায় ما انا بقارى-এর এ অর্থ ছিল না যে, আমি নিরক্ষর নই, বরং এর অর্থ হবে, ওহীর ভীতি ও ব্যাপকতার কারণে আমি তা পড়তে পারছি না। রাজাধিরাজের বক্তব্য, ওহীর ঔজ্জ্বল্যের কারণে অন্তরে এমন ভীতি ও বিহ্বলতা বিস্তার করেছে যে, মুখ তা উচ্চারণে ব্যর্থ হচ্ছে। যেমন কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, তিনি (সা) বলেছেন, كيف اقرا কেমন করে পড়ব ? এরই ভিত্তিতে আমরা এ অনুবাদ করেছি, অর্থ আমি পড়তে জানি না, যা এ অর্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং পূর্বে কৃত অর্থের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। এ ব্যাখ্যাই শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র) আশআসুল লুমুআত (২খ. পৃ. ৪০০), মাদারিজুন নুবূয়াত (১৭খ. পৃ. ৩৩)-এ এবং অনুরূপ শায়খ নূরুল হক দেহলবী কৃত বুখারী শরীফের ফারসী শরাহ তায়সীরুল কারী (১খ. পৃ. ৭) এবং শায়খুল ইসলাম দেহলবী কৃত ফারসী অনুবাদে প্রদত্ত হয়েছে।[২]

[নবী (সা) বলেন] ফিরিশতা এরপর তৃতীয়বার আমাকে বুকে কঠিনভাবে চেপে ধরলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন :

اقْرَاْبِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٥ اقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ٥ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٥ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ٥

“আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তার নামে পড়ুন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিণ্ড দ্বারা, আপনি পড়ুন, আপনার প্রভু বড়ই মেহেরবান, যিনি কলম দ্বারা শিখিয়েছেন আর মানুষকে ঐ জ্ঞান শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।”[৩] (সূরা আলাক : ১-৫)

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ২১৮।

২ কতিপয় মুফাসসিরের এ বক্তব্য আশআসুল লুমুআতে নয়; বরং শরহে সীরাতে ইবন হিশাম-এ আছে।

৩. কিতাবুত তাফসীর ও কিতাবুত তাবীরে مـالم يعلم পর্যন্ত বর্ণিত আছে এবং বাদ্উল ওহীতে কেবল وربك الاكرم পর্যন্ত বর্ণিত আছে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিন।

এরপর তিনি গৃহে ফিরে আসেন। এ অবস্থায় যে, শংকায় তাঁর শরীর থর থর করে কাঁপছিল। এসেই তিনি হযরত খাদীজাকে বললেন, زملونى زملونى "আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর।" কিছুক্ষণ পর যখন তাঁর ভীতি ও বিমূঢ়তার ভাব কেটে গেল, তখন তিনি হযরত খাদীজার সামনে সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আমার আশংকা হচ্ছে যে, আমার প্রাণ বায়ু বেরিয়ে না যায়! যেহেতু ওহীর অবতরণ এবং নূরান্বিত ফিরিশতার উজ্জ্বল প্রভা নবী (সা)-এর মানবীয় প্রকৃতির উপর প্রথম অবতরণের কারণে তাঁর অন্তরে ভীতি প্রবেশ করেছিল এ জন্যে যে, ওহীর আমানত ও প্রচণ্ডতা দ্বারা তাঁর এ ধারণা হয়েছিল যে, যদি ওহীর কাঠিন্য এমনটিই হয়, তা হলে আশ্চর্য নয় যে, আমার নশ্বর দেহ ওহীর ওজন এবং দায়িত্বভার বহন করতে পারবে না। অথবা নবূয়াতের দ্বারা পরাস্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই এ আয়াতে ঐ বোঝার প্রতিই ঈঙ্গিত রয়েছে : اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً (হে মুহাম্মদ!) "আমি আপনার উপর এক কঠিন ও ভারী আয়াত নাযিল করব।" (সূরা মুযযাম্মিল : ৫)

আরোহী অবস্থায় যখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হতো, তখন ওহীর ভারে উটনী বসে পড়তো। হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা) বলেন, একবার তাঁর উপর ওহী নাযিল হলো। এ সময় তাঁর শরীর আমার রানের ওপর ছিল। ঐ সময় তা আমার কাছে এতই ভারী মনে হলো যে, আমার রান ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। একটা সাধারণ বস্তু যদি প্রকৃতিবিরুদ্ধভাবে এসে যায়, তখন এতে মানুষ হয়রান হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে যদি একটা বিশাল ঘটনা সামনে এসে যায়, যা চিন্তা ও ধারণার উর্ধ্বে, এমন ঘটনা দ্বারা ঘাবড়ে যাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। মূসা (আ)-কে যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে লাঠি বিষয়ক মু'জিযা দেয়া হয়েছিল এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, হে মূসা ! তোমার লাঠি মাটিতে ফেলে দাও, তখন তিনি দেখলেন যে, সেটি সাপ হয়ে চলতে শুরু করেছে, তখন মূসা (আ) ভীত হয়ে এত দ্রুত পলায়ন শুরু করলেন যে, পিছনে ফিরেও দেখেন নি; তখনই আওয়াজ হলো : اَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ "অগ্রসর হও, এবং ভয় করো না, তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।" মূসা (আ)-এর এ ভীতি ও পলায়ন ছিল সম্পূর্ণ মানবিক প্রবৃত্তিজাত। কেননা خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا "মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোন সন্দেহ কিংবা দোদুল্যমানতা ছিল না। অনুরূপভাবে নবী করীম (সা)-এর ভীতি এবং পেরেশানীও এরই ভিত্তিতে ছিল যে, এই প্রথমবারের মত তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হয়েছিল; কোন সন্দেহ কিংবা দোদুল্যমানতার কারণে ছিল না। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, সন্দেহ সংশয়ে পড়বেন না, মানবীয় প্রকৃতির প্রথম ফেরেশতা দর্শনে প্রাবল্যের দরুন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়া কোন আশ্চর্য কিছু নয়। যখন বার বার ফেরেশতার গমনাগমনের ফলে তাঁর মানবীয় প্রকৃতি অভ্যস্ত হয়ে পড়ছিল,

তখন এ ভীতিও ধীরে ধীরে দূরীভূত হচ্ছিল। অবশ্য নবূয়াতের ভার অর্পিত হওয়ার পর তিনি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন এবং এ সন্দেহে পতিত হয়েছিলেন যে, আমাকে মেরে ফেলা হবে না তো ! আল্লাহর আশ্রয়, নবূয়াত ও রিসালতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। এটা ছিল এজন্যে যে, জিবরাঈল (আ)-এর অবতরণ ও নূরের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত হওয়ার পর নবূয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল অসম্ভব। যেমনটি ইবন শিহাব যুহরীর একটি মুরসাল বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ) এসে আমার বক্ষ বিদারণ করলেন এবং আমাকে একটি অতি উত্তম মসনদে বসালেন যা ছিল মণিমুক্তা খচিত।

ثم استعان له جبرئيل فبشره برسالته الله حتى اطمان النبى ﷺ ثم قال له اقراء فقال كيف اقراء فقال اقراء باسم ربك الذى خلق الى قوله مالم يعلم فقبل الرسول رسالة به وتنصرف فجعل لا يمر على شجر ولا حجر الاسلم عليه فرجع مسرورا الى اهله موقنا قد راى امرا عظيما الحديث

"আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আ) আবির্ভূত হলেন এবং নবূয়াতের সুসংবাদ দান করলেন, এমন কি তিনি এতে নিশ্চিত হলেন। এরপর বললেন, পড়। তিনি বললেন, কি করে পড়বো? জিবরাঈল (আ) বললেন, اقراء باسم। তিনি আল্লাহর পয়গাম গ্রহণ করলেন এবং যখন ফিরে চলছিলেন, তখন পথিপার্শ্বের সমস্ত পাথর ও বৃক্ষরাজি বলতে লাগল, হে আল্লাহর নবী ! আপনার প্রতি সালাম। এভাবে তিনি আনন্দ ও স্বস্তির সাথে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। আর তাঁর এ প্রত্যয় জন্মেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবূয়াত ও রিসালতের ন্যায় বিরাট বস্তু দান করেছেন।"

এ বর্ণনা 'দালাইলে বায়হাকী' ও 'দালাইলে আবূ নুয়াইমে' মূসা ইবন উকবা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।[1] আর বর্ণনাটি 'উয়ূনুল আসার'-এ হাফিয আবুল বাশার দুলাবীর সনদে বর্ণিত আছে।

হাফিয আসকালানী বলেন, উবায়দ ইবন উমর থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ জিবরাঈল এলেন এবং আমাকে একটি মসনদে বসালেন, যা মণি-মুক্তা খচিত ছিল। ইমাম যুহরী থেকে একটি মুরসাল বর্ণনায় রয়েছে, আমাকে এমন একটি মসনদে বসানো হয়েছিল যে, তা দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম।[2] মোট কথা, তিনি গৃহে ফিরে এলেন এবং হযরত খাদীজাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন এবং বললেন যে, আমার জীবনের আশংকা করছি। হযরত খাদীজা বললেন, এটা আপনার জন্য সুসংবাদ, আপনি কখনই ভীত হবেন না।

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৯৩।

২ ফাতহুল বারী, ১২খ. পৃ. ৩১৩।

আল্লাহর কসম! তিনি আপনাকে কখনই অপসন্দ করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেন, আপনার এ ঔদার্য খুবই যুক্তিযুক্ত, আপনি সর্বদা সত্য কথা বলেন, লোকদের বোঝা বহন করেন, অর্থাৎ অন্যের দায়িত্ব নিজের মাথায় বহন করেন। অনাথ-অসহায়ের খোঁজ-খবর নেন, আপনি আমানতদার, জনগণের আমানত রক্ষা করেন, মেহমানকে আহার্যদানের হক আদায় করেন, আপনি সত্যের পক্ষে সর্বদা রক্ষক ও সাহায্যকারী।

এটা বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা। ইবন জারীর-এর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত খাদীজা এও বলেছেন যে, ما اتيت فاحشة قط অর্থাৎ আপনি অশ্লীলতার কাছেও কখনো যান নি।[১]

সার কথা এই যে, যে ব্যক্তি সুন্দর, পরিপূর্ণ এবং এমন প্রশংসিত ও পবিত্র আর এমন চরিত্র ও দৈহিক পূর্ণতার অধিকারী; এমন অর্থ এবং গুণাবলীর ভাণ্ডার ও খনি, তার অপদস্থতা অসম্ভব। এমন ব্যক্তি পৃথিবীতেও অপদস্থ হতে পারে না আর আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা যাঁকে এহেন সৌন্দর্য ও পূর্ণতা দান করেছেন, তাঁকে সর্বপ্রকার বালা-মুসীবত থেকে নিরাপদে রাখেন। ইবন ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত খাদীজা তাঁকে এ বলে সান্ত্বনা দেন যে, ঐ পবিত্র সত্তার শপথ, যাঁর হাতে খাদীজার প্রাণ, আমি দৃঢ় আশা রাখি যে, আপনি এ উম্মতের নবী হবেন।[২] বর্ণিত আছে যে,

واخبرها بما جاء به فقالت ابشر فوالله لا يفعل الله بك الا خيرا فاقبل الذى جاءك من الله فانه حق وابشر فانك رسول الله حقا

"তিনি সমুদয় ঘটনা হযরত খাদীজার নিকট বর্ণনা করলেন। হযরত খাদীজা বললেন, কল্যাণ হোক এবং আপনার জন্য সুসংবাদ। আল্লাহর শপথ! তিনি আপনার জন্য কল্যাণই করবেন। যে সৌভাগ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার নিকট এসেছে, তা গ্রহণ করুন, নিঃসন্দেহে তা সত্য। আবার বলছি, আপনার জন্য সুসংবাদ, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর সত্যিকারের রসূল।" (বায়হাকী, দালায়িলে আবূ মায়সারা থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত)।[৩]

হাফিয আসকালানী এ রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করে বলেন, এ বর্ণনায় সরাসরি এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সর্ব প্রথম হযরত খাদীজাই ঈমান আনয়ন করেন। এরপর হযরত খাদীজা একাকী তাঁর চাচাত ভাই ওরাকা ইবন নাওফলের নিকট গেলেন, যিনি তাওরাত ও ইঞ্জিলের বড় আলিম ছিলেন। তিনি সুরিয়ানী ভাষা থেকে আরবীতে ইঞ্জিল অনুবাদ করেছিলেন এবং জাহিলিয়াতের যুগে মূর্তি পূজায় বিতৃষ্ণ হয়ে খ্রিস্টধর্ম

১. তারীখে তাবারী, ২খ. পৃ. ৮১।

২ সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৮১।

৩. ফাতহুল বারী, ১২খ. পৃ. ৩১৫।

গ্রহণ করেছিলেন। তখন তিনি খুবই বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত খাদীজা সমুদয় ঘটনা তাঁকে খুলে বললেন। শুনে ওরাকা বললেন :

لئن كنت صدقتنى انه لياتيه ناموس عيسى

"তুমি যদি সত্যি বলে থাক, তা হলে অবশ্যই তিনি নামূস[১] (ফেরেশতা) যিনি ঈসা (আ)-এর নিকট আসতেন।"

এই বর্ণনা 'দালাইলে আবূ নুয়াইম' গ্রন্থে 'হাসান' সনদে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর হযরত খাদীজা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সাথে নিয়ে ওরাকার নিকটে গেলেন এবং বললেন, ভাইজান ! আপনার ভাতিজার[২] অবস্থা তার মুখ থেকেই শুনুন। ওরাকা তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, ভাতিজা ! বল দেখি, তুমি কি দেখেছ ? হযরত (সা) সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করলেন। ওরাকা যখন তাঁর সমস্ত কথা শুনলেন, তাতে তাঁর মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মালো যে, তিনি যা কিছু বলেছেন, সবই সত্য। ওরাকা তাঁর কথা বুঝতে পারলেন এবং তা সমর্থন করলেন (ফাতহুল বারী, ১২খ. পৃ. ৩১৭)।

ওরাকা তাঁর সকল অবস্থা শুনে বললেন, আগন্তুক হলেন ঐ নামূস (ফেরেশতা), যিনি মূসা (আ)-এর নিকট আসতেন। হায়, তোমার পয়গাম্বরীর সময় যদি আমি শক্তিমান থাকতাম এবং অন্ধ না হতাম ! যখন তোমার সম্প্রদায় তোমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে, কিংবা অন্তত জীবিতও যদি থাকতাম ! তিনি (সা) খুবই আশ্চর্য[৩]

---

১. ভাল সংবাদ আনয়নকারী ফিরিশতাকে 'নামূস' ও মন্দ খবর আনয়নকারীকে 'জাসূর' বলে। (ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ২৪)।

২ এ অতিরিক্ত বর্ণনা এ জন্যে করা হয়েছে, যাতে বুখারী ও দালাইলে আবূ নুয়াইমের বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য না ঘটে।

৩. শ্রবণ, বিশ্বাস, জানার সবগুলোর কর্তা ছিলেন ওরাকা। কিন্তু আল্লামা শিবলী এগুলোর কর্তা হিসেবে মহানবী (সা)-কে বুঝে এভাবে অর্থ করেছেন যে, যখন তিনি ওরাকার কথা শুনলেন, এতে তাঁর সত্যের প্রতি বিশ্বাস জন্মালো এবং তিনি তা বুঝতে সক্ষম হলেন (সীরাতুন নবী, ১খ. পৃ. ১৮৯)। আল্লামা শিবলী বুঝেছেন যে, মহানবী (সা)-এর নবূয়াত ও রিসালাতের ব্যাপারে সন্দেহে ছিলেন, ওরাকার কথা শুনে তাঁর এ বিষয়ে প্রত্যয় জন্মালো। আল্লামা শিবলীর এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। নবীজী (সা)-এর নবূয়াত ও রিসালাত সম্পর্কীয় জ্ঞান ও বিশ্বাস পূর্বেই অর্জিত ছিল। যখন হযরত জিবরাঈল (আ) প্রথম হেরা গুহায় প্রবেশ করেন, তখন প্রথমেই নবী (সা)-কে সালাম দেন। যেমনটি আবূ দাউদ তায়ালিসীর বর্ণনায় রয়েছে। (দ্র. যারকানী, ১খ. পৃ. ২১১; ফাতহুল বারী, ১২খ. পৃ. ৩১৩, তাবীর অধ্যায়)। এরপর জিবরাঈল তাঁকে আল্লাহর রাসূল হওয়ার সুসংবাদ দেন। এমন কি এতে তাঁর প্রত্যয় জন্মায়। এরপর জিবরাঈল (আ) তাঁকে বলেন, اقرا এবং সূরা আলাকের কয়েকটি আয়াত তাঁকে পড়িয়ে দিলেন। এরপর যখন তিনি হেরা গুহা থেকে বের হলেন তখন পথিপার্শ্বের বৃক্ষ ও পাথর কর্তৃক তাঁকে "আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ," আওয়াজ শুনতে পেতেন (খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৯৪)। মোট কথা, ঐ সমস্ত বিষয় থেকে তাঁর নবূয়াতের ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস জণ্ডেছিল। অবশ্য তাঁর মুখে এ ঘটনা শুনে ওরাকার মনে এ প্রত্যয় জণ্ডেছিল এবং তিনি চিনতে পেরেছিলেন যে, তিনিই সেই নবী, যাঁর সুসংবাদ তাওরাত ও ইঞ্জিলে দেয়া হয়েছে। তাঁর নবূয়ত ও রিসালতের প্রতি ওরাকার প্রত্যয়নের বিষয়টি আল্লামা শিবলী ভুলক্রমে নবী (সা)-এর প্রতি আরোপ করে ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন।

হয়ে বললেন, ওরা কি আমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে ? ওরাকা বললেন, কেবল তুমিই নও, এ পৃথিবীতে যিনিই আল্লাহর বাণী নিয়ে এসেছেন, মানুষ তাঁরই সাথে শত্রুতা করেছে। যদি আমি ঐ পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে অবশ্যই তোমাকে সাধ্যমত সাহায্য করবো। কিন্তু এরপর ওরাকা বেশিদিন বেঁচে ছিলেন না। বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত আবূ মায়সারা বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীসে আছে, ওরাকা বলেন :

ابشر فانا اشهد انك الذى بشربه ابن مريم وانك على مثل ناموس موسى وانك نبى مرسل وانك تومر بالجهاد

"আপনার জন্য সুসংবাদ, আপনি আল্লাহর নবী। যেমনটি নবী ছিলেন ঈসা ইবন মরিয়ম (আ), যাঁকে এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। এছাড়া আপনি মূসা (আ)-এর অনুরূপ প্রেরিত নবী। অচিরেই আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাকে জিহাদের হুকুম দেয়া হবে।"[১]

যেহেতু তিনিও মূসা (আ)-এর ন্যায় জিহাদের নবী, আর মূসা (আ)-এর শরীয়তের মতই তাঁর শরীআতে হদ, জিহাদ ও কিসাসের বিধান রয়েছে, হালাল-হারামের বিধান এতে চূড়ান্ত পর্যায়ে বিদ্যমান,সেহেতু ওরাকা খ্রিস্টান হওয়ার কারণে বলেছেন, তিনিই নামূস (ফেরেশতা) যিনি মূসা (আ)-এর নিকট অবতীর্ণ হতেন। হযরত খাদীজা (রা) প্রথমবার একাকী ওরাকার সাথে সাক্ষাতের সময় ওরাকা খ্রিস্টান হওয়ার কারণে ঐ ফিরিশতাকে ঈসা (আ)-এর নামূস (ফিরিশতা)-এর সাথে সাদৃশ্য বর্ণনা করেছেন। এক বর্ণনায় আছে, নবী (সা) প্রত্যাবর্তনকালে ওরাকা তাঁর মস্তকে চুম্বন করেন।[২] তিনি গৃহে ফিরে এলেন এবং কয়েকদিন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল বন্ধ রাখা হয়[৩] যাতে তাঁর ভীতি ও কষ্ট দূর হয়ে যায় এবং পরবর্তী ওহী আগমনের উৎসাহ ও অপেক্ষা করার আগ্রহ তাঁর অন্তরে জাগ্রত হয়।

دیرست كه دلدار بيامى نفرستاد نتوشت سلامے وكلامے نفرستاد

"বহুদিন হলো বন্ধু কোন বার্তা পাঠাচ্ছে না, না বার্তা, আর না সালাম-কালাম।"

ওহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন হযরত (সা) এতটা চিন্তিত ও ব্যথাতুর হয়ে পড়লেন যে, তিনি বার বার পাহাড় চূড়ায় উঠতেন এবং নিজকে সেখান থেকে ফেলে দেয়ার চিন্তা করতেন।

هر دل سالك هزاران غم بود گرزباغ دل خلافے كم بود

هجرسے بره كر مصيبت كچه نهين اس سے بهترهے كه مر جاؤن كهين

১. ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ৪৫৪; উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৮৪।

২ উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৮৭।

৩. ওহী বন্ধ হওয়া অর্থ কয়েকদিনের জন্য কুরআন করীম নাযিল বন্ধ হয়ে যায়। এর অর্থ এটা নয় যে, হযরত জিবরাঈল (আ)-এর আগমন বন্ধ হয়ে যায়; বরং তাঁর গমনাগমন সর্বদা অব্যাহত ছিল। (উমদাতুল কারী, ১খ. পৃ. ৭৩)।

"প্রত্যেক সাধকের অন্তরে হাজারো চিন্তা-ভাবনা থাকে, নিশ্চিন্ত জীবন কমই আছে। বিরহ অপেক্ষা বড় মুসীবত কিছুই নেই, কোনভাবে মরে যাওয়াও যেন এর চেয়ে উত্তম।"

কিন্তু তিনি যখনই এরূপ চিন্তা করতেন তখনই জিবরাঈল (আ) দৃশ্যমান হতেন এবং বলতেন ঃ يا محمد انك رسول الله حقا "হে মুহাম্মদ! সত্যিই আপনি আল্লাহর রাসূল।" এ কথা শুনে তাঁর অন্তরে স্বস্তি ফিরে আসতো।[১]

একবার হযরত খাদীজা (রা) নবী (সা)-কে বললেন, আবার যখন ঐ নামূস আসবেন, সম্ভব হলে আমাকে অবশ্যই খবর দেবেন। কাজেই এরপর যখন হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর কাছে এলেন, তিনি ওয়াদা মুতাবিক হযরত খাদীজা (রা)-কে খবর দিলেন। খাদীজা (রা) নবীজী (সা)-কে বললেন, আপনি আমার আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। তিনি আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। এমতাবস্থায় হযরত খাদীজা মাথার কাপড় খুলে ফেলেন এবং জিজ্ঞেস করেন, এখনও কি আপনি ফিরিশতাকে দেখতে পাচ্ছেন ? নবী (সা) বললেন, না। তখন খাদীজা (রা) বললেন, আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর শপথ, তিনি ফেরেশতা, শয়তান নয়। এ বর্ণনা মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইসমাঈল ইবন হাকিম থেকে 'মুরসাল' সনদে রিওয়ায়াত করেন। সীরাতে ইবন হিশামের[২] অপর এক বর্ণনায় আছে, খাদীজা বললেন, আপনার জন্য সুসংবাদ, তিনি অবশ্যই ফেরেশতা, শয়তান হলে (আমার ঘোমটা খুলে ফেলাতে) লজ্জাবোধ করতো না। আবূ নুয়াইম হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) থেকে দুর্বল সনদে 'দালাইলে' বর্ণনা করেছেন।[৩]

সার সংক্ষেপ

সার কথা এই যে, হযরত খাদীজার এ প্রমাণ উপস্থাপন ছিল যৌক্তিক। কারণ, নবী করীম (সা)-এর ন্যায় এমন সুন্দর চরিত্র ও পরিপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী অনুপম ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য কেবল নবূয়াত ও রিসালাতের জন্যই প্রযোজ্য। আর ওরাকার যুক্তি ছিল উদ্ধৃতিগত যে, তিনিই সেই নবী ও রাসূল, যাঁর সুসংবাদ হযরত মসীহ্ ইবন মরিয়ম (আ) প্রদান করেছিলেন। সুলায়মান তায়মী এবং মূসা ইবন উকবা তাঁদের কিতাবুল মাগাযীতে উল্লেখ করেন, হযরত খাদীজা ওরাকার পূর্বে আদ্দাস[৪] -এর নিকট যান এবং জিবরাঈল (আ)-এর আগমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। আদ্দাস জিবরাঈলের

১. ফাতহুল বারী, ১২খ. পৃ. ৩১৭; যারকানী, ১খ. পৃ. ২১৬।

২ খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৯৫।

৩. ইসাবা, ৪খ. পৃ. ২৮১।

৪. আদ্দাস (রা) উতবা ইবন রবীয়ার গোলাম ছিলেন। তিনি ছিলেন নিনুয়া নগরের অধিবাসী, যেখানে হযরত ইউনুস (আ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খ্রিস্টান ছিলেন এবং পরে ইসলাম কবূল করেন। (ইসাবা, ২খ. পৃ. ২৬৬)।

নাম শুনতেই বললেন, কুদ্দুস, কুদ্দুস, অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ! মূর্তিপূজায় কলুষিত এ যমীনে জিবরাঈল কিভাবে আসবেন ? তিনি তো আল্লাহ তা'আলার বিশ্বস্ত বান্দা, আল্লাহ ও তাঁর পয়গাম্বরদের মধ্যে ভ্রমণকারী এবং হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-এর বন্ধু। এরপর খাদীজা ওরাকার নিকটে যান।[১]

কিছু কিছু সীরাত গ্রন্থে আছে, হযরত খাদীজা বহিরা দরবেশের নিকটও গিয়েছিলেন এবং ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বহীরার জবাবও প্রায় তাই ছিল যে জবাব আদ্দাস দিয়েছিলেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত খাদীজা একবার নবী (সা)-কে আরয করলেন, ওরাকা আপনার নবূয়াত ও রিসালাত প্রত্যায়ন করেছেন, কিন্তু দীনের প্রকাশ্য দাওয়াতের পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি (সা) ইরশাদ করেন, আমি ওরাকাকে স্বপ্নে দেখেছি যে, তিনি সাদা পোশাক পরিহিত আছেন। যদি দোযখের অধিবাসী হতেন, তবে অন্য কোন রঙের পোশাক পরিহিত থাকতেন। ফাতহুল বারীর সূরা আলাকের তাফসীরে, মুসনাদে বাযযারে এবং মুসনাদে হাকিমে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "ওরাকাকে মন্দ বলো না। তার জন্যে আমি বেহেশতে একটি অথবা দু'টি বাগান দেখেছি।"[২]

বড় কাজের কথা

মহানবী (সা)-কে নিয়ে হযরত খাদীজার কখনো ওরাকার নিকট গমন, কখনো তাঁকে আদ্দাসের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং ঘটনা খুলে বলাটা কোনরূপ সন্দেহ-সংশয়ের কারণে বা প্রত্যয় জন্মানোর জন্য ছিল না, বরং রাসূল (সা)-কে সান্ত্বনা দান ও তাঁর উদ্বেগ প্রশমনই ছিল উদ্দেশ্য। ওহী নাযিলের কারণে রাসূল (সা)-এর উপর ক্লেশ ও উৎকণ্ঠা বিদ্যমান ছিল, যা থেকে তিনি স্বস্তি লাভ করতে পারেন। কেননা হযরত খাদীজা (রা) হযরত নবী করীম (সা)-কে যে বিবাহ করেছিলেন, তা তাঁর অদৃশ্য কারামত ও বৈশিষ্ট্য দেখে এ উদ্দেশ্যেই করেছিলেন, যে শেষনবীর সুসংবাদ তিনি তাঁর চাচাত ভাই ওরাকা ইবন নওফল থেকে বার বার শুনে আসছিলেন, এর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তিনিই হবেন। কাজেই যখন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হয় এবং হেরা গুহা থেকে ফিরে এসে তিনি খাদীজাতুল কুবরাকে তা বললেন, তা শোনার সাথে সাথেই খাদীজার অন্তরে তাঁর নবূয়াতের দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আনন্দের প্রকাশ ঘটানো এবং ভালবাসার প্রেরণায় অতিরিক্ত নিশ্চয়তার জন্য কখনো ওরাকার নিকট, কখনো আদ্দাসের নিকট তাঁকে নিয়ে যান, তিনি যে উদ্দেশ্যে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন, তা সফল হয়েছে। খাদীজা কেবল নবী (সা)-এর পেরেশানী দেখে দুঃখিত ছিলেন। অন্যথায় অন্তরে অফুরন্ত খুশিতে ভরপুর ছিলেন। আর রাসূল (সা)-এর উদ্দেশ্যও ছিল কেবল

---

১. ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ৫৫৪।

২. উমদাতুল কারী, ১খ. পৃ. ৭৫।

সান্ত্বনা ও উদ্বেগ প্রশমন। আল্লাহ না করুন, রাসূল (সা)-এর স্বীয় নবূয়াত ও রিসালাতের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয়ও ছিল না। আর জিবরাঈল (আ)-এর সাক্ষ্য এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করার পর, এ ব্যাপারে দ্বিধা-সন্দেহ হওয়াটাও অসম্ভব ও অগ্রহণযোগ্য।

এর কারণ এটাই ছিল যে, ওরাকা যদিও আলিম ছিলেন; কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রকৃতিজান্তা ছিলেন না। নবী (সা)-এর অন্তরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, এর প্রকৃত অবস্থা, প্রকৃত স্বাদ এবং সে স্বাদের বৈশিষ্ট্য নবী করীম (সা)-এরই কেবল জানা ছিল। এটা উপভোগের পর্যায়ে অনুধাবন করতে ওরাকা ছিলেন অক্ষম, স্বাদ সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অনবহিত; কেবল জ্ঞানগত পর্যায়েই তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে, নবী (আ)-গণের উপর ওহী নাযিলের সময় এরূপই হয়ে থাকে। এজন্যে তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। আর এ অবস্থায় কেবল তিনিই সান্ত্বনা দিতে পারেন। যার এ অবস্থা সৃষ্টি হয়নি, বরং কিছুটা ভাসা ভাসাভাবে যিনি এ সম্পর্কে মোটামুটি একটা কিছু জানেন, যেমন ডাক্তার রোগীকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকে। অন্যথায় যার উপর এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তিনি নিজেই ভীত ও দিশেহারা হয়ে পড়বেন, তার নিজের খবরই থাকবে না, তিনি আবার অন্যকে কি সান্ত্বনা দেবেন ? আর জ্ঞান-বুদ্ধি ও শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা আবশ্যিক নয় যে, সান্ত্বনাদানকারী অবস্থার শিকার ব্যক্তি থেকে উত্তম এবং পরিপূর্ণ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান হবেন।

নবূয়াত লাভের তারিখ

সমস্ত মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ একমত যে, নবূয়াতের এ মর্যাদা তাঁকে সোমবার দিনেই দান করা হয়। তবে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, তিনি কোন্ মাসে নবূয়াত লাভ করেন। হাফিয ইবন আবদুল বার বলেন, তিনি রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখে এ মর্যাদা লাভ করেন। এ প্রেক্ষিতে যে, ঐ তারিখে তাঁর বয়স পূর্ণ চল্লিশ বছর হয়েছিল। আর মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন যে, ১৭ই রমযান তিনি নবূয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন।

واتت عليه اربعون فاشرقت شمس النبوة منه فى رمضان

এ প্রেক্ষিতে নবূয়াত লাভের সময় তাঁর বয়স চল্লিশ বছর ছয় মাস ছিল। হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারীতে এ বর্ণনাকে বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। এজন্যে যে, হেরা গুহায় তিনি রমযান মাসেই ই'তিকাফ করতেন। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য যারকানী, ১খ. পৃ. ২০৭; ফাতহুল বারী, ১২খ. পৃ. ৩১৩; কিতাবুত তাবীর, ৮খ. পৃ. ৫৫১; কিতাবুত তাফসীর, ১খ. পৃ. ২৬ দ্র.)।

সূক্ষ্ম তত্ত্ব

১. নবূয়াত ও রিসালাতের মর্যাদাদানের জন্য চল্লিশ বছর বয়সকে এজন্যে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, মানুষের শারীরিক ও আত্মিক শক্তি চল্লিশ বছর বয়সেই

চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً "এমনকি যখন সে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে এবং যখন পৌঁছে চল্লিশ বছর বয়সে।"

কাজেই মানুষের উপযুক্ত বয়স তো চল্লিশ বছরই। এরপর পতন আর ভাটার সময়। একইভাবে যখন শারীরিক ও আত্মিক শক্তি চূড়ান্ত পূর্ণতায় উপনীত হয় এবং আল্লাহর নূরের দীপ্তি ও পূত-পবিত্র শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করার যোগ্যতা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা তাঁকে নবূয়ত ও রিসালাতের মর্যাদা অর্পণ করেন। وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহের জন্য বিশেষরূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।" (সূরা বাকারা : ১০৫)

২. ইমাম শা'বীর একটি মুরসাল রিওয়ায়াত, যা ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল স্বীয় তারিখে উল্লেখ করেছেন, তা হলো, নবূয়াতপ্রাপ্তির পর কিছুদিন হযরত ইসরাফিল (আ) নবী (সা)-এর সাহচর্যদান ও সহায়তার জন্য আদিষ্ট হন। অধিকন্তু, তিনি তাঁকে আদব ও সৌজন্যবোধ শিক্ষা দেন। তবে তাঁর মাধ্যমে কোন কুরআনের আয়াত নাযিল হয়নি। এ রিওয়ায়াতটি সনদের দিক থেকে সহীহ।[১]

ইসরাফিল (আ)-এর সাহচর্যদান ও সহায়তা এ কথার ইঙ্গিতবাহী ছিল যে, এ নবীই শেষ নবী, তাঁর পর কেবল কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করা কর্তব্য হবে। এটা এ জন্যে যে, ইসরাফিল (আ)-ই কিয়ামতের প্রাক্কালে শিঙ্গায় ফুৎকার দিতে আদিষ্ট হয়েছেন। তাঁরই শিঙ্গায় ফুৎকারে কিয়ামত সংঘটিত হবে। আল্লামা সুয়ূতী কতিপয় আলিম থেকে তাঁর 'ইতকানে' এ কথা উল্লেখ করেছেন।

৩. হাদীসের বাক্য ثم حبب اليه الخلاء "অতঃপর একাকীত্ব তাঁর নিকট প্রিয়তর করে তোলা হয়।" এখানে مجهول তথা কর্মবাচ্যের শব্দ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য ঐ দিকে ইঙ্গিত করা যে, একাকী থাকার এ অভ্যাস তাঁর মধ্যে আপনা আপনি সৃষ্টি হয়নি, বরং কোন প্রয়োগকারী এটা তাঁর প্রতি প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ এটা আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত। নির্জনতা প্রিয়তা তাঁর অন্তরে এ জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, নিঃসঙ্গতা (খালাওয়াত ও আয্‌লাত) হচ্ছে সৃষ্টি থেকে দূরে থাকা ও একাকীত্ব সকল উপাসনার মূল, বরং এটা একটা পৃথক ইবাদত। যদি একাকীত্বের সাথে যিকর ও ফিকির-এর ন্যায় ইবাদতও অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তো সুবহানাল্লাহ তা নূরের উপর নূর।

৪. এ হাদীসে ঐদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শিক্ষার্থীর জন্য একাকীত্ব ও সৃষ্টি থেকে দূরে থাকাটাই উপযুক্ত। গৃহে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে থেকে উত্তমরূপে ইবাদত করা যায় না। শিক্ষা সমাপনকারীর বিশেষ নির্জনতা আবশ্যকীয় নয়; এজন্যে

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ২৩৬।

যে, পরিপূর্ণ ও বিদ্বান ব্যক্তির জন্য আত্মীয়-স্বজনের সাহচর্য আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয় না। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : رِجَالٌ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَاَقَامِ الصَّلٰوةِ "সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না...." (সূরা নূর : ৩৭)

ازدرون شو اشناؤ از برون بیگانه باش

این چنین زیبا روش کم می بود اندر جهان

"অভ্যন্তর সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানী হও, বাহির সম্পর্কে হও অজ্ঞ, পৃথিবীতে এ ধরনের রূপাচারী কমই হয়ে থাকে।"

কিন্তু শিক্ষা সমাপনকারীর জন্যও এতটুকু একাকীত্ব জরুরী যে, দিনের কোন না কোন সময় একাকীত্বের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া। যেমনটি আল্লাহ তা'আলার বাণী فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ "অতএব যখনই অবসর পাও সাধনায় লিপ্ত হও এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ কর।" (সূরা ইনশিরাহ : ৮)

৫. হেরা গুহায় গমনকালে তাঁর পাথেয় নিয়ে যাওয়া এ কথারই প্রমাণ যে, পানাহারের ব্যবস্থা করা আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়; বরং এটা আল্লাহর রিযিকের প্রতি নিজের দারিদ্র্য, অক্ষমতা এবং ক্ষুধা ও অভাব-অনটন-জনিত মুখাপেক্ষিতারই বহিঃপ্রকাশ, যা ইবাদতের প্রাণ স্বরূপ।

رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

"হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে, আমি তার কাঙ্গাল।" (সূরা কাসাস : ২৪)

والفقرلی وصف ذات لازم ابدا　　كما الغنى ابدا وصف له ذاتی

"দারিদ্র্য এবং প্রয়োজন আমার মূল বৈশিষ্ট্য; আমার সত্তা ও প্রকৃতির জন্য আবশ্যিক, কখনো তা পৃথক হবার নয়। যেমন প্রাচুর্য ও মুখাপেক্ষিহীনতা আল্লাহর সত্তাগত গুণ। কাজেই আল্লাহর জন্য যেমন প্রাচুর্য ও মুখাপেক্ষিহীনতা মহাগুণ, তেমনি বান্দার জন্য দারিদ্র্য ও অভাব সত্তাগত আবশ্যিক।"

কবিতাটি হাফিয ইবন তাইমিয়ার। তিনি এ কবিতাটি বেশি বেশি আবৃত্তি করতেন। পূর্ণ কবিতাটি 'মাদারিজুস সালিকীনে' বর্ণিত আছে। একই বক্তব্য এ গুনাহগার (লেখক) নিম্নোক্ত কবিতায় উল্লেখ করেছি ঃ

توغنی مطلقی ائ ذوالجلال　　من فقير مطلقم بے قيل وقال

تو كريمی من گدائے مطلقم　　تو عزيزى من ذليل مطلقم

ذات پاكت منبع جود و نوال　　ماز سرتا پاشده نقش سوال

"আমার কাছে তুমিই পরিপূর্ণ হে সর্ব শক্তিমান. আমি অন্তহীন দরিদ্র, নাই কোন উচ্চবাচ্য, তুমি দয়ালু আমি সম্পূর্ণ নিঃস্ব, তুমি সম্মানী আমি পুরোপুরি অধম, তোমার সত্তা দয়া আর দানের উৎস, আর আমি তো হলাম পুরোপুরি সওয়ালের প্রতিভূ।"

হযরত মূসা (আ) মাদাইনে পৌঁছার পর যখন ক্ষুধার উদ্রেক হলো, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিজের দারিদ্র ও ক্ষুধাকে এভাবে পেশ করেছিলেন

رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

"হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে, আমি তার কাঙ্গাল।" (সূরা কাসাস : ২৪)

আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের দিকে নিজের দারিদ্র ও মুখাপেক্ষিতাকে সম্পৃক্ত রাখা ইবাদতের সার কথা এবং নবী (আ)-গণের সুন্নত। আর পাথেয় সঙ্গে না নেয়া নেপথ্যে তাওয়াক্কুলের দাবি করা। কাজেই কিছু কিছু সৎ ব্যক্তির অভ্যাস ছিল যে, একাধারে কয়েকদিন রোযা রাখতেন কিন্তু বালিশের নিচে একটি রুটি অবশ্যই রেখে দিতেন। একদিন এক ভক্ত তার মুর্শিদের বালিশের নিচ থেকে রুটিটি সরিয়ে নিল। শায়খ যখন দেখলেন যে, রুটিটি নেই, এতে তিনি অনুসারীদের প্রতি খুবই নাখোশ হন এবং কঠোর তিরস্কার করেন। ভক্তবৃন্দ বলল, হযরতের এটার কী প্রয়োজন ? শায়খ বললেন, তোমরা ভাবছো যে, আমি যেহেতু একাধিক্রমে রোযা রাখতে সক্ষম, কাজেই রুটি রাখার কোন প্রয়োজন নেই! তোমাদের এ ধারণা ভুল। আমি আমার শক্তির উপর নির্ভর করে রোযা রাখি না; বরং মহামহিম আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের উপর ভরসা করি এবং সব সময় নিজের দুর্বলতা ও অসহায়ত্বকে ভয় করে চলি, না জানি কোন্ সময় আমার এ সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরতা থামিয়ে দেয়া হয় এবং মানবীয় ও দৈহিক প্রবৃত্তির প্রতি ফিরিয়ে দেয়া হয়, তখন তো ঐ رزاق ذو القوة المتين (মহান রিযিকদাতা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী) তখন শুকনা রুটিরই মুখাপেক্ষী হতে হবে। বান্দা নিজ সত্তা থেকে এক লহমার জন্যও আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে অনির্ভরশীল হতে পারে না। আত্মার প্রশান্তির জন্যই সব সময় সঙ্গে রুটি রাখি, আত্মার প্রতি যাতে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা আরোপিত না হয়। 'সালেক' তথা সাধকের জন্য আত্মার চাহিদায় প্রেক্ষিতে রিযিককে রিযিক মনে করে, বরং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকে তৃপ্ত হওয়া ও নির্ভর করা উত্তম।

৬. হেরা গুহায় নির্জনবাস ও সৃষ্টজীব থেকে দূরে থাকাকালীন তাঁর অভ্যাস ছিল, কখনো কখনো তিনি গৃহে আগমন করতেন এবং কয়েক দিনের রসদ সঙ্গে নিয়ে ফিরে যেতেন। এটা এদিকে ইঙ্গিত করে যে, নির্জনবাসে অবস্থানকারীর জন্য লোকসমাজ থেকে একেবারেই সম্পর্কচ্ছেদ করা সমীচীন নয়, গৃহবাসী ও প্রতিবেশীর হক আদায় করাও আবশ্যক। এ কারণে তিনি ইরশাদ করেন : لا رهبانية فى الاسلام "ইসলামে বৈরাগ্য নেই।"

অভ্যন্তরীণ রোগ চিকিৎসার জন্য এবং ইবাদতে দৃঢ়তা ও মযবুতি আনয়নের লক্ষ্যে যদি কোন গুহা কিংবা পাহাড়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্জনবাস (যেমনটি সূফীগণের নিয়ম) করা হয়, তবে এটা সুন্নত, বিদ'আত নয়।

৭. আর এটি এদিকেও ইঙ্গিত করে যে, যে ব্যক্তি গুহা কিংবা পাহাড়ে নির্জন বাসের ইচ্ছা করে, তবে তার নির্জনবাসের ঠিকানা গৃহবাসীদের জানানো উচিত। যাতে করে তাদের কোন প্রকার দুশ্চিন্তা না হয়, তার প্রতি তাদের অন্তরে কোন কু ধারণার সৃষ্টি না হয়, প্রয়োজনের সময় খোঁজ-খবর নিতে পারে, অসুস্থ হয়ে পড়লে সেবা-শুশ্রূষা করতে পারে, ইত্যাদি।

৮. জিবরাঈল (আ) কর্তৃক তাঁকে তিনবার চাপ দেয়া ছিল ফিরিশতাসুলভ ও আত্মিক ফয়েয দানের উদ্দেশে, যাতে জিবরাঈল (আ)-এর আধ্যাত্মিক ও ফেরেশতাসুলভ ক্ষমতা তাঁর মানব প্রবৃত্তির উপর বিজয়ী হয় এবং তাঁর পবিত্র অন্তর আল্লাহর বাণী, অদৃশ্যের গোপন রহস্য এবং প্রভুর জ্ঞান বহন করতে পারে। আর তাঁর সত্তা বরকতের সাথে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে মাধ্যম এবং দৃশ্যমান জগতের সমাপ্তি ও অদৃশ্য জগতের সূচনা হতে পারেন। সম্মানিত 'আরিফ'গণের এভাবে কাউকে ফয়েয পৌঁছানো বর্ণনা পরম্পরায় প্রমাণিত। হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী করীম (সা) আমাকে নিজ বক্ষে চেপে ধরলেন এবং এ দু'আ করলেন : اللهم علمه الكتاب। "হে আল্লাহ ! একে আপনার কিতাবের জ্ঞান দান করুন।" (বুখারী শরীফ)

নবী করীম (সা) কর্তৃক হযরত ইবন আব্বাস (রা)-কে বুকে চেপে ধরা তেমনই ছিল, যেমন জিবরাঈল (আ) তাঁকে বুকে চেপে ধরেছিলেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি সময় সময় আপনার নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করি এবং ভুলে যাই। তিনি বললেন, তোমার চাদর বিছাও। আমি চাদর বিছালাম, তিনি হাত দিয়ে কিছু ইশারা করলেন যেমন কেউ দু' হাত ভর্তি করে কিছু দেয়। এরপর বললেন যে, এখন এ চাদর তোমার বুকের সাথে লাগাও। আমি ঐ চাদর আপন বুকের সাথে লাগালাম। অতঃপর আমি আর কোন হাদীস ভুলিনি। (সহীহ বুখারী, ১খ. পৃ.২২)।

হাফিয আসকালানী 'ফাতহুল বারী'তে বলেন, কোন হাদীসে এ ব্যাখ্যা নেই যে, তিনি দু' হাত ভর্তি করে হযরত আবূ হুরায়রার চাদরে কি দিয়েছিলেন। কিন্তু এই অধম বান্দা (লিখক) বলছে, অবশ্য যদি তা পুণ্যের হয় তবে তা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে, আর যদি (দু'হাত ভর্তির কথাটা) ভুলবশত হয়ে থাকে, তবে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। আমার ধারণা এই যে, অদৃশ্য জগতে যে হিফযের ভাণ্ডার রয়েছে, রাসূল (সা) ঐ হিফযের ভাণ্ডার থেকে দু' হাত ভর্তি করে নিয়ে আবূ হুরায়রার চাদরে ঢেলে দেন। আর পরে ঐ চাদর থেকে তা আবূ হুরায়রার বক্ষে পৌঁছে। হিফয যদিও দৃশ্যমান জগতবাসীর কাছে অনুভবযোগ্য, কিন্তু অদৃশ্য জগতের দূরদর্শী

বাসিন্দাদের দৃষ্টিতে গোপন ও অদৃশ্য নয়। এ ধরনের বাক্য ঐসব লোকই অস্বীকার করে যারা মহান নবী (আ)-গণের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ধরন সম্পর্কে অজ্ঞ। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মুখস্থ শক্তির আরো অনেক ঘটনা আছে, যা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। (বিজ্ঞ পাঠক ফাতহুল বারী, হিফযুল ইলম অধ্যায়, ১খ. পৃ. ১৯২-এ দেখুন।)

৯. আল্লামা তীবী তাইয়্যাবাল্লাহু সারাহু শরহে মিশকাতে লিখেছেন, সূরা আলাক-এর নাযিল হওয়া আয়াতে নবী (সা)-এর সন্দেহ যে, ما انا بقارئ "আমি পড়তে জানি না", এর জবাবে বলছে যে, অবশ্যই আপনি পড়তে জানেন না, কিন্তু স্বীয় প্রভুর পবিত্র নামের বরকতে ও সহযোগিতায় পড়ুন, সব সহজ হয়ে যাবে। আর বুঝুন যে, আল্লাহ তা'আলা কাউকে কিতাব এবং কলমের মাধ্যমে জ্ঞান দান করেন, যাকে পরিভাষাগত অর্থে কিতাবী জ্ঞান বলা হয় عَلَّمَ الاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ "তিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষাদান করেন" আয়াত দ্বারা এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার কাউকে সরাসরি কোন বাহ্যিক উপকরণ ছাড়াই জ্ঞান দান করেন যাকে পরিভাষাগত অর্থে 'ইলমে লাদুন্নী' বলা হয়। আর আয়াত এ এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সংক্ষেপ জবাব এটাই যে, তিনি (সা) যদিও লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কুদরত খুবই প্রশস্ত। প্রকাশ্য উপকরণ ছাড়া এবং কোন মাধ্যম ছাড়াই তিনি যাকে ইচ্ছা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দানে ধন্য করেন। একইভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকেও জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

"আর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে জানিয়েছেন যা আপনি জানতেন না। আর আপনার উপর তা ছিল বিরাট অনুগ্রহ।" (সূরা নিসা : ১১৩)

১০. হযরত খাদীজা (রা)-এর সান্ত্বনাপ্রদ জবাব দ্বারা সহমর্মিতা, অতিথি আপ্যায়ন, দানশীলতা ও পরোপকারিতার দরুন পৃথিবীতেও মানুষ বিপদ-মুসীবত থেকে নিরাপদ ও সংরক্ষিত থাকে।[1]

১১. হযরত খাদীজা (রা) কর্তৃক নবী (সা)-এর গুণপনা ও পরিপূর্ণতার উল্লেখ এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, কারো বাস্তব স্বয়ংকৃত সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে তার সামনে বর্ণনা করা, যদি তাতে অহমিকা ও আত্মপ্রশস্তিতে পরিণত হওয়ার আশংকা না থাকে, তবে তা কেবল জায়েযই নয়, বরং উত্তম।[2]

১২. নবী করীম (সা) কর্তৃক এ ঘটনাটি সর্ব প্রথম হযরত খাদীজাকে বলা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, মানুষের জীবনে যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়, তখন যদি তার স্ত্রী পরহেযগার ও সমঝদার হয়, তবে সর্ব প্রথম তারই নিকট বলা উচিত, এরপর জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবানদের নিকট বর্ণনা করা যেতে পারে।

---

১. উমদাতুল কারী, ১খ. পৃ. ৭৫।

২ প্রাগুক্ত।

১৩. হযরত খাদীজা (রা) এ কথা শুনে নবী (সা) কে ওরাকা ইবন নওফলের নিকট নিয়ে যাওয়া, যিনি তৎকালে সর্বাপেক্ষা বড় আলিম ছিলেন, এটাই প্রমাণ করে যে, কোন বিরল ঘটনা যখন ঘটে যায়, তখন তা আল্লাহওয়ালা আলিমের নিকট উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

১৪. অধিকন্তু, কারো মধ্যস্থতায় জ্ঞানী ব্যক্তির খেদমতে উপস্থিত হওয়া অধিক উত্তম। যেমন নবী করীম (সা) হযরত খাদীজার মাধ্যমে ওরাকা ইবন নওফলের সাথে সাক্ষাত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) একাকী ওরাকার নিকট গমন করেন নি; বরং হযরত খাদীজাকে সঙ্গে নেন যার সাথে ওরাকার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। এতে জানা গেল যে, আলিম ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাতের জন্য যদি কোন পথ-প্রদর্শক সাথে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে তা হবে উপযুক্ত কাজ, যাতে করে কথোপকথন সহজতর হয়।

১৫. যে ব্যক্তি বয়সে নিজের চেয়ে বড়, তাকে শ্রদ্ধা, ইযযত-সম্মান করা খুবই জরুরী; যদিও অল্প বয়সী ব্যক্তি জ্ঞান, মর্যাদা, সম্মান ও পরিপূর্ণতায় সমস্ত আলিম সমাজ থেকে উন্নত ও উচ্চতর হয়।

১৬. ছোট যদিও মর্যাদার দিক থেকে বড় হয়, তবুও বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য ছোটদেরকে সম্বোধনকালে ঐরূপ বাক্য ব্যবহার করা বৈধ যা বয়সে ছোটদের জন্য সাধারণত ব্যবহার করা হয়। যেমন হযরতকে নবী ও রাসূল হিসেবে মেনে নেয়ার পরেও ওরাকা يَا ابْنَ اَخِيْ "হে ভ্রাতুষ্পুত্র !" বলে সম্বোধন করেছেন। অধিকন্তু, এটাও জানা গেল যে, ছোটরা যখন বড়দের মজলিসে উপস্থিত হয়, তখন বড়র প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ মুরব্বী কথা না বলবেন, ছোট ততক্ষণ পর্যন্ত বক্তব্য শুরু করবে না। কাজেই হযরত খাদীজা যখন তাঁকে ওরাকার নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললেন : يا ابن عم اسمع من ابن اخيك "ওহে চাচাত ভাই, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট কিছু শুনুন।" তখনও তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। যখন ওরাকা স্বয়ং কথা শুরু করলেন এবং বললেন : يا ابن اخي ماذا ترى "হে ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি কি দেখেছ ?" তখন তিনি ঘটনার বিশদ বর্ণনা দিলেন।[১]

১৮. ওরাকার কথার জবাবে তাঁর এ কথা বলা : او مخرجي هم "কী, ওরা আমাকে (মক্কা থেকে) বের করে দেবে ?" বাক্য থেকে এটা জানা গেল যে, মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্নতা নবী (আ) গণের জন্যেও কষ্টদায়ক।[২]

১৯. অধিকন্তু, ঐ সময় ওরাকার বক্তব্য, হায় ! যদি আমি ঐ সময় শক্তিমান ও যুবক থাকতাম; যখন আপনার সম্প্রদায় আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে। এটা প্রমাণ করে যে, মানুষের জন্য কোন উত্তম কামনা করা বৈধ, যদিও সে উত্তম কর্ম অর্জনের অবকাশ না থাকে।[৩]

---

১. বাহজাতুন নুফূস, ১খ. পৃ. ২০।

২ রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১৫৮।

৩. বাহজাতুন নুফূস, ১খ. পৃ. ২১।

২০. ইমাম মালিক (র)-কে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, মানুষের নাম জিবরাঈল রাখা কিরূপ? তিনি এটা পসন্দ করেননি।[১]

তাওহীদ ও রিসালতের পর সবচে' প্রথম ফরয

তাওহীদ ও রিসালতের শিক্ষাদানের পর মহানবী (সা)-কে যে বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়, তা ছিল উযূ ও নামায। প্রথমে হযরত জিবরাঈল (আ) পায়ের গোড়ালী দ্বারা মাটিতে আঘাত করলে একটি ঝর্ণার সৃষ্টি হয়। এতে জিবরাঈল (আ) প্রথমে উযূ করেন এবং নবী করীম (সা) দেখতে থাকেন। এরপর তিনিও একইভাবে উযূ করেন। অতঃপর জিবরাঈল (আ) দু' রাক'আত নামায পড়ান এবং নবী (সা) তাঁর ইকতিদা করেন। উযূ ও নামায শেষে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং হযরত খাদীজা (রা)-কে উযূ ও নামায শিক্ষা দেন। এ বর্ণনা 'দালাইলে আবূ নুয়াইমে' (১খ. পৃ. ৭০) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হাফিয আসকালানী হাদীসটির সনদ 'যঈফ' বলেছেন।[২]

হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা) স্বীয় পিতা হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেন, নবূয়াতের প্রাথমিককালে ওহী নাযিলের সময় জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আসেন এবং আমাকে উযূ ও নামায শিক্ষা দেন। এ রিওয়ায়াত 'মুসনাদে আহমদ', 'সুনানে দারা কুতনী' এবং 'মুস্তাদরাকে হাকিমে' বর্ণিত আছে। আল্লামা আযিযী শরহে 'জামে সগীরে' এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন, শায়খ বলেছেন, হাদীসটি 'সহীহ'।

(সিরাজুম মুনীর, ১খ. পৃ. ২৯)

আর হাদীসটি সুনানে ইবন মাজাহতেও উল্লেখ আছে। আল্লামা সুহায়লীও নিজ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উভয়ের সনদেই ইবন লাহিয়া নামে একজন রাবী আছেন, যার সম্বন্ধে মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করেছেন। হাফিয ইবন সাইয়্যেদুন নাস (কু. আ.) বলেন, যেভাবে এ হাদীস হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, একইভাবে হযরত বারা' ইবন আযিব (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবন আব্বাসের হাদীসে আছে, 'এটা ছিল প্রথম ফরয।' (উয়ূনুল আসার, পৃ. ৯১)

আল্লামা সুহায়লী এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, কাজেই উযূ ফরয হওয়ার দিক থেকে মক্কী আর তিলাওয়াতের দিক থেকে মাদানী। এ জন্যে যে, উযূ সম্পর্কিত আয়াতটি হিজরতের পর মদীনায় নাযিল হয়েছে। (রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১৬৩)

নবূয়াতের প্রথম থেকেই নবী (সা)-এর নামায পাঠ অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। মতভেদ কেবল পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পূর্বে (যা মি'রাজের রাত্রিতে ফরয

---

১. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১৫৬।

২ ইসাবা, ৪খ. পৃ. ২৮১।

হয়েছে) তাঁর উপর কোন নামায ফরয ছিল কি না। কিছু আলিমের মতে মি'রাজের পূর্বে কোন নামায ফরয ছিল না। নবী (সা) যতটা চাইতেন, নামায পড়তেন। কেবল রাতের নামাযের নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছিল। আর কিছু আলিমের মতে নবূয়াতের শুরু থেকে দু'টি নামায ফরয ছিল। দু' রাক'আত ফজরের এবং দু' রাক'আত আসরের। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ

"আর সকাল সন্ধ্যায় আপনার প্রভুর প্রশংসা জ্ঞাপন করুন।"

(সূরা মু'মিন : ৫৫)

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا

"সূর্যোদয় ও অস্তগমনের পূর্বে আপনার রবের সপ্রশংস তসবীহ পাঠ করুন।"

(সূরা তাহা : ১৩০)

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ

"আর দিনের দু'প্রান্তে নামায কায়েম করুন।" (সূরা হূদ : ১১৪)

আর এর কিছুদিন পরে সূরা মুযযাম্মিল নাযিল হয় এবং কিয়ামে লায়ল অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাযের নির্দেশ নাযিল হয়।

(ফাতহুল বারী, কিতাবুস সালাত, كيف فرضت الصلات অধ্যায়)

আল্লামা সুহায়লী বলেন, মুযানী ও ইয়াহিয়া ইবন সাল্লাম থেকে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে।[১]

মুকাতিল ইবন সুলায়মান থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইসলামের শুরুতে দু' রাক'আত প্রত্যুষের এবং দু' রাক'আত সন্ধ্যার নামায ফরয করেন। পরে শবে মি'রাজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়।[২]

সর্ব প্রথম যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন[৩]

সর্ব প্রথম তাঁর পবিত্র সহধর্মিণী হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সোমবার সন্ধ্যায় তাঁর সাথে প্রথম নামায আদায় করেন। কাজেই প্রথম কিবলার অনুসারী তিনিই ছিলেন। (ইসাবা, উয়ূনুল আসার)। এরপর ওরাকা ইবন

---

১. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১৬২।

২ উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৯১।

৩. رضى الله عنهم ورضوا عنه অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ বাক্যই উদ্ধৃত হয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতিই সন্তুষ্ট থাকেন যাঁর সমাপ্তি ঈমান ও ইসলামের উপর হয়; ফাসিক ও মুনাফিকের উপর আল্লাহ কখনই সন্তুষ্ট থাকেন না।

নওফেল ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন এবং এর পরপরই হযরত আলী (ক), যিনি দীর্ঘকাল তাঁরই অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন,[১] তিনি দশ বৎসর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবূয়াত লাভের পরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার তাঁর সাথে নামায আদায় করেন।[২] ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, নবূয়াত লাভের পরবর্তী দিন আলী (রা) নবী (সা) ও হযরত খাদীজা (রা)-কে নামায পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করেন, এটা কি ? জবাবে তিনি ইরশাদ করেন, এটাই আল্লাহর দীন। এ দীন নিয়েই পয়গাম্বরগণ পৃথিবীতে আসেন। আমি তোমাকে আল্লাহর দীনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে, তাঁরই ইবাদত কর এবং লাত-উযযাকে অস্বীকার কর। হযরত আলী বললেন, এতো সম্পূর্ণ নতুন কথা! ইতোপূর্বে কখনো এ ধরনের কথা শুনিনি। আমি আমার পিতা আবূ তালিবের কাছে না শুনে এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারব না। নবী (সা)-এর কাছে এটা খুব কঠিন মনে হলো যে, এ গুপ্ত বিষয়টি না জানি কারো কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে! কাজেই বললেন হে আলী, যদি তুমি ইসলাম কবূল নাও কর, তবুও কারো কাছে এটা ফাঁস করবে না। হযরত আলী চুপ থাকলেন। একটা রাতও কাটলো না, আলীর অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করিয়ে দেয়া হলো। প্রভাত হলে তিনি তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোন্ বিষয়ে দাওয়াত দিচ্ছেন ? তিনি (সা) ইরশাদ করলেন : "সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। লাত-উযযাকে অস্বীকার কর, মূর্তিপূজা থেকে ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ কর।" হযরত আলী ইসলাম কবূল করলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত (অর্থাৎ কিছু কিছু বর্ণনামতে এক বছর) নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা আবূ তালিবের কাছে গোপন রাখলেন।[৩] এর কিছুকাল পরে তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম যায়দ ইবন হারিসা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাথে নামায আদায় করেন।[৪]

আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

যখন পরিবারভুক্ত সবাই ইসলামে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি নিজ বন্ধু ও সৎকর্মশীলদেরকে এ বিরাট অনুগ্রহ ও বিশাল দানে শরীক হওয়ার আহ্বান জানান।

---

১. এক বৎসর যখন মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন হযরত (সা) নিজ পিতৃব্য হযরত আব্বাসকে বললেন, চাচা আবূ তালিবের পোষ্যের সংখ্যা বেশি, আর দুর্ভিক্ষও চলছে। এজন্যে আবূ তালিবকে কিছু সাহায্য সহযোগিতা করা দরকার, যাতে তার ভার কিছুটা লাঘব হয়। কাজেই তার কোন কোন সন্তানকে আপনি আর কাউকে আমি নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসি। তাঁরা উভয়ে আবূ তালিবের কাছে এসে প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন। আবূ তালিব বললেন, আকিলকে আমার জন্য রেখে তোমরা যাকে ইচ্ছা, নিয়ে যাও। ফলে তিনি আলীকে এবং আব্বাস (রা) জাফরকে নিজ অভিভাবকত্বে গ্রহণ করতে পসন্দ করলেন। (সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৮৪)।

২. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৯৩।

৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৪।

৪. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৯৪।

সর্বপ্রথম তিনি স্বীয় নিস্বার্থ সুহৃদ, বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ, দীর্ঘদিনের বন্ধু, দুর্দিনের সাথী অর্থাৎ হযরত আবূ বকরকে ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দেন। আবূ বকর কোন চিন্তা-ভাবনা, কোন দ্বিধা-সংশয় ছাড়াই প্রথম প্রস্তাবেই তাঁর দাওয়াত কবূল করেন।

چشم احمد بر ابوبکرے زده　　وزیکے تصدیق صدیق امده

"আহমদ (সা)-এর চক্ষু আবূ বকর (রা)-এর উপর পড়ে। এক প্রত্যায়নই তাঁকে সিদ্দীকে পরিণত করল।"

সুতরাং হাদীসে এসেছে, আমি যার নিকটই ইসলাম পেশ করেছি, সেই ইসলামের ব্যাপারে কিছু না কিছু ইতস্তত করেছে। কিন্তু আবূ বকর ইসলাম গ্রহণে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব করেননি।[১]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-কে যখন প্রশ্ন করা হলো যে, সর্ব প্রথম কে মুসলমান হয়েছেন ? জবাবে তিনি বলেন যে, স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে সর্ব প্রথম আবূ বকর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন, মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা), দাসদের মধ্যে হযরত যায়দ (রা) এবং বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রা)।[২-৩]

বাদ্উল ওহী-এর রিওয়ায়াত থেকে যদিও প্রকাশ্যত এটা মনে হয় যে, হযরত আলী সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন, তাঁর এ অগ্রগামিতা ফযীলত এবং বড়ত্বের কারণে নয়; বরং এজন্যে যে হযরত খাদীজা তো তাঁর স্ত্রী ছিলেন ও তাঁর অনুগত ছিলেন। আর হযরত আলী ছিলেন অল্প বয়স্ক ও তাঁরই অভিভাবকত্বে প্রতিপালিত। গৃহের মহিলা ও শিশুদের এ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি থাকে না যে, বড়দের কোন সিদ্ধান্তে দ্বিমত পোষণ করে।

কিন্তু আবূ বকর (রা) এর ব্যতিক্রম, তিনি ছিলেন স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। কারো অনুগত ও প্রভাবাধীন ছিলেন না। কোন চাপ, প্রভাব বা ঝোঁকের বশবর্তী না হয়ে ইসলাম গ্রহণ ছিল তাঁর মর্যাদার স্বীকৃতি। অধিকন্তু, হযরত খাদীজা ও হযরত আলীর ইসলাম গ্রহণ তাঁদের সত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এর বিপরীতে হযরত আবূ বকরের ইসলাম গ্রহণ ছিল ব্যাপক ও সার্বজনীন। আর সত্তাগত বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা ব্যাপক বৈশিষ্ট্য সর্বদাই উত্তম হয়ে থাকে। এ জন্যে যে, হযরত আবূ বকর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেই ইসলামের প্রচার-প্রসার, দাওয়াত-তাবলীগে আত্মনিয়োগ করেন এবং হুযূর (সা)-কে সাহায্য করতে থাকেন; তাঁর জন্যে একটি শক্তির উৎসে পরিণত হন। আর হযরত আলী (রা) ঐ সময়ে বালকমাত্র ছিলেন। তিনি ইসলামের দাওয়াতে কি সাহায্য করতে পারতেন ? হযরত আলী তো তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা আপন পিতার

---

১. প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ৯৫।

২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৯।

৩. প্রাগুক্ত।

নিকটও গোপন রেখেছিলেন (দ্র. যারকানী, ১খ., পৃ. ২৪৪)। আর আবূ তালিবের দারিদ্র্যের কারণে তিনি মহানবী (সা)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি হুযূর (সা)-কে কিংবা ইসলামকে কোন আর্থিক সাহায্য করতেও সক্ষম ছিলেন না। অধিকন্তু ছোটদের অভ্যাস এটাই যে, তারা যখন কোন ব্যক্তির সাহচর্যে ও তত্ত্বাবধানে থাকে, তখন তাকে যে কাজ করতে দেখে, তারই রেশ ধরে ঐ কাজই করতে থাকে। শিশুদের মধ্যে কোন কাজের উপকারিতা কিংবা ক্ষতি, সৌন্দর্য কিংবা অসৌন্দর্য বুঝার ও পরীক্ষা করার সামর্থ্য বা জ্ঞান কোনটাই থাকে না। হযরত আলীর অবস্থা তখন এমনটিই ছিল।[১]

এর বিপরীতে হযরত আবূ বকর ছিলেন খুবই জ্ঞানী ও হুঁশিয়ার ব্যক্তি; যিনি উপকার-ক্ষতি, সৌন্দর্য-কদর্যের মাঝে পার্থক্য করার পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখতেন এবং তিনি নবী করীম (সা)-এর সমবয়সী ছিলেন। এছাড়া তিনি মক্কার প্রভাবশালী, সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন লোকদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) এ অবস্থায় কারো কোন চাপ ছাড়াই প্রথম আহ্বানেই ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত কবূল করেন এবং জনগণের মাঝে তা প্রকাশ করেন। পিতা কিংবা ভাইয়ের নিকট নিজের ইসলাম গ্রহণ গোপন রাখেন নি। নিজের বিশিষ্ট বন্ধুদের কাছে বিশেষভাবে স্বীয় ইসলামকে প্রকাশ করেন এবং এ দীনে প্রবেশের আহ্বান জানান। এরূপ ইসলাম গ্রহণকারীর জন্য রয়েছে শত কল্যাণ।

সারকথা হলো, আবূ বকর এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি ছিলেন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, জ্ঞানী, প্রভাবশালী ও সম্ভ্রান্ত, প্রথম আহ্বানেই ইসলাম গ্রহণকারী। প্রথম থেকেই ইসলামের দাওয়াতে নবী করীম (সা)-এর হাত ও বাহুতে পরিণত হন এবং নিজের ধন-সম্পদ ও জীবন সবকিছুই ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে দেন। পূর্ণ তের বছর পর্যন্ত সর্ব প্রকারের কষ্ট ও বিপদে হযরত রাসূল (সা)-এর সঙ্গে থাকেন এবং শত্রু প্রতিরোধ করেন। আর হযরত আলী অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে শত্রু প্রতিরোধ ও তাদের মুকাবিলা করার শক্তি তাঁর ছিল না। আর আবূ বকর (রা) ইসলামে প্রবেশ করেই ইসলামের প্রচার শুরু করেন। তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুদের মধ্যে যারা তাঁর কাছে আসতেন কিংবা তিনি যাদের কাছে যেতেন, প্রত্যেককেই তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কাজেই তাঁর বন্ধু ও সঙ্গীদের মধ্যে তাঁর প্রচারের দরুন এ ব্যক্তিগণ ইসলামে প্রবেশ করেন ঃ[২] উসমান ইবন আফফান, যুবায়র ইবন আওয়াম, আবদুর রহমান ইবন আউফ, তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ, সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা), এরা সবাই কুরায়শদের বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবূ বকর-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবূ বকর (রা) এদের সবাইকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর

১. প্রাগুক্ত।

২ মক্কার নেতৃস্থানীয় এগার অথবা বারজন সাহাবীর পর ইসলাম গ্রহণ করেন। (ইসাবা)।

দরবারে উপস্থিত হন। এখানে সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাথে নামায আদায় করেন। এদের পর পর ইসলাম গ্রহণ করেন, আবূ উবায়দা[১], আমের ইবন জাররাহ, আরকাম ইবন আবুল আরকাম, মাযঊন ইবন হাবীবের তিন পুত্র উসমান ইবন মাযঊন, কুদামা ইবন মাযঊন ও আবদুল্লাহ ইবন মাযঊন, উবায়দা ইবন হারিস, সাঈদ ইবন যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল এবং তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে খাত্তাব অর্থাৎ হযরত উমর (রা)-এর বোন, আসমা বিনতে আবূ বকর, খাব্বাব ইবন আরাত, উমায়র ইবন আবূ ওয়াক্কাস অর্থাৎ সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাসের ভাই, আবদুল্লাহ[২] ইবন মাসঊদ, মাসঊদ ইবন কারী, সলীত ইবন আমর, আয়্যাশ ইবন আবূ রবীয়াহ এবং তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে সালামাহ, খুবায়স ইবন হুযাফা, আমের ইবন রবীয়াহ, আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ ও তাঁর ভাই আবূ আহমদ ইবন জাহাশ, জা'ফর ইবন আবূ তালিব ও তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়স, হাতিব ইবন হারিস, তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে মুজাল্লাল, তাঁর ভাই খাত্তাব ইবন হারিস, তাঁর স্ত্রী ফাকিহা বিনতে ইয়াসার, মামার ইবন হারিস, সাঈদ ইবন উসমান ইবন মাযঊন, মুত্তালিব ইবন আযহার, তাঁর স্ত্রী রামলা বিনতে আবূ আউফ, নাঈম ইবন আবদুল্লাহ নুহাম[৩], হযরত আবূ বকর-এর মুক্ত ক্রীতদাস আমির[৪] ইবন ফুহায়রা, খালিদ ইবন সাঈদ ইবন আস, তাঁর স্ত্রী উমায়না বিনতে খালফ, হাতিব ইবন আমর, আবূ হুযায়ফা ইবন উৎবা, ওয়ালিদ ইবন

---

১. হযরত আবূ উবায়দা নবী (সা) আরকামের গৃহে অবস্থান গ্রহণের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। (তাবাকাতে ইবন সাদ, পৃ. ১২)।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ বলেন, আমি উকবা ইবন আবূ মুয়াঈতের বকরী চরাতাম। একদিন হযরত (সা) আমাদের গলিপথ অতিক্রম করছিলেন এবং হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলন, তোমার কাছে কি দুধ আছে ? আমি বললাম, আমি তো রক্ষক মাত্র। তিনি (সা) বললেন, কোন দুধহীন বকরী থাকে তো নিয়ে আস। আমি একটি দুধহীন বকরী তাঁর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি এর স্তনে নিজের পবিত্র হাত রাখলেন এবং দুধ দোহন করতে শুরু করলেন। প্রথমে আবূ বকরকে এবং তারপর আমাকে দুধপান করালেন। এমনকি আমরা পুরোপুরি তৃপ্ত হলাম। এরপর তিনি বকরীর স্তনের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, হে দুধ, তুই স্তন থেকে পৃথক হয়ে যা। তখন বকরীটির স্তন পূর্ববৎ দুধহীন হয়ে যায়। এ মুজিযা দেখে আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। এরপর বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাকে তালীম দিন। তিনি (সা) তাঁর পবিত্র হাত আমার মাথায় বুলালেন এবং বললেন, আল্লাহ তোমাতে বরকত দিন, তুমি আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত বালক। হাফিয ইবন সায়্যিদুন নাস নিজ সনদে এ রিওয়ায়াত করেছেন। (উয়ূনুল আসার)

৩. নুহাম নাহম শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ আওয়াজ। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, سمعت نحمه فى الجنة "আমি তার (নাঈম ইবন আবদুল্লাহর) আওয়াজ বেহেশতে শুনেছি।" (ইসাবার বরাতে সীরাতে ইবন হিশাম, ৩খ. পৃ. ৫৬৭; তাবাকাত, ৪খ. প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১০২)।

৪. হযরত আমির ইবন ফুহায়রা (রা) বীরে মাউনার যুদ্ধে শহীদ হন এবং ফিরিশতারা তাঁর শবদেহ আসমানে উঠিয়ে নেন। (রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১৬৮)।

আবদুল্লাহ, বুকায়র ইবন আবদ ইয়ালীলের চার[১] পুত্র, খালিদ, আমির, আকিল এবং আয়্যাস, আম্মার ইবন ইয়াসার, আবদুল্লাহ ইবন জুদআনের আযাদকৃত দাস সুহায়ব ইবন সিনান রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন।

যখন নামাযের সময় আসতো, তখন তিনি কোন ঘাঁটি অথবা উপত্যকায় গোপনে নামায আদায় করতেন। একবারের ঘটনা, তিনি (সা) ও হযরত আলী (রা) কোন উপত্যকায় নামায পড়ছিলেন, হঠাৎ আবূ তালিব তাঁদের দিকে বেরিয়ে আসেন। হযরত আলী ততদিন পর্যন্ত তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর নিজ মা-বাবা চাচা এবং অপরাপর নিকটাত্মীয়ের নিকট প্রকাশ হতে দেন নি। আবূ তালিব হযরত (সা)-কে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে ভ্রাতুষ্পুত্র! এটা কেমন ধর্ম আর এটা কি ধরনের ইবাদত? তিনি বললেন, চাচা! এটাই আল্লাহর দীন, ফেরেশতাদের দীন, পয়গাম্বরগণের দীন; বিশেষ করে আমাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আ)-এর দীন। আর আল্লাহ আমাকে তাঁর সমস্ত বান্দার প্রতি রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। আপনিই আমার নসীহতের সর্বাপেক্ষা বেশি উপযুক্ত যে, আপনাকেই প্রথমে কল্যাণ ও হিদায়াতের প্রতি আহ্বান জানাই। আর আপনারও কর্তব্য যে, আপনিই সর্বপ্রথম এ সত্য হিদায়াত ও দীন গ্রহণ করবেন এবং এ ব্যাপারে আমার সাহায্য ও সহায়তাকারী প্রমাণিত হবেন।

আবূ তালিব বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র, আমি তো আমার পিতৃপুরুষের ধর্ম ছাড়তে পারি না, তবে এতটুকু অবশ্যই পাবে যে, কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এরপর হযরত আলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে পুত্র, এটা কেমন ধর্ম যা তুমি গ্রহণ করেছ? হযরত আলী বললেন, বাবা, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, আরও তিনি যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন, তা সত্যায়ন করেছি। এর সাথে সাথে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করি এবং এরই অনুগত ও অনুসারী। আবূ তালিব বললেন, উত্তম, তোমাকে কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে, এর সাহচর্য ত্যাগ করবে না। (সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ., পৃ. ৮৭)।

---

১. আরকামের গৃহে এই চার ভাই খালিদ, আমির, আকিল এবং আয়্যাস সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর হাতে বায়'আত হন। যখন হিজরতের হুকুম হলো, এই চার ভাইই তাঁদের স্ত্রী-সন্তান-সন্তুতি সহ, তাঁদের আত্মীয়-স্বজন কেউই মক্কায় বাকী ছিলেন না, ঘরে তালা লাগিয়ে মদীনায় যাত্রা করেন এবং রিফা'আ ইবন আবদুল মুনযির-এর গৃহে অবতরণ করেন (তাবাকাতে ইবন সাদ, ৩খ. পৃ. ২৮২)। আকিলের নাম প্রকৃতপক্ষে গাফিল ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর গাফিল নাম পরিবর্তন করে আকিল রাখেন (ইসাবা, ২খ. পৃ. ২৪৭) প্রথমে আখিরাত বিষয়ে গাফিল (অসতর্ক) ছিলেন, এক্ষণে আকিল (জ্ঞানী) হয়ে গেলেন।

হযরত জাফর ইবন[1] আবূ তালিব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

একদিন হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ইবাদতে মশগুল ছিলেন। হযরত আলী তাঁর ডান পার্শ্বে ছিলেন। ঘটনাক্রমে আবূ তালিব ঐ দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, জাফরও তার সঙ্গে ছিলেন। নবী (সা)-কে যখন তিনি নামাযরত অবস্থায় দেখলেন, তখন জাফরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ওহে পুত্র ! তুমিও আলীর মত তোমার চাচাত ভাইয়ের শক্তিশালী বাহুতে পরিণত হও, আর তার বামপার্শ্বে দাঁড়িয়ে তার সাথে নামাযে শরীক হয়ে যাও (উসদুল গাবা, ১খ. পৃ. ২৮৭)। জাফর প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং একত্রিশ অথবা পঁচিশজন সাহাবার পর ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। (ইসাবা, ১খ. পৃ. ২৩৭)

আফীফ[2] কিন্দী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

আফীফ কিন্দী (রা) হযরত আব্বাস (রা)-এর দোস্ত ছিলেন তিনি আতরের ব্যবসা করতেন। এ সূত্রে তাঁর ইয়েমেনে যাতায়াতও ছিল। আফীফ কিন্দী বলেন, একবার আমি হযরত আব্বাসের সাথে মিনায় ছিলাম। সে সময় এক ব্যক্তি এলো এবং খুবই উত্তমরূপে উযূ করলো। অতঃপর নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেল। এরপর একজন স্ত্রীলোক এলো এবং একইভাবে উযূ করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। এরপর একটি এগার বছর বয়স্ক বালক এলো এবং একইভাবে উযূ করে তাঁর পাশে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। আমি আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কোন্ ধর্ম ? হযরত আব্বাস বললেন, এটা আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর ধর্ম, যিনি বলেন, আল্লাহ তাকে তাঁর রাসূল করে প্রেরণ করেছেন। আর এ বালক আলী ইবন আবূ তালিবও আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, যে ঐ ধর্মের অনুসারী এবং ঐ স্ত্রীলোক মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহর স্ত্রী। এরপর আফীফ ইসলাম গ্রহণ করেন। আর তিনি এরূপ বলতেন যে আহা, আমি যদি চতুর্থ মুসলমান হতাম! (উয়ূনুল আসার)। হাফিয ইবন আবদুল বার বলেন, এ হাদীসটি খুবই উত্তম এবং এর হাসান হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। হাফিয আসকালানী বলেন, এ হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর তারিখে এবং বাগাবী ও ইবন মান্দাও উল্লেখ করেছেন। এতে অতিরিক্ত এটাও আছে যে, হযরত আব্বাস এও

---

১. তিনি হযরত আলী (রা)-এর সাক্ষাৎ ভ্রাতা এবং বয়সে আলী থেকে দশ বছর বড় ছিলেন। আবিসিনিয়ার শাসক নাজ্জাশী তাঁর হাতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মুতার যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেন, এ যুদ্ধে তাঁর পবিত্র দেহে নয়টিরও বেশি যখম হয়েছিল। বিস্তারিত বর্ণনা ইনশা আল্লাহ মুতার যুদ্ধ অধ্যায়ে দেয়া হবে। (ইসাবা)।

২. আফীফ প্রকৃতপক্ষে উপাধি। হাফিয (আসকালানী) বলেন, তাঁর প্রকৃত নাম শারাহীল, নিষ্পাপ ও পবিত্রতার দরুন আফীফ উপাধিতে ভূষিত হন। কাজেই হযরত আফীফের কবিতা-সমূহের মধ্যে একটি কবিতা এটাও যে, وقالت لى حلم النصابى قلت عففت عما تعلمينا "সে আমাকে খেল-তামাশার দিকে আহ্বান করে, আমি বললাম, তুমি তো আমার পরহেযগারী ও পবিত্রতা সম্বন্ধে জানই।" (ইসাবা, ২খ. পৃ. ৪৮৭)।

বলেছেন, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আরো বলে যে, রোম ও পারস্যের ধনভাণ্ডারও তাঁর হাতে বিজিত হবে (ইসাবা, ২খ. পৃ. ৪৮৭; আফীফ কিন্দীর জীবন চরিত)।

হযরত তালহা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত তালহা বলেন, আমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে বসরা গিয়েছিলাম। একদিন আমি বসরার বাজারে ছিলাম, এ সময়ে এক দরবেশ তার উপাসনা গৃহ থেকে উচ্চৈঃস্বরে বলছিল, জিজ্ঞেস করে দেখ, এ লোকদের মধ্যে পবিত্র মক্কায় বসবাসকারী কেউ নেই তো? তালহা বললেন, আমি পবিত্র মক্কায় বাসকারী। দরবেশ বলল, আহমদ (সা) কি প্রকাশিত হয়েছেন? আমি বললাম, কোন্ আহমদ (সা)? দরবেশ বলল, আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিবের পুত্র, এ মাস তাঁর প্রকাশ পাওয়ার মাস, মক্কা মুকাররমায় প্রকাশ পাবেন, একটি প্রস্তরময় খেজুর বাগানবিশিষ্ট স্থানের দিকে হিজরত করবেন। তিনিই শেষ নবী। দেখ, তুমি পিছে পড়ো না। দরবেশের সাথে এ ধরনের কথোপকথনের দ্বারা আমার অন্তরে বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। সত্বর মক্কায় ফিরে গেলাম এবং লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, নতুন কিছু ঘটেছে কি ? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, আল-আমিন মুহাম্মদ নবূওয়াতের দাবি করেছেন এবং ইবন আবূ কুহাফা অর্থাৎ হযরত আবূ বকর তাঁকে সমর্থন করেছেন। আমি শীঘ্র আবূ বকরের নিকট উপস্থিত হলাম। আবূ বকর আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়েই আমি ইসলাম গ্রহণে ধন্য হলাম এবং ঐ দরবেশের ঘটনা পুরোপুরি বর্ণনা করলাম। [ইসাবা, ২খ. পৃ. ২২৯, হযরত তালহা (রা)-এর জীবন চরিত]।

হযরত সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের তিন রাত্রি পূর্বে এ স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি যেন ঘুটঘুটে ভীষণ অন্ধকারে আছি। অন্ধকারের কারণে কোন কিছুই আমার নজরে আসছে না। হঠাৎ একটি চন্দ্র উদিত হলো। আমি এর পিছু নিয়ে দেখলাম যে, যায়দ ইবন হারিসা, আলী এবং আবূ বকর ঐ নূরের প্রতি আমার চেয়ে অগ্রগামী। আমি হযরতের খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং আরয করলাম, আপনি কিসের প্রতি আহ্বান জানান ? তিনি ইরশাদ করলেন, আল্লাহর একত্ব এবং আমার রাসূল হওয়ার প্রতি সাক্ষ্যদানের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি। আমি কালেমা শাহাদত পাঠ করলাম। (ইবন আবিদ-দুনইয়া ও ইবন আসাকির সূত্রে খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১২২)।

হযরত খালিদ ইবন সাঈদ ইবন আস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

তিনি প্রথম যুগের ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে চতুর্থ অথবা পঞ্চম মুসলমান[1] ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেন, (তিনি বলেন ঃ) আমি যেন প্রচণ্ড

---

১. ইসাবা, ১খ. পৃ. ৪০৬।

অগ্নি প্রজ্জ্বলিত একটি গর্তের কিনারে দাঁড়িয়ে আছি। আমার পিতা সাঈদ আমাকে ঐ গর্তে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার ইচ্ছা করছে, হঠাৎ করে রাসূলুল্লাহ (সা) এসে পড়লেন এবং আমার কোমর ধরে সরিয়ে নিলেন। ঘুম থেকে জেগে আমি কসম খেয়ে বললাম, আল্লাহর কসম, এ স্বপ্ন সত্য।

এরপর আমি হযরত আবূ বকরের নিকট এলাম এবং স্বপ্ন খুলে বললাম। আবূ বকর বললেন, আল্লাহ তোমার জন্য মঙ্গলের ইচ্ছা করেছেন, তিনি আল্লাহর রাসূল। তাঁর অনুসরণ কর এবং ইসলাম কবূল কর। ইনশা আল্লাহ তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ করবে এবং ইসলামে প্রবেশ করবে। আর ইসলামই তোমাকে অগ্নিতে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তোমার পিতা অগ্নিতে প্রবেশ করবে। অতঃপর আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং আরয করলাম, হে মুহাম্মদ (সা) ! আপনি কিসের প্রতি আহ্বান করেন ? তিনি বললেন :

ادعوك الى الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله تخلع ما كنت عليه من عبادة حجر لا يضرو ولا ينفع ولا يدرى من عبده ممن لم يعبده

"আমি তোমাকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করি, যাঁর কোন শরীক নেই আর মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আর আমি তোমাকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, মূর্তিপূজা ছেড়ে দাও[১], এটা কোন উপকারও করতে পারে না আর কোন ক্ষতিও করতে পারে না। ওরা জানতেও পারে না যে, কে ওদের পূজা করলো আর কে পূজা করলো না।"

খালিদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক এবং আপনি সত্য রাসূল। আমি ইসলামে শামিল হয়ে গেলাম। আমার পিতা যখন আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পেলেন, তখনই আমাকে এমন মার দিলেন যে, আমার মাথা যখম হয়ে গেল এমনকি একটি ছড়ি আমার মাথায় ভেঙে ফেললেন, অতঃপর বললেন, তুই মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণ করিস! পুরো সমাজ যার বিরোধী। সে আমাদের উপাস্যদের খারাপ বলে এবং আমাদের পিতা-পিতামহদেরকে আহমক ও মূর্খ বলে? খালিদ বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, আল্লাহর শপথ, মুহাম্মদ (সা) সম্পূর্ণ সত্য সঠিক কথাই বলেন।

এ কথা শুনে আমার পিতার রাগ আরো বেড়ে গেল। তিনি আমাকে খুবই কটু-কাটব্য করলেন, বকুনি দিলেন এবং বললেন, রে মূর্খ ! তুই আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা। আল্লাহর কসম, আমি তোর খানাপিনা বন্ধ করে দেব।

---

১. তাওহীদ ও রিসালাতের ঘোষণার পর কুফর ও শিরক থেকে পৃথক হওয়ার হুকুম দেয়া দ্বারা কুফরের প্রতি অনীহা ও অপসন্দের ইঙ্গিত দেয় যা ইসলাম ও ঈমানের জন্য শর্ত, আমরা শীঘ্রই এ বিষয়ে বর্ণনা করব।

আমি বললাম, তুমি যদি আমার খানাপিনা বন্ধ করে দাও, তখন আল্লাহ তা'আলাই আমাকে রিযক দান করবেন। এর ফলে পিতা আমাকে ঘর থেকে বের করে দিলেন এবং অন্য পুত্রদের বললেন, কেউ যেন ওর সাথে কথা না বলে। যে কথা বলবে, তার সাথেও এ ব্যবহারই করা হবে। খালিদ নিজ পিতার আশ্রয় ছেড়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আশ্রয়ে এসে গেলেন। তিনি (সা) খালিদকে খুবই সমীহ করতেন।[১]

হাফিয আসকালানীও 'ইসাবায়' এ ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। সাধারণত মানুষ কারো আশ্রয় ছেড়ে অপমানিত ও অপদস্থ হয় না; কিন্তু সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর আশ্রয় ছেড়ে যদি অন্যত্র কোথাও চলে যায়, তা হলে সে সম্মান পেতে পারে না।

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ এ আয়াত দ্বারা প্রকাশ পায় যে, সম্মান জড়িত থাকে ঈমানের সাথে আর অপমান জড়িত হলো কুফরের সাথে।

عزیز یکه ازدر گهش سرتافت   بهر درکه شد هیچ عزت نه یافت

"পরম প্রভু আল্লাহ্ এমন সম্মানিত সত্তা যে, তাঁর দরবার থেকে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে কোথাও সে আর ইযযত পায় না।"

খালিদ (রা) বলেন, আমার পিতার একবার অসুখ হলে বললেন যে, আল্লাহ্ যদি আমাকে এবারের অসুখ থেকে মুক্তি দেন, তা হলে আমি মক্কায় ঐ খোদার ইবাদত হতে দেব না, মুহাম্মদ (সা) যে খোদার ইবাদত করার কথা বলে।

খালিদ বলেন, এ কথা শুনে আমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করলাম যে, আয় আল্লাহ্, আমার পিতাকে তুমি এ অসুখ থেকে মুক্ত করো না। ফলে ঐ অসুখেই আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেন।[২]

হযরত উসমান ইবন আফফান (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত উসমান বলেন, আমি একবার ঘরে গিয়ে আমার খালা সু'দাকে অন্যদের সাথে বসা অবস্থায় দেখলাম। আমার খালা ভবিষ্যদ্বাণীও করতেন। আমাকে দেখামাত্র বললেন :

ابشرو حییت ثلاثا وترا   ثم ثلاثا وثلاثا اخری

"হে উসমান তোমার জন্য সুসংবাদ ও নিরাপত্তা, তিনবার, তিনবার এবং আরো তিনবার";

ثم باخری لکی تتمم عشرا   لقیت خیرا ووقیت شرا

"আরো একবার যাতে দশ পূর্ণ হয়ে যায়, তুমি কল্যাণের সাথে মিলিত হয়েছ এবং অকল্যাণ থেকে নিরাপদ হয়েছ।"

---

১. আল-মুস্তাদরাক, ৩খ. পৃ. ২৪৮।

২ আল-মুস্তাদরাক, ৩খ. পৃ. ২৪৯।

نكحت والله حصانا زهرا وانت بكر ولقيت بكرا

"আল্লাহর কসম, তুমি এক পবিত্রা সুন্দরী রমণীকে বিয়ে করেছ, তুমি নিজেও আল্লাহর অনুরাগী আর আল্লাহর অনুরাগীর সাথেই বিয়ে হয়েছে।"

এটা শুনে আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হলাম এবং বললাম, খালা, আপনি এসব কি বলছেন ! তখন সু'দা এ কবিতা আবৃত্তি করলেন ঃ

عثمان يا عثمان يا عثمان لك الجمال ولك الشان

"হে উসমান, হে উসমান, হে উসমান ! তোমার জন্য সৌন্দর্য আর তোমার জন্য মর্যাদা",

هذا نبى معه البرهان ارسله بحقه الديان

"তিনি নবী আর তাঁর সাথে রয়েছে নবূয়াতের দলীল প্রমাণ, প্রতিদানদাতা প্রভু তাঁকে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন।"

وجاء التنزيل والفرقان فاتبعه لا تغيابك الاوثان

"তাঁর প্রতি আল্লাহর কালাম অবতীর্ণ হয় এবং তিনি সত্য আর অসত্য পৃথককারী, কাজেই তুমি তাঁরই অনুসরণ কর, যাতে মূর্তি তোমাকে পথভ্রষ্ট না করে।"

আমি বললাম, হে খালা, আপনি এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করছেন, শহরে কোন দিন যার নামও শোনা যায় নি। কিছুই বুঝতে পারছি না। তখন সু'দা বললেন :

محمد بن عبد الله رسول من عند الله جاء بتنزيل الله يدعو الى الله قوله صلاح

ودينه فلاح وامره نجاح ما ينفع الصياح لو وقع الرماح وسلت الصفاح ومدت الرماح

"মুহাম্মদ আবদুল্লাহর পুত্র, আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আল্লাহর পথে আহ্বান করেন, তাঁর বাণী কল্যাণময়, তাঁর দীন হবে সফলকাম, তাঁর নির্দেশ পরিত্রাণের উপায়, তাঁর বিপরীতে তাঁর বিরুদ্ধে যতই তরবারি ও বর্শা চালানো হোক, কারো চিৎকার ও আহ্বান কল্যাণকর হবে না।"

এ পর্যন্ত বলে তিনি উঠে পড়লেন। কিন্তু তার কথা আমার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করলো। ঐ সময় থেকেই আমি চিন্তা-ভাবনায় পড়ে গেলাম। হযরত আবূ বকরের সাথে আমার সুসম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল। কাজেই তাঁর কাছে এসে বসে পড়লাম। আবূ বকর আমাকে চিন্তাযুক্ত দেখে জিজ্ঞেস করলেন, চিন্তিত কেন? আমি নিজ খালার নিকট থেকে যা শুনেছিলাম, তা সবিস্তারে আবূ বকর (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। সব শুনে আবূ বকর (রা) বললেন, মাশাআল্লাহ, হে উসমান ! তুমি খুবই সতর্ক এবং বুদ্ধিমান, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য খুবই বুঝতে পারো। তোমার মত ব্যক্তির হক ও বাতিলের ব্যাপারে সংশয় থাকতে পারে না। ঐ মূর্তিগুলো কি বস্তু যার পূজায় আমাদের সম্প্রদায় নিমগ্ন ? ঐ মূর্তিগুলো কি অন্ধ এবং বধির নয়, যারা শুনতেও পায় না, দেখতেও পায় না; আর না কারো ক্ষতি করতে পারে, না উপকার। হযরত

উসমান বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম, অবশ্যই ব্যাপারটা তো সেরকমই, যেমনটি তুমি বলছো। এতে আবূ বকর বললেন, আল্লাহর কসম, তোমার খালা বিলকুল সত্য কথাই বলেছেন। তিনি মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ, আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তাঁকে নিজ পয়গাম দিয়ে সমগ্র সৃষ্টির জন্য প্রেরণ করেছেন। তুমি যদি ভাল মনে কর, তা হলে তাঁর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর বাণী শুনতে পার। এসব কথাবার্তাই চলছিল, ঠিক এ সময় দেখলাম, রাসূল (সা) ঐদিক দিয়েই যাচ্ছেন আর হযরত আলী তাঁর সঙ্গী ছিলেন। কি একটা কাপড় তাঁর হাতে ছিল। হযরত আবূ বকর তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং চুপে চুপে তাঁর কানে কি যেন বললেন। তিনি তাশরীফ আনলেন এবং বসে পড়লেন। এরপর উসমানের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, ওহে উসমান, আল্লাহ তোমাকে জান্নাতের দাওয়াত দিচ্ছেন, তুমি জান্নাতের দাওয়াত কবূল কর। আর আমি আল্লাহর রাসূল, তোমার প্রতি এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

হযরত উসমান (রা) বলেন :

فوالله ما تمالكت حين سمعت قوله ان اسلمت واشهدت ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله

"আল্লাহর কসম, আপনার কথা শোনামাত্রই অজ্ঞাতসারে ও অবলীলায় ইসলাম দ্রুত আমার অন্তরে এসে গেল, আর মুখে জারী হয়ে গেল এই কালেমা –

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

در دل هر امتی کز حق مزه است　　　روئ وآواز پیمبر معجزه است

"প্রত্যেক জাতির অন্তরে সত্যের স্বাদ বিদ্যমান থাকে, পয়গম্বরের চেহারা ও আওয়ায তার জন্য মু'জিযা।"

এর অল্প কিছুদিন পরেই তাঁর শাহযাদী হযরত রুকাইয়া (রা) আমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। সবাই এ বিয়েকে স্বাগত ও সাধুবাদ জানালেন। আর আমার খালা সু'দা তখন এ কবিতা পাঠ করলেন :

هدى الله عثمان الصفى بقوله　　　فارشده والله يهدى الى الحق

"আল্লাহ তাঁর বান্দা উসমানকে হিদায়েত দিয়েছেন, আর আল্লাহই সত্যের পথ প্রদর্শন করেন।"

فتابع بارائ السديد محمدا　　　وكان ابن اروى لايصد عن الحق

"অতঃপর উসমান নিজ সঠিক সিদ্ধান্তে মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণ করলো, আরওয়ার পুত্র সঠিক চিন্তা এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করলো।" অর্থাৎ সে হককে অস্বীকার করলো না। (আরওয়া বিনতে কারীয হযরত উসমানের মাতার নাম)।

وانكحه المبعوث احدى بناته فكان كبدر مازج الشمس فى الافق

"আরর সেই প্রেরিত পয়গাম্বর (সা) নিজের এক কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দিয়েছে, সত্য সত্যই তা এমন জুটি, যেন পূর্ণিমার চাঁদ সূর্যের সাথে একত্রিত হয়েছে।"

فدى لم يا ابن الهاشميين مهجتى فانت امين الله ارسلت للخلق

"ওহে হাশিমের পুত্র মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (সা) ! আমার জীবন আপনার প্রতি হোক উৎসর্গিত, আপনি তো আল্লাহর আমীন এবং সৃষ্টির হিদায়তের জন্য প্রেরিত।"[১]

হযরত উসমান ইবন আফফান (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের দু'দিন পর হযরত আবূ বকর (রা) নিম্নের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সাথে নিয়ে রাসূল (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন ঃ

উসমান ইবন মাযউন[২], আবূ উবায়দা[৩] ইবনুল জাররাহ, আবদুর রহমান ইবন আউফ, আবূ সালমা[৪] ইবন আবদুল আসাদ, আরকাম ইবন আরকাম, এঁরা সবাই একই মজলিসে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। (রিয়াযুন নাযরাহ, ১খ. পৃ. ৮৫) ইয়াযীদ ইবন রুমান থেকে বর্ণিত আছে যে, উসমান ইবন মাযউন, উবায়দা ইবনুল হারিস, আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ, আবদুর রহমান ইবন আউফ, আবূ সালমা ইবন আবদুল আসাদ এঁরা সবাই মিলে নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। তিনি (সা) তাদের সামনে ইসলাম পেশ করলেন এবং ইসলামের শর্তাবলী সম্পর্কে অবহিত ও সাবধান করলেন। ফলে একই সময়ে এঁরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং নবী (সা) আরকামের গৃহে অবস্থান গ্রহণের পূর্বে এঁরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন।[৫]

---

১. আল-ইসাবা, ১খ. পৃ. ৩২৭।

২. হযরত উসমান ইবন মাযউন (রা) জাহিলী যুগ থেকেই শারাবকে অপসন্দ ও ঘৃণা করতেন এবং বলতেন যে, আমি এমন বস্তু কখনই পান করব না, যা জ্ঞানকে অবলুপ্ত করে দেয় এবং আমার চেয়ে নিম্নস্তরের মানুষকে আমার প্রতি হাসার সুযোগ করে দেয়, আর বেহুঁশ অবস্থায় এমন ব্যক্তির সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিই যাকে আমি অপসন্দ করি। যখন শারাব নিষিদ্ধের ব্যাপারে সূরা মায়িদার আয়াত নাযিল হলো, তখন এক ব্যক্তি এসে তাঁকে ঐ আয়াত শোনালেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ শারাবকে হালাক ও বরবাদ করুন, আমার দৃষ্টি প্রথম থেকেই এর বিরোধী ছিল। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৩খ. পৃ. ২৮৬, প্রথম অংশ)।

৩. আবূ উবায়দা ছিল তাঁর ডাকনাম, প্রকৃত নাম ছিল আমির, আর উপাধি ছিল আমীনুল উম্মত। প্রথম যুগের মুসলমান ও আশারা মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইনি দু'দফা হিজরত করেন, একবার আবিসিনিয়ায়, আর একবার মদীনায়। তিনি সমস্ত জিহাদে শরীক হয়েছিলেন। হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালে সিরীয় বাহিনীর সিপাহসালার ছিলেন। ১৮ হিজরীতে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে সিরিয়ায় ইনতিকাল করেন। উমর (রা) ইনতিকালের সময় বলেছিলেন, যদি আবূ উবায়দা জীবিত থাকতেন, তবে তাকেই খলীফা বানাতাম।

৪. হযরত আবূ সালমা হযরত (সা)-এর দুধভ্রাতা এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর প্রথম স্বামী ছিলেন।

৫. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৩খ., পৃ. ২৮৬।

হযরত আম্মার ও হযরত সুহায়ব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

আম্মার ইবন ইয়াসির বলেন, আরকামের গৃহের দরজায় সুহায়ব ইবন সিনানের সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ভিতরে ছিলেন। আমি সুহায়বকে জিজ্ঞেস করলাম, উদ্দেশ্যটা কি ? সুহায়বও আমাকে একই প্রশ্ন করলেন, তোমার কি ইচ্ছা ? আমি বললাম, আমার ইচ্ছা হলো তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তব্য শুনব। সুতরাং আমরা দু'জনেই তাঁর খিদমতে হাযির হলে তিনি আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং আমরা ইসলাম গ্রহণে ধন্য হই।[১]

হযরত আমর ইবন আবাসা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আমর ইবন আবাসা (রা) বলেন, শুরু থেকেই আমার মূর্তি পূজার প্রতি ঘৃণা ও অনীহা ছিল। আর এটা বুঝতাম যে, এ মূর্তি উপকার অপকার কোনকিছু করার আদৌ অধিকারী নয়, এ কেবলই পাথর। আমি আহলে কিতাবের আলিমদের মধ্যে এক আলিমের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সর্ব প্রথম উন্নত ও উত্তম ধর্ম কোনটি ? ঐ আলিম বললেন, মক্কায় এক ব্যক্তি প্রকাশিত হবেন, মূর্তিপূজা থেকে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করবেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম ও উন্নত দীন তিনিই আনয়ন করবেন। তুমি যদি তাঁকে পাও, তবে অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করবে। আমর ইবন আবাসা বলেন, ঐ সময় থেকে সকল সময় কেবল আমার মক্কার কথাই খেয়ালে থাকত, ছোট বড় সবার কাছেই মক্কার খবর জিজ্ঞেস করতাম। শেষ পর্যন্ত আমি হযরত (সা)-এর সংবাদ পেলাম। এ বর্ণনা 'মু'জামে তাবারানী' এবং 'দালাইলে আবূ নুয়াইমে' উদ্ধৃত আছে। আমর ইবন আবাসা (রা)-এর বর্ণনায়, তাঁর খবর পাওয়ার পর আমি মক্কা মুকাররামায় গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং অত্যন্ত গোপনে তাঁর সাথে মিলিত হলাম। আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নবী। বললাম, আল্লাহই কি আপনাকে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ আপনাকে কি পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছেন? তিনি (সা) ইরশাদ করলেন, আল্লাহকে এক বলে মানা হোক, তাঁর সাথে কোন শরীক না করা হোক, মূর্তিগুলোকে ভাঙা হোক আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা হোক। আমি বললাম, এ ব্যাপারে কে আপনার সাথে আছেন? তিনি বললেন, এক আযাদ আর এক গোলাম, অর্থাৎ হযরত আবূ বকর ও হযরত বিলাল (রা)। আমি আরয করলাম, আমিও আপনার অনুগত, অনুসারী ও সাহায্যকারী হতে চাই। তিনি বললেন, এ সময়ে তুমি নিজ দেশে ফিরে যাও, যখন আমার বিজয়ের সংবাদ জানতে পারবে, তখন আসবে। হযরত আমর ইবন আবাসা বলেন, আমি মুসলমান হয়ে নিজ দেশে ফিরে এলাম এবং তাঁর সংবাদাদি নিতে থাকলাম। যখন তিনি (সা) হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ নিলেন, তখন আমি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৩খ., পৃ. ২১২।

(সা)! আমাকে চিনতে পেরেছেন কি? তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, তুমি তো ঐ ব্যক্তি, যে মক্কায় আমার সাথে সাক্ষাত করেছিলে। আমি আরয করলাম, জি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ; আমাকে কিছু তালিম দিন,... (হাদীসের শেষ পর্যন্ত)। সম্পূর্ণ হাদীস মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, আর এ হাদীস সহীহ মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে।[1]

হযরত আবূ যর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবূ যর গিফারী (রা)-এর নিকট যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবূয়াত লাভের খবর পৌঁছলো, তখন তিনি নিজ ভ্রাতা উনায়সকে[2] বললেন, মক্কায় যাও এবং ঐ ব্যক্তির খবর নিয়ে এসো যিনি দাবি করেন, আমি আল্লাহর নবী এবং আসমান থেকে আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়। তাঁর বক্তব্যও শুনবে। আবূ যর-এর পরামর্শ অনুসারে উনায়স মক্কায় আগমন করেন এবং তাঁর সাথে মিলিত হয়ে ফিরে গেলেন। আবূ যর জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর নিয়ে এসেছ ? উনায়স বললেন, যখন আমি মক্কায় পৌঁছলাম, তখন কেউ তাঁকে মিথ্যাবাদী, জাদুকর বলছিল আর কেউ গল্পকার ও কবি বলছিল। কিন্তু আল্লাহর কসম, তিনি কবিও নন, আর গল্পকারও নন। উনায়স নিজে একজন খুব বড় কবি ছিলেন। এ জন্যে তিনি বললেন, আমি গল্পকারের কথাও শুনেছি, কিন্তু তাঁর বক্তব্য গল্পকারদের বক্তব্যের অনুরূপ নয়। তাঁর বক্তব্যকে কবিতার ওজনে রেখে দেখেছি, তা কবিতাও নয়। আল্লাহর কসম, তিনি সম্পূর্ণ সত্যবাদী। তিনি আরো বললেন :

رآيته يامر بالخير و ينهى عن الشر ورايته يامر بمكارم الاخلاق وكلاما ما هو بالشعر

"ঐ ব্যক্তিকে আমি কেবল কল্যাণ এবং উত্তম কাজের নির্দেশ দিতে আর খারাপ ও অকল্যাণকর কাজ থেকে নিষেধ করতে দেখেছি। উত্তম ও পবিত্রতম চরিত্র গঠনের নির্দেশ দিতে দেখেছি। আর তাঁর থেকে যে বাক্য শুনেছি, কবিতা বলতে যা বুঝায় তার সাথে এর কোন মিল নেই।"

আবূ যর এ সব শুনে বললেন, অন্তরের পূর্ণ প্রশান্তি হলো না। সম্ভবত আবূ যর তাঁর অবস্থা ও ঘটনাবলী পুরোপুরি শুনতে চেয়েছিলেন। এত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তাঁর জন্য যথেষ্ট ও প্রশান্তিদায়ক হলো না। এ জন্যে আবূ যর নিজেই কিছু পাথেয় এবং পানির মশক নিয়ে মক্কায় রওয়ানা হন এবং হযরত আলীর মাধ্যমে দরবারে রিসালতে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁর বক্তব্য শোনেন ও তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হেরেম শরীফে পৌঁছে স্বীয় ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। ফলে কাফিরেরা তাঁকে এত বেশি মারধর করে যে, যমীনে শুইয়ে দেয়। হযরত আব্বাস এসে তাঁকে উদ্ধার

---

১. আল-ইসাবা, ১খ. পৃ. ৬।

২ উনায়স আবূ যরব থেকে বড় ছিলেন; (ইসাবা, ১খ., পৃ. ৭৬।

করেন। রাসূল (সা) বললেন, এখন নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকেও এ ব্যাপারে অবহিত কর। আমাদের বিজয়ের সংবাদ পেলে ফিরে আসবে। আবূ যর (রা) ফিরে যান এবং দু'ভাই মিলে তাদের মাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। মাতা অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে এ দাওয়াত কবূল করেন। এরপর তারা সম্প্রদায়ের লোকদের দাওয়াত দেন। সম্প্রদায়ের অর্ধেক লোক ঐ সময়েই ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

দ্রষ্টব্য : হযরত আমর ইবন আবাসা এবং হযরত আবূ যর (রা)-এর এ ঘটনা দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হুযূর (সা)-এর আল্লাহর দীনের বিকাশ এবং বিজয় সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অন্যথায় এ ধরনের সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় বিজয়ের প্রত্যাশা ওহীর সংবাদ ছাড়া অসম্ভব।

আরকামের গৃহে মুসলমানদের জমায়েত

যখন এভাবে আস্তে আস্তে জনগণ ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করলেন, তখন মুসলমানদের একটি ছোট দল তৈরি হলো। সবাই তখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, হযরত আরকাম[২] (রা)-এর গৃহে একত্রিত হওয়া যাক। হযরত আরকাম প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে সপ্তম অথবা দশম অবস্থানে ছিলেন আর তাঁর গৃহটি ছিল সাফা পাহাড়ে। হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানগণ সেখানে একত্রিত হতেন। হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা যেখানে ইচ্ছা, একত্রিত হতেন।[৩]

হাফিয ইরাকী (র) বলেন :

واتخذ النبى دار الارقم   للصحب مستخفين عن قومهم
وقيل كانوا يخرجون تقرى   الى للشعاب الصلوة سرا
حتى مضت ثلثة سنينا   واظهر الرحمن بعد الدنيا
وصدع النبى جهرا معلنا   اذ نزلت فاصدع بما فما ونى
وانذر العشائر التى ذكر   يجمعهم اذ نزلت وانذر

"নবী (সা) আরকামের গৃহে অবস্থান নেন, সঙ্গীদের জন্য—তাদের সম্প্রদায় থেকে গোপন রাখার জন্য, বলা হয় তারা গোপনে বের হন, গোপনে সালাত আদায় করেন, এমনকি তিন বছর চলে গেল, দয়াময় আল্লাহ এরপর পৃথিবীতে তাদের প্রকাশ ঘটালেন, নবী (সা) প্রকাশ্যে আহ্বান শুরু করলেন, যখন নাযিল হলো فاصدع بما تؤمر, "যে ব্যাপারে তোমাকে আদেশ করা হয়, সেটা প্রকাশ্যে জানিয়ে দাও।"

১. আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৬২।

২. হযরত আরকাম (রা) বদর, উহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) এর খিলাফতকালে ৫৫ হিজরীতে ইনতিকাল করেন।

৩. আল-ইসাবা, ১খ., পৃ. ২৮।

তিনি নিকটজনদের একত্র করে সকলকে সতর্ক করলেন। যখন নাযিল হলো وانـذر।"

দাওয়াতের ঘোষণা

তিন বৎসর পর্যন্ত হযরত (সা) গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন এবং মানুষ ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকলো। তিন বৎসর পর এ নির্দেশ নাযিল হলো যে, প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিন।

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ

"যে বিষয়ে আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা পরিষ্কার ঘোষণা করুন এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না।"

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

"আর সর্বপ্রথম আপনার নিকটাত্মীয়দের কুফর ও শিরকের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করুন।"

وَاخْفِضْ جُنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"আর যারা ঈমান এ আপনার আনুগত্য করছে, তাদের সাথে নম্র ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করুন।"

وَقُلْ اِنِّىْ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ

"আর আপনি এ ঘোষণা দিন যে, আমি প্রকাশ্যে সতর্ককারী।"

অতএব তিনি সাফা পাহাড়ে উঠলেন এবং কুরায়শ সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকলেন। যখন সবাই একত্রিত হলো, তিনি ইরশাদ করলেন, যদি আমি তোমাদের এ খবর দেই যে, পাহাড়ের অপর প্রান্তে একদল সৈন্য জমায়েত হয়েছে যারা তোমাদের উপর হামলার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে, তবে কি তা সত্য মনে করবে ? সবাই একবাক্যে বলল, অবশ্যই; কেননা আমরা তো আপনার মধ্যে সত্যবাদিতা ছাড়া কিছু দেখিনি। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি (অর্থাৎ মূর্তিপূজার শিরকী গুনাহর শাস্তি। তোমাদের ইলআহ্ শুধু একজন–ইলাহুকুম ইলাহুল ওয়াহিদ)। আবূ লাহাব তখন গোসসায় জাবলে উঠলো; বলল, তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি এজন্যে আমাদেরকে একত্রিত করেছ ? এ প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্ রাগান্বিত হয়ে সাথে সাথে এ মর্মে ওহী পাঠালেন যে, 'তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিউঁ ওয়া তাব্ব...' যার অর্থ আবূ ল াহাব ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক..(শেষ পর্যন্ত) সূরা নাযিল হয় (বুখারী)।

ইসলামের দাওয়াত এবং ভোজের নিমন্ত্রণ

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন যে, যখন وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (আর সর্বপ্রথম আপনার নিকটাত্মীয়দের কুফর ও শিরকের শাস্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার ও

ভীতি প্রদর্শন করুন) আয়াতটি নাযিল হলো, তখন হযরত (সা) আমাকে বললেন, এক সা' শস্য, ছাগলের একটি রান ও এক পেয়ালা দুধ সংগ্রহ কর এবং এরপর আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের একত্র কর। আমি তাঁর নির্দেশ পালন করি। কমবেশি চল্লিশ ব্যক্তি একত্রিত হলো; যাদের মধ্যে তাঁর পিতৃব্য আবূ তালিব, হামযা, আব্বাস এবং আবূ লাহাবও শামিল ছিলেন। তিনি এক পেয়ালা গোশত তাঁর পবিত্র দাঁত দ্বারা চিরে ঐ পেয়ালাতেই রাখলেন এবং বললেন, আল্লাহর নাম নিয়ে সকলে আহার করুন। ঐ এক পেয়ালা গোশতে সবাই খেয়ে তৃপ্ত হলেন। এরপরও কিছু বেঁচে গেল। আসলে ঐ খাবার এতটুকু ছিল যে, একজনের জন্য তা যথেষ্ট হতে পারতো। এরপর আমাকে হুকুম দিলেন, দুধের পেয়ালা আন এবং সবাইকে পান করাও। ঐ এক পেয়ালা দুধে সবাই পরিতৃপ্ত হলেন অথচ এক পেয়ালা দুধ এত অধিক পরিমাণ ছিল না। এক পেয়ালা দুধ তো একজনই খেতে পারে। যা হোক, এভাবে চল্লিশ ব্যক্তি যখন খাওয়া শেষ করলেন, তখন তিনি (সা) কিছু বলার ইচ্ছা করলেন, আবূ লাহাব তখন বলে উঠলো, লোক সকল! উঠে পড়, মুহম্মদ তো আজ তোমাদের খাবারের উপর জাদু করেছে। এমন জাদু, যা এর আগে কখনো দেখিইনি। এ কথা বলাতে লোকজন উঠে পড়তে শুরু করলো আর তাঁর কিছু বলার সুযোগই হলো না। দ্বিতীয় দিন তিনি একইভাবে হযরত আলীকে খাবারের আয়োজন করতে নির্দেশ দিলেন। এমনিভাবে দ্বিতীয় দিনও লোকজন একত্রিত হলো। আহার শেষে তিনি (সা) বললেন, যে বস্তুটি আমি এবার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি, এর চেয়ে উত্তম কোন বস্তু এর পূর্বে কোন ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থাপন করেনি। আমি আপনাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সংবাদ নিয়ে এসেছি। (ইবন ইসহাক, বায়হাকী ও আবূ নুয়াইম থেকে উদ্ধৃত)।[১]

আবূ লাহাব যদিও সম্পর্কে তাঁর চাচা ছিলেন, কিন্তু সত্যায়ন, আত্মোৎসর্গ ও সত্যিকারের ভালবাসায় হযরত আবূ বকর (রা) সবার শীর্ষে ছিলেন। একইভাবে মিথ্যা প্রমাণ, কষ্ট দেয়া, বিদ্রূপ করা, হিংসা এবং শত্রুতায় আবূ লাহাব ছিল সবার শীর্ষে। আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত দিন। এ শত্রুতার কারণেই নবী (সা)-এর দু' কন্যা অর্থাৎ হযরত রুকাইয়া ও হযরত উম্মে কুলসুম (রা) নবূয়াত লাভের পূর্বে আবূ লাহাব পুত্র উতবা ও উতায়বার স্ত্রী ছিলেন। আবূ লাহাব হযরতের অন্তরে কষ্ট দেয়ার জন্যে নিজ পুত্রদের থেকে উভয়ের তালাক নিয়ে নেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিরাট রহমত। এরা দু'জনই পর্যায়ক্রমে হযরত উসমান (রা)-এর সহধর্মিণী হন এবং হযরত উসমান যুন-নূরাইন উপাধিতে ভূষিত হন। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর (আ)-এর সাহাবীগণের মধ্যে একমাত্র হযরত উসমান (রা) এমন সাহাবী, যিনি নবীর দু' সাহেবযাদীকে পর্যায়ক্রমে (একের মৃত্যুর পর

---

১. আল-খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ১২৩।

অপরকে) বিবাহ করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং 'যুন-নূরাইন' উপাধিতে আখ্যায়িত হন। যত দিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) জনগণকে শুধু ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কুরায়শ তাঁর কোন প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু যখনই প্রকাশ্য ঘোষণা, মূর্তিপূজার অসারতা ও খারাবী বর্ণনা করতে শুরু করলেন এবং কুফর ও শিরক থেকে লোকজনকে বারণ করতে লাগলেন, তখনই কুরায়শগণ নবী (সা)-এর প্রচণ্ড বিরোধিতা ও শত্রুতা শুরু করে। কিন্তু আবূ তালিব তাঁর সহায় ও সাহায্যকারী হিসেবে থেকে যান।

একবার কুরায়শের কয়েক ব্যক্তি একত্র হয়ে আবূ তালিবের কাছে এসে বলল, আপনার ভাইপো আমাদের প্রতিমাগুলোকে মন্দ বলে, এগুলোর সমালোচনা করে, আমাদের ধর্মকে খারাপ আর আমাদেরকে আহমক, মূর্খ এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পথভ্রষ্ট বলছে। আপনি হয় তাকে নিষেধ করুন অথবা তার ও আমাদের মধ্যে কিছু হলে আপনি আসবেন না, আমরা নিজেরাই বোঝাপড়া করব। আবূ তালিব তাদেরকে সুসম্পর্ক ও নম্রতা দিয়ে বশীভূত করেন। আর হযরত (সা) একইভাবে তাওহীদের দাওয়াত এবং কুফর ও শিরকের বিরুদ্ধাচরণে মশগুল থাকলেন। এতে আবূ লাহাব এবং তার সমচিন্তার লোকদের হিংসা ও শত্রুতার আগুনে ঘৃতাহূতির কাজ করল।

ঐসব লোকের একটি দল দ্বিতীয়বার আবূ তালিবের নিকট এলো এবং বলল, আপনার শরাফত ও মর্যাদা আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য, কিন্তু নিজেদের প্রভুদের প্রতি অভিসম্পাত আর পূর্বপুরুষদেরকে আহমক ও মূর্খ বলার বিষয়টি আমরা সহ্য করতে পারি না। আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বারণ করুন, অন্যথায় লড়াই করে আমাদের কোন এক পক্ষ শেষ হয়ে যাবে। এ কথা বলেই তারা চলে গেল। পুরো খান্দান ও সম্প্রদায়ের বিরোধিতা ও শত্রুতা আবূ তালিবের মনকে প্রভাবিত করলো।

যখন হযরত (সা) তাশরীফ আনলেন। আবূ তালিব বললেন, হে প্রিয় বৎস! তোমার সম্প্রদায়ের লোকজন আমার কাছে এসেছিল এবং এইসব বলে গেল। কাজেই তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ কর এবং নিজের প্রতিও একটু নজর দাও। আমার উপর সাধ্যের অতীত বোঝা চাপিও না। আবূ তালিবের এ ধরনের বাক্যালাপে রাসূল (সা)-এর মনে এ ধারণার উদয় হলো যে, হয়ত আবূ তালিব আমার সাহায্য-সহায়তা থেকে বিরত থাকতে চাইছেন। কাজেই তিনি ছলছল নেত্রে ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন, চাচাজান ! আল্লাহর কসম, যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্রও এনে দেয় এবং বলে এ কাজ ছেড়ে দাও, তবুও আমি কখনো তা ছাড়তে পারবো না; যতক্ষণ না আল্লাহ আমার দীনকে বিজয়ী করেন অথবা আমি ধ্বংস হয়ে যাই। এ কথা বলে তিনি কেঁদে ফেলেন এবং উঠে চলে যেতে লাগলেন। আবূ তালিব উচ্চৈস্বরে বললেন, ওহে প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার যা খুশি কর, আমি কখনই তোমাকে শত্রুর হাতে তুলে দেব না।[১]

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৪৭।

সূক্ষ্ম তত্ত্ব : বাহ্যিক দৃষ্টিতে চন্দ্র–সূর্য থেকে কোন বস্তুই উজ্জ্বল ও প্রভাযুক্ত নয়। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের নিকট ঐ প্রকাশ্য নূর, যা মুহাম্মদ রাসূল (সা) পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন, তা ঐ চন্দ্র-সূর্য থেকেও বেশি উজ্জ্বল ও প্রভাময়। মুশরিকগণ এ প্রকাশ্য নূরকে নিভিয়ে দিতে তৎপর, যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِؤُا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلاَّ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

"এরা চায় ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁর নূরকে পূর্ণতায় পৌঁছাবেন যদিও কাফিররা তা অপসন্দ করে।" (সূরা তাওবা : ৩২)

রাসূল (সা) এ জন্যে চন্দ্র-সূর্যের উল্লেখ করে বলেন, যে প্রকাশ্য নূর আমি নিয়ে এসেছি, এর সামনে চন্দ্র ও সূর্যের কোন গুরুত্বই নেই। চন্দ্র ও সূর্যের ঐ প্রকাশ্য নূরের সামনে অণুর সাথে সূর্যের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, ততটুকু সম্পর্কও নেই। কাজেই তোমাদের মত মূর্খের কথা অনুযায়ী আমি উন্নততর নূরকে ছেড়ে তুচ্ছ নূরকে কেন গ্রহণ করব ? আর যেভাবে বাঁ হাতের তুলনায় ডান হাত উন্নত ও উত্তম, তেমনি চন্দ্রের তুলনায় সূর্যও উন্নত ও উত্তম, এ জন্যেই আরব ও আজমের সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধভাষী নবী করীম (সা) সূর্যকে ডান হাতে এবং চন্দ্রকে বাম হাতে রাখার কথা বলেছেন।

বড়ই কাজের কথা

হযরত (সা)-এর কুফর ও শিরক বিরোধী প্রকাশ্য ঘোষণা এবং মূর্তি ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ঘৃণার দরুন তাঁর ও তাঁর সাহাবাদের তীব্র শত্রুতা ও বিরোধিতার মুখে অটল থাকা এ বিষয়েরই প্রকাশ্য প্রমাণ যে, ঈমান এবং ইসলামের জন্য কেবল অন্তরে সত্যায়ন অথবা মৌখিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়, বরং কুফর ও কাফিরী এবং শিরকের বৈশিষ্ট্য ও আনুসঙ্গিকতার বিরোধিতা জরুরী এবং সেগুলো অপসন্দ করাও অত্যাবশ্যক। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ اِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীগণের মধ্যে অবশ্যই একটি অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ রয়েছে। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যার পূজা কর তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো যদি না তোমরা এক আল্লাহ্ বিশ্বাস স্থাপন কর।" (সূরা মুমতাহানা : ৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ

"এটা যখন তার নিকট সুস্পষ্ট হলো যে, সে (আযর) আল্লাহর শত্রু, তখন ইবরাহীম তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল।" (সূরা তাওবা : ১১৪)

এ আয়াত দ্বারা পরিষ্কার প্রকাশ পেল যে, যেভাবে ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু এবং তাঁর রাসূল মুজতবা (সা)-এর প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য ঘোষণা করা আবশ্যিক, ঠিক তেমনিভাবে (ক্ষেত্র বিশেষে) আল্লাহর দুশমনদের সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষের ঘোষণা দেয়াও জরুরী। যেমন তিনি (সা) নবম হিজরীতে হযরত আলী (ক)-কে বিশেষভাবে এজন্যে মক্কায় প্রেরণ করেছিলেন, হজ্জের মৌসুমে যেন তিনি সমগ্র উম্মতের কাছে ঐ ঘোষণা দেন, যা সূরা তাওবায় নাযিল হয়েছিল। এবং হাদীস শরীফে এসেছে ঃ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ "যে ব্যক্তি আল্লাহর মহব্বতে ভালবাসলো এবং আল্লাহর জন্যই বিদ্বেষ পোষণ করলো, সে তার ঈমান পূর্ণ করলো।" আর আল্লাহর প্রতি মহব্বত ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দুশমনদের সাথে পূর্ণ শত্রুতা ও বিদ্বেষভাব পোষণ না করবে। অন্তরে আল্লাহর দুশমনদের প্রতি যতটুকু অনুভূতি থাকে, আল্লাহর মহব্বত অন্তর থেকে ততটুকই খালি থাকে। আল্লাহ তা'আলা কারো জন্যই দুটি অন্তর সৃষ্টি করেননি, কাজেই একটি অন্তরে দুটি পরস্পর বিরোধী বস্তু কিরূপে অবস্থান করবে ? পরিপূর্ণ মু'মিন তো ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেযামন্দির বিপরীতে সারা দুনিয়ার অসন্তুষ্টির বিন্দুমাত্র পরোয়া করে না। اسخطت كل الناس فى ارضائه

মহান পয়গাম্বর (আ)-গণের সুন্নত তথা আদর্শ তো এটাই, যেভাবে তাঁরা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান ও সত্যায়নের আহ্বান জানান, ঠিক তেমনিভাবে কুফর, শিরক ও তাগূতকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও অস্বীকারের আহ্বান জানান। যেমন আল্লাহ বলেন :

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ

"অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" (সূরা নিসা : ৬০)

বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হলে ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) প্রণীত মাকতুবাত,পৃ. ৩২৫, প্রথম দফতর, মাকতুব নং ২৬৬ দেখুন।

কুরায়শগণ যখন দেখলো যে, দু'বার বলা সত্ত্বেও আবূ তালিব নবীজী (সা)-এর সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে কিছুটা নমনীয়, তখন তারা তৃতীয়বার নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে আবূ তালিবের কাছে এলো এবং বলল, আবূ তালিব ! এই যে উমারা ইবন ওলীদ, কুরায়শের খুবই সুন্দর, সুঠাম এবং অনিন্দ্য সুন্দর, খুবই চতুর ও বুদ্ধিমান যুবক, আপনি তাকে গ্রহণ করুন আর তার পরিবর্তে আপনার ভাইপো, আমাদের পুরা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তাকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন, যেন আমরা তাকে হত্যা করে গোটা সম্প্রদায়কে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারি।

আবূ তালিব বললেন, এটা কি করে সম্ভব, আমি আমার প্রতিপালনাধীন পুত্রকে তোমাদের কাছে সোপর্দ করব আর তোমাদের পুত্রকে নিয়ে প্রতিপালন ও দেখাশুনা করব ? আল্লাহর কসম, এটা কখনই হতে পারে না। মুতইম ইবন আদী বলল, হে আবূ তালিব ! আল্লাহর শপথ, এই বিপদ থেকে উদ্ধারের লক্ষ্যে আপনার সম্প্রদায় একটা বিজ্ঞজনোচিত ইনসাফপূর্ণ রায় এবং একটা উত্তম পন্থা আপনার সামনে পেশ করেছিল, কিন্তু আপনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। আবূ তালিব বললেন, "আল্লাহর কসম, আমার সম্প্রদায় আমার সাথে ইনসাফ করেনি। তোমাদের যা করার থাকে, কর।" কুরায়শগণ আবূ তালিব থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে প্রকাশ্য শত্রুতা করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। সম্প্রদায়ের মাঝে যেসব নিঃস্ব অসহায় মুসলমান ছিল, তারা তাদের উপর নানা ধরনের যুলুম নির্যাতন চালাতে লাগল। আবূ তালিব বনী হাশিম এবং বনী মুত্তালিবকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহায্য সহায়তা করার আহ্বান জানালেন। আবূ তালিবের এ আহ্বানে সমগ্র বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব সাড়া দিল। বনী হাশিম শাখা গোত্রের আবূ লাহাবই কেবল দুশমনদের সাথে শরীক হলো (উয়ূনুল আসার)।

রবীয়া ইবন আব্বাদ (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে উকায এবং যুল-মাজায বাজারে দেখেছি যে, তিনি লোকদের বলছেন : يايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا "হে লোক সকল ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল, সাফল্য অর্জন করবে।" আর তাঁর পিছে পিছে একটা ট্যাড়া চোখবিশিষ্ট ব্যক্তি বলতে বলতে যাচ্ছে যে, এ ব্যক্তি সাবী (বেদীন) এবং মিথ্যাবাদী। আমি লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম, লোকটি কে ? জানা গেল যে, তাঁরই চাচা আবূ লাহাব। হাদীসটি 'মুসনাদে আহমদ' ও 'মু'জামে তাবারানী'তে উল্লেখ আছে। ইসাবায় রবী' ইবন আব্বাদ-এর জীবনী এবং হাফিয ইবন সায়্যিদুন নাসও নিজ নিজ সনদে এ হাদীস উল্লেখ করেছেন। তবে এতে রয়েছে তিনি লোকদেরকে বলছেন :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَعْبُدُوْنَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا

"হে লোক সকল ! আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, কেবল তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না।"[১]

আর আবূ লাহাব তাঁর পিছে পিছে এ কথা বলে চলছিল : ايها الناس ان هذا يأمركم ان تتركوا دين اباكم "হে লোক সকল ! এ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছে তোমাদের বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে দেয়ার জন্য।"

মূলত নবীকুল শিরোমণি (সা) তো ইসলাম ও শান্তির দিকে আহ্বান করছিলেন, আর আবূ লাহাব আহ্বান করছিল প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার দিকে।

---

১. ইসাবা, ২খ., পৃ. ৫০৯।

ইসলামের প্রচার প্রসার বন্ধ করার জন্য কুরায়শদের পরামর্শ

কুরায়শগণ যখন দেখলো যে, দৈনন্দিন ইসলামের প্রসার বেড়েই চলছে, তখন একদিন তারা ওলীদ ইবন মুগীরার নিকট একত্রিত হলো, যে ছিল তাদের মধ্যে বয়োঃবৃদ্ধ ও প্রবীণ ব্যক্তি, তারা বলল, হজ্জের মৌসুম তো সমাগত, আর তাঁর [নবী (সা)-এর] উল্লেখ ও চর্চা তো সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে, এ উপলক্ষে দেশের আনাচে কানাচে থেকে সব লোক আসবে আর আপনাকে ঐ ব্যক্তি [হযরত মুহাম্মদ (সা)] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। কাজেই তাঁর সম্পর্কে আমাদের একটা সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত থাকা দরকার এবং সবাই এ ব্যাপারে একই সিদ্ধান্ত দেয়া দরকার, যাতে তা পরস্পর বিরোধী না হয়। অন্যথায় আমাদের মধ্যেই একজনের কথায় অপরেরটা মিথ্যা ও পরস্পর বিরোধী প্রতিপন্ন হবে, যা মোটেই সমীচীন হবে না। কাজেই হে আবূ আবদুশ শামস (ওলীদের উপাধী) ! আপনি আমাদের জন্য একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিন, যার উপর আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকব।

ওলীদ বলল, তোমরা প্রস্তাব কর, আমি শুনি; এরপর একটা সিদ্ধান্তে আসা যাবে। তারা বলল, ইনি (আল্লাহ মাফ করুন) গণক। ওলীদ বলল, এটা মিথ্যা কথা, আল্লাহর কসম তিনি গণক নন। আমি যথেষ্ট গণক দেখেছি। তাঁর মধ্যে না গণকের কোন চিহ্ন আছে, আর না তাঁর বক্তব্য গণকদের মত গোঙ্গানো কথার সাথে কথা জড়ানো। লোকেরা বলল, তিনি (সা) পাগল। ওলীদ বলল, তিনি পাগলও নন। আমি পাগল ও উন্মাদদের প্রকৃতিও জানি, আমি তাঁর মধ্যে এ ধরনের কোন আলামত পাই না। লোকেরা বলল, তিনি কবি। ওলীদ বলল, আমি নিজেও কবি, এর সমস্ত শাখা-প্রশাখা, যেমন রাজায ও হাযাজ, মাকবূয ও মাবসূত ইত্যাদি সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। তাঁর বক্তব্যের সাথে কবিতার কোনই সম্পর্ক নেই। লোকেরা বলল, তিনি জাদুকর। ওলীদ বলল, তিনি জাদুকরও নন। তিনি জাদুকরদের মত ঝাঁড়ফুকও করেন না আর তাদের মত গিরাও বাঁধেন না। লোকেরা বলল, ওহে আবূ আবদুশ শামস, তা হলে আপনিই বলুন শেষ পর্যন্ত তা হলে কি ?

ওলীদ বলল, আল্লাহর কসম, মুহম্মদ (সা)-এর কথা[১] এক আশ্চর্য ধরনের মিষ্টি ও মাধুর্যমণ্ডিত। আর এর এক আশ্চর্য ধরনের চমক রয়েছে। এ বক্তব্যের উৎস মূল অত্যন্ত সজীব এবং এর শাখা-প্রশাখা অত্যন্ত ফলবান (অর্থাৎ এই ইসলাম একটি পবিত্র বৃক্ষের ন্যায়, যা অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে শক্ত জমি থেকে উদ্গত এবং এর শাখা-প্রশাখা আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত, যা ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ)। কাজেই যা কিছু তোমরা বললে, আমি ভালভাবেই জানি যে তা সবই বাতিল ও ভিত্তিহীন। আমার বিবেচনায় এটা বলা সবচেয়ে উপযুক্ত হবে যে এ ব্যক্তি জাদুকর এবং তার কথাও জাদু যা স্বামী-স্ত্রীতে,

১. মুস্তাদরাকের বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে যে, وانه ليعلوا وما يعلى وانه ليحطم ما تحته অর্থাৎ "এ বাক্যাবলী সমুচ্চ ও প্রাধান্য বিস্তার করবে, কখনই বিজিত হবে না এবং সবকিছুকেই পরাভূত করবে।" (মুস্তাদরাক, ২খ. পৃ. ৫০৭)।

পিতা-পুত্রে, ভাইয়ে-ভাইয়ে এবং গোত্রে-গোত্রে বিভেদ সৃষ্টি করে—যেটা জাদুরই বৈশিষ্ট্য। এ সব কথার পর সভা ভঙ্গ হলো।

যখন হজ্জের মৌসুম এলো, লোকজন আসতে শুরু করল, কুরায়শরা পথেঘাটে ছড়িয়ে পড়ল এবং যে ব্যক্তিই সেদিক দিয়ে যেত, মুহম্মদ (সা)-এর ব্যাপারে তাকেই বলতে থাকল, ঐ ব্যক্তি জাদুকর, তোমরা তার থেকে দূরে থাকবে। কিন্তু কুরায়শদের এ প্রচেষ্টা ইসলামের কোনই ক্ষতি করতে সক্ষম হলো না (বরং এ ব্যাপারে আগ্রহ আরো বেড়ে গেল)। দেশের আনাচে কানাচে থেকে আগত লোকজন হযরত (সা) সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হয়েছে।[১] আল্লামা যারকানী বলেন, এ হাদীসটি ইবন ইসহাক, হাকিম এবং বায়হাকী উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।[২]

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ওলীদ ইবন মুগীরার ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন :

ذَرنِىْ وَمَن خَلَقْتُ وحِيْداً - وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوْدَا وَّبَنِيْنَ شُهُوْداً وَّمَهَّدْتُّ لَهُ
تَمْهِيْداً ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ كَلاَّ اَنَّهُ كَانَ لاٰيٰتِنَا عَنِيْداً سَاُرْهِقُهُ صَعُوْداً اَنَّهُ فَكَّرَ
وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْف قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وبَسَرَ ثُمَّ اَدْبَرَ
وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ اِنْ هٰذَا اِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرَ اِنْ هٰذَا اِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ

"আমাকে আর তাকে ছেড়ে দাও, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ এবং নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ এবং তাকে দিয়েছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরো বেশি দিই। না, তা হবে না, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের ঔদ্ধত্য বিরুদ্ধাচারী। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তিতে আচ্ছন্ন করব। সে তো চিন্তা করেছে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অভিশপ্ত হোক সে, কেমন করে এ সিদ্ধান্ত নিল ! আরো অভিসম্পাত হোক সে, কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো ! সে আবার চেয়ে দেখল। অতঃপর ভ্রূ কুঞ্চিত করল এবং মুখ ভেঙচিয়ে চলে গেল। এরপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল ও দম্ভ জাহির করল। আর ঘোষণা করল, এ তো লোক-পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ছাড়া কিছুই নয়। এ তো মানুষেরই কথা, আমি অচিরেই তাকে সাকার-এ নিক্ষেপ করব....আয়াতের শেষ পর্যন্ত।" (সূরা মুদ্দাচ্ছির ১১–২৬)

আর একটি মুরসাল রিওয়ায়াতে এসেছে, আয়াতটি ছিল :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَائِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

---

১. উয়ূনুল আসার, ১খ., পৃ. ১০১।

২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৬১।

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।" (সূরা নাহল ৯০)–যা পরিপূর্ণ চরিত্র ও উত্তম কর্মের সমষ্টি।[১]

হযরত হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ[২]

একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) সাফা পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, ঘটনাক্রমে আবূ জাহলও সেখানে এসে পড়ল। হযরতকে দেখে সে অনেক রূঢ় কথা বলল কিন্তু তিনি আবূ জাহলের অনভিপ্রেত এ কথাবার্তার কোন জবাব দিলেন না। তিনি এ অজ্ঞতাপূর্ণ কথার প্রতিউত্তর না দিয়ে চুপচাপ চলে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবন জুদ'আনের দাসী এ সমুদয় ঘটনা দেখছিল। ইতিমধ্যে হযরত হামযা তীর-ধনুক ইত্যাদিসহ শিকার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। আবদুল্লাহ ইবন জুদ'আনের দাসী হযরত হামযাকে দেখে বলল, হে আবূ উমারা, তুমি যদি ঐ সময় উপস্থিত থাকতে, যখন আবূ জাহল তোমার ভাই পোকে রূঢ় ও অনভিপ্রেত কথাবার্তা বলছিল !

এ কথা শোনামাত্র হযরত হামযার আত্মসম্ভ্রমবোধে আঘাত লাগল। তিনি আবূ জাহলের সন্ধানে রওয়ানা হলেন। হযরত হামযার অভ্যেস ছিল, শিকার থেকে ফিরে তিনি সর্বাগ্রে হারেম শরীফে উপস্থিত হতেন। এ অভ্যাসবশত তিনি আজও হারেম শরীফে গিয়ে দেখেন যে, আবূ জাহল কুরায়শের একটি দলের সাথে বসে আছে। পৌঁছেই তিনি তার মাথায় ধনুক দ্বারা এমন আঘাত করলেন যে, তার মাথায় যখম হয়ে গেল এবং বললেন, তুই মুহাম্মদকে গালি দিস, অথচ আমি নিজেই তাঁর দীনের অনুসারী ! সভার উপস্থিত কেউ কেউ আবূ জাহলের সাহায্যে এগিয়ে আসতে চাইল, কিন্তু আবূ জাহল নিজেই তাদের বাধা দিল এবং বলল, আজ আমি এর ভাইপোকে অনেক গালিগালাজ করেছি, হামযাকে তার নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও। সভায় উপস্থিতদের কেউ কেউ হামযাকে উদ্দেশ্য করে বলল, হামযা, তুমি কি সাবী (বেদীন) হয়ে গেলে ? হামযা বললেন, মুহাম্মদের রাসূল (সা) হওয়ার ব্যাপারে যথার্থতা ও সত্যতা ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল আর তিনি যা বলেন, তা যথাযথ সত্য। আমি কখনো তা থেকে বিরত হব না, তোমাদের যা খুশি করতে পার। হযরত হামযা এ কথা বলে বাড়ি চলে গেলেন। শয়তান কুমন্ত্রণা দিল যে, হে হামযা, তুমি কুরায়শের সর্দার, তুমি এ ধর্মত্যাগীর আনুগত্য কিরূপে করলে, আর নিজের বাপ-দাদার ধর্ম কেন ছেড়ে দিচ্ছ ? এরচেয়ে

---

১. প্রাগুক্ত।

২ ইবনুল জাওযী বলেন যে, হযরত হামযা (রা) নবূয়াতের ষষ্ঠ বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করেন। এটাই প্রসিদ্ধ বর্ণনা। হাফিয ইবন হাজার তাঁর ইসাবায় বলেন, হযরত হামযা (রা) নবূয়াতের দ্বিতীয় বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করেন। (যারকানী, ১খ. পৃ. ১৫৬)।

তো মরে যাওয়াই উত্তম। এর ফলে হামযা কিছুটা বিব্রত হলেন এবং সন্দেহে পড়ে গেলেন। হযরত হামযা বলেন, তখন আমি আল্লাহর দরবারে এ দু'আ করলাম :

اللهم ان كان رشدا فاجعل تصديقه فى قلبى والا فاجعل لى مما وقعت فيه مخرجا

"হে আল্লাহ্ ! যদি এটা হিদায়াত হয়, তবে তার সত্যতা আমার অন্তরে ঢেলে দাও, অন্যথায় এ বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোন বলিষ্ঠ পন্থা সৃষ্টি করে দাও।"[১]

অপর এক বর্ণনায় আছে, এই অস্থিরতা ও দুর্ভাবনার মধ্যে তাঁর সারা রাত কেটে গেল, এক মুহূর্তও চোখে ঘুম এলো না। যখন কিছুতেই এ দুর্ভাবনা ও অস্থিরতা দূর হলো না, তখন তিনি হারেম শরীফে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং খুবই কাকুতি মিনতি ও ক্রন্দন সহকারে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে সত্যের জন্য বিকশিত করে দাও এবং যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় দূর করে দাও। দু'আ তখনও শেষ হয়নি, ইতিমধ্যে আমার অন্তর সকল বাতিল চিন্তা-ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেল, আনুগত্য ও নিশ্চিন্ততায় আমার অন্তর ভরপুর হয়ে গেল। প্রভাত হতেই আমি হযরত (সা)-এর পবিত্র খেদমতে গিয়ে হাযির হলাম এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি আমাকে অবিচল ও ইসলামের উপর দৃঢ় ও অটল থাকার জন্য দু'আ করলেন।[২] 'মুস্তাদরাকে হাকিমে' বর্ণিত আছে, যখন হযরত হামযা রাসূল (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন বললেন :

اشهد انك لصادق شهادة المصدق والعارف

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই সত্য নবী, সত্যায়নকারী এবং পৌঁছে দেয়ার মত সাক্ষ্য দিচ্ছি।"

হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ! আপনি আপনার দীনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রকাশ করেছেন। আল্লাহর কসম, যদি দুনিয়া এবং তার মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবই আমি পেয়ে যাই, তবুও আপনার দীন ত্যাগ করে নিজ পিতা-পিতামহের ধর্ম গ্রহণ করব না। অতঃপর হামযা এ কবিতা আবৃত্তি করলেন :

حمدت الله حين هدى فوادى　　الى الاسلام والدين الحنيف

"আর আমি আল্লাহর প্রশংসা ও স্তূতি করছি যেহেতু তিনি আমার অন্তরে ইসলাম ও দীনে ইবরাহীম (আ) গ্রহণের তওফীক দিয়েছেন।"

لدين جاء من رب عزيز　　خبير بالعباد بهم لطيف

---

১. ইবনুল জাওযী বলেন যে, হযরত হামযা (রা) নবূয়াতের ষষ্ঠ বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করেন। এটাই প্রসিদ্ধ বর্ণনা। হাফিয ইবন হাজার তাঁর ইসাবায় বলেন, হযরত হামযা (রা) নবূয়াতের দ্বিতীয় বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করেন। (যারকানী, ১খ. পৃ. ১৫৬)।

২ মুস্তাদরাক, ৩খ., পৃ. ১৯৩।

"ঐ দীন গ্রহণের তওফীক দিয়েছেন যা সেই পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে আগত, যিনি তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত এবং তাদের প্রতি দয়াবান।"

اذا تليت رسائله علينا   تحدر دمع ذى اللب الحصيف

"যখন তাঁর বাণী আমাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন পূর্ণ জ্ঞানবানদের চোখে অশ্রু প্রবাহিত হয়।"

رسائل جاء احمد من هداها   بايات مبينت الحروف

"ঐ আল্লাহর বাণী যা আহমদ (সা) মানুষকে হিদায়াত করার জন্য নিয়ে এসেছেন, তা স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য নিদর্শন।"

واحمد مصطفى فينا مطاع   فلا تغشوه بالقول العنيف

"আর আহমাদ মুজতবা আল্লাহর মনোনীত, তিনি যা কিছু সত্য নিয়ে এসেছেন তার আনুগত্য করা আমাদের জন্য অপরিহার্য, একে তোমরা কঠিন বাক্যের আড়ালে গোপন করো না।"

فلا والله نسلمه لقوم   ولما نقض فيهم بالسيوف

"আল্লাহর কসম, যতক্ষণ আমরা তরবারির মাধ্যমে ফয়সালা না করছি, ততক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ (সা) কে মানুষের হাতে কিছুতেই তুলে দেব না।"[১]

হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের ফলে কুরায়শগণ বুঝে ফেলল যে, হযরত (সা)-এর উপর যুলুম-নির্যাতন করা আর সহজ ব্যাপার নয়।

হযরত হামযা (রা)-এর ক্রোধ

যখন আবদুল্লাহ ইবন জুদ'আনের দাসী হযরত হামযার নিকট আবূ জাহল কর্তৃক নবী (সা) কে রূঢ় ভাষায় গালি-গালাজের ঘটনা বলল, তখন হযরত হামযার ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। 'সীরাতে ইবন হিশাম', 'মুস্তাদরাকে হাকিম' এবং 'উয়ূনুল আসার'-এ হযরত হামযা (রা)-এর ক্রোধের বর্ণনা এ ভাষায় বিবৃত হয়েছে : فاحتمل الغضب لما اراد الله به من كرامته "হযরত হামযা (রা) রেগে গেলেন, এ জন্যে আল্লাহ তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দানের ইচ্ছা করলেন।"

মনে হয় আল্লাহ জাল্লা শানুহু যার মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তরে নিজ দুশমনদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ঈর্ষা সৃষ্টি করেন। ঈমানের পাল্লা যখনই সমান সমান হয়ে যায়, তখন ডান পাল্লায় আল্লাহর প্রতি ভালবাসা এবং বাম পাল্লায় আল্লাহর জন্য ক্রোধে ভরপুর থাকে। যেমনটি নবী করীম (সা) বলেছেন : مَنْ اَحَبَّ لله وَاَبْغَضَ لله فَقَد اسْتَكْمَلَ الاِيْمَانَ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালবাসল এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করল, সে তার ঈমান পূর্ণ করে নিল।"

---

১. রাউযুল, উনুফ, ১খ., পৃ. ১৮৬।

এ অধমের (লেখকের) ধারণায় আল্লাহর জন্য ভালবাসার মতই আল্লাহর জন্য শত্রুতাও অত্যাবশ্যক, এর একটা থেকে অপরটাকে পৃথক ও বিভক্ত করা অসম্ভব ও অবাস্তব বলে মনে হয়। পার্থক্য কেবল এটুকুই যে, কখনো আল্লাহর প্রতি ভালবাসার প্রকাশ প্রথমে ঘটে, আর কখনো আল্লাহর প্রতি শত্রুতা পোষণের। কেননা আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য, আর আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ আপেক্ষিক উদ্দেশ্য। এ জন্যে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ঈমানের পাল্লার ডানদিকে আর তাঁর জন্য শত্রুতা পোষণ পাল্লার বামদিকে রাখাই যুক্তিযুক্ত। আল্লাহই ভাল জানেন।

কুরায়শ সর্দারিদের পক্ষ থেকে ইসলামের প্রচার বন্ধ করার জন্য অর্থ ব্যয়, বাদশাহী-নেতৃত্ব প্রদানের প্রলোভন ও হযরত (সা)-এর জবাব

কুরায়শগণ যখন দেখল যে, হযরত হামযাও ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছেন এবং প্রতিদিন মুসলমানের সংখ্যা বেড়েই চলছে, তখন আবূ জাহল, উতবা, শায়বা, ওলীদ ইবন মুগীরা, উমায়্যা ইবন খালফ, আসওয়াদ ইবন মুত্তালিব এবং অপরাপর কুরায়শ সর্দারগণ পরামর্শ করে নবী (সা)-এর সাথে কথা বলার জন্য উতবা ইবন রবীয়াকে নির্বাচন করল, রবীয়া জাদুবিদ্যা, কাহিনীকার এবং কবিতাচর্চায় সেকালের একক ব্যক্তিত্ব ছিল।

উতবা নবী (সা)-এর নিকটে এলো এবং বলল, মুহাম্মদ ! তোমার বংশ, মর্যাদা, যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই, কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, তুমি সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ। তুমি আমাদের প্রতিমাগুলোকে মন্দ বলো, আমাদের পিতা-পিতামহকে বোকা ও মূর্খ বলো, তাই এ ব্যাপারে আমি কিছু কথা বলতে চাই। রাসূল (সা) বললেন, হে আবুল ওলীদ, বলুন, আমি শুনছি।

উতবা বলল, ওহে আমার ভাতিজা ! তোমার এ সব কথাবার্তার মূল উদ্দেশ্য কি? তুমি যদি ধন-দওলতের প্রত্যাশী হও, তা হলে আমরা সবাই মিলে এতটা পরিমাণ সম্পদ একত্র করে দেব যে, বড় থেকে বড় আমীর ব্যক্তিও তোমার সমকক্ষ হতে পারবে না। আর যদি তুমি বিয়ে করতে চাও, তা হলে যে মেয়েকে ইচ্ছা, যতজনকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পার। আর যদি সম্মান ও নেতৃত্ব লাভের ইচ্ছা পোষণ কর, তা হলে আমরা সবাই তোমাকে আমাদের নেতা হিসেবে মেনে নেব। আর যদি বাদশাহী চাও, তা হলে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ রূপে মেনে নেব। আর যদি তুমি অসুস্থ হয়ে থাক, তবে তোমার চিকিৎসা করাব।

হযরত (সা) বললেন, হে আবুল ওলীদ, আপনার যা বলার ছিল, তা কি বলে শেষ করেছেন ? উতবা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আচ্ছা, এখন আমি যা বলি, তা শুনুন। আপনাদের মাল-সম্পদের প্রয়োজন আমার নেই, আর আপনাদের নেতৃত্ব সর্দারী করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি তো আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আমাকে আপনাদের প্রতি পয়গাম্বর করে প্রেরণ করেছেন, তিনি আমার প্রতি একটি কিতাব

অবতীর্ণ করেছেন। তিনি আমাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি আপনাদেরকে আল্লাহ প্রদেয় নেকীর সুসংবাদ শোনাব এবং তাঁর আযাবের ভীতি প্রদর্শন করব। আমি আপনাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি। আপনাদের কল্যাণকামী হিসেবে উপদেশ আকারে তা অবহিত করেছি। যদি আপনারা তা গ্রহণ করেন তবে তা আপনাদের জন্য উভয় জগতের সৌভাগ্য ও কল্যাণের নিমিত্ত হবে। আর যদি আপনারা না মানেন, তা হলে আল্লাহ আমার এবং আপনাদের মধ্যে ফয়সালা না করা পর্যন্ত আমি সবর করব। আর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

بَسْــــــمِ اللّٰهِ الرَّحمنِ الرَّحِـــــيْمِ

حٰـــمٓ - تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ
بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُوْنَ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِىْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا
اِلَيْهِ وَفِىْ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ
الَّذِيْنَ لاَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۰اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ
اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ
اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا
اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا
وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ
وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ
الْعَلِيْمِ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। হা-মীম, ইহা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট থেকে অবতীর্ণ। এ এক কিতাব, এর আয়াতসমূহ আরবী ভাষায় কুরআনরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে; কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে। সুতরাং ওরা শুনবে না। ওরা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত, কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মাঝে আছে যবনিকা, সুতরাং তুমি তোমাদের কাজ কর আর আমরা আমাদের কাজ করি। বল, আমি তো তোমাদের

মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। অতএব তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য—যারা যাকাত দান করে না এবং ওরা আখিরাতেও অবিশ্বাসী। যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। বল, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও ? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক। তিনি ভূ-পৃষ্ঠে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং ওতে রেখেছেন কল্যাণ আর চারদিনের মধ্যে সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য এতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। ওরা বলল, আমরা এলাম অনুগত হয়ে। তারপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে এই বলে তার বিধান ব্যক্ত করলেন যে, আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং সুরক্ষিত করলাম। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। তবুও এরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, আমি তো তোমাদেরকে আদ ও সামূদের শাস্তির অনুরূপ এক ধ্বংসকর শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি।" (সূরা হা-মীম-আস-সাজদা : ১-১৩)

তিনি তিলাওয়াত করছিলেন আর উতবা দু'হাত পিছনে জমিতে ঠেক দিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। কিন্তু যখন তিনি শেষ আয়াত فان اعرضوا -এ পৌঁছলেন, তখন উতবা নিজ হাত নবীজী (সা)-এর মুখের উপর ধরল এবং তাঁকে দোহাই দিয়ে বলল, আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আমাদের উপর অনুগ্রহ কর। উতবার ভয় হচ্ছিল যে, না জানি আদ ও সামূদ সম্প্রদায়ের মত এখনই তার উপর আযাব নাযিল হয়ে না যায় ! এরপর হযরত (সা) সিজদা পর্যন্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। যখন তিলাওয়াত শেষ হলো, উতবাকে সম্বোধন করে বললেন, হে আবুল ওলীদ, যা কিছু শোনার ছিল, তা আপনি শুনেছেন, এখন আপনার ইচ্ছা। উতবা তাঁর থেকে বিদায় গ্রহণ করে নিজ বন্ধুদের নিকটে ফিরে গেল। কিন্তু উতবা যেন আর সে উতবা ছিল না। কাজেই আবূ জাহল বলে উঠল, উতবা তো সে উতবা নেই, উতবা তো ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে ! উতবা বলল, আমি তাঁর কথা শুনেছি, আল্লাহর কসম, আমি এমনটি আর কোনদিন শুনিনি। তা না কবিতা, না জাদু আর না তা কাহিনী, এ তো অন্য কিছু। হে আমার সম্প্রদায় ! যদি তোমরা আমার কথা শোন, তা হলে মুহাম্মদকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। আল্লাহর শপথ, যে বাণী আমি তার থেকে শুনে এলাম, অচিরেই তার বিশেষ মর্যাদা অর্জিত হবে। আরববাসী যদি তাকে ধ্বংস করে দেয়, তবে তো তোমাদের কোন চিন্তার প্রয়োজনই নেই। আর যদি মুহাম্মদ আরববাসীর উপর বিজয়ী হয় তা হলে তার সম্মান তো তোমাদেরই সম্মান, তার নেতৃত্ব তো তোমাদেরই নেতৃত্ব; কারণ সে তো তোমাদেরই কওমের লোক। কুরায়শগণ বলল, ওহে আবুল ওলীদ! মুহাম্মদ

তোমাকে জাদু করেছে। উতবা বলল, আমার মত তো এটাই, এখন তোমাদের যা ইচ্ছা হয় করো।[১]

সূরা কাফিরূন অবতরণ

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, কুরায়শগণ নবী (সা)-এর কাছে এ আবেদন জানাল যে, হয় আপনি আমাদের মূর্তিগুলোকে দোষারোপ করা থেকে বিরত থাকুন। আর যদি এটা সম্ভব না হয় তবে আপনার ও আমাদের মধ্যে এভাবে ফয়সালা হতে পারে যে, এক বছর আপনি আমাদের মূর্তিগুলোর পূজা করবেন আর এক বছর আমরা আপনার আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করব। 'মুজামে তাবারানী'তে বর্ণিত আছে যে, এর পরই এ সূরা নাযিল হয় :

قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لاَ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ وَلاَ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۝ وَلاَ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝ وَلاَ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ

"বলে দাও, হে কাফিরগণ ! আমি তার ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত কর, আর তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও আমি যাঁর ইবাদত করি এবং আমি তার ইবাদতকারী নই, তোমরা যার ইবাদত করে আসছ এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের দীন তোমাদের জন্য, আমার দীন আমার জন্য।" (সূরা কাফিরূন : ১-৬)

ইবন জারীর তাবারীর বর্ণনায় আছে, সূরা কাফিরূন ছাড়াও এ সময় নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় :

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّىْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ۝ وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ

"বল, হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা ! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে বলছ ? অথচ (হে নবী) তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে, তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম তো বিফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত। অতএব তুমি আল্লাহরই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও।" (সূরা যুমার : ৬৪-৬৬)

মক্কার মুশরিকদের কিছু অর্থহীন ও বাজে প্রশ্ন

এরপর কুরায়শগণ তাঁকে বলল, ভাল কথা, যদি এ প্রস্তাব আপনার মনমত না

---

১. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১০৫; যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ২৫৭; খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ১১৪।

হয় তা হলে অপর একটি বিষয় আপনার সামনে পেশ করছি। তা এই যে, আপনি জানেন, আপনার সম্প্রদায় খুবই গরীব আর এ মক্কা শহরও খুবই সংকুচিত, চারদিকে কেবল পাহাড় আর পাহাড়, সবুজ শ্যামলিমার নাম-নিশানাও নেই। কাজেই আপনি আপনার রব, যিনি আপনাকে পয়গাম্বর করে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কাছে এ মর্মে আবেদন করুন যে, এই শহর থেকে পাহাড়গুলো সরিয়ে দিন[1] যাতে শহর প্রশস্ত হয় এবং সিরিয়া ও ইরাকের মত এ শহরে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিন আর আমাদের পিতৃপুরুষদের, বিশেষত কুসাই[2] ইবন কিলাবকে জীবিত করে দিন যাতে আমরা আপনার ব্যাপারে, আপনি যা বলছেন সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে, তা সত্য নাকি মিথ্যা। যদি আমাদের পিতৃপুরুষ জীবিত হওয়ার পর আপনাকে সত্য বলে, তা হলে আমরা বুঝব আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন আমরাও আপনাকে সত্য বলে মেনে নেব।

তিনি (সা) বললেন, আমি এ জন্যে প্রেরিত হইনি। আল্লাহ আমাকে যে বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমি তা তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি। যদি তোমরা তা গ্রহণ কর তবে তা হবে তোমাদের সৌভাগ্য, আর যদি তোমরা তা না মানো, তবে আমি ধৈর্যধারণ করব, যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমার ও তোমাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা প্রদান করেন।

কুরায়শগণ বলল, আচ্ছা, যদি আপনি আমাদের জন্য এমনটি করতে না পারেন তবে আপনি আপনার নিজের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন, যিনি আপনাকে সত্যায়ন করবেন এবং সর্বত্র আপনার সঙ্গে থাকবেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে এ দু'আও করুন যেন তিনি আপনাকে বাগ-বাগিচা, প্রাসাদ এবং সোনা-রূপার ভাণ্ডার দান করেন, যাতে আমরা আপনার মর্যাদা এবং মাহাত্ম্য জানতে পারি। আমরা দেখি যে, আমাদের মত আপনিও জীবিকা অর্জনের জন্য বাজারে গমন করেন।

তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে কখনই এ ধরনের প্রার্থনা করব না, আমি এজন্যে প্রেরিত হইনি। আমি তো সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে

---

১. যেমন আল্লাহ বলেন ঃ وَلَوْ اَنَّ قُرَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا اَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا "যদি কোন কুরআন এমন হতো যদ্দারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেতম অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত, তবুও ওরা তাতে বিশ্বাস করত না। কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। তবে কি যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতেন"? (সূরা রা'দ ঃ ৩১)

২ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ. পৃ. ৫১; কুসাই ইবন কিলাবের নাম তারা এ জন্যে বলেছিল যে, তিনি সত্যবাদী ও পরহেযগার ছিলেন। এ ঘটনা প্রসঙ্গে সূরা ফুরকানের ৭-১০ আয়াত নাযিল হয়।

প্রেরিত হয়েছি। যদি তোমরা মানো, তবে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আর যদি না মানো, তবে আমি ধৈর্যধারণ করব যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমার ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা প্রদান করেন।

কুরায়শগণ বলল, আচ্ছা আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি আমাদের প্রতি কোন আযাব নাযিল করেন। তিনি বললেন, তোমাদের প্রতি আযাব নাযিল করা কিংবা অবকাশ দেয়া আল্লাহর ইচ্ছাধীন। এ কথার পর আবদুল্লাহ ইবন আবূ উমায়্যা[১] দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, ওহে মুহাম্মদ, আপনার সম্প্রদায় আপনার সামনে এত কথা বলল, আপনি তাদের একটি কথাও গ্রহণ করলেন না ? হে মুহাম্মদ ! আল্লাহর শপথ, যদি আপনি সিঁড়ি লাগিয়ে আসমানেও আরোহণ করেন এবং সেখান থেকে নিজের নবূয়াত ও রিসালতের পরওয়ানা লিখিয়ে নেন আর চারজন ফেরেশতা যদি আপনার সহায়তায় আসেন এবং আপনার নবূয়াতের পক্ষে উচ্চ কণ্ঠে সাক্ষ্য দেন, তা হলেও আমি আপনাকে সত্য বলে মানব না। হযরত (সা) নিরাশ হয়ে গৃহে ফিরে এলেন।[২]

সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম অনুসন্ধান

আল্লাহ তা'আলা যখন কাউকে নবূয়াত ও রিসালতের মর্যাদা দান করেন, সাথে সাথে সেই রিসালতের তথ্য-প্রমাণ, নিদর্শন ও চিহ্নও প্রেরণ করেন. যাতে কোন ব্যক্তি যদি তার অন্তরকে সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত রেখে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তা হলে তার নবূয়াত ও রিসালতের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু এমন কোন দলীল-প্রমাণ দেয়া হয় না, যা দেখামাত্রই বাধ্য হয়ে নবী (আ)গণের সত্য হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়। এটা এ জন্যে যে, উদ্দেশ্য তো (ঈমানের) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। আর পরীক্ষায় সাফল্য তো অর্জন করতে হয়। অর্থাৎ যে ঈমান নবূয়াতের আলামত ও রিসালতের নিদর্শনে চিন্তা-ভাবনা করার পর আনা হয়, এ ধরনের ঈমান ও বিশ্বাসের উপরই শাস্তি অথবা প্রতিদান প্রযোজ্য। যে ঈমান ও

---

১. আবদুল্লাহ ইবন আবূ উমায়্যা হযরত (সা)-এর ফুফাত ভাই এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমার ভাই। মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। উম্মুল মু'মিনীনের সুপারিশে নবী (সা) তাকে ক্ষমা করেন। তার প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "এবং ওরা বলে, কখনই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না যতক্ষণ না আমাদের জন্য ভূমি থেকে এক ঝর্ণাধারা উত্থিত করবে, অথবা তোমার খেজুর কিংবা আংগুরের একটি বাগান থাকবে, যার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র নদীনালা প্রবাহিত করে দেবে। অথবা তুমি যেমন বলে থাক, আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলবে অথবা আল্লাহ ও ফিরিশতাগণকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে, অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে। কিন্তু আমরা তোমার আকাশে আরোহণ কখনো বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ করবে যা আমরা পাঠ করব। বল, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক, আমি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।" (সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৯০-৯৩)। (ইসাবা, ২খ. পৃ ৩৭)।

২ উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১০৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৫০।

সত্যায়ন স্বেচ্ছায় ও ইচ্ছামাফিক করা হয়, শরী'আতে তাই কেবল ধর্তব্য, আর যে সত্যায়ন বাধ্যতামূলকভাবে কিংবা আবশ্যিকভাবে অর্জিত হয়, না তা শরী'আতের কাছে ধর্তব্য, আর না তা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য। কেবল হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের আস্থা ও ভরসায় ফিরিশতাদের সত্য বলে জানা এটা ইচ্ছাধীন ঈমান ও ঐচ্ছিক সত্যায়ন আর মৃত্যুকালে ফেরেশতাগণকে দেখে তাঁদের সত্য বলে জানা বাধ্যতামূলক ও অনিয়ন্ত্রিত বিশ্বাস ও সত্যায়ন, যা শরী'আতে ধর্তব্য নয়। এ পৃথিবী পরীক্ষাগার, কাজেই আল্লাহর নবী (আ)গণকে এমন কোন মুজিযা দান করা, যা দেখামাত্রই বাধ্যতামূলকভাবে নবী (আ)গণের উপর এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, শত্রুতা পোষণকারী ব্যক্তিরও অস্বীকার করার কোন উপায় না থাকে, এটা সরাসরি প্রজ্ঞাবিরোধী (তাতে পরীক্ষার তাৎপর্য থাকে না)। অধিকন্তু, এর দ্বারা নবী প্রেরণের যে উদ্দেশ্য, তাও নষ্ট হয়ে যায়। কারণ উদ্দেশ্য তো এটাই যে, মানুষ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী ঈমান আনয়ন করবে। যদি বাধ্যতামূলকভাবেই ঈমান আনানো উদ্দেশ্য হতো, তা হলে নবী (আ)গণকে পৃথিবীতে প্রেরণের কি প্রয়োজন ছিল ? আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা যথারীতি স্বীয় বাণী সরাসরি বান্দাদেরকে শুনিয়ে দিতেন। কোন মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর বাণী শোনার পর অতঃপর কারো পক্ষে তা অস্বীকার করা অসম্ভব ও অবাস্তব ছিল।

মক্কার মুশরিকগণ এ ধরনেরই অযৌক্তিক দলীল-প্রমাণ চাইছিল, যাতে দেখামাত্র অপরিহার্যভাবে তাঁর নবূয়াত ও রিসালাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস এসে যাবে। যেমন ফিরিশতাগণের মানুষের সামনে এসে তাঁর নবূয়াত ও রিসালতের সাক্ষ্য দেয়া কিংবা মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে তাঁর নবূয়াত-রিসালতের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া। এ ধরনের চিহ্ন ও নিদর্শন প্রকাশকে এজন্যে অস্বীকার করা হয়েছে যে, এরূপ মু'জিযা প্রকাশ প্রজ্ঞা এবং নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যের সরাসরি পরিপন্থি। আর আল্লাহ তা'আলারও নিয়ম এটাই, যে সম্প্রদায় চায় না, তারা মুজিযা দেয়ার পরও ঈমান আনে না। ফলে সে সময়েই তাদের আল্লাহর আযাব এসে ধ্বংস করে দেয়। যেমনটি পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের ঘটনাবলী কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত আছে। যথা আল্লাহ বলেন :

وَمَا مَنَعَنَا اَن نرسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلاَّ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ

"পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা থেকে বিরত রাখে।" (সূরা বানী ইসরাঈল : ৫৯)

এই বিশেষ বিশেষ নিদর্শনাবলী যা কুরায়শগণ চাচ্ছিল বাস্তবে তা পাঠানোয় কোনই বাধা নেই, কিন্তু কেবল কারণ এটাই যে, পূর্ববর্তী লোকেরা এ ধরনের মু'জিযা দেয়ার পরেও ঈমান আনয়নে অস্বীকার করেছে। এজন্যে তাদের ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে এরাও তাদের প্রার্থিত মুজিযা দেয়ার পরও যদি ঈমান না আনে, তা হলে পূর্বের রীতি অনুসারে এদেরকেও ধ্বংস করে দেয়া হবে।

আর যেহেতু নবী করীম (সা) কে রাহমাতুললিল আলামিন করে প্রেরণ করা হয়েছে, এর বরকতে এ ধরনের সকল আযাব উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর আপতিত হয়েছিল। কাজেই একটি বর্ণনায় রয়েছে, কুরায়শগণ তাঁর কাছে এ আবেদন করলো যে, সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করুন। তিনি ইচ্ছা করছিলেন যে, এবারে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন। জিবরাঈল (আ) আগমন করলেন এবং বললেন হে নবী করীম (সা) ! আপনি ওদের বলে দিন যে তোমরা যা চাও তাই হবে, কিন্তু জেনে রাখ এই নিদর্শন প্রকাশ হওয়ার পর যদি ঈমান না আন তবে মঙ্গল হবে না, তৎক্ষণাৎ সব ধ্বংস করে দেয়া হবে। কুরায়শগণ বলল, আমাদের প্রয়োজন নেই। এ সমুদয় বর্ণনা আল্লামা সুহায়লীর বক্তব্যের বিশ্লেষণ।[১]

ইয়াহূদী আলিমদের সাথে মক্কার কুরায়শদের পরামর্শ

কুরায়শগণ যখন বুঝতে পারল যে, আমাদের এ প্রশ্নাবলী ছিল মূর্খতা ও বৈরিতামূলক, তখন পরামর্শ করে নাযর ইবন হারিস ও উকবা ইবন আবূ মুয়াইতকে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রেরণ করল–যাতে তারা সেখানে পৌঁছে ইয়াহূদী আলিমদের সাথে তাঁর ব্যাপারে অনুসন্ধান করে। তারা নবী (আ) বিষয়ক জ্ঞানে জ্ঞানী এবং পয়গাম্বরগণের নিদর্শন সম্পর্কে অবহিত ও জ্ঞাত ছিল। এ দু'ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হলো এবং ইয়াহূদী আলিমদের নিকট সমুদয় ঘটনা উল্লেখ করল। ইয়াহূদী আলিমগণ বলল, তোমরা তিনটি জিনিসের ব্যাপারে মুহাম্মদ (সা) কে জিজ্ঞেস করবে। (প্রথম) ঐ সকল ব্যক্তি কারা, যারা গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করেছিল আর তাদের ঘটনাটি কি ? অর্থাৎ তাঁর নিকট আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনা জিজ্ঞেস কর। (দ্বিতীয়) ঐ ব্যক্তি কে ছিল, যে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত অভিযান চালিয়েছে। অর্থাৎ যুল কারনায়নের ঘটনা জিজ্ঞেস কর। (তৃতীয়) রূহ কি বস্তু ? মুহাম্মদ (সা) যদি প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দেন এবং তৃতীয়টির ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকেন, তবে বুঝবে তিনি প্রকৃতই প্রেরিত নবী, অন্যথায় সে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক।

নাযর এবং উকবা আনন্দে গদগদ চিত্তে মক্কায় ফিরে এল এবং কুরায়শদের বলল, আমরা একটি নিষ্পত্তিযোগ্য বক্তব্য নিয়ে এসেছি। তারা নবীজী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলো এবং সেখানে ঐ প্রশ্নাবলী পেশ করল। আগামীকাল পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন ওহী নাযিল হবে, এ আশায় হযরত (সা) বললেন, আগামীকাল জবাব দেব। মানব প্রকৃতি অনুসারে তিনি ইনশা আল্লাহ (আল্লাহ যদি চান) বলতে ভুলে গেলেন। কয়েকদিন অপেক্ষার পর সূরা কাহ্‌ফের আয়াতসমূহ নাযিল হলো, যাতে আসহাবে কাহ্‌ফ ও যুল কারনায়নের কিসসা বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো এবং তৃতীয় জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হলো : قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي অর্থাৎ "আপনি বলে দিন, রূহ-এর হাকীকত তোমাদের বুঝে আসবে না।" এতটুকু জানা যথেষ্ট যে, রূহ এমন

---

১. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১৮৭।

একটি বস্তু, আল্লাহর নির্দেশে যখন তা দেহে প্রবেশ করে, তখন দেহ জীবিত হয় আর যখন তা বেরিয়ে যায়, তখন মানুষ মরে যায় (মুযিহুল কুরআন)। আর মানবীয় কারণে হযরত (সা) 'ইনশা আল্লাহ' বলা ভুলে যাওয়ার দরুন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় :

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۝ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ

"কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলো না যে, আমি তা আগামীকাল করব, আল্লাহ ইচ্ছা করলে এ কথা না বলে, যখন ভুলে যাও তখন আল্লাহকে স্মরণ করো...।" (সূরা কাহফ : ২৩-২৪)

এ জন্যে হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলতেন, যদি এক বছর পরেও ইনশা আল্লাহ স্মরণে আসে, তবে তখনই বলে নাও, যাতে ঐ ভুল এবং ভ্রান্তি অপনোদন হয়ে যায়। এক বছর পর ইনশা আল্লাহ্ বলার অর্থ এটাই। এটা অর্থ নয় যে, তালাক বা দাস মুক্তির ক্ষেত্রেও এক বছর পর তা মূলতবী হয়ে যাবে।

কাজেই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছেড়ে দিয়ে নিজের ইচ্ছার উপর ভরসা করে 'আমি আগামীকাল এটা করব' এটা বলা আল্লাহর নিকট অপসন্দনীয়। এজন্যে যদি কোন ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ইনশাআল্লাহ্ বলা ভুলে যায়, তবে এর প্রতিকার হলো, যখনই স্মরণ হবে, তখনই ইনশা আল্লাহ্ বলবে, যাতে ছুটে যাওয়ার প্রতিকার হয়ে যায়।

হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর এ উদ্দেশ্য কখনই ছিল না যে, তালাক এবং দাস মুক্তি কসম এবং ঋণের ব্যাপারেও এক বছর পর ইনশাআল্লাহ বলা গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম ইবন জারীর ও হাফিয ইবন কাসীর হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যের এ অর্থই করেছেন। ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করুন।

রূহ এবং নফস

রূহ-এর প্রকৃতি নিয়ে আলিমদের অনেক উক্তি রয়েছে, কিন্তু বাস্তব কথা হলো, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ ছাড়া তা কারো জানা নেই। হাফিয ইবন আরসালান মাতনুয-যাবদীনে বলেন :

والروح ما اخبر منها المجتبى فنمسك المقال عنها ادبا

"রূহ তো হলো তাই, যে সম্পর্কে নবী মুজতবা (সা) অবহিত করেছেন। আদব ও শিষ্টাচারবশত আর কিছু বলা থেকে আমরা বিরত থাকলাম।"

এ ব্যাপারে দার্শনিক এবং চিকিৎসকদের বিভিন্ন বক্তব্য উদ্ধৃত করে পাঠকদের হয়রানী পেরেশানীতে ফেলা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (সা)-এর সুন্নত রূহ ও নফসের ব্যাপারে কি নির্দেশ দিয়েছে এবং কোন্ সীমা পর্যন্ত, সংক্ষিপ্তাকারে এটা বলে দেয়া যা আমাদের অবহিত করেছেন। জমহূর (অধিকাংশ)

আলিমের মতে রূহ একটি সূক্ষ্ম আলোকিত বস্তুর নাম, যা শরীরে এভাবে অবস্থান করে, যেমনটি গোলাপের মধ্যে পানি, যায়তুনের মধ্যে তেল এবং অঙ্গারের মধ্যে আগুন অবস্থান করে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সূক্ষ্ম বস্তু জড় দেহের মধ্যে অবস্থান করে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ জড় দেহ জীবিত থাকে। আর যখন এ সূক্ষ্ম আলোকিত বস্তু জড় দেহ থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন ঐ দেহ মরে যায়। সূক্ষ্ম আলোকিত বস্তুটির সাথে জড় দেহের সংযুক্তি ও সম্পৃক্তির নামই আয়ুষ্কাল ও জীবন। আর দেহ সত্তা থেকে তার পৃথক ও সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার নামই মৃত্যু। আত্মার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হওয়া কুরআনের আয়াত ও পর্যাপ্ত পরিমাণ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। উদাহরণত রূহকে ধরা এবং ছেড়ে দেয়া এবং ফেরেশতাগণ কর্তৃক তা বের করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়া, মৃত্যুকালীন রূহ কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া—রূহের এসব গতি-প্রকৃতি কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে। এ থেকে রূহের বস্তু হওয়াটা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়।

হাদীস শরীফে আছে, যখন মু'মিন ব্যক্তির রূহ কবয করা হয়, তখন মু'মিনের দৃষ্টি তা দেখে। মু'মিনের রূহ পাখির মত বেহেশতের বৃক্ষরাজিতে উড়তে থাকে এবং সেখানকার ফল-ফলাদি আহার করে। আরশের শামাদানে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করে। মু'মিনের রূহকে ফেরেশতাগণ জান্নাতের কাফনে জড়িয়ে আসমানে নিয়ে যান এবং তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। প্রত্যেক আসমানের ঊর্ধ্বতন ফেরেশতা দরজা পর্যন্ত তার অনুগমন করেন, এমন কি অবশেষে তা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর কাফিরদের রূহকে সর্বনিম্নতম স্থান সিজ্জিনে নিক্ষেপ করা হয়। মুমিনের রূহের জন্য ফেরেশতাগণ বেহেশতের সূক্ষ্ম কাফন নিয়ে আসেন আর কাফিরের রূহের জন্য মোটা চটের অনুরূপ চাদরের কাফন নিয়ে আসেন। মুমিনের রূহ আতরযুক্ত ও সুরভিত হয়ে থাকে। ফেরেশতাদের যে দলের নিকট দিয়েই অতিক্রম করে, তারা বলেন, সুবহানাল্লাহ কি পবিত্র রূহ! আর কাফিরের রূহ পুঁতিগন্ধময় হয়। হাফিয ইবনুল কাইয়্যেম (র) তাঁর 'কিতাবুর রূহ' পুস্তকে রূহের সূক্ষ্ম বস্তু হওয়ার সপক্ষে একশ' ষোলটি দলীল দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন। এসব দলীলে কেবল আল্লাহর কিতাব, সুন্নাতে রাসূল (সা) এবং পূর্ববর্তী মনীষীগণের মতামতই উপস্থাপন করেছেন। উক্ত হাফিয সাহেব বলেন, কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল (সা) এবং সাহাবীগণের ঐকমত্য এ বক্তব্য প্রমাণিত করে যে, রূহ একটি সূক্ষ্ম বস্তুর নাম এবং সুস্থ ও যথাযথ প্রকৃতি এরই সাক্ষ্য।[১]

ইমাম গাযালীর উস্তাদ ইমামুল হারামাইন তাঁর 'ইরশাদ' নামক পুস্তকে রূহ-এর এ বর্ণনাই দিয়েছেন যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর এটাই আল্লামা তাফতাযানী 'শারহে মাকাসিদ'-এর পরলোক বিষয়ক আলোচনায় উদ্ধৃত করেছেন। আল্লামা বুকাঈ 'সিররুর রূহ' কিতাবে ইমামুল হারমাইনের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন :

---

১. ইবনুল কাইয়্যেম, কিতাবুর রূহ, পৃ. ২৮৪।

على هذا القول دل الكتاب والسنة واجماع الصحابة وادلة العقل والفطرة

কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল, সাহাবাগণের ইজমা এবং জ্ঞান ও স্বভাব-প্রকৃতি দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, রূহ একটি সূক্ষ্ম বস্তু যা এই জড় দেহে পরিব্যাপ্ত থাকে (সিররুর-রূহ, পৃ. ৪)। আর শায়খ ইয্‌যুদ্দীন আবদুস সালাম বলেন :

ويجوز ان تكون الارواح كلها نور لطيفة شفاقة ويجوز ان يختص ذلك بارواح المؤمنين والملائكة دون ارواح الكفار والشياطين

"সম্ভবত সমস্ত রূহই নূরান্বিত, সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন। আরও সম্ভাবনা আছে যে, কাফির ও শয়তানদের রূহ ছাড়া সকল মুমিন ও ফেরেশতাদের জন্য নূরান্বিত রূহ নির্দিষ্ট।"[১] যেমন শিঙ্গা বিষয়ক হাদীসে আছে :

ان اسرافيل يدعوا لارواح فتاتيه جميعا ارواح المسلمين تتوهج نورا والاخرى مظلمة

"ইসরাফীল (আ) রূহসমূহকে আহ্বান করবেন। মুসলমানদের রূহসমূহ নূরান্বিত ও প্রোজ্জ্বল অবস্থায় উপস্থিত হবে আর কাফিরদের রূহ ঘুটঘুটে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায়।"[২]

এ হাদীস থেকে এটা জানা যায় যে, নূরান্বিত হওয়া মু'মিনদের রূহের জন্য নির্দিষ্ট আর কাফিরের রূহ হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। যদিও প্রকৃতি ও সহজাতভাবে মু'মিন ও কাফির উভয়ের রূহই নূরানী ছিল। যেমন হাদীস শরীফে আছে :

كل مولد يولد على الفطر فابواه يهودانه وينصر انه ويمجسانه .

"প্রতিটি শিশুই ফিতরাত তথা প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাদের পিতামাতা সন্তানদেরকে ইয়াহূদী, নাসারা কিংবা অগ্নিপূজকে পরিণত করে।"

মু'মিনের রূহ ঈমানের দরুন এ জন্যে অধিক ঔজ্জ্বল্য লাভ করে যে, ঈমান প্রকৃতিগতভাবেই একটি নূর। যেমন হাজরে আসওয়াদ যখন জান্নাত থেকে নাযিল হয়েছিল, তখন দুধ অপেক্ষা সাদা ছিল। আদম সন্তানের পাপরাশি একে কালো বানিয়ে দিয়েছে। অনুরূপভাবে প্রকৃতিগতভাবে কাফিরদের রূহ নূরান্বিত থাকলেও পরে শিরক এবং কুফরীর অপরাধের দরুন পরে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কারণ কুফর তথা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা প্রকৃতিগতভাবেই অন্ধকার, আর ঈমান হচ্ছে সঙ্গতভাবেই নূর। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُوْلٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

১. শারহে সুদূর, পৃ. ২১৬।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।

"যারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান। আর যারা কাফির, তাগূত (বিদ্রোহী)-রাই তাদের অভিভাবক। এরা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়।" (সূরা বাকারা : ২৫৭)

উল্লিখিত আয়াতটি এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, ঈমান হচ্ছে নূর এবং কুফর হচ্ছে অন্ধকার। আর কিয়ামতের দিন মু'মিনদের চেহারা উজ্জ্বল ও নূরান্বিত হওয়া এবং কাফিরদের চেহারা কালো ও অন্ধকারময় হওয়ার কথা কুরআন মজীদে স্পষ্ট বর্ণিত আছে : "يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ" অর্থাৎ "ঐদিন তাদের কারো চেহারা হবে শুভ্র আর কারো চেহারা হবে কৃষ্ণবর্ণ।"

এ সব কিছুই ঈমানকে নূর এবং কুফরকে অন্ধকার হিসেবে প্রকাশ করার জন্য করা হবে। এ কারণেই আল্লাহর ফেরেশতাগণ মু'মিনের রূহকে সাদা কাফনে আর কাফিরের রূহকে কালো মোটা চাদরের কাফনে গ্রহণ করে নিয়ে যাবেন। মোটকথা, কুরআনের এ সব আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে এটা জানা গেল যে, আনুগত্যের রং সাদা এবং পাপের রং কালো। যার বিস্তারিত বর্ণনার এখানে অবকাশ নেই।

রূহ ও নফসের মধ্যে কি পার্থক্য

কিছু কিছু আলিমের মতে রূহ ও নফস একই বস্তু; কিন্তু নির্ভরযোগ্য আলিমগণের মতে রূহ ও নফস দুটি পৃথক বস্তু।

উস্তাদ আবুল কাসিম কুশায়রী (র) বলেন, প্রশংসনীয় চরিত্রের খনি ও উৎসের নাম হচ্ছে রূহ এবং দুষ্ট চরিত্রের খনি এবং উৎসের নাম হচ্ছে নফস। কিন্তু সূক্ষ্মদেহী হওয়ার ব্যাপারে উভয়ে এক। যেমন ফেরেশতা এবং শয়তান উভয়ে সূক্ষ্মদেহী হওয়ার ব্যাপারে এক। কিন্তু ফেরেশতা নূর দ্বারা সৃষ্ট এবং শয়তান আগুন দ্বারা তৈরি। ফেরেশতাকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর দিয়ে এবং শয়তানকে আগুন দিয়ে। যেমন সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে খোলাখুলি বলা হয়েছে। হাফিয ইবন আবদুল বার এ ব্যাপারে যে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, তা হলো এই :

ان الله خلق ادم وجعل فيه نفسا وروحا فمن الروح عفافه وفهمه وحمله وسحاءه ووفاءه ومن النفس شهوته وطيشه وسفهه وغضبه ونحو هذا .

"আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) কে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর মধ্যে একটি নফস ও একটি রূহ রাখলেন। ফলে রূহ থেকে ক্ষমা, বিবেচনা, ধৈর্য, দানশীলতা ও বিশ্বস্ততা ইত্যাদি প্রকাশ পায় এবং নফস থেকে কুপ্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয় প্রবণতা, নির্বুদ্ধিতা, ক্রোধ ও এ ধরনের দুশ্চরিত্রতামূলক কাজগুলো প্রকাশ পায়।"[১]

১. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ ১৯৭।

মোটকথা হলো, প্রশংসনীয় চরিত্র এবং পসন্দনীয় গুণাবলী রূহের দ্বারা প্রকাশ পায় আর চরিত্রের দোষসমূহ নফস আম্মারাহ থেকে প্রকাশ পায়। খোদ কুরআন এবং হাদীস নিয়ে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলেই এটা বুঝা যায় যে, কুপ্রবৃত্তি, নির্বুদ্ধিতা, ইন্দ্রিয় প্রবণতা এবং এ ধরনের চারিত্রিক দূষণীয় কর্মগুলো কুরআন এবং হাদীসে নফস আম্মারাহর সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে, রূহের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيْ اَنْفُسُكُمْ

"তোমাদের জন্য জান্নাতে তাই রয়েছে যা তোমরা ইচ্ছা কর।"

(সূরা হা-মীম সাজদাহ : ৩১)

তিনি আরো বলেছেন : وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ "মানুষ লোভহেতু স্বভাবত কৃপণ।" (সূরা নিসা : ১২৮)

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه وَنَهَى النَّفْس عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى

"পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং নিজকে প্রবৃত্তি হতে বিরত রাখে, জান্নাত হবে তাদের আবাসস্থল।"

(সূরা নাযি'আত : ৪০-৪১)

এ আয়াতসমূহে প্রবৃত্তি, লোভ, ইত্যাদি কামনা-বাসনাকে নফসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আর এমনটি বলেননি যে :

ولكم فيها تشتهى ارواحكم احضرت الارواح الشح ونهى الروح عن الهوى

এবারে নির্বুদ্ধিতার ব্যাপারটি দেখুন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ

"যে নিজেকে নির্বোধ বানিয়েছে, একমাত্র সেই ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ থেকে বিমুখ হবে!" (সূরা বাকারা : ১৩০)

এ আয়াতে নির্বুদ্ধিতাকে নফসের প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন এবং الا من سفهت روحه বলেননি। ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি ও ক্রোধের কথা ধরুন, হাদীস শরীফে এসেছে, ঐ ব্যক্তি পাহলোয়ান ও শক্তিশালী বীর, যে ক্রোধের অবস্থায় নিজের নফসকে সংযত রাখে। এখানে বলা হয়নি 'যে রূহকে সংযত রাখে।' অধিকন্তু হাদীসসমূহে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্যে অধিক তাকিদ এসেছে। আর নফসের বিরুদ্ধে জিহাদকে 'জিহাদে আকবর' বা বড় জিহাদ বলা হয়েছে। কিন্তু রূহের বিরুদ্ধে জিহাদ করার কথা কোন হাদীসে দেখা যায়নি। এমনকি একটি দুর্বল সনদ বিশিষ্ট হাদীসে এসেছে : اعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك অর্থাৎ "তোমার সবচে' বড় দুশমন হচ্ছে তোমার নফস, যা তোমার দু' পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে।" এ হাদীস থেকে দুটি বিষয় জানা যায়, প্রথমত নফস হচ্ছে সবচে' বড় দুশমন আর দ্বিতীয় যে বিষয় জানা গেল, সেটি হলো

দু'পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থানে নফসের অবস্থান। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় রূহ হচ্ছে নফস থেকে পৃথক বস্তু। কারণ রূহ মানুষের শত্রু নয়; দ্বিতীয়ত এই যে, রূহ মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবাহিত ও বিতৃত, পাঁজরের সাথে নির্দিষ্ট নয়। অধিকন্তু, হযরত খুযায়মা ইবন হাকিম (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা) কে নফসের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন, এটা কলবে। এ হাদীসটি তাবারানীকৃত 'মু'জামে আওসাতে' বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে।[1] এছাড়া হিংসা এবং অহংকারকে কুরআন মজীদে নফসের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে : حسدا من عند انفسهم "ঈর্ষামূলক মনোভাব বশত..."(সূরা বাকারা : ১০৯) لقد استكبروا فى انفسهم। "এবং ওরা ওদের অন্তরে (নফসে) অহংকার পোষণ করে..."(সূরা ফুরকান : ২১)। অধিকন্তু, আল্লাহ তা'আলার এ বাণী : ان النفس لامارة بالسوء "নফস অবশ্যই মন্দ কাজের জন্যে অধিক নির্দেশদাতা।" এর উপর সরাসরি নির্ভর করে যে, সমস্ত মন্দ ও খারাপীর খনি ও উৎসমূল হলো নফস। পবিত্র কুরআনের কোথাও বলা হয়নি যে, ان الروح لامارة بالسوء "নিশ্চয়ই মন্দ কাজের জন্যে অধিক নির্দেশদাতা।" হযরত ওহাব ইবন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত আছে যে, রূহ মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং নফস খারাপীর দিকে; কলব যদি মু'মিন হয় তবে রূহ এর আনুগত্য করে (ইবন আবদুল বার-এর তামহীদ থেকে)।[2] তাবাকাতে ইবন সাদ-এ ওহাব ইবন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু প্রথমে মাটি ও পানি দিয়ে হযরত আদম (আ)-এর পুত্তুলি তৈরি করেন। অতঃপর এতে নফস সৃষ্টি করেন। এর পরে তাতে রূহ ফুঁকে দেন।[3] কাজেই জানা গেল যে, নফস ও রূহ আলাদা আলাদা বস্তু। রূহ 'আলমে আমর' থেকে আর নফস 'আলমে খালক' থেকে সৃষ্ট। আল্লামা বুকাঈ 'সিররুর-রূহ' কিতাবে লিখেছেন :

وفى زاد المسير لابن الجوزى فى تفسير سورة الزمر عن ابن عباس ابن ادم نفس وروح فالنفس العقل والتمييز والروح النفس والتحريك فاذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه وقال ابن جريج فى الانسان روح ونفس بينهما حاجز فهو تعالى يقبض النفس عند النوم ثم يردها الى الجسد عند الانتباه فاذا اراد اماتة العبد فى النوم لم يرد النفس وقبض الروح والله اعلم

"আল্লামা ইবনুল জাওযীর কিতাব 'যাদুল মাসীরে' সূরা যুমারের তাফসীরে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, মানুষ রূহ ও নফসের সমষ্টি। মানুষ নফস দ্বারা পাওয়ার চেষ্টা ও বিবেচনা করে এবং রূহ দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে ও নড়াচড়া

---

১. শারহুস সুদূর, পৃ. ২১৭।

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬।

৩. প্রাগুক্ত।

করে। যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ তার নফসকে কবয করে নেন, কিন্তু রূহ কবয করেন না। ইবন জুরায়জ বলেন, মানুষের মধ্যে একটি রূহ এবং একটি নফস থাকে, আর এর মধ্যে একটি পর্দা অন্তরাল থাকে। ঘুমানোর সময় আল্লাহ নফসকে কবয করে নেন এবং জাগ্রত হওয়ার সময় তা ফিরিয়ে দেন। আর যখন আল্লাহ কাউকে ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যুদানের ইচ্ছা করেন, তখন তার নফস ফিরিয়ে দেন না এবং রূহকে কবয করে নেন। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

রূহের আকৃতি

রূহের আকৃতি দৃশ্যত তাই, যেমন মানুষ। যেমন শরীরের চোখ নাক হাত পা আছে, তেমনি রূহেরও চোখ নাক হাত পা ইত্যাদি আছে। প্রকৃত মানুষ তো রূহ; আর এ দৃশ্যে শরীর হচ্ছে রূহের পোশাকতুল্য। শরীরের হাত রূহের হাতের জন্য জামার আস্তিনের মত এবং পদদ্বয় পায়জামার অনুরূপ, আর মাথা টুপির ন্যায় ও চেহারা নেকাবের সদৃশ। তা এভাবেই কিয়াস করা যায়।

আল্লামা আরেফ রূমী বলেন :

جان همه نور است وتن رنگست بو　　رنگ وبو بگزار دیگر آن بگو
رنگ دیگر شد ولیکن جان پاك　　فارغ از رنگست وازار کان خاك
عالم خلق است باسو جهات　　بے جهت دان عالم امر و صفات
بے جهت دان عالم امرای صنم　　بے جهت تر باشد آمر لا جرم
روح من چون امر ربی مختفی است　　هر مثالیکه بگویم منتفی است

“প্রাণ পুরোটাই হচ্ছে আলো আর দেহ হচ্ছে রং ও বর্ণের সমষ্টি। কাজেই দেহ ও রং ত্যাগ কর এবং অন্য কথা বল। রং বদলে যায় কিন্তু আত্মা পবিত্র ও রং থেকে বিচ্ছিন্ন। মাটির বৈশিষ্ট্য তাকে স্পর্শ করতে পারে না, সৃষ্টি জগতে শত শত দিক রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্র নির্দেশ ‘রূহ’ এবং সিফাতের কোন দিক নেই।”

কাফিরগণ কর্তৃক হযরত (সা) কে কষ্ট দেয়া

কুরায়শগণ যখন দেখল যে, সর্বোচ্চ পর্যায়ে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে এবং প্রকাশ্যে মূর্তিপূজার কুফল বর্ণনা করা হচ্ছে, তখন তারা এটা বরদাশত করতে পারল না এবং যিনি এক আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছিলেন, তাঁর সাথে তারা দুশমনি ও শত্রুতায় কোমর বেঁধে লেগে গেল, তাওহীদের মুকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, নবী (সা) কে এ পরিমাণ কষ্ট-যাতনা দিতে হবে, যাতে তিনি ইসলামের দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত থাকেন।

১. ‘মু‘জামে তাবারানী’তে হযরত মুনীব গামিদী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে লোকদের উদ্দেশ্য করে বলতে শুনলাম, হে লোক সকল!

বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং স্বস্তি লাভ করো। কিন্তু বদবখত কতিপয় দুর্ভাগা তাঁকে গালি-গালাজ করছিল এবং তাঁর প্রতি থু থু নিক্ষেপ করছিল; আর কেউ নিক্ষেপ করছিল মাটি। এভাবে দুপুর হয়ে গেল। ঐ সময় একটি বালিকা পানি নিয়ে এল এবং তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল ও হাত ধুয়ে দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কে ? লোকেরা বলল, তাঁর কন্যা যয়নব (রা)।

ইমাম বুখারী একই সনদে হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হারিস ইবন হারিস গামিদী (রা) থেকেও বর্ণিত আছে। তাতে অতিরিক্ত আছে যে, রাসূল (সা) হযরত যয়নব (রা) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, প্রিয়তমা কন্যা! তুমি তোমার পিতার পরাজিত ও অপদস্থ হওয়ায় দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ো না। ইমাম বুখারী কর্তৃক তাঁর 'তারিখ'-এ বর্ণিত এবং তাবারানী, আবূ নুয়ায়ম, আবূ যুরআ ও আল্লামা দিমাশকী হাদীসটি সহীহ বলেছেন।[১]

২. হযরত তারিক ইবন আবদুল্লাহ আল-মুহারিবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে যুল-মাজায বাজারে দেখলাম, তিনি যেতে যেতে বলছেন, হে লোক সকল ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল, মুক্তি পাবে, কল্যাণ লাভ করবে। এদিকে তাঁর পিছে পিছে এক ব্যক্তি পাথর ছুঁড়ছিল, আর হযরতের পবিত্র দেহ রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে। লোকটি বলছিল, হে লোক সকল ! এর কথা শুনো না, কেননা সে মিথ্যাবাদী। এটি ইবন আবূ শায়বার বর্ণনা।[২]

৩. বনী কিনানার এক শায়খ বলেন, আমি নবী করীম (সা) কে যুল-মাজায বাজারে দেখলাম, তিনি বলতে বলতে যাচ্ছিলেন যে, হে লোক সকল! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল, মুক্তি পাবে, কল্যাণ লাভ করবে। আর আবূ লাহাব তাঁর প্রতি মাটি নিক্ষেপ করতে করতে বলছে, হে লোকেরা ! তোমরা এর ধোঁকায় পড়ো না; এ তোমাদেরকে লাত ও উযযা থেকে বিমুখ করতে চায়। আর রাসূলুল্লাহ (সা) তার কথায় একটুও ভ্রূক্ষেপ করছিলেন না।[৩]

৪. হযরত উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) বলেন, আমি একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কে মুশরিকগণ যে কষ্ট দিয়েছে, তা বর্ণনা করুন। আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) বললেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) নামায আদায় করছিলেন, এ সময় উকবা ইবন আবূ মুয়াইত একটা কাপড় তাঁর গলায় দিয়ে এমন জোরে পেঁচাতে শুরু করলো যে, এতে তাঁর শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। সামনের দিক থেকে হযরত আবূ বকর (রা) এসে পড়লেন এবং উকবাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। তখনই হযরত আবূ বকর (রা) এ আয়াত পাঠ করলেন :

---

১. কানযুল উম্মাল, ৬খ. পৃ. ৩০৬।

২ প্রাগুক্ত, ৬খ. পৃ. ৩০২।

৩. মুসনাদে আহমদ, ৪খ. পৃ. ৬৩।

اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ

"তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যে বলে, আমার রব আল্লাহ। আর সে ব্যক্তি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছে।"

ফিরাউন ও হামান যখন হযরত মূসা (আ) কে হত্যার পরামর্শ করল, তখন ফিরাউনের লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি যে গোপনে হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল, সে তাদেরকে যে কথা বলেছিল, সেটাই আল্লাহ তা'আলা কুরআনের এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন :

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ

"ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তি, যে মুমিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখত, সে বলল, তোমরা কি একজন লোককে এ জন্যেই হত্যা করবে যে, সে বলে, আল্লাহ আমার রব। অথচ সে তোমাদের রব্বের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছে।" (সূরা মুমিন : ২৮)

মুসনাদে বাযযার ও দালাইলে আবূ নুয়াইমে মুহাম্মদ ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আলী (রা) খুতবার শুরুতে বললেন, বল দেখি সবচে' শক্তিশালী ও বাহাদুর ব্যক্তি কে ? লোকেরা বলল, আপনি। আলী (রা) বললেন, আমার অবস্থা তো এই যে, কেউ যদি আমার সাথে মুকাবিলা করে, তখন আমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করি। সবচে' বেশি শক্তিশালী তো ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা)। আমি একবার দেখেছিলাম, কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ (সা) কে মারতে উদ্যত অবস্থায় তিনি বলছেন : انت الالهة الها واحدا অর্থাৎ "তুমিই আমাদের সমস্ত মাবূদকে এক মাবূদ বানিয়ে দিয়েছ।" আমাদের কারোই এ সাহস হচ্ছিল না যে, তাঁর নিকটে যাই এবং তাঁকে দুশমনদের নিকট থেকে ছাড়িয়ে আনি। হঠাৎ সেখানে হযরত আবূ বকর (রা) এসে পড়লেন এবং তিনি শত্রুর দলের মধ্যে ঢুকে পড়ে একে এক ধাক্কা, ওকে এক ঘুষি দিলেন। এ সময় যেমন সেই মর্দে মুমিন ফিরাউন ও হামানকে বলেছিলেন اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ অনুরূপভাবে আবূ বকরও কাফিরদের উদ্দেশ্য করে বলছিলেন : وَيْلَكُمْ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ অর্থাৎ "আফসোস, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এ জন্যে হত্যা করবে, সে বলে, আমার প্রভু আল্লাহ...।"

হযরত আলী (রা) এ কথা বলে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি যে, বলো, ফিরাউনের বংশের সেই ব্যক্তি উত্তম ছিলেন, না আবূ বকর ? লোকজন চুপ করে রইল। তিনি অতঃপর বললেন, আল্লাহর কসম, আবূ বকরের এক ঘন্টা ফিরাউন বংশীয় ঐ মর্মে মু'মিনের সারা জীবন থেকে

মর্যাদার দিক থেকে উত্তম। ঐ ব্যক্তি তার ঈমানকে গোপন করেছিলেন আর আবূ বকর তাঁর ঈমানকে নির্ভয়ে প্রকাশ করেছিলেন। [ফাতহুল বারী (৭খ. পৃ. ১২৯) ما لقى النبى ﷺ واصحابه من المشركين بمكة অধ্যায়]। অধিকন্তু, ঐ ব্যক্তি কেবল মুখে উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন। আর আবূ বকর (রা) মৌখিক উপদেশ ছাড়াও হাত দ্বারা নবী (সা)-এর সাহায্য- সহায়তা করেছেন।

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা)-এর এক বর্ণনায় আছে, যা ইমাম বুখারী (র) তাঁর গ্রন্থের خلق افعال العباد অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন আর আবূ ইয়ালা ও ইবন হিব্বান এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন যে, দুশমন যখন পৃথক হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন :

والذى نفسى بيده ما ارسلت اليكم الابالذبح

"ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের মত (আল্লাহ্র চরম অবাধ্য) লোকদের হত্যা করার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।" (ফাতহুল বারী, ما لقى النبى ﷺ واصحابه من المشركين بمكة অধ্যায়)।

আর 'দালাইলে আবূ নুয়াইম', 'দালাইলে বায়হাকী' ও 'সীরাতে ইবন ইসহাকে'র বর্ণনায় এ-ও আছে যে, তাঁর এ কথা বলামাত্র কাফিরদের উপর পরাজয়ের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকল। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ অবস্থানে মাথা হেঁট করে বসে রইল।[১] কেননা তারা জানত যে, তিনি (সা) যা বলবেন, তা অবশ্যম্ভাবী।

৬. মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ও মুসনাদে বাযযারে হযরত আনাস (রা) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে, একবার কুরায়শগণ তাঁকে এতই মেরেছিল যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। আবূ বকর (রা) তাঁকে সাহায্যের জন্য এলে ওরা তাঁকে ছেড়ে আবূ বকরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুসনাদে আবূ ইয়া'লায় হাসান সনদে হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, ওরা আবূ বকর (রা) কে এতই প্রহার করেছিল যে, তাঁর মাথা যখম হয়ে গিয়েছিল। যখমীর কারণে তিনি মাথায় হাতও দিতে পারছিলেন না।[২]

৭. হযরত উসমান ইবন আফফান (রা) বলেন, একবার আমি নবী করীম (সা)-কে বায়তুল্লাহ তাওয়াফরত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তিনি তাওয়াফ করছিলেন আর উকবা ইবন আবূ মুয়াইত, আবূ জাহল ও উমায়্যা ইবন খালফ হাতীমে বসেছিল। তিনি যখন ওদের সামনে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন ওরা তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে কিছু অশোভন বাক্য বলল। তিনি দ্বিতীয়বার যাওয়ার সময়ও ওরা এরূপ বলল। যখন তিনি তৃতীয়বার ওদের সামনে এলেন, তখনও ওরা একই ধরনের বেহুদা কথা বলছিল। এতে তাঁর পবিত্র চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৪৪; সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৯৮।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১২৯।

বললেন, আল্লাহর কসম, শীঘ্রই তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব না আসা পর্যন্ত তোমরা বিরত হবে না। হযরত উসমান (রা) বলেন, তখন সেখানে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না, যে ভয়ে কাঁপছিল না। এ বলে তিনি গৃহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। আমরাও তাঁর অনুগমন করলাম। তখন হযরত (সা) আমাদেরকে বললেন :

ابشروا فان الله مظهر دينه ومتم كلمته وناصر دينه ان هؤلاء الذين تدرون ممن يذبح بايديكم عاجلا فوالله لقد رأيتهم ذبحهم الله بايدينا

"তোমাদের জন্য সুসংবাদ, আল্লাহ অবশ্যই তাঁর দীনকে বিজয়ী করবেন, তাঁর বাণীকে পূর্ণ করবেন, স্বীয় দীনকে সাহায্য করবেন। আর ঐ লোক, যাদের তোমরা দেখছ, শীঘ্রই আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের হাতে হত্যা করাবেন। হযরত উসমান (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা দেখেছি, আল্লাহ ওদেরকে আমাদের হাতে যবেহ করিয়েছেন।" এ বর্ণনা দারা কুতনীর।[১] 'দালাইলে আবূ নুয়াইমে'ও এ বর্ণনা আছে এবং ফাতহুল বারী (৭খ. পৃ.১২৮)-তেও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) হারাম শরীফে নামায আদায় করছিলেন। এবং আবূ জাহল ও তার সঙ্গী-সাথীরাও[২] সেখানে উপস্থিত ছিল। আবূ জাহল[৩] বলল, এমন কেউ নেই কি, যে অমুক উটের নাড়িভুড়ি উঠিয়ে আনবে আর মুহাম্মদ (সা) যখন সিজদায় যাবে, তার পিঠের উপর রেখে দেবে ? ঐ সময়[৪] সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ ছিল, অর্থাৎ উতবা ইবন আবূ মুয়াইত,[৫] সে উঠল এবং উটের ঐ নাড়িভুড়ি এনে রাসূল (সা)-এর পিঠের উপর রেখে দিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) বলেন, আমি এ দৃশ্য দেখছিলাম, কিন্তু কিছুই করার ছিল না। ওদিকে মুশরিকরা পরস্পরের প্রতি তাকিয়ে হাসছিল। আর হাসির চোটে একে অপরের উপর গড়িয়ে পড়ছিল।

---

১. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১০৪।

২. আবূ জাহলের সঙ্গী-সাথী দ্বারা ঐ সব লোক বুঝায়, যাদের নাম নিয়ে হুযূর (সা) বদদু'আ করেছিলেন। যেমনটি এ বর্ণনারই শেষে উল্লেখ আছে। আর মুসনাদে বাযযারে তা বিশদভাবে উল্লেখিত আছে। (ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৩০১)।

৩. সহীহ বুখারীতে আবূ জাহলের নাম স্পষ্ট উল্লেখ নেই, মুসলিমের রিওয়ায়াতে উল্লেখ আছে। (ফাতহুল বারী)।

৪. প্রকৃতপক্ষে তো আবূ জাহলই সবচে' পাপিষ্ঠ ছিল। কেননা সে ছিল ঐ সম্প্রদায়ের ফিরাউন, কিন্তু ঐ সময়ে সর্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ ও হতভাগ্য উকবা ইবন আবূ মুয়াইতই ছিল। কেননা আবূ জাহল ও অন্যান্যরা তো কেবল উস্কানী দিয়েছিল, আর ঐ হতভাগ্য তা কার্যে পরিণত করেছিল। আর প্রকাশ থাকে যে, কার্যে বাস্তবায়ন উস্কানীর চেয়ে কঠিন অপরাধ। যেমন 'কুদার' জনগণকে উস্কানী দেয়ার ফলে তারা সালিহ (আ)-এর উটনীকে যবেহ করে ফেলল, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ إِذِ انۢبَعَثَ أَشْقَاهَا এজন্যে আল্লাহ তা'আলা তাকেই সবচে' বেশি পাপিষ্ঠ বলেছেন।

৫. উকবা ইবন আবূ মুয়াইতের নামের উল্লেখ মুসনাদে আবূ দাঊদ তায়ালিসীতে আছে (ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৩০২)। উপরন্তু এ হাদীসটি ইমাম বুখারী কিতাবুল জিহাদের শেষে طرح جيف المشركين فى البر অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

ঐ মুহূর্তে সেখানে হযরত ফাতিমা এসে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি চার-পাঁচ বছরের বালিকা মাত্র, দৌড়ে গিয়ে হযরতের উপর থেকে ঐ বোঝা সরিয়ে দিলেন। রাসূল (সা) সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করলেন এবং কুরায়শদের জন্য তিনবার বদ দু'আ করলেন। তাদের কাছে তাঁর বদ দু'আ দুঃসহ মনে হলো। কেননা কুরায়শদের বিশ্বাস[১] ছিল যে, এ শহরে দু'আ কবূল হয়। এরপর তিনি বিশেষভাবে আবূ জাহল, উকবা ইবন রবীয়াহ, শায়বা ইবন রবীয়াহ, ওলীদ ইবন উকবা, উমায়্যা ইবন খালফ, উকবা ইবন আবূ মুয়াইত এবং আম্মারা ইবন ওলীদের নাম ধরে ধরে বদদু'আ করেন। তাদের অধিকাংশ বদর যুদ্ধে নিহত হয়।[২]

বুখারী শরীফের কিতাবুত তাহারাত ও কিতাবুস সালাতের এক বর্ণনায় আছে যে, কাপড় পাক সংক্রান্ত কুরআনী নির্দেশ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ এ ঘটনার পরেই নাযিল হয়েছে।[৩] হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি দুটি মন্দতম প্রতিবেশীর মাঝখানে বাস করছি, আবূ লাহাব এবং উকবা ইবন আবূ মুয়াইত। এরা উভয়েই আমার দরজায় ময়লা আবর্জনা রেখে দিত।[৪]

হযরত যিমাদ ইবন সালাবা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

যিমাদ ইবন সালাবা ইয়্দী জাহিলী যুগ থেকেই নবী করীম (সা)-এর বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি মন্ত্র ও ঝাড়-ফুঁকের দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করতেন। মহানবী (সা)-এর নবূয়াত লাভের পর তিনি মক্কায় এলেন। দেখলেন, একদল বালক নবীজীর পিছু নিয়েছে, তাদের কেউ তাঁকে জাদুকর, কেউ গল্পকার বলছে, আবার কেউ কেউ তাঁকে পাগল বা উম্মাদও বলছে। যিমাদ তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, আমি পাগলের চিকিৎসা জানি। আপনি আমাকে চিকিৎসা করার অনুমতি দিন। সম্ভবত আল্লাহ আমার হাতে আপনাকে আরোগ্য দান করবেন। তিনি (সা) ইরশাদ করলেন :

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له وانى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

---

১. সহীহ মুসলিমে আছে যে, তাঁর আওয়ায শোনামাত্র তাদের সমস্ত হাসি কর্পূরের মত উড়ে গেল এবং তাঁর বদদু'আয় তারা ভীত হয়ে পড়ল (ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৩০২)।

২. কুরায়শদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শরী'আতের কিছু কিছু বিষয় অবশিষ্ট ছিল। সম্ভবত মক্কার হারামে দু'আ কবূল হওয়ার বিশ্বাসও শরী'আতে ইবরাহীমের অবশিষ্ট বিশ্বাস ছিল (ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৩০২)।

৩. ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ৫২১।

৪. যারকানী, ১খ. পৃ. ২৫১।

"আলহামদু লিল্লাহ, আমরা সবাই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও স্তুতি জ্ঞাপন করছি এবং তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করছি, তাঁরই ক্ষমার প্রত্যাশী। নিজেদের নফসের খারাপী থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর সত্য রাসূল।"

যিমাদ বলেন,আমি বললাম, এ বাক্যগুলো পুনরায় বলুন। আল্লাহর কসম, আমি অনেক কবিতা শুনেছি একং গল্পকারদের অনেক তন্ত্রমন্ত্রও শুনেছি, কিন্তু আল্লাহর শপথ, এ ধরনের বাক্য তো আমি কখনো শুনিনি। এ বাক্যাবলী তো বিশুদ্ধ ভাষার সমুদ্রের তলদেশ থেকে উৎসারিত। আর আমিও তাই বলছি যে,

وانى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই; এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

যিমাদ এভাবে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হলেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষে তাঁর হাতে বায়য়াত হলেন।[১]

হাফিয ইরাকী বলেন :

ثم الى ضماد وهو الازدى يستبين امره بالنقد

ما هو الا ان محمدا خطب اسلم للوقت وذهب

"নুবূয়াত প্রাপ্তির পাঁচ অথবা নয় বছর পর যিমাদ ইবন সালাবা আযাদী অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য মক্কায় উপস্থিত হন" (যেমনটি শারহে বলা হয়েছে),তিনি (সা) যিমাদের সামনে এক খুতবা পাঠ করেন, যা শুনেই যিমাদ তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে যান।"

বিশিষ্ট দুশমনবৃন্দ

তাওহীদের ঘোষণা ও দাওয়াতের পর সমস্ত মক্কাবাসীই তাঁর দুশমনে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু যে সব ব্যক্তি হযরত (সা)-এর বিরুদ্ধে দুশমনী ও শত্রুতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। তাদের নাম নিম্নে দেয়া হলো :

১. আবূ জাহল ইবন হিশাম, ২. আবূ লাহাব ইবন আবদুল মুত্তালিব,
৩. আসওয়াদ ইবন আবদ ইয়াগূস, ৪. হারিস ইবন কায়স,
৫. ওলীদ ইবন মুগীরা, ৬. উমায়্যা ইবন খালফ ও
৭. উবাই ইবন খালফ অর্থাৎ খালফের পুত্রদ্বয়,
৮. আবূ কায়স ইবন ফাকাহ, ৯. আস ইবন ওয়ায়েল,

১. ইসাবা, ২খ. পৃ. ২১৯; অধিকন্তু, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৩৬।

১০. নাযর ইবন হারিস, ১১. মানবা ইবন হাজ্জাজ,
১২. যুহায়র ইবন আবূ উমায়্যা, ১৩. সাইব ইবন সায়ফী,
১৪. আসওয়াদ ইবন আবদুল আসওয়াদ,
১৫. আস ইবন সাঈদ, ১৬. আস ইবন হাশিম,
১৭.উকবা ইবন আবূ মুয়াইত, ১৮. ইবনুল আসদী,
১৯. হাকাম ইবন আস, এবং ২০. আদী ইবন হামরা।

এদের মধ্যে বেশিরভাগ তাঁর প্রতিবেশী, মান্যবর ও সম্ভ্রান্ত ছিল, তাঁর প্রতি শত্রুতায় ছিল উৎসাহী। দিবারাত্র তাদের এটাই ছিল কর্ম, এটাই ছিল ধ্যান। আবূ জাহল, আবূ লাহাব এবং উকবা ইবন আবূ মুয়াইত ছিল সব চেয়ে অগ্রসর।[১] আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদি রীতি তো এটাই যে, যখন তিনি কোন বস্তু সৃষ্টি করেন, তখন এর বিপরীত অর্থাৎ বিরোধীও তৈরি করেন। যেমন আল্লাহ বলেন :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" (সূরা যারিয়াত : ৪৯)

কাজেই যেমন আল্লাহ তা'আলা আলোর বিপরীতে অন্ধকার, দীর্ঘকায়ের বিপরীতে খর্বকায় সৃষ্টি করেছেন, একইভাবে কল্যাণের বিপরীতে অকল্যাণ এবং হিদায়াতের বিপরীতে ভ্রষ্টতা ও ফিরিশতাদের বিপরীতে শয়তানদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে সত্য ও মিথ্যার মুকাবিলা এবং দ্বন্দ্ব চলতে থাকে আর লোকজন স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে যে কোন এক পক্ষ গ্রহণ করে। এটা যেন না হয় যে, কোন এক পক্ষ গ্রহণ করতে তারা বাধ্য হয়ে পড়ে। যদি কেবল সত্য ও সত্যপন্থীদের সৃষ্টি করা হতো এবং বাতিলের কোন অস্তিত্বই না থাকত, তা হলে মানুষ সত্য গ্রহণে বাধ্য হতো– যা সরাসরি প্রজ্ঞা বিরোধী। শরী'আতের উদ্দেশ্য কখনই এটা নয় যে, মানুষ বাধ্যতামূলকভাবে ও চাপে পড়ে ইসলাম গ্রহণ করুক। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا

"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে, তারা সবাই ঈমান আনতো। (সূরা ইউনুস : ৯৯)

এজন্যে আল্লাহ তা'আলা যখন নবী (আ)গণকে পয়দা করেন, তখন তাঁদের বিরোধিতা করার জন্য জিন ও মানুষরূপী শয়তানকেও সেইসাথে সৃষ্টি করেছেন, যাতে পৃথিবীবাসী হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব এবং হিদায়াত ও গুমরাহীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত ভালভাবে প্রত্যক্ষ করে এবং নিজের ইচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে হক ও বাতিলের মধ্যে যে পক্ষ ইচ্ছা, গ্রহণ করতে পারে। নিম্নের আয়াতে এরই মর্মের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে :

---

১. তাবাকাতুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৩৪।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ

"এরূপে আমি মানুষ ও জিনের মধ্যে শয়তানকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি।" (সূরা আনআম : ১১২)

কাজেই যেমন প্রত্যেক ফিরাউনের জন্য একজন মূসা প্রয়োজন, ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যেক মূসার জন্যও একজন ফিরাউন আবশ্যক। তর্কশাস্ত্রের একটি স্বীকৃত নিয়ম হলো, প্রত্যেক বিষয়ের বিপরীত আবশ্যকীয় ও সত্য হয়।

در کار خانهء عشق از کفر ناگزیر است دوزخ کرابسوز دگر بولهب بناشد

"প্রেমের রাজ্যে অস্বীকৃতি অনিবার্য; আবূ জাহল না থাকলে দোযখ জ্বালাত কাকে?"

এজন্যে আমরা হযরত রাসূল (সা)-এর কতিপয় বিশিষ্ট দুশমনের অবস্থা সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরছি।

আবূ জাহল ইবন হিশাম

নবী (সা)-এর উম্মতের ফিরাউন ছিল, যে তাঁর সাথে শত্রুতা ও বিরুদ্ধাচরণে এক মুহূর্তও বিরত থাকেনি। আবূ জাহলের শত্রুতার কিছু কিছু ঘটনা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, আর সামনে আরো কিছু বর্ণনা করা হবে। মৃত্যুকালীন সময়ে সে যে বক্তব্য দিয়েছিল (যার বিস্তারিত বিবরণ ইনশা আল্লাহ্ বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে) যা দ্বারা সম্মানিত পাঠকবর্গ আবূ জাহলের শত্রুতা ও বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন। আবূ জাহলের নাম ছিল আবুল হাকাম, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে আবূ জাহল উপাধি দান করেন যেমনটি ফাতহুল বারী ذكر نبى ﷺ من يقتل ببدر অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। আবূ জাহল নিজে বলত যে, আমার নাম আযীয করীম, অর্থাৎ সম্মানিত নেতা। সে প্রেক্ষিতে এ আয়াতসমূহ নাযিল হয় :

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ۝ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ۝ كَالْمُهْلِ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ ۝ كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ ۝ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ۝ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۝ ذُقْ اَنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۝ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ

"নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে—পাপীর খাদ্য, গলিত তামার মত, তা তার উদরে ফুটতে থাকবে–ফুটন্ত পানির মত। ওকে ধর এবং জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাও, তারপর তার মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে শাস্তি দাও এবং বলা হবে, আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। এটা তো তাই, যে বিষয়ে সন্দেহ করতে।[1] (সূরা দুখান : ৪৩-৫০)

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১৩৬।

আবূ লাহাব

আবূ লাহাব ছিল তার উপাধি, প্রকৃত নাম ছিল আবদুল উযযা ইবন আবদুল মুত্তালিব। সম্পর্কের দিক থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আপন চাচা ছিল। প্রথমে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) কুরায়শগণকে একত্রিত করে আল্লাহর বাণী শোনান, তখন সবার আগে আবূ লাহাবই তাঁকে মিথ্যা বলে অভিহিত করে এবং বলে : تبا لك سائر اليوم الهذا اجمعتنا। "আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন, এজন্যেই কি তুমি আমাদের একত্রিত করেছ ?"

এ প্রসঙ্গে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়। আবূ লাহাব যেহেতু খুবই সম্পদশালী ছিল, এজন্যে যখন তাকে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখান হতো, তখন সে বলত, যদি আমার ভাইপোর কথাই সত্য হয়, তা হলে কিয়ামতের দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি উপঢৌকন দিয়ে মুক্তি পাব। তার জবাবে আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে জানালেন مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ "তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসে নি।" (সূরা লাহাব : ২) আয়াতটি দ্বারা এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তার স্ত্রী উম্মে জামিল বিনতে হারব অর্থাৎ আবূ সুফিয়ান ইবন হারবের বোনেরও হযরত (সা)-এর প্রতি ক্রোধ ও শত্রুতা ছিল। রাতের বেলা সে নবীজী (সা)-এর পথে কাঁটা ছড়িয়ে রাখত (তাফসীরে ইবন কাসীর ও রূহুল মা'আনী)।

ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে যে, যখন উম্মে জামিল জানতে পেল যে, তার এবং তার স্বামীর ব্যাপারে সূরা নাযিল হয়েছে, তখন একটি পাথর নিয়ে তাঁকে হত্যার উদ্দেশে দৌড় দিল। ঐ সময় তিনি ও হযরত আবূ বকর (রা) মসজিদে হারামে গিয়েছিলেন। উম্মে জামিল যখন সেখানে পৌঁছল, তখন আল্লাহ তা'আলা তার চোখের উপর এমন পর্দা দিয়ে দিলেন যে, সে কেবল হযরত আবূ বকরকেই দেখতে পাচ্ছিল, নবী (সা) কে দেখতেই পাচ্ছিল না। উম্মে জামিল আবূ বকর (রা) কে জিজ্ঞেস করল, তোমার সঙ্গী কই? আমি জানতে পেলাম সে আমাকে অভিসম্পাত দেয় ও নিন্দাবাদ করে। আল্লাহর শপথ! আমি যদি তাকে পেতাম তা হলে এই পাথর দ্বারা তাকে হত্যা করতাম। আল্লাহর কসম, আমি একজন বড় কবি। এরপর সে বলল ঃ

مذمما عصينا * وامره ابينا * ودينه قلينا *

"অভিসম্পাত দিয়েছি আমরা তাকে, তার অবাধ্যতা করেছি, আর তার নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেছি ও তার দীনের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছি।"

শত্রুতার দরুন নবী (সা)-কে তারা মুহাম্মদের পরিবর্তে 'মুযাম্মাম' বলত। 'মুহাম্মদ' শব্দের অর্থ প্রশংসিত আর 'মুযাম্মাম' শব্দের অর্থ নিন্দিত ও মন্দ। আর এ বলে সে ফিরে গেল।[১]

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১২৩।

কুরায়শগণ যখন হযরত নবী করীম (সা) কে নিন্দিত ও মন্দ বলত, তখন তিনি বলতেন, হে লোক সকল ! তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ না যে, আল্লাহ তা'আলা কিরূপে ওদের গালমন্দকে আমা থেকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, ওরা নিন্দিত ও মন্দ বলছে, আমি তো মুহাম্মদ প্রশংসিত। (ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১২৪)

অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত আবূ বকর (রা) যখন উম্মে জামিলকে নবী (সা)-এর দিকে আসতে দেখলেন, আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! উম্মে জামিল সামনের দিক থেকে আসছে, আপনার ব্যাপারে আমার ভয় করছে। তিনি (সা) ইরশাদ করলেন ঃ انها لن ترانى "সে আমাকে কখনই দেখবে না।" এবং কিছু কুরআনের আয়াত[১] তিলাওয়াত করলেন (তাফসীরে ইবন কাসীর, সূরা লাহাবের তাফসীর)।

মুসনাদে বাযযারে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে, যখন উম্মে জামিল আবূ বকর (রা)-কে এ সব বলছিল, তা তাকে সত্যায়নই করছিল। যখন উম্মে জামিল চলে গেল, তখন আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সম্ভবত উম্মে জামিল আপনাকে দেখেনি। তিনি বললেন, তার প্রস্থান পর্যন্ত একজন ফেরেশতা আমাকে আড়াল করে রেখেছিল।[২] বদর যুদ্ধের সাত দিন পর আবূ লাহাবের শরীরে বিষাক্ত গুটি দেখা দেয়। এর ফলেই সে মৃত্যুবরণ করে। নিজেরা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে তার পরিবারের লোকজন তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। তিন দিন পর্যন্ত লাশ সেখানেই পচতে থাকে। লজ্জা এবং দুর্নামের ভয়ে কয়েকজন হাবশী শ্রমিক ডেকে এনে লাশ উঠানো হয়, মজুররা একটি গর্ত খুড়ে লাঠির দ্বারা তার মরদেহ সে গর্তে ফেলে মাটি ও পাথর চাপা দেয়। এ তো গেল তার পার্থিব যিল্লতি ও অপমান। আর আখিরাতে তার অবমাননার তো কোন প্রশ্ন করাই অবান্তর। اجارنا الله تعالى من ذلك "আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর থেকে পানাহ দিন।" আবূ লাহাবের তিন পুত্র ছিল, উতবা, উতায়বা ও মুয়াত্তাব। তন্মধ্যে উতবা ও মুয়াত্তাব মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর উতায়বা, যে আবূ লাহাবের কথায় নবী (সা)-এর কন্যাকে তালাক দিয়েছিল, অধিকন্তু, অপরাধও করেছিল, নবী (সা)-এর বদ দু'আর ফলে ধ্বংস হয়ে যায়। মক্কা বিজয়ের দিন হযরত রাসূল (সা) হযরত আব্বাস (রা) কে বললেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র উতবা এবং মুয়াত্তাব কোথায়, কোথাও তো চোখে পড়েনি ? হযরত আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সম্ভবত কোথাও আত্মগোপন করে আছে। নবী (সা) বললেন, তাদেরকে খুঁজে আনুন। সন্ধান করতে

---

১. যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا "তুমি যখন কুরআন পাঠকর, তখন তোমার ও যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দিই।" (সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৪৫)

২ ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৫৬৭, সূরা লাহাবের তাফসীর।

গিয়ে আরাফাতের ময়দানে পাওয়া গেল। হযরত আব্বাস (রা) উভয়কে নিয়ে নবী (সা)-এর সামনে হাযির হলেন। নবী (সা) তাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম কবূল করলেন এবং নবী (সা)-এর হাতে বায়'আত হলেন। নবী (সা) বললেন, আমি আমার চাচার এ দু'পুত্রকে আল্লাহর কাছে চেয়েছিলাম, আল্লাহ তাদের দু'জনকে আমাকে দান করেছেন।[১]

উমায়্যা ইবন খাল্‌ফ জুমাহী

উমায়্যা নবী (সা)-কে সবচে' বেশি গালি-গালাজ করত। তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে চোখ টিপত। এ প্রেক্ষিতে এ সূরা নাযিল হয় :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ

وَيلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۝ نِ الَّذِى جَمَعَ مَا لاً وَّعَدَّدَهٗ ۝ يَحْسَبُ اَنَّ مَا لَهٗ اَخْلَدَهٗ

كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۝ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِىْ تَطَّلِعُ

عَلَى الْاَفْئِدَةِ ۝ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পেছনে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে; যে অর্থ জমায় ও তা বারবার গুণে দেখে, সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে;কখনই নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়; তুমি কি জানো হুতামা কি? এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত হুতাশন, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে। নিশ্চয়ই এটা ওদেরকে বেষ্টন করে রাখবে, দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।" (সূরা হুমাযা : ১-৯)

উমায়্যা ইবন খালফ, উতবা, উতায়বা ও মুয়াত্তাব খাল্‌ফ বদর যুদ্ধে হযরত খুবায়ব অথবা হযরত বিলাল (রা)-এর হাতে নিহত হয়।[২]

উবাই ইবন খাল্‌ফ

উবাই ইবন খাল্‌ফও তার ভাই উমায়্যা ইবন খাল্‌ফের প্রতি পদে পদে অনুসরণ করত। একদিন সে একটি জরাজীর্ণ হাড় নিয়ে নবী (সা)-এর সামনে এসে তা হাত দিয়ে গুড়ো করে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বলল, আল্লাহ কি একেও দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, একে এবং তোর হাড়ও এমনটি হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ পুনরায় জীবিত করবেন; আর তোকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় :

---

১. ইসাবা, ২খ. পৃ. ৪৫৫।

২ ইবন হিশাম. ১খ. পৃ. ১২৪।

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَاهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

"আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়, বলে, অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পচে গলে যাবে? বল, এর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত কর। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি এর অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন ? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলেন হও, ফলে তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁর হাতে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"

(সূরা ইয়াসীন : ৭৮–৮৩)

উবাই ইবন খাল্‌ফ উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে নিহত হয় (তারিখে ইবনুল আসীর, ২খ. পৃ. ২৬; ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১২৬; উহুদ যুদ্ধে যে সব মুশরিক নিহত হয়েছিল–এর বর্ণনা)।

উকবা ইবন আবূ মুয়াইত

উকবা উবাই ইবন খাল্‌ফের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। একদিন উকবা মহানবী (সা)-এর নিকট এসে কিছুক্ষণ বসে এবং তাঁর কথা শোনে। উবাই সংবাদ পেয়ে, দ্রুত উকবার নিকট এসে বলল, আমি সংবাদ পেলাম যে, তুমি মুহাম্মদ-এর নিকট বসেছ এবং তার কথা শুনেছ। আল্লাহর কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি মুহাম্মদের মুখে থুথু দিয়ে না আসবে, ততক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলা এবং তোমার চেহারা দেখা আমার জন্য হারাম। কাজেই হতভাগা উকবা উঠল এবং তাঁর পবিত্র চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করল। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلاً لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِىْ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلاً وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّ نَصِيْرًا

"যালিমগণ সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে একইপথ অবলম্বন করতাম! হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম ! আমার কাছে উপদেশ পৌঁছবার পর সে তো আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল, শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক। রাসূল বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যজ্য মনে করে। (আল্লাহ বলেন,) এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম। তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট। (সূরা ফুরকান ২৭-৩১)

উকবা বদর যুদ্ধে বন্দী হয় এবং সাফরা নামক স্থানে পৌঁছে তাকে হত্যা করা হয়।[১]

ওলীদ ইবন মুগীরা

ওলীদ ইবন মুগীরা বলে বেড়াত যে, এটা বড়ই আশ্চর্যের কথা যে, মুহাম্মদের উপর ওহী নাযিল হলো অথচ আমাকে এবং আবূ মাসঊদ সাকাফীকে বাদ দিয়ে ! কার্যত আমরা দু'জনই নিজ নিজ শহরে সর্বাধিক সম্মানিত। আমি কুরায়শের সর্দার আর আবূ মাসঊদ সকীফ গোত্রের সর্দার। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়

وَقَالُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

"এবং তারা বলে, এই কুরআন কেন নাযিল হলো না দুই জনপদের কোন মহান ব্যক্তির উপর ? এরা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বন্টন করে ? আমিই ওদের মধ্যে রিযক বন্টন করি ওদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে এবং ওরা যা জমা করে তা থেকে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।" (সূরা যুখরুফ : ৩১-৩২)

অর্থাৎ নবূয়াত ও রিসালতের উৎস ধন-দৌলত ও পার্থিব মান-সম্মানের উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং একদিনের ঘটনা ঃ ওলীদ ইবন মুগীরা, উমায়্যা ইবন খাল্ফ, আবূ জাহ্ল, উতবা, শায়বা, রবীয়ার পুত্রগণ এবং অপরাপর কুরায়শ সর্দারগণ ইসলামের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য নবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হলো। তিনি ওদের বুঝাতে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময়ে মসজিদে নববীর অন্ধ মুয়াযযিন আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম (রা) কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য এসে পড়েন। তিনি (সা) মনে করলেন, ইবন উম্মে মাকতূম তো মুসলমান, তিনি অন্য কোন সময় জেনে

---

১. ইবনুল আসীর, ২খ. পৃ. ২৭।

নিতে পারবেন; কিন্তু এ ব্যক্তিগণ প্রভাবশালী, যদি এরা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে এদের কারণে সহস্র মানুষ মুসলমান হয়ে যাবে। এজন্যে তিনি ইবন উম্মে মাকতূমের প্রতি দৃষ্টি দিলেন না এবং তার অসময়ে প্রশ্ন করার দরুন তাঁর চেহারা মুবারকে কিছুটা বিরক্তির লক্ষণ প্রকাশ পেল। এ কারণে যে, তার উচিত ছিল চলমান কথাবার্তা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। কিন্তু আল্লাহ জাল্লা শানুহুর রহমত উথলে উঠল এবং এ আয়াতগুলো নাযিল করলেন :

عَبَس وَتَوَلّٰى   اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى ۔ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى   اَوْيَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرٰى
اَمَّا منِ السْتَغْنٰى ۔ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۔ وَمَا عَلَيْكَ اَلاَّ يَزَّكّٰى ۔ وَاَمَّا منْ جَاءَكَ يَسْعٰى
وَهُوَ يخْشٰى   فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى   كَلاَّ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ   فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهٗ   فِيْ صُحُفٍ
مُّكَرَّمَةٍ   مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ   بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ   كِرَامٍ بَرَرَةٍ   قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهٗ
مِنْ اَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ   مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ   ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ   ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۔
ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهٗ   كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهٗ   فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ   اَنَّا
صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا   ثُمَّ شَقَقْنَا الاَرْضَ شَقًّا   فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا   وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا
وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلاً   وَّحَدَائِقَ غُلْبًا   وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا   مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلاَنْعَامِكُمْ   فَاِذَا
جَاءَتِ الصَّاخَّةُ   يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ   وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ   وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ   لِكُلِّ
امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ   وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ   ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ   وَوُجُوْهٌ
يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ   تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ   اُولٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ

"সে ভ্রূ কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল, এ জন্যে যে, তার নিকট অন্ধ লোকটি এলো। তুমি কেমন করে জানবে, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হতো, অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত। পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না, তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছ। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দায়িত্ব নাই, অন্যদিকে যে তোমার কাছে ছুটে এলো এবং সে সশংকচিত্ত, তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে; না, এ আচরণ অনুচিত, এ তো উপদেশ বাণী, যে ইচ্ছা করবে, সে তা স্মরণ রাখবে, তা আছে মহান লিপিসমূহে, যা উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র, মহান পূত-চরিত্র লিপিকর হস্তে লিপিবদ্ধ। মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ ! তিনি তাকে কোন্ বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন ? শুক্রবিন্দু থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেন, পরে তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন, এরপর তার জন্য পথ সহজ করে দেন; তারপর

তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন। এরপর যখন ইচ্ছা, তিনি তাকে পুনর্জীবিত করবেন। এ প্রকার আচরণ অনুচিত, তিনি ওকে যা আদেশ করেছেন সে এখনও তা পুরাপুরি করেনি। মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি, অতঃপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি এবং এতে আমি উৎপন্ন করি শস্য, আঙুর, শাক-সবজি, যয়তুন, খেজুর, বহু বৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদির খাদ্য, এটা তোমাদের ও তোমাদের পশুপালের জন্য। যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে, সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই থেকে এবং তার মা, তার বাবা, তার স্ত্রী ও তার সন্তান থেকে, সেদিন ওদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণ ব্যস্ত রাখবে। অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল, এবং অনেক মুখমণ্ডল হবে সেদিন ধূলিধূসর; সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে মলিনতা। এরাই কাফির এবং গুনাহগার। (সূরা আবাসা : ১-৪২)

এর পরে নবী (সা)-এর অবস্থা এই ছিল যে, যখন কোন সময় আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম উপস্থিত হতেন, তখন তিনি তার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিতেন এবং বলতেন, মারহাবা ঐ ব্যক্তির জন্য, যার জন্য আমার রব আমার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

আবূ কায়স ইবন ফাকাহ

এই ব্যক্তিও মহানবী (সা)-কে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়েছে। সে আবূ জাহলের বিশিষ্ট সাহায্য-সহায়তাকারী ছিল। আবূ কায়স বদর যুদ্ধে হযরত হামযা (রা)-এর হাতে নিহত হয়।[১]

অপসংস্কৃতি দ্বারা ইসলামবিমুখ করা জাহিলী যুগের রীতি

নাযর ইবন হারিস

নাযর ইবন হারিস কুরায়শ সর্দারদের মধ্যে একজন ছিল। ব্যবসা উপলক্ষে সে পারস্য যেত এবং সেখান থেকে সে অনারবী রাজা-বাদশাহদের গল্প-কিসসা-কাহিনী কিনে আনত আর কুরায়শদের শোনাত। বলত, মুহাম্মদ তো তোমাদেরকে কেবল আদ ও সামূদের কাহিনী শোনায়, আর আমি তোমাদের রুস্তম, ইসফান্দিয়ার এবং পারস্যরাজদের কাহিনী শোনাচ্ছি। এ সব কাহিনী মানুষের কাছে খুব উপভোগ্য মনে হতো (যেমন আজকালকার নভেল)। জনগণ এ সব কিসসা শুনত এবং কুরআন শুনত না।

একটি গায়িকা দাসীও সে কিনে রেখেছিল, জনগণকে তার গান শোনাত। যে কোনও ব্যক্তি সম্বন্ধে এটা জানা যেত যে, সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট, তার নিকট সে

১. ইবনুল আসীর, ২খ. পৃ. ২৬।

ঐ গায়িকাকে নিয়ে যেত এবং তাকে বলত, লোকটিকে পানাহার করাও ও গান শোনাও। অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে বলত—বল তো, এটা উত্তম না ঐ বস্তু উত্তম যার প্রতি মুহাম্মদ (সা) আহ্বান করে ? বলে, নামায পড়, রোযা রাখ, আল্লাহর দুশমনদের সাথে জিহাদ কর ? তখনই এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِىْ اُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য কিনে নেয় এবং আল্লাহ্ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। ওদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। যখন তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয়, তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে তা শুনতে পায় নি, যেন তার কান দুটি বধির; অতএব ওদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।"[১] (সূরা লুকমান : ৬–৭)

সতর্কবাণী : খাওয়ানো, পান করানো এবং বালিকাদের গান শুনিয়ে নিজ ধর্ম মতাদর্শের প্রতি লোকদের আকৃষ্ট করে রাখাটা বাতিলপন্থীদের প্রাচীন রীতি, যা বিশেষভাবে নাসারাদের পদ্ধতি; আর তাদের দেখাদেখি হিন্দুস্থানের আর্যগণও এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। আল্লাহ যাকে সামান্যতম জ্ঞানও দিয়েছেন, সে ভালই বুঝে যে, এ পদ্ধতি আল্লাহর উপাসনাকারীদের নয়; বরং কাম-বাসনা পূজারীদের। ঐসব থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

নাযর ইবন হারিস বদর যুদ্ধে বন্দী হয় এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।[২]

আস ইবন ওয়ায়েল সাহমী

আস ইবন ওয়ায়েল সাহমী ছিল হযরত আমর ইবন আস (রা)-এর পিতা। যারা নবী (সা) কে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত—এ ব্যক্তিও ছিল তাদের অন্তর্ভুক্ত। নবী (সা)-এর যত পুত্র সন্তান জন্মেছিল, সবাই তাঁর জীবদ্দশায়ই ইনতিকাল করেন। এতে আস ইবন ওয়ায়েল বলল : ان محمدا ابتر لا يعيش له ولد "নিশ্চয়ই মুহাম্মদ নির্বংশ, তার কোন পুত্রই জীবিত থাকে না।"

আবতার বলা হয় লেজকাটা জন্তুকে। আগে পরে যে ব্যক্তির নাম নেয়ার মত কেউ না থাকে, সে যেন লেজকাটা জন্তুর মতই। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় : اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ "তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।" (সূরা কাওসার : ৩)

---

১. রূহুল মা'আনী, ২খ. পৃ. ৬৯।

২ ইবনুল আসীর, ২খ. পৃ. ২৭।

হযরতের নাম নেয়ার মত লোক তো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি। হিজরতের একমাস পর কোন জন্তু আস-এর পায়ে দংশন করে যদ্দরুন তার পা এমন ফুলে উঠে যে, উটের গর্দানের ন্যায় হয়ে যায়। এতেই আস মারা যায়।[১]

হাজ্জাজের পুত্রদ্বয় নবীহ ও বনীহ

নবীহ ও বনীহও নবী (সা)-এর কঠোরতর দুশমনদের মধ্যে ছিল। যখনই তারা নবী (সা) কে দেখত তখনই বলত, আল্লাহ কি তাকে ছাড়া আর কাউকে পয়গাম্বর বানানোর জন্য খুঁজে পাননি ? এ দু'জনই বদর যুদ্ধে নিহত হয়।[২]

আসওয়াদ ইবন মুত্তালিব

আসওয়াদ ইবন মুত্তালিব ও তার সঙ্গীরা যখনই রাসূল (সা) অথবা তাঁর কোন সাহাবীকে দেখত, তখন চোখ টেপাটিপি করত আর বলত, এরাই ঐ সব লোক, যারা পৃথিবীর বাদশাহ হবে, রোম ও পারস্যের বাদশাহর ধনভাণ্ডার হস্তগত করবে ! এ সব বলত আর শিষ দিত, হাতে তালি দিত।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বদ দু'আ করলেন, আয় আল্লাহ, ওকে অন্ধ বানিয়ে দাও (যাতে তার চোখ টেপার যোগ্যতাই না থাকে) আর তার পুত্রকে ধ্বংস করে দাও। সুতরাং আসওয়াদ তো ঐ সময়েই অন্ধ হয়ে গেল, আর তার পুত্র বদর যুদ্ধে নিহত হলো। কুরায়শগণ যে সময় উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঐ সময় আসওয়াদ অসুস্থ ছিল, জনগণকে সে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করছিল। উহুদ যুদ্ধের পূর্বেই সে মারা যায়।[৩]

আসওয়াদ ইবন আবদে ইয়াগূস

আসওয়াদ ইবন আবদে ইয়াগূস ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মামাত ভাই। যার বংশ লতিকা ছিল এরূপ, আসওয়াদ ইবন আবদে ইয়াগূস ইবন ওহাব ইবন মান্নাফ ইবন যোহরা। সেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কঠোরতম দুশমনদের একজন ছিল। যখন সে কোন দরিদ্র মুসলমানকে দেখত, তখন বলত, এরাই পৃথিবীর বাদশাহ হতে যাচ্ছে, এরা কিসরার বাদশাহীর উত্তরাধিকার হবে। আর যখন হযরত (সা) কে দেখত তখন বলত, আজ কি আসমান থেকে কোন কথা আসে নি ! এমনি ধরনের আজে বাজে কথা বলত আর বিদ্রূপ করত।[৪]

হারিস ইবন কায়স সাহমী

যাকে হারিস ইবন আয়তালাও বলা হতো। আয়তালা ছিল তার মার নাম আর কায়স ছিল তার পিতার নাম। এ ব্যক্তিও ঐ সব লোকের দলে ছিল, যারা নবী

১. ইবনুল আসীর, ২খ. পৃ. ২৬।
২. প্রাগুক্ত।
৩. প্রাগুক্ত পৃ. ২৭।
৪. প্রাগুক্ত

(সা)-এর সাহাবীগণের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত আর বলত, মুহাম্মদ তার সঙ্গীদের এ বলে ধোঁকা দিয়েছে যে, মৃত্যুর পর তারা পুনর্জীবিত হবে!

وَقَالُوْا مَاهِيَ الاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا الاَّ الدَّهْرُ

"ওরা বলে, একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি এবং সময়কালের (স্বাভাবিক) নিয়মই আমাদেরকে ধ্বংস করে।" (সূরা জাসিয়া ২৪)

যখন তাদের ঠাট্টা-তামাশা সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা নবী (সা)-কে সান্ত্বনা দিয়ে এ আয়াত নাযিল করেন :

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ   اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ

"অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা কর। বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট।" (সূরা হিজর ৯৪–৯৫)

বেশি হাস্য-পরিহাসকারী ছিল এ পাঁচ ব্যক্তি, আসওয়াদ ইবন আবদ ইয়াগূস, ওলীদ ইবন মুগীরা, আসওয়াদ ইবন আবদুল মুত্তালিব, আস ইবন ওয়ায়েল এবং হারিস ইবন কায়স।

একবার হযরত (সা) বায়তুল্লাহ[১] তাওয়াফ করছিলেন, সে সময় জিবরাঈল (আ) আগমন করেন। তিনি জিবরাঈল (আ) কে তাদের ঠাট্টা-মস্করার ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। ইত্যবসরে ওলীদ সামনে দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি বললেন, এ ব্যক্তি ওলীদ। জিবরাঈল (আ) ওলীদের শাহরগের দিকে ইশারা করলেন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি করলেন? জিবরাঈল বললেন, আপনি ওলীদের জন্য যথেষ্ট হয়েছেন। এরপর আসওয়াদ ইবন আবদুল মুত্তালিব অতিক্রম করল। তিনি বললেন, এ হলো আসওয়াদ ইবন আবদুল মুত্তালিব। জিবরাঈল (আ) তার দু' চোখের প্রতি ইশারা করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে জিবরাঈল, কি করলেন ? জিবরাঈল বললেন, আপনি আসওয়াদ ইবন আবদুল মুত্তালিবের জন্য যথেষ্ট হয়েছেন। এরপর আসওয়াদ ইবন ইয়াগূস অতিক্রম করল। তিনি বললেন, এ হলো আসওয়াদ ইবন ইয়াগূস। জিবরাঈল (আ) তার মাথার প্রতি ইশারা করলেন। পূর্বের ন্যায় তাঁর প্রশ্নের জবাবে জিবরাঈল বললেন, আপনি যথেষ্ট হয়েছেন। এরপরে আস ইবন ওয়ায়েল ঐ দিক দিয়ে অতিক্রম করল। জিবরাঈল (আ) তার পায়ের তলায় কিছু ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, আপনি তার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন।

সুতরাং ওলীদের ঘটনা এই হলো যে, একবার ওলীদ বনী খুযা'আর এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল, যে তীর বানাচ্ছিল। ঘটনাক্রমে তার কোন তীরের

---

১. এ বর্ণনা রূহুল মা'আনী, ৪খ. পৃ. ৭৮ থেকে করা হয়েছে। কিন্তু বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার ঘটনা ইবন ইসহাকের বর্ণনা থেকে গৃহীত–যাকে হাফিয ইবন কাসীর স্বীয় তাফসীরে সংশ্লিষ্ট আয়াতের নিচে লিপিবদ্ধ করেছেন।

উপর ওলীদের পা পড়ে যায় এবং তাতে সে সামান্য আহত হয়। ঐ যখমের প্রতিই ইশারা করা হয়েছিল। ফলে যখম বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং এতেই সে মারা গেল। আসওয়াদ ইবন আবদুল মুত্তালিবের ঘটনা হল, একদিন সে একটি বাবলা গাছের নিচে গিয়ে বসেছিল, এমতাবস্থায় নিজ ছেলেদের চেঁচিয়ে বলতে শুরু করল যে, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, কোন ব্যক্তি আমার চোখে কাঁটা ফুটিয়ে দিচ্ছে। ছেলেরা বলল, আমরা তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। এভাবে বলতে বলতে সে অন্ধ হয়ে গেল। আসওয়াদ ইবন আবদ ইয়াগূসের ঘটনা এই ঘটল যে, জিবরাঈল (আ) তো তার মাথার দিকে ইশারা করেছিলেন, কাজেই তার সমস্ত মাথা ফোঁড়ায় ভরে গেল, আর এ কষ্টেই সে মারা গেল। হারিসের পেটে এমন অসুখ হলো যে, তার মুখ দিয়ে পায়খানা[১] বের হতে শুরু করে। আর এতে সে মারা যায়। আস ইবন ওয়ায়েলের পরিণতি এই ঘটল যে, সে গাধায় চড়ে তায়েফ যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে গাধা থেকে কাঁটাযুক্ত একটি ঘাসের ঝোঁপের উপর পড়ে যায়। এতে তার পায়ে একটা সাধারণ কাঁটা বিঁধে। কিন্তু সেই সাধারণ কাঁটাই এমন কঠিন হলো যে, তার প্রাণ রক্ষা হলো না। এতেই সে মারা গেল। এটি আল্লামা তাবারানী[২] তাঁর আওসাতে, বায়হাকী ও আবূ নুয়াইম উভয়ের দালাইলে এবং ইবন মারদুবিয়া উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ! এ ঘটনাবলী থেকে অনুমান করুন যে, ইসলামের প্রচার ও প্রসারে কি জোর-যবরদস্তির আশ্রয় নেয়া হয়েছিল, নাকি একে স্তব্ধ ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য জোর-যবরদস্তির আশ্রয় নেয়া হয়েছিল ?

মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার

(بَاطِنَهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرَهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ)

(এতে অন্তর্নিহিত রয়েছে রহমত আর বাহ্যত এর পূর্বে রয়েছে অত্যাচার)।

যে গতিতে ইসলাম প্রসারিত হচ্ছিল আর মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল, ঠিক সে অনুপাতেই মক্কার মুশরিকদের ক্রোধ ও ঈর্ষা বেড়ে চলছিল। যে সকল মুসলমানের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী ছিল, তাদের উপর তো মক্কার কাফিরদের বাড়াবাড়ি চলছিল না। তবে হ্যাঁ, যারা অভিভাবকহীন মুসলমান ছিল, যাদের পেছনে ছিল না কোন আশ্রয়-অবলম্বন, তারা মক্কার কুরায়শদের অত্যাচার-নির্যাতন অনুশীলনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। তাঁদের কাউকে মারতো, কাউকে ক্ষুদ্র কক্ষে আটক করে নির্যাতন চালাতো। এক্ষণে আমরা কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করছি, যা দ্বারা মক্কার মুশরিকদের যুলম-অত্যাচার এবং সাহাবীগণের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার কিছুটা অনুমান করা সম্ভব হবে।

---

১. যেমন তূসীর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে যে, শেষ সময়ে তার মুখ থেকে পায়খানা আসত। যাতে করে আল্লামা শীরাযী বলেছেন ঃ این ان ریلست که در آخر تجرید خورده

২ এ বর্ণনা খাসাইসুল কুবরায় ১খ. পৃ. ১৪৬ এবং তাফসীরে ইবন কাসীরে সূরা হিজর, ৫খ. পৃ. ৩৩৬ পুরাতন সংস্করণে উল্লিখিত আছে। তবে এতে হাসান সনদের কথা বলা হয়নি; এটা কেবল রূহুল মা'আনীতে ১৪খ. পৃ. ৭৮ উল্লেখ আছে। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন।

সালাত ও কল্যাণের জন্য আহ্বানকারী মুয়াযযিনদের ইমাম হযরত বিলাল ইবন রাবাহ[1] (রা)

তিনি ছিলেন হাবশী বংশোদ্ভূত, উমায়্যা ইবন খালফের ক্রীতদাস। ঠিক দুপুর বেলা যখন রোদ খুব তীব্র হয়ে উঠত এবং পাথর আগুনের মত উত্তপ্ত হয়ে যেত, তখন সে চাকরদের নির্দেশ দিত বিলালকে ঐ উত্তপ্ত পাথরের উপর শুইয়ে তাঁর বুকের উপর একটা ভারী পাথর তুলে দিতে, যাতে নড়াচড়া করতে না পারেন। আর বলত, তুই এভাবেই মারা যাবি। যদি উদ্ধার পেতে চাস, তবে মুহাম্মদকে অস্বীকার কর এবং লাত-উযযার পূজা কর। কিন্তু বিলাল (রা)-এর মুখ থেকে এ সময়ও আহাদ, আহাদ (তিনি এক, তিনি এক) উচ্চারিত হতো।[2]

موحد چه برپائے ریزی زرش　　چه فولاد هندی نهی برسرش

امیدو هراش نباشد زکس　　همیں است بنیاد توحید وبس

"একত্ববাদী কি শেষ পর্যায়ে ভারতীয় লোহা তার মাথায় তুলে রাখে, কারো মাঝে আশাও থাকবে না, ভয়ও থাকবে না, আর এটাই তাওহীদের বুঁনিয়াদ, এটাই শেষ কথা।"

আর কখনো গরুর চামড়ায় জড়িয়ে এবং কখনো লৌহ বর্ম পরিয়ে রৌদ্রে রেখে দিত। এ অসহনীয় কষ্টের মধ্যেও তাঁর মুখ থেকে কেবল আহাদ আহাদ-ই উচ্চারিত হতো। উমায়্যা যখন দেখল যে, তাঁর অটল ধৈর্যে কোন প্রকার চিড় ধরেনি, তখন তাঁর গলায় রশি বেঁধে বালকদের হাতে তুলে দেয় যাতে তারা তাঁকে সারা শহরে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়। তবুও তাঁর মুখ থেকে কেবল আহাদ আহাদ-ই বের হতো।[3] হাকিম এ হাদীসটি সহীহ বলেছেন; কিন্তু তিনি তা উদ্ধৃত করেননি, আর ইমাম যাহবী তা সমর্থন করেছেন।[4]

এভাবেই হযরত বিলাল (রা) কে অত্যাচার-নির্যাতনের অনুশীলনক্ষেত্রে পরিণত করা হচ্ছিল, এ সময় হযরত আবূ বকর (রা) ঐ দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি অন্তরে ব্যথা পেলেন। আর উমায়্যাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ الا تتقى الله فى هذا المسكين حتى متى انت "তুমি কি এ মিসকীনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর না, এ অত্যাচার-নিপীড়ন কতদিন চালাবে ?"

উমায়্যা বলল, তুমিই তো তাকে নষ্ট করেছ, এখন তুমিই তাকে উদ্ধার কর। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, উত্তম, আমার কাছে একটি গোলাম আছে, যে খুবই

---

১. রাবাহ ছিল তাঁর পিতার নাম, আর রাহমামা ছিল তাঁর মাতার নাম।

২ সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১০৯।

৩. তাবাকাতে ইবন সাদ, ৩খ, পৃ. ২৬, ২৭।

৪. মুস্তাদরাকে হাকিম, ৩খ. পৃ. ২৮৪।

শক্তিশালী এবং তোমার ধর্মের উপর অটল ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। তাকে তুমি নিয়ে নাও এবং তার পরিবর্তে বিলালকে আমার হাতে সোপর্দ কর। উমায়্যা বলল, আমি প্রস্তাবটি গ্রহণ করলাম। আবূ বকর (রা) উমায়্যার নিকট থেকে বিলাল (রা) কে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন।[১]

আল্লাহর পথে সর্বোত্তম আহ্বানকারী সায়্যিদুনা মাওলানা হযরত বিলাল (রা)-এর পবিত্র পৃষ্ঠদেশে মুশরিকদের অত্যাচার নির্যাতনের যখম ও চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল। কাজেই যখন তিনি পৃষ্ঠদেশের কাপড় উঠাতেন, তখন ঐ যখম ও চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হতো।

لاقـى بـلال بـلاء مـن امـيـة قـد   احلـه الصبـر فـيـه اكـرم الـنـزل
اذ جهدوه بضنك الامر وهو على   شدائد الازل ثبت الازر لم يـزل
القوه بطحا برمضاء البطاح وقد   علـوا عـلـيـه صخورا جمة اثقل
فوحد الله اخلاصا وقد ظهـرت   بظهره كندوب الطل فـى الطلل
ان قـد ظهر ولـى الله مـن دبـر   قـد قـد قـلـب عـدو الله من قبل

(যেমনটি মাওয়াহিবে বর্ণিত হয়েছে)।

হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)

হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) কাহতানী বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতা ইয়াসির (রা) তাঁর এক হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের সন্ধানে মক্কা মুকাররামায় আসেন। তাঁর অপর দুই ভাই হারিস এবং মালিকও তাঁর সাথে ছিলেন। হারিস ও মালিক পরে ইয়েমেনে ফিরে যান কিন্তু ইয়াসির মক্কায় থেকে যান এবং আবূ হুযায়ফা মাখযূমীর সাথে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তোলেন। আবূ হুযায়ফা দাসী সুমাইয়া বিনতে খায়্যাতকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়ে দেন, যার গর্ভে হযরত আম্মার জন্মগ্রহণ করেন। আবূ হুযায়ফার মৃত্যু পর্যন্ত ইয়াসির এবং আম্মার তার সাথেই থাকেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা ইসলাম প্রকাশ করেন আর ইয়াসির, সুমাইয়া, আম্মার এবং তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবন ইয়াসির সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আম্মারের আরো একটি ভাই ছিল, যে ছিল হযরত আম্মারের চেয়ে বয়সে বড়, তার নাম ছিল হারিস ইবন ইয়াসির, জাহিলী যুগে বনী দায়লের হাতে নিহত হয়।[২] মক্কায় যেহেতু আম্মার ইবন ইয়াসিরের এমন কোন গোত্র কিংবা সম্প্রদায় ছিল না, যারা তাঁদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী হতে পারে; এ জন্যে তাঁকে কুরায়শগণ খুবই কঠিন কঠিন শাস্তি দেয়। দুপুরের সময় উত্তপ্ত যমীনে তাঁকে শুইয়ে দিত এবং এমনভাবে মারতো যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন। কখনো পানিতে চুবাতো আবার কখনো জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১০৯।

২ তাবাকাতে ইবন সাদ, ৩খ, পৃ. ১৭৬।

শুইয়ে দিত। এ অবস্থায় যখন হযরত নবী করীম (সা) হযরত আম্মারের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন, তখন তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন এবং বলতেন :

يا نار كونى بردا وسلاما على عمار كما كنت على ابراهيم

"হে আগুন, তুমি ঠাণ্ডা এবং আম্মারের জন্য শান্তিদায়ক হয়ে যাও, যেমনটি হয়েছিলে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপর।"

যখন নবী করীম (সা) হযরত আম্মার, তাঁর পিতা হযরত ইয়াসির এবং তাঁর মাতা সুমাইয়াকে বিপদগ্রস্ত দেখতেন, তখন বলতেন, হে ইয়াসির পরিবার, সবর কর। কখনো বলতেন, হে আল্লাহ, তুমি ইয়াসির পরিবারকে ক্ষমা কর। আবার কখনো বলতেন, তোমাদের জন্য বেহেশতের সুসংবাদ, তোমাদের আশা পূর্ণ হবে। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, প্রথম ভাগ ও ইবন আবদুল বার-এর আল-ইসতিয়াব, হযরত আম্মার (রা)-এর আলোচনা।

হযরত আলী (ক) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, আম্মারের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঈমানে ভরপুর। হাদীসটি জামে তিরমিযী ও সুনানে ইবন মাজাহ-এ আছে; এর সনদ হাসান।[১] বাযযার হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, নাসাঈতেও বর্ণিত আছে, যার সনদও সহীহ, মানাকিবে আম্মার অধ্যায়।[২]

হযরত আম্মার (রা) একবার তাঁর জামা খুললেন, তখন মানুষ তাঁর পিঠে কালো কালো দাগ দেখতে পেল। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, মক্কার কুরায়শগণ আমাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর চিৎ করে শুইয়ে রাখতো এ চিহ্ন তারই।[৩] আর এ একই ব্যবহার তাঁর পিতা হযরত ইয়াসির ও মাতা হযরত সুমাইয়া (রা)-এর সাথেও করা হতো।

মুজাহিদ বলেন, সাত ব্যক্তি সর্ব প্রথম নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন :

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা), হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত বিলাল (রা), হযরত খাব্বাব (রা), হযরত সুহায়ব (রা), হযরত আম্মার (রা) এবং হযরত সুমাইয়া (রা)। বংশ মর্যাদার কারণে তো রাসূলুল্লাহ (সা)[৪] ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপর মক্কার মুশরিকদের পুরা খবরদারী চলতো না; কাজেই হযরত বিলাল (রা), হযরত খাব্বাব (রা), হযরত সুহায়ব (রা), হযরত আম্মার (রা) ও হযরত সুমাইয়া (রা)-কে নিজেদের নির্যাতন-নিপীড়নের অনুশীলনের শিকারে পরিণত করে। ভর

---

১. ইসাবা, ২খ. পৃ. ৫১২।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ, পৃ. ৭২।

৩. তাবাকাতে ইবন সাদ, ৩খ, পৃ. ৭৭।

৪. ইসাবা, ৪খ. পৃ. ৩৩৫।

দুপুরে এ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গকে লৌহ বর্ম পরিয়ে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখতো। একদিন আবূ জাহল তাঁদের সামনে এসে পড়লো এবং হযরত সুমাইয়া (রা)-এর লজ্জাস্থানে বর্শাদ্বারা আঘাত করলো, এতে তিনি শহীদ হয়ে যান আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা মুজাহিদ থেকে সহীহ মুরসাল সূত্রে হযরত সুমাইয়া (রা) অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ থেকে সহীহ সূত্রে তাবাকাতে ইবন সা'দ-এ বর্ণিত আছে যে, ইসলামের সর্ব প্রথম শহীদ ছিলেন হযরত সুমাইয়া (রা), যিনি ছিলেন বৃদ্ধ ও দুর্বল। বদর যুদ্ধে যখন আবূ জাহল মারা গেল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আম্মারকে উদ্দেশ্য করে বলেন : قتل الله قاتل امك "আল্লাহ তোমার মার হত্যাকারীকে ধ্বংস করেছেন।" আর হযরত ইয়াসির (রা) ঐ কঠিন নির্যাতনের ফলে হযরত সুমাইয়ার পূর্বেই ইনতিকাল করেন।[১]

হযরত সুহায়ব ইবন সিনান (রা)

সুহায়ব (রা) প্রকৃতপক্ষে মসূলের আশপাশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা এবং পিতৃব্য পারস্য সম্রাটের পক্ষে ওবুল্লার শাসনকর্তা ছিলেন। একবার রোমক বাহিনী ঐ এলাকা আক্রমণ করে। সুহায়ব (রা) ঐ সময় অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন। লুটপাটের সময় রোমানরা তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। সেখানেই তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। এ জন্যে তিনি সুহায়ব রূমী নামে প্রসিদ্ধ হন। বনী কালবের এক ব্যক্তি তাঁকে রোমানদের নিকট থেকে ক্রয় করে মক্কায় নিয়ে আসে। মক্কায় আবদুল্লাহ ইবন জুদ'আন তাঁকে ক্রয় করে আযাদ করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন হযরত সুহায়ব এবং হযরত আম্মার একই সময়ে আরকামের গৃহে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। হযরত আম্মারের মত হযরত সুহায়বকেও মক্কার মুশরিকরা নানা ধরনের কষ্ট দেয়। যখন তিনি হিজরতের ইচ্ছা করলেন, তখন মক্কার কুরায়শরা বলল, যদি তুমি ধন-সম্পদ এখানে ছেড়ে যাও, তা হলে যেতে পার, অন্যথায় নয়। হযরত সুহায়ব (রা) এটা মেনে নিলেন এবং পার্থিব তুচ্ছ বস্তুকে পদাঘাত করে হিজরত করলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে তিনি নবী (সা)-এর দরবারে সমুদয় ঘটনা খুলে বললেন। শুনে তিনি বললেন, ربح البيع "এ ব্যবসায়ে সুহায়ব খুবই মুনাফা অর্জন করেছে।" অর্থাৎ সে নশ্বরকে ছেড়ে অবিনশ্বরকে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল করেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ

"মানুষের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তিও আছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্ম-বিক্রি করে থাকে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।"

(সূরা বাকারা ২০৭)

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ, পৃ. ১৭।

অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি (সা) বারবার বলতে থাকেন : ربح صهيب ربح صهيب "সুহায়ব খুবই মুনাফা অর্জন করেছে, সুহায়ব খুবই মুনাফা অর্জন করেছে।"

উমর ইবন হাকাম থেকে বর্ণিত আছে যে, মক্কার মুশরিকরা হযরত সুহায়ব, হযরত আম্মার, হযরত আবূ ফায়েদা, হযরত আমির ইবন ফুহায়রা প্রমুখ (রা) কে এমনই নির্যাতন করতো যে, তাঁরা অপ্রকৃতস্থ ও বেহুঁশ হয়ে যেতেন। অপ্রকৃতস্থতা এমনই ছিল যে, মুখ দিয়ে কি বলা হচ্ছে, সে খবরও থাকতো না। এর প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় :

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, তোমার প্রতিপালক এ সবের পর তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা নাহল : ১১০)

এ আয়াত ঐ বুযর্গদের প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছে।[১]

হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা)

হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) প্রথম যুগের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ষষ্ঠতম মুসলমান ছিলেন এবং নবীজী (সা) আরকামের গৃহে অবস্থান গ্রহণের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি উম্মে আনমারের দাস ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের ফলে উম্মে আনমার তাঁর উপর কঠোর নির্যাতন চালায় (ইসাবা, ১খ. পৃ. ৪১৬)। একবার হযরত খাব্বাব (রা) হযরত উমর (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলে উমর (রা) তাঁকে নিজ আসনে উপবেশন করান এবং বলেন, বিলাল (রা) বাদে এ মসনদে বসার উপযুক্ত তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। এতে খাব্বাব (রা) বললেন, আমীরুল মুমিনীন, বিলালও আমার চেয়ে বেশি উপযুক্ত নন। কেননা সেই কঠিনতম দিনগুলোতে মক্কার মুশরিকদের মধ্যে কিছু লোক অন্তত হযরত বিলালের সহমর্মী ও সহায়তাকারী ছিল, কিন্তু আমার সহায়তাকারী কেউ ছিল না। একদিন মক্কার মুশরিকরা আমাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর চিৎ করে শুইয়ে দিল এবং একজন আমার বুকের উপর তার পা রাখল, যাতে আমি নড়াচড়া করতে না পারি। তিনি জামা তুলে পৃষ্ঠদেশের দাগগুলো দেখালেন।[২]

হযরত খাব্বাব (রা) বলেন, জাহিলী যুগে আমি কামার ছিলাম, তরবারি বানাতাম। একবার আমি আস ইবন ওয়ায়েলের জন্য তরবারি বানালাম। যখন এর মজুরীর জন্য

১. ইসাবা, ২খ. পৃ.১৯৫ ও তাবাকাতে ইবন সাদ, ৩খ. পৃ. ১৬১।

২ তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৩খ. পৃ. ১১৭।

তাকিদ দিতে এলাম, তখন আস ইবন ওয়ায়েল বলল, আমি তোমাকে এক কড়িও দেব না, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদ (সা) কে অস্বীকার করছ। খাব্বাব (রা) বললেন, যদি তুমি মরেও যাও এবং মরার পর আবার জীবিত হও, তবুও আমি মুহাম্মদ (সা) কে অস্বীকার করব না। আস বলল, কী ! মারা যাওয়ার পর আবার আমাকে জীবিত করা হবে ? খাব্বাব (রা) বললেন, হ্যাঁ। আস বলল, যখন আল্লাহ্ আমাকে মৃত্যু দেবেন এরপর দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন, আর এভাবে আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান আমার সাথে থাকবে, তখন আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন

اَفَرَئَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَداً اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْداً كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَداً وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْداً

"তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? কখনই নয়, তারা যা বলে, আমি তা লিখে রাখব এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। সে যে বিষয়ে কথা বলে, তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা।" (সূরা মরিয়ম ৭৭-৮০) (সহীহ্ বুখারী, পৃ. ২৯১; তাফসীরে সূরা মরিয়ম; ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ৩৩৬)।

হযরত আবূ ফুকায়হা জুহানী (রা)

আবূ ফুকায়হা উপাধি, প্রকৃত নাম ছিল ইয়াসার, তবে উপাধিই বেশি প্রসিদ্ধ। সাফওয়ান ইবন উমায়্যার গোলাম ছিলেন। উমায়্যা ইবন খালফ কখনো তাঁর পায়ে রশি বেঁধে হেঁচড়িয়ে নিয়ে বেড়াত, কখনো লোহার বেড়ী পরিয়ে উত্তপ্ত যমীনে উপুড় করে শুইয়ে রেখে পিঠে একটা মস্ত ভারী পাথর রেখে দিত, এমন কি তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন; আর কখনো তাঁর গলা টিপে ধরত।

একদিন উমায়্যা ইবন খালফ তাঁকে উত্তপ্ত যমীনে শুইয়ে তাঁর গলা টিপে ধরল। এ সময়ে সামনে থেকে উমায়্যা ইবন খালফের ভাই উবাই ইবন খালফ এসে পড়ল। সে কমীনা দয়া প্রদর্শনের পরিবর্তে বলতে থাকল, আরো জোরে টিপে ধর। কাজেই সে এত জোরে টিপে ধরল যে, লোকে মনে করল তাঁর দম হয়ত বেরিয়ে গেছে। সৌভাগ্যক্রমে হযরত আবূ বকর (রা) ঐদিক দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তিনি আবূ ফুকায়হাকে কিনে নিয়ে মুক্তি দিয়ে দেন।[1]

১. আল ইসতিয়াব, ৪খ. পৃ. ১৫৭।

হযরত যানিরা (রা)

হযরত যানিরা (রা) প্রথম যুগের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি হযরত উমর (রা)-এর দাসী ছিলেন। প্রাক-ইসলামী যুগে উমর (রা) তাঁকে এতই মারতেন যে, নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। আবূ জাহলও তাঁকে নির্যাতন করতো। আবূ জাহল ও মক্কার অন্যান্য সর্দারগণ হযরত যানিরা (রা) কে দেখলে বলত, ইসলাম যদি এত ভালো কিছু হতো, তা হলে যানিরা আমাদের অগ্রগামী হতো না (সে রকম নয় বলেই তো যানিরার মত নির্বোধেরা তাতে অংশ নেয়)। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল করেন :

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ

"মুমিনদের সম্বন্ধে কাফিররা বলে, যদি এ দীন ভালই হতো তবে তারা (সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা) এর প্রতি আমাদের অগ্রগামী হতো না।" (সূরা আহকাফ : ১১)

অর্থাৎ আমীর এবং সর্দারদের আল্লাহর নবীগণের হিদায়াত ও নসীহত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া আর ধন-সম্পদের প্রতি নিস্পৃহ দরবেশদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে গ্রহণ না করা, এটা কখনই হক-এর বাতিল হওয়ার প্রমাণ নয়; বরং অস্বীকারকারীদের অহংকার, দর্প, আত্মম্ভরিতা ও ঔদ্ধত্বেরই এটা প্রকাশ্য প্রমাণ। বরং দুর্বল এবং অভাবী লোকেরা সত্যগ্রহণ করলে এর দরুন বরং ঐ দুর্বল ও অভাবী ব্যক্তিরাই লাভবান হয়। তারা সত্য গ্রহণ করার ফলে পেছনের সারি থেকে উচ্চতর মর্যাদার স্তরে উন্নীত হন। অপরদিকে তথাকথিত প্রভাবশালী আমীর ও রঈসরা হক অস্বীকার করার কারণে সূক্ষ্মদর্শীদের দৃষ্টিতে দুনিয়া-আখিরাতে অপদস্থ ও নিগৃহীত হবার পথই বেছে নেয়। হ্যাঁ, যদি সমাজের আমীর ও প্রভাবশালী হয়েও হক গ্রহণে ইতস্তত না করে, যেমন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, হযরত উসমান গনী, হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা), তা হলে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হবে।

কঠিন নির্যাতন, নিপীড়ন ও বিপদের ফলে হযরত যানিরা (রা)-এর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেতে থাকে। মক্কার মুশরিকরা বলতে থাকে, লাত ও উযযা তাকে অন্ধ বানিয়ে দিচ্ছে। হযরত যানিরা (রা) মক্কার মুশরিকদের জবাবে বললেন, লাত ও উযযার তো এ খবরও নেই যে, কে তাদের পূজা করে। আল্লাহ যদি চান তা হলে আমার দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহর কুদরতের কারিশমা দেখুন, ঐ রাতের পরদিন ভোরেই তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। মক্কার মুশরিকরা বলল, মুহাম্মদ জাদু করেছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বাঁদী যানিরাকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন।[১]

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এভাবে অনেক গোলাম ও বাঁদীকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন এবং অত্যাচারিতদের জীবন বাঁচান। হযরত বিলাল, হযরত আবূ ফুকায়হা, হযরত আমর ইবন ফুহায়রা, হযরত যানিরা, হযরত নাহদিয়া, হযরত নাহদিয়ার

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ২৬৯।

কন্যা, হযরত লাবিনা, হযরত মুমিলিতা এবং হযরত উম্মে উবায়স (রা), এঁদের সবাইকে হযরত আবূ বকরই ক্রয় করে আযাদ করে দেন।[১]

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর পিতা আবূ কুহাফা তখনো মুসলমান হন নি, একবার আবূ বকরকে বললেন, আমি দেখছি তুমি খুঁজে খুঁজে দুর্বল এবং অসহায়দের কিনে নিয়ে আযাদ করে দিচ্ছ, যদি শক্তিশালী এবং যুবকদের কিনে নিয়ে আযাদ করে দিতে, তবে তা তোমার উপকারে আসতো। আবূ বকর বললেন, যাদের কিনে নিয়ে আযাদ করে দিচ্ছি, তাদের কেনার উদ্দেশ্য তো আমার অন্তরে আছে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى•وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنيسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى . فَسَنيسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهٗ اِذَا تَرَدّٰى اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى وَاِنَّ لاَ لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى فَاَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظّٰى لاَ يَصْلٰيهَا اِلاَّ الْاَشْقٰى الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى وَمَا لاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِن نِعْمَةٍ تُجْزٰى اِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى وَلَسوفَ يَرْضٰى

"সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে আমি তার জন্য সহজ পথ সুগম করে দেব। আর কেউ কার্পণ্য করলে এবং নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা বর্জন করলে, তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণতির পথ। আর যখন সে ধ্বংস হবে, তখন তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না। আমার কাজ তো কেবল পথ নির্দেশ করা। আমি তো পরলোকের ও ইহলোকের মালিক। আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি; যে নিতান্তই হতভাগা, যে হককে অস্বীকার করে ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে-ই ওতে প্রবেশ করবে। আর পরম মুত্তাকীদের তা থেকে বহু দূরে রাখা হবে, যে আত্মশুদ্ধির জন্য নিজ সম্পদ দান করে এবং কারো প্রতি তার অনুগ্রহের প্রতিদান পাওয়ার জন্যে নয়, কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় তা করে, সে তো অচিরেই (নিজ অনুগ্রহের পুরস্কার দেখে) সন্তোষ লাভ করবে।" (সূরা লায়ল ৫–২১)

হাকিম হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) থেকে (যে উপলক্ষে আয়াতটি নাযিল হয়েছে) হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। (যারকানী, ১খ. পৃ. ২৬৯; উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১১১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৫৮)।

---

১. প্রাগুক্ত।

এ আয়াত সর্বসম্মত মতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। এতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে اتقى বলা হয়েছে। অর্থাৎ সবচে' বেশি পরহেযগার এবং আল্লাহকে সর্বাধিক ভয়কারী। সূরা হুজুরাতে ইরশাদ হয়েছে : اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী।" (সূরা হুজুরাত ১৩)

বুঝা গেল যে, মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট নবী করীম (সা)-এর পরে উম্মতের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। আর হুযূর (সা)-এর পরে তাঁরাই সবচে' উত্তম ছিলেন, যাঁরা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে জীবন ও সম্পদ দিয়ে ইসলামকে সাহায্য করেছেন এবং ক্রীতদাসদের কিনে কিনে আযাদ করে দিয়েছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তের বছরে ইসলাম ও মুসলমানদের খিদমতে চল্লিশ হাজার দিরহাম মূলধন ব্যয় করেছেন। আর যা অতিরিক্ত ছিল, হিজরতের সফর এবং মসজিদে নববীর জায়গা ক্রয়ে তা ব্যয় হয়ে গেছে। যখন কাপড় ছিল না, তখন চাদর জড়িয়ে নবীজীর দরবারে উপস্থিত হন এবং আরয করেন, তবুও আমি আমার পরওয়ারদিগারের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

কতিপয় শী'আ বলে থাকে যে, এ আয়াত হযরত আলী (রা)-এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। এর জবাব হলো, এ সূরার সমুদয় বাক্যই এ কথার সাক্ষ্য যে, সূরাটি ঐ ব্যক্তির প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যিনি নিজের ধন-সম্পদ কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও রেযামন্দী হাসিলের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করেছেন। আর সারা পৃথিবীই জানে যে, হযরত আলী (রা) সে সময় অল্পবয়স্ক ছিলেন, আবূ তালিবের অভাবের কারণে তিনি নবী করীম (সা)-এর তত্ত্বাবধানে ও অভিভাবকত্বে ছিলেন। তাঁর মধ্যে ঐ সময় না ছিল আর্থিক সামর্থ্য, আর না ছিল শারীরিক শক্তি, যা দিয়ে ইসলামের সাহায্য করতে পারেন। তিনি কেমন করে এ আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারেন ? পক্ষান্তরে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) জান ও মাল দিয়ে ইসলামকে এতটা সাহায্য করেছেন যে, যখন ইসলাম অসহায়, নির্বান্ধব ও অভিভাবকহীন ছিল, ঐ সময়ের সাহায্য গ্রহণীয় ও শত কল্যাণময় ছিল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

"তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে (ইসলামের দুর্দিনে) ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে, তারা আর পরবর্তীরা সমান নয়; তারা ওদের চেয়ে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।" (সূরা হাদীদ : ১০)

মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের আর্থিক উন্নতি হয়, সে সময় আর সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন থাকেনি। এ কারণে নবী করীম (সা)-এর পর সমস্ত উম্মতের মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন। এ জন্যে পূর্ববর্তী আয়াতের ভিত্তিতে তাঁর মুত্তাকী হওয়ার বিষয়টি জানা যায়, যা আল্লাহর নিকট তাঁর সম্মানিত হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আর দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা তাঁর উচ্চ মর্যাদার কথা জানা যায়। এজন্যে যে, তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলামকে সহায়তা করেছেন এবং জান-মাল দ্বারা ইসলামের সাহায্য করেছেন।

অধিকন্তু, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণের কথা ইতোমধ্যে বলা হয়েছে, আর হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহযাত্রী হওয়া, হেরা গুহায় তাঁর সাহচর্য এবং নবী (সা)-এর মৃত্যুপূর্ব অসুস্থতাকালীন সালাতে ইমামতি করার বর্ণনা ইনশা আল্লাহ এর পরেই আসছে। এ সমুদয় কর্মকাণ্ড হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উত্তম হওয়ারই প্রমাণ বহন করে।

মোটকথা, কুরায়শ মুসলিম নির্যাতনে এক মুহূর্তও নষ্ট করেনি। ওরা মুসলমানদের গাছে লটকিয়ে রেখেছে, পায়ে রশি বেঁধে হেঁচড়িয়ে নিয়েছে, পেট ও পিঠে উত্তপ্ত অঙ্গার রেখেছে, সব কিছুই করেছে, কিন্তু সত্য দীন থেকে কাউকে পদস্খলিত করতে সক্ষম হয়নি। অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু ইসলাম থেকে বিমুখ হননি। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

এ তো ছিল ঐ সব লোকের বর্ণনা, যাঁরা ক্রীতদাস ছিলেন অথবা ভিনদেশী ছিলেন। মুশরিকদের নির্যাতনের কালো হাত থেকে ঐ সব লোকও রেহাই পাননি, যাঁদের বংশীয় মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জিত ছিল।

১. হযরত উসমান গনী (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তাঁর চাচা হাকিম ইবন আবুল আস তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখল এবং বলল যে, কেন তুমি বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছ ? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনো এ দীন পরিত্যাগ করব না, আর এর থেকে কখনো পৃথকও হবো না। হাকিম যখন দেখল যে, তিনি দীনের উপর খুবই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তখন তাঁকে ছেড়ে দিল।[১]

২. হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর চাচা তাঁকে একটি বস্তায় ভরে ধোঁয়া দিত, যাতে তিনি পুনরায় স্বধর্মে ফিরে আসেন। কিন্তু হযরত যুবায়র (রা) বলতেন : لا اكفر ابدا "আমি কখনই কুফরী করব না।"[২]

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৩খ. পৃ. ৩৮।

২. ইসাবা, ১খ. পৃ. ৫৪৫।

৩. হযরত উমর (রা)-এর ভগ্নিপতি এবং চাচাত ভাই হযরত সাঈদ ইবন যায়দ (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন হযরত উমর (রা) তাঁকে রশি দিয়ে বাঁধেন। (সহীহ বুখারী, হযরত সাঈদ ইবন যায়দ-এর ইসলাম গ্রহণ অধ্যায়)।

৪. হযরত খালিদ ইবন সাঈদ ইবন আস (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর পিতা তাঁকে এতই প্রহার করেন যে, তাঁর মাথা ফেটে যায় এবং তাঁর খানাপিনা বন্ধ করে দেয়া হয়। বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে দেয়া হয়েছে।

৫. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত তালহা (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন কুরায়শের ব্যাঘ্র বলে কথিত নওফেল ইবন খুয়ায়লিদ দু'জনকে ধরে একই রশি দিয়ে বেঁধে রাখে। এ কারণে হযরত আবূ বকর ও হযরত তালহাকে 'কারনায়ন' (অর্থাৎ দু'জন এক 'কারন' বা একই রশি দিয়ে বাঁধা) বলা হতো। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, হযরত তালহা (রা)-এর জীবন চরিত)।

৬. হযরত ওলীদ ইবন ওলীদ, হযরত আয়্যাশ ইবন আবূ রবীয়া ও হযরত সালমা ইবন হিশাম (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, মক্কার কাফিরগণ তাঁদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালালো এবং তাঁদেরকে হিজরত পর্যন্ত করতে দেয় নি; যাতে করে হিজরতের ফলে এ নির্যাতনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মহানবী (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁদেরকে মক্কার মুশরিকদের কবল থেকে উদ্ধারের জন্য ফজরের সালাতের পর প্রত্যেকের নাম নিয়ে দু'আ করতেন যে, আয় আল্লাহ ! তুমি ওলীদ ইবন ওলীদ, আয়্যাশ ইবন আবূ রবীয়া ও সালমা ইবন হিশাম-কে মুশরিকদের অত্যাচারের খপ্পর থেকে নাজাত দাও। (সহীহ বুখারী)।

৭. হযরত আবূ যর গিফারী (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন মসজিদে হারামে গিয়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। ফলে মক্কার মুশরিকগণ তাঁকে মারতে মারতে মাটিতে ফেলে দেয়। হযরত আব্বাস (রা) এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। (সহীহ বুখারী, হযরত আবূ যর-এর ইসলাম গ্রহণ অধ্যায়)।

চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিতকরণের মু'জিযা

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ। কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।

মদীনায় হিজরতের প্রায় পাঁচ[1] বছর পূর্বে একবার মক্কার মুশরিকগণ একত্রিত হয়ে নবী (সা)-এর কাছে এলো। যাদের মধ্যে ওলীদ ইবন মুগীরা, আবূ জাহল, আস ইবন ওয়ায়েল, আস ইবন হিশাম, আসওয়াদ ইবন আবদে ইয়াগূস, আসওয়াদ ইবন মুত্তালিব, জামা'আ ইবনুল আসওয়াদ, নযর ইবন হারিস প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা তাঁর কাছে এ আবদার করল যে, যদি আপনি সত্যিই আল্লাহর নবী হয়ে থাকেন তবে নবূওয়াতের বিশেষ কোন নিদর্শন দেখান। অপর এক রিওয়ায়াতে আছে যে, চাঁদকে দু'টুকরা করে দেখান। তখন রাত ছিল এবং চতুর্দশী চাঁদ আকাশে উদিত হয়েছিল।

---

১. যেমনটি রূহুল মা'আনীর সূরা কামার-এর তাফসীরে উল্লিখিত আছে।

নবী (সা) বললেন, আচ্ছা, যদি এ মু'জিযা দেখাই, তা হলে ঈমান আনবে তো ? লোকেরা বলল, হ্যা, আমরা ঈমান আনব। হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করলেন এবং পবিত্র আঙ্গুল দিয়ে চাঁদের প্রতি ইশারা করলেন। সাথে সাথে চাঁদ দু 'টুকরা হয়ে গেল। এক টুকরা আবূ কুবায়স পাহাড়ের উপর এবং অপর টুকরা কায়কায়ান পাহাড়ের উপর ছিল। দীর্ঘক্ষণ মানুষ আশ্চর্য হয়ে দেখতে থাকে। ওরা এতটা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল যে, কাপড় দিয়ে চোখ পরিষ্কার করতে থাকে এবং চাঁদের দিকে দেখতে থাকে, এতে চাঁদ পরিষ্কার দু' টুকরা দেখা যেতে থাকে। রাসূল (সা) তখন বলছিলেন, আশহাদু আশহাদু; "হে লোকেরা, সাক্ষ্য থাকো, সাক্ষ্য থাকো।" আসর এবং মাগরিবের মধ্যে যতটা সময় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত চাঁদ দু' টুকরা থাকে, পরে আবার তা একত্রিত হয়ে যায়।

মক্কার মুশরিকরা বলল, মুহাম্মদ, তুমি তো জাদু করেছ। কাজেই বাইরে থেকে আগত মুসাফিরের অপেক্ষা কর এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। কেননা এটা কখনই সম্ভব নয় যে, মুহাম্মদ সমস্ত লোকের উপর জাদু করবে। যদি তারাও এ ব্যাপারে নিজেরা দেখার সাক্ষ্য দেয়, তবে ঠিক আছে; আর যদি তারা বলে যে, আমরা দেখি নি, তবে নিশ্চিত মুহাম্মদ তোমাদের উপর জাদু করেছে। সুতরাং মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞেস করা হল। সমস্ত দিক থেকে আগত মুসাফিরেরা নিজেদের সাক্ষ্য দিল যে, আমরা চাঁদকে দু' টুকরা হওয়া দেখেছি। কিন্তু এ সাক্ষ্যের ফলেও ঐ দুশমনেরা ঈমান আনলো না; বরং বলল• এটা চিরাচরিত জাদু। অর্থাৎ শীঘ্রই এর প্রতিক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হলো

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ

"কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে, ওরা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে এ তো চিরাচরিত জাদু।" (সূরা কামার ১-২)

চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার মু'জিযা রাসূল (সা)-এর যামানায় সংঘটিত হওয়া কুরআনুল করীম, মুতাওয়াতির, সহীহ ও উত্তম সনদে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর এটা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমদের ঐকমত্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যদি কোন নাম-গোত্রহীন ব্যক্তি, যে ইনশাক্কা-কে 'সা-ইনশাক্ক' অর্থাৎ অতীতকাল বাচক বলতে চায়, সে সরাসরি কুরআনের আয়াত, সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীস এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমদের ইজমার বিরোধিতা করে; যা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়।

চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিতকরণের এ ঘটনা, যা আমরা বর্ণনা করেছি, হাফিয ইবন কাসীরের আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া[১] এবং ফাতহুল বারী-র ইনশিকাকুল কামার[২] অধ্যায় থেকে গ্রহণ করেছি। সম্মানিত উলামায়ে কিরাম, মূল কিতাব দেখে নিন। ইসলাম বিরোধীগণ

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১১৮।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৩৮।

এ মু'জিযা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেন যে, প্রথমত এটা অসম্ভব ও অবাস্তব ঘটনা যে, চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করা যায়। দ্বিতীয়ত, এ ঘটনা কোন ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়নি। এর জবাব এটাই যে, আজ অবধি কোন জ্ঞানায়ত্ব প্রমাণ দ্বারা এ ধরনের কোন ঘটনা অসম্ভব ও অবাস্তব প্রমাণিত হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

যেমন মৃত্তিকার স্থায়িত্ব ও ভঙ্গুর হওয়া জ্ঞানত অবাস্তব ও অসম্ভব নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও ইচ্ছায় উর্ধ্বাকাশেরও স্থায়িত্ব ও ভঙ্গুর হওয়া অসম্ভব নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের নিরিখে আসমান এবং যমীন, সূর্য এবং চন্দ্র, বৃক্ষ এবং পাথর সব একইরূপ। যে আল্লাহ্ সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ্ তাকে ভাঙতেও পারেন, জুড়তেও পারেন। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের কারামত প্রকাশ নিশ্চিতভাবে অসম্ভব নয়। হ্যাঁ, ধারণাতীত ও বিরল তো বটেই। আর মু'জিযার জন্য কল্পনাতীত হওয়াটাই আবশ্যিক। যে ব্যক্তি কেবল ধারণাতীত হওয়ার কারণে এটা অসম্ভব দাবি করে, সে অসম্ভব এবং ধারণাতীত-এর পার্থক্যটাই জানে না। বাকী রইল এ ঘটনা ইতিহাস গ্রন্থসমূহে না থাকার অভিযোগ যা এ ধরনের শত শত, হাজার হাজার আশ্চর্য ও ধারণাতীত ঘটনা, যা বাস্তবে ঘটেছে কিন্তু ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এর উল্লেখ নেই। তাওরাত এবং ইঞ্জিলে এ ধরনের অনেক এমন ঘটনা আছে, যার নাম-নিশানাও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে নেই। অধিকন্তু, চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিতকরণ ছিল রাতে সংঘটিত ঘটনা, যা সাধারণত মানুষের আরাম করার সময় এবং কেবল সামান্য সময় মাত্র ছিল। এ কারণে যদি ব্যাপকভাবে জনগণ এটা না জানে, তা হলে তা অসম্ভব কিছু নয়। কোন কোন সময় চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ লাগে, আর অনেক মানুষ হয়ত তার খবরও রাখে না। অধিকন্তু, স্থানিক দূরত্বের কারণে অনেক স্থানে তখন হয়ত দিন হয়ে থাকবে, আবার কোন স্থানে অর্ধ রাত্রি হয়ে থাকবে, সাধারণত সেখানে লোকজন ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে। এ মু'জিযার উদ্দেশ্য ছিল কেবল মক্কাবাসীকে দেখানো ও তাদেরকে প্রমাণ দেখিয়ে দেয়া সে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গিয়েছিল, সমগ্র বিশ্বকে দেখানো উদ্দেশ্য ছিল না। এ ছাড়া কোন বস্তু দেখা আল্লাহ্ তা'আলার দেখানোর উপর নির্ভর করে। যদি কোন বস্তু চোখের সামনেও থাকে, আর আল্লাহ্ তা'আলা তা দেখাতে না চান, তা হলে ঐ বস্তু চোখে পড়বে না।

সূর্যের প্রত্যাবর্তন[1]

রাসূল (সা)-এর প্রসিদ্ধ মু'জিযাসমূহের মধ্যে সূর্যের প্রত্যাবর্তনও অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পুনরায় ফিরে আসা। হযরত আসমা বিনতে উমায়স (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা) খায়বরের সন্নিকটে 'সাহবা' নামক স্থানে ছিলেন।

---

১. এ মু'জিযা যদিও হিজরতের পর সপ্তম হিজরীতে খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তনকালে 'সাহবা' নামক স্থানে প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধায় এখানে বর্ণনা করা উপযুক্ত মনে হলো। আল্লাহই ভাল জানেন।

হুযূর (সা) হযরত আলী (ক)-এর কোলে মাথা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হযরত আলী তখনো আসরের সালাত পড়েননি, এ অবস্থায় ওহী নাযিল হওয়া শুরু হলো। এমনকি সূর্য ডুবে গেল। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আসরের সালাত পড়নি? তিনি বললেন, না। তৎক্ষণাৎ রাসূল (সা) হাত তুলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানালেন যে, আয় আল্লাহ! আলী তোমার রাসূলের আনুগত্য করছিল, সূর্যকে ফিরিয়ে দাও, যাতে সে ওয়াক্তমত আসরের সালাত আদায় করতে পারে। আসমা বিনতে উমায়স (রা) বলেন, সূর্য ডুবে যাওয়ার পর ফিরে এলো, আর এর রশ্মি যমীন এবং পাহাড়সমূহের উপর পতিত হলো। ইমাম তাহাবী বলেন, হাদীসটি সহীহ এবং এর সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। ইবনুল জাওযী ও ইবন তায়মিয়া হাদীসটি মওযূ' ও ভিত্তিহীন বলেছেন। আর শায়খ জালালউদ্দীন সুয়ূতী এ হাদীস সম্পর্কে একটি পৃথক পুস্তিকা রচনা করেন, যার নাম দেন كشف اللبس عن حديث رد شمس যাতে তিনি হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা ও সনদসমূহ বর্ণনা করেন এবং এ হাদীসটিকে সহীহ বলে প্রমাণিত করেন আল্লামা যারকানীও শারহে মাওয়াহিবে হাদীসটি সহীহ ও বিশুদ্ধ সনদ সম্বলিত বলে প্রমাণ করেছেন।[১]

সূর্যের গতি থেমে যাওয়ার মু'জিযা

কতিপয় যঈফ বর্ণনায় আছে যে, একবার রাসূল (সা)-এর জন্য সামান্য সময় সূর্যের গতি থামিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ বর্ণনা মুহাদ্দিসগণ গ্রহণ করেননি। (যারকানী, ৫খ. পৃ. ১১৮, নাসীমুর রিয়ায, ৩খ. পৃ. ১৪ এবং আল্লামা কারীকৃত আশ-শিফা, ১খ. পৃ. ৫৯১)।

যেহেতু চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হওয়া, সূর্যের প্রত্যাবর্তন এবং সূর্যের গতি থেমে যাওয়া কাছাকাছি ধরনের মু'জিযা, এ জন্যে আমরা এ তিনটিকে একই ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করলাম।

এ মু'জিযা মক্কা মুকাররমায় সংঘটিত হয়। হযরত (সা) যখন মি'রাজ থেকে ফিরে আসেন এবং কুরায়শদের সামনে মি'রাজের অবস্থা বর্ণনা করেন, কুরায়শগণ সততা পরীক্ষার্থে হযরতকে বায়তুল মুকাদ্দাসের নিদর্শনাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করছিল। তারা তাঁর কাছে একটি কাফেলা সম্পর্কেও জানতে চায়, যে কাফেলাটি বাণিজ্যের উদ্দেশে সিরিয়া গিয়েছিল সেটি কবে ফিরে আসবে। তিনি (সা) বললেন, কাফেলাটি বুধবার মক্কায় প্রবেশ করবে। যখন বুধবার শেষ হতে চলল এবং সন্ধ্যা সমাগত হলো, তখন কাফিরেরা শোরগোল আরম্ভ করলো। রাসূল (সা) তখন দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা সূর্যকে ঐ স্থানেই স্থির রাখেন, এমনকি ইতিমধ্যে কাফেলা এসে পড়লো। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীর বক্তব্যের সত্যতা প্রকাশ করলেন।

কাযী ইয়ায কৃত আশ শিফা-র শরাহ নাসীমুর রিয়ায, ৩খ. পৃ. ১০-১৩; যারকানী, ৫খ. পৃ. ১১৩-১১৬।

আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত

মক্কার মুশরিকগণ যখন দেখল যে, দিনকে দিন মানুষ ইসলামে দাখিল হচ্ছে, আর ইসলামের পরিধি বিস্তৃত হতে চলেছে, তখন তারা মুসলমানদের উপর যুলুম-নির্যাতন চালানোর জন্য সকলে ঐক্যবদ্ধ হলো। নানাভাবে মুসলমানদের উপর যুলুম-নিপীড়ন চালাতে লাগলো। উদ্দেশ্য, যেন তাঁরা ইসলাম ত্যাগ করেন। তখন নবী (সা) ইরশাদ করলেন :

تفرقوا فى الارض فان الله سيجمعكم قالوا الى اين نذهب قال الى هنا واشار بيده الى ارض الحبشة

"তোমরা আল্লাহর যমীনের কোথাও হিজরতে চলে যাও, আল্লাহ্ শীঘ্রই তোমাদের একত্রিত করবেন। সাহাবীগণ আরয করলেন, কোথায় যাব ? তিনি আবিসিনিয়ার দিকে ইঙ্গিত করেন।" (আবদুর রাযযাক মা'মার থেকে এবং তিনি যুহরী থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেন)।

হযরত (সা) আরো বললেন, সেখানে এক বাদশাহ আছেন, যাঁর সাম্রাজ্যে কেউ কারো উপর যুলুম করতে পারে না। সাহাবায়ে কিরাম (রা) তখন কুফর ও শিরকের এ ফিতনার কারণে ঘাবড়িয়ে যান এবং দীন ও ঈমান হরণকারী দস্যুদের কালো থাবার বাইরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন, নিরুপদ্রব পরিবেশে নিশ্চিন্তে স্বীয় প্রভুর নাম নিতে পারাটাই ছিল তাঁদের কাম্য। কাজেই নুবূওয়াতের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে নিম্ন বর্ণিত সাহাবা কিরাম (রা) আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন

পুরুষ

১. হযরত উসমান ইবন আফফান (রা);
২. হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা);
৩. হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা);
৪. হযরত আবূ হুযায়ফা ইবন উতবা (রা);
৫. হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা);
৬. হযরত আবূ সালমা ইবন আবদুল আসাদ (রা);
৭. হযরত উসমান ইবন মায'উন (রা);
৮. হযরত আমের ইবন রবীয়াহ (রা);
৯. হযরত সুহায়ল ইবন বায়যা (রা);
১০. হযরত আবূ সাবরা ইবন আবূ রুহম আমিরী (রা), (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৪৩);
১১. হযরত হাতিব ইবন আমর (রা)। (উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১১৫)।

মহিলা

১. হযরত রুকাইয়্যা (রা), অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা ও হযরত উসমান সম্মানিত স্ত্রী;
২. হযরত সাহলা বিনতে সুহায়ল (রা), হযরত আবূ হুযায়ফা (রা)-এর স্ত্রী;
৩. হযরত উম্মে সালমা বিনতে আবূ উমায়্যা (রা), হযরত আবূ সালমা (রা)-এর স্ত্রী, যিনি আবূ সালমার ইনতিকালের পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীত্ব লাভে ধন্য হন এবং উম্মুল মু'মিনীন উপাধিতে ভূষিত হন;
৪. হযরত লায়লা বিনতে আবূ হাসমা (রা), হযরত আমের ইবন রবীয়াহ (রা)-এর স্ত্রী, (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৪৩, আবিসিনিয়ায় হিজরত অধ্যায়);
৫. হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে সুহায়ল ইবন উমর (রা), হযরত আবূ সাবরা (রা)-এর স্ত্রী। (উয়ূনুল আসার)।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের তালিকায় হাতিব ইবন উমর এবং উম্মে কুলসুমের নাম উল্লেখ করেন নি। এ নাম হাফিয ইবন সায়্যিদুন নাস উয়ূনুল আসার-এ উল্লেখ করেছেন। ওয়াকিদী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা)-এর নামও উল্লেখ করেছেন।

হাফিয আসকালানী বলেন, বিশুদ্ধ এটাই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতে শরীক ছিলেন না, বরং দ্বিতীয় হিজরতে শরীক ছিলেন, যা আমরা শীঘ্রই উল্লেখ করব।

আর মুহাম্মদ ইবন ইসহাকও এটাই বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতে শরীক ছিলেন না; বরং দ্বিতীয় হিজরতে শরীক ছিলেন এবং মুসনাদে আহমদের হাসান সনদে বর্ণিত একটি রিওয়ায়াত দ্বারাও এটাই অনুমিত হয়।[১]

এই এগারজন পুরুষ ও পাঁচজন স্ত্রীলোক গোপনে রওয়ানা হন। কয়েকজন বাহনে আর কয়েকজন পদব্রজে। ঘটনাক্রমে যখন তাঁরা বন্দরে পৌঁছলেন, তখন দুটি ব্যবসায়ী নৌকা আবিসিনিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিল। পাঁচ দিরহাম নিয়ে তারা তাঁদের সবাইকে নৌকায় তুলে নিল।

মক্কার মুশরিকদের কাছে যখন এ খবর পৌঁছল, তারা পিছনে লোক লেলিয়ে দিল। কিন্তু তারা বন্দরে পৌঁছার পূর্বেই নৌকা যাত্রা করেছিল (উয়ূনুল আসার, ৭খ. পৃ. ১১৬)।

হযরত আসকালানী বলেন, এ সাহাবীগণ জেদ্দার উপকূল থেকে নৌকায় আরোহণ করেছিলেন (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮০)। এঁরা রজব থেকে শাওয়াল পর্যন্ত আবিসিনিয়ায় অবস্থান করেন।

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৪৩।

শাওয়াল মাসে খবর শুনলেন যে, মক্কাবাসী সবাই মুসলমান হয়ে গেছে, তখন তাঁরা মক্কায় ফিরে এলেন। মক্কার নিকটে পৌঁছে যখন জানলেন, খবরটি মিথ্যা, তখন তাঁরা মহাসংকটে পড়ে গেলেন। অগত্যা তাঁদের কেউ গোপনে এবং কেউ কারো আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন।

আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত

এবার কুরায়শরা পূর্বের তুলনায় বেশি অত্যাচার শুরু করলো। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে পুনরায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন। তখন নিম্নবর্ণিত সাহাবায়ে কিরাম (রা) হিজরত করেন :

পুরুষ

১. হযরত উসমান ইবন আফফান (রা);
২. হযরত জাফর ইবন আবূ তালিব (রা);
৩. হযরত আমর ইবন সাঈদ ইবন আস (রা);
৪. হযরত খালিদ ইবন সাঈদ ইবন আস (রা),হযরত আমর ইবন সাঈদ (রা)-এর ভাই;
৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা);
৬. উবায়দুল্লাহ ইবন জাহাশ, যিনি আবিসিনিয়া গিয়ে খ্রিস্টান হয়ে যান এবং খ্রিস্টান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন;
৭. হযরত কায়স ইবন আবদুল্লাহ (রা);
৮. হযরত মুয়াইকিব ইবন আবূ ফাতিমা দাওসী (রা);
৯. হযরত উতবা ইবন গাযওয়ান (রা);
১০. হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা);
১১. হযরত আবূ হুযায়ফা ইবন উতবা (রা);
১২. হযরত আসওয়াদ ইবন নওফেল (রা);
১৩. হযরত ইয়াযীদ ইবন যাম'আ (রা);
১৪. হযরত আমর ইবন উমায়্যা (রা);
১৫. হযরত তালিব ইবন উমায়র (রা);
১৬. হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা);
১৭. হযরত সুয়ায়বিত ইবন সা'দ (রা);
১৮. হযরত জুহম ইবন কায়স (রা);
১৯. হযরত আমর ইবন জুহম (রা), অর্থাৎ হযরত জুহম ইবন কায়স (রা)-এর পুত্র;
২০. হযরত খুযায়মা ইবন জুহম (রা), অর্থাৎ জুহমের দ্বিতীয় পুত্র;
২১. হযরত আবুর রূম ইবন উমায়র (রা) অর্থাৎ হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা)-এর ভাই;

২২. হযরত ফিরাস ইবন নাযর (রা);
২৩. হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা);
২৪. হযরত আমর ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা);
২৫. হযরত মুত্তালিব ইবন আযহার (রা);
২৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা);
২৭. হযরত উতায়বা ইবন মাস'উদ (রা), অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর ভাই;
২৮. হযরত মিকদাদ ইবন আমর (রা);
২৯. হযরত হারিস ইবন খালিদ (রা);
৩০. হযরত আমর ইবন উসমান (রা);
৩১. হযরত আবূ সালমা ইবন আবদুল আসাদ (রা);
৩২. হযরত শাম্মাস (রা), যাকে উসমান ইবন আবদুশ শারীদ বলা হতো;
৩৩. হযরত হাব্বার ইবন সুফিয়ান ইবন আবদুল আসাদ (রা);
৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন সুফিয়ান (রা), হযরত হাব্বার (রা)-এর ভাই;
৩৫. হযরত হিশাম ইবন আবূ হুযায়ফা (রা);
৩৬. হযরত সালমা ইবন হিশাম (রা);
৩৭. হযরত আয়্যাশ ইবন আবূ রবীয়াহ (রা);
৩৮. হযরত মুয়াত্তাব ইবন আওফ (রা);
৩৯. হযরত উসমান ইবন মায'উন (রা);
৪০. হযরত সায়িব ইবন উসমান (রা);
৪১. হযরত কুদামা ইবন মায'উন (রা);
৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মায'উন (রা), হযরত কুদামা এবং আবদুল্লাহ (রা) এ দু'জনই হযরত সায়িব (রা)-এর চাচা;
৪৩. হযরত হাতিব ইবন হারিস (রা);
৪৪. হযরত মুহাম্মদ ইবন হাতিব (রা);
৪৫. হযরত হারিস ইবন হাতিব (রা), অর্থাৎ হযরত হাতিব (রা)-এর উভয় পুত্র;
৪৬. হযরত খাত্তাব ইবন হারিস (রা), অর্থাৎ হাতিব ইবন হারিস (রা)-এর ভাই;
৪৭. হযরত সুফিয়ান ইবন মা'মার (রা);
৪৮. হযরত জাবির ইবন সুফিয়ান (রা);
৪৯. হযরত জুনাদা ইবন সুফিয়ান (রা), হাসনার গর্ভজাত সুফিয়ানের পুত্র;
৫০. হযরত শারজীল ইবন হাসনা (রা), অর্থাৎ হযরত জাবির এবং সুফিয়ানের বৈপিত্রেয় ভাই;
৫১. হযরত উসমান ইবন রবীয়াহ (রা);
৫২. হযরত খুনায়স ইবন হুযাফাহ সাহমী (রা);

৫৩. হযরত কায়স ইবন হুযাফা সাহমী (রা);
৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা সাহমী (রা), এ তিনজন পরস্পর ভাই;
৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবন হারিস সাহমী (রা);
৫৬. হযরত হিশাম ইবন আস সাহমী (রা);
৫৭. হযরত আবূ কায়স ইবন হারিস সাহমী (রা);
৫৮. হযরত হারিস ইবন হারিস ইবন কায়স সাহমী (রা);
৫৯. হযরত মা'মার ইবন হারিস সাহমী (রা);
৬০. হযরত বিশর ইবন হারিস সাহমী (রা);
৬১. হযরত সাঈদ ইবন আমর সাহমী (রা), বিশর ইবন হারিসের বৈপিত্রেয় ভাই;
৬২. হযরত সাঈদ ইবন হারিস সাহমী (রা);
৬৩. হযরত সায়িব ইবন হারিস সাহমী (রা);
৬৪. হযরত উমায়র ইবন রুয়াব সাহমী (রা);
৬৫. হযরত মুহাম্মিয়া ইবন জাযর (রা);
৬৬. হযরত মা'মার ইবন আবদুল্লাহ (রা);
৬৭. হযরত উরওয়া ইবন আবদুল উযযা (রা);
৬৮. হযরত আদী ইবন নাযলা (রা);
৬৯. হযরত নুমান ইবন আদী (রা), অর্থাৎ হযরত আদী ইবন নাযলা (রা)-এর পুত্র;
৭০. হযরত আমির ইবন রবীয়াহ (রা);
৭১. হযরত আবূ সাবরা ইবন আবূ রুহম (রা);
৭২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাখরামা (রা);
৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন সুহায়ল ইবন আমর (রা);
৭৪. হযরত সালীত ইবন আমর (রা);
৭৫. হযরত সুকরান ইবন আমর (রা), অর্থাৎ গযরত সালীত ইবন আমর (রা)-এর ভাই;
৭৬. হযরত মালিক ইবন রবীয়াহ (রা);
৭৭. হযরত আবূ হাতিব ইবন আমর (রা);
৭৮. হযরত সা'দ ইবন খাওলা (রা);
৭৯. হযরত আবূ উবায়দা আমির ইবন জাররাহ (রা);
৮০. হযরত সুহায়ল ইবন বায়যা (রা);
৮১. হযরত আমর ইবন আবূ সারাহ (রা);
৮২. হযরত ইয়ায ইবন যুহায়র (রা);
৮৩. হযরত আমর ইবন হারিস ইবন যুহায়র (রা);
৮৪. হযরত উসমান ইবন আবদে গানাম (রা);
৮৫. হযরত সা'দ ইবন আবদে কায়স (রা);
৮৬. হযরত হারিস ইবন আবদে কায়স (রা)।

মহিলা

১. হযরত রুকাইয়্যা বিনতে রাসূলুল্লাহ (সা);
২. হযরত আসমা বিনতে উমায়স (রা), হযরত জাফর (রা)-এর স্ত্রী, যাঁর গর্ভে আবিসিনিয়াতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা) জন্মগ্রহণ করেন;
৩. হযরত ফাতিমা বিনতে সাফওয়ান (রা), হযরত আমর ইবন সাঈদ (রা)-এর স্ত্রী;
৪. হযরত উমায়না বিনতে খালফ (রা), হযরত খালিদের স্ত্রী;
৫. হযরত উম্মে হাবিবা বিনতে আবূ সুফিয়ান (রা), হযরত উবায়দুল্লাহ (রা)-এর স্ত্রী, উবায়দুল্লাহর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন;
৬. হযরত বরকত বিনতে ইয়াসার (রা), কায়সের স্ত্রী;
৭. জাহমের স্ত্রী, হযরত উম্মে হারমালা বিনতে আবদুল আসওয়াদ (রা);
৮. হযরত মুত্তালিবের স্ত্রী, হযরত রামলা বিনতে আওফ (রা);
৯. হযরত হারিসের স্ত্রী হযরত রায়তা বিনতে হারিস ইবন জাবালা, যাঁর গর্ভে আবিসিনিয়াতে মূসা, আয়েশা, যয়নব এবং ফাতিমা জন্মগ্রহণ করেন;
১০. আবূ সালমার স্ত্রী, উম্মে সালমা, যাঁর গর্ভে আবিসিনিয়াতে যয়নব জন্মগ্রহণ করেন, আবূ সালমার মৃত্যুর পর যাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সৎ মেয়ে বলা হতো;
১১. হযরত হাতিবের স্ত্রী, হযরত ফাতিমা বিনতে মুজাল্লাল (রা);
১২. খাত্তাবের স্ত্রী, হযরত ফাকিহা বিনতে ইয়াসার (রা);
১৩. সুফিয়ানের স্ত্রী, হযরত হাসনা (রা);
১৪. আবূ সাবরার স্ত্রী হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে সুহায়ল (রা);
১৫. সুকরানের স্ত্রী, হযরত সাওদা বিনতে জাম্'আ (রা);
১৬. মালিকের স্ত্রী হযরত উমরা বিনতে সা'দী (রা)।

(সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ, পৃ. ১১১–১১৪; উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১১৬)।

ইবন হিশাম আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের নামসমূহ বংশ ও গোত্র পরিচিতি সহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন আর হাফিয ইবন সায়্যিদুন নাস উয়ূনুল আসারে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন।

হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)-এর ব্যাপারে জীবনী লেখক আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের মধ্যে ছিলেন কিনা। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের মধ্যে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর পবিত্র নামও উল্লেখ করেছেন। ওয়াকিদী এবং অপরাপর আলিম এটা অস্বীকার করেছেন। কতিপয় আলিম তো এ পর্যন্ত বলে দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের মত ইমামের এ ব্যাপারে চুপ থাকা অসম্ভব। হাফিয ইবন কায়্যিম বলেন, প্রকৃত অবস্থা এই যে, হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) ইয়েমেনে বসবাসকারী। নবূয়াতের সূচনাকালে তিনি মক্কা মুকাররামায় উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন, এরপর ইয়েমেনে ফিরে যান। আর যখন হযরত জাফর ও অপরাপর সাহাবা (রা)দের

হিজরত করে আবিসিনিয়া গমনের খবর জানতে পারেন, তখন যেহেতু আবিসিনিয়া ইয়েমেনের সন্নিকটবর্তী, কাজেই তিনি হিজরত করে আবিসিনিয়া গমন করেন এবং সেখানে স্থায়ী হন। এরপর সপ্তম হিজরী সালে হযরত জাফর (রা)-এর সাথে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় আসেন। যেহেতু হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-ও আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন, যদিও সে হিজরত মক্কা থেকে ছিল না; বরং ইয়েমেন থেকে ছিল। এ জন্যে মুহাম্মদ ইবন ইসহাক হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর নাম আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের তালিকায় উল্লেখ করেন। যে সমস্ত ব্যক্তি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন, চাই তা মক্কা থেকে হোক অথবা ইয়েমেন থেকে কিংবা অন্য কোন স্থান থেকে, তাঁদের মধ্যে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)ও শামিল ছিলেন। হ্যাঁ, যদি মুহাম্মদ ইবন ইসহাক এমনটি বলতেন যে, হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) মক্কা থেকে আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করেছেন, তা হলে নিঃসন্দেহে তা অস্বীকার করার উপযুক্ত ছিল।[১]

কুরায়শগণ যখন দেখল যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) আবিসিনিয়া গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন এবং নিরাপদে ইসলামের হুকুম-আহকাম পালন করে চলছেন, তখন তারা পরামর্শ করল যে, আমর ইবন আস ও আবদুল্লাহ ইবন আবূ রবীয়াকে দিয়ে নাজ্জাশী এবং তার পারিষদবর্গ ও নিকটজনদের পর্যাপ্ত পরিমাণে হাদিয়া বা উপঢৌকন দিয়ে নিজেদের মতে আনয়ন করবে। সুতরাং আমর ইবন আস ও আবদুল্লাহ ইবন আবূ রবীয়া আবিসিনিয়া উপস্থিত হলো এবং প্রথমে পারিষদবর্গ ও মোসাহেবদেরকে উপহার দিয়ে বলল যে, আমাদের শহরের কিছু মূর্খ ও আহমক নিজেদের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে আপনাদের শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ওরা নিজেদের পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করে আপনাদের খ্রিস্টধর্মও গ্রহণ করেনি; বরং এমন এক নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে, যে সম্পর্কে আমরা আপনারা, কেউই কিছু জানি না। দেশের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আমাদের দু'জনকে মহামান্য বাদশাহর কাছে এ জন্যে প্রেরণ করেছেন যেন ঐ লোকগুলোকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আপনারা অনুগ্রহ করে বাদশাহর কাছে সুপারিশ করুন, যাতে কোন কথাবার্তা ছাড়াই বাদশাহ ওদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিন। কাজেই তারা যখন নিশ্চিন্ত হলো এবং হাদিয়া বা উপঢৌকনের বিনিময়ে দরবারী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে নিজেদের আরযী পেশ করল, তখন তারা এদের পুরোপুরি সমর্থন করল। আবিসিনিয়ার বাদশাহ সাহাবায়ে কিরামের কাউকে ডেকে তাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করুন কিংবা তাদের কাছ থেকে বাদশাহ কিছু কথা শুনুন, আমর ইবন আস ও আবদুল্লাহ ইবন আবূ রবীয়ার জন্য এটা খুবই কঠিন ও কষ্টকর ব্যাপার ছিল।

পাঠকবর্গ খুব ভাল করেই বুঝেন যে, তারা কেন এটা চাচ্ছিল না হাবশী বাদশাহ মুহাজির সাহাবাগণের কারো সঙ্গে কোন কথা না বলুন কিংবা তাঁদের কিছু জিজ্ঞেস না

১. যাদুল মা'আদ,২খ. পৃ. ৪৫; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৪৩।

করুন, এমনিতেই মুহাজিরগণকে ওদের হাতে সোপর্দ করুন। প্রকাশ্য কারণ এটাই যে, কথা বললে ওরা যে হক কথাই বলবেন এটা ওদের জানা ছিল। মোটকথা, তারা বাদশাহের সামনে নিজেদের আরযী পেশ করলো আর দরবারীরাও পুরোপুরি সমর্থন করল ঐ লোকগুলোকে আরব প্রতিনিধিদের হাতে সোপর্দ করা হোক। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়। নাজ্জাশী রাগান্বিত হয়ে সাফ সাফ বলে দিলেন, আমি তাদের অবস্থা সম্বন্ধে না জেনে, তাদের সাথে কথা না বলে তাদেরকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করতে পারি না। এটা কি করে সম্ভব হতে পারে, যে সমস্ত লোক নিজেদের দেশ ছেড়ে আমার সাম্রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের সম্বন্ধে তত্ত্ব-তালাশ না নিয়েই তাদের বিরোধী লোকদের হাতে তাদেরকে তুলে দেব ? বাদশাহ সাহাবা (রা) দের ডেকে আনার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠালেন। দূত তাঁদের কাছে বাদশাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিল। তখন সাহাবীদের মাঝে একজন বললেন, দরবারে পৌঁছে কি বলব (অর্থাৎ বাদশাহ খ্রিস্টান আর আমরা মুসলমান, অনেক কিছু বিশ্বাসেই আমরা তাদের বিপরীত)। সাহাবাগণ বললেন, আমাদের নবী (সা) যা আমাদের শিখিয়েছেন ও বলেছেন আমরা দরবারে গিয়ে তাই বলব। যত কিছুই হোক, আমরা তা থেকে সামান্যও পিছপা হব না। দরবারে পৌঁছে তাঁরা কেবল বাদশাহকে সালাম জানিয়েই ক্ষান্ত হলেন, কেউই তাকে সিজদা করলেন না। দরবারী অভিজাত শ্রেণীর নিকট মুসলমানদের এ কাজ খুবই দৃষ্টিকটূ মনে হল। তখন মোসাহেব এবং অমাত্যবর্গ প্রশ্ন করে বসলেন, আপনারা বাদশাহ নামদারকে কেন সিজদা করলেন না ? অপর এক বর্ণনায় আছে, বাদশাহ স্বয়ং এ প্রশ্ন করলেন যে, আপনারা সিজদা করলেন না কেন? হযরত জাফর (রা) বললেন, আমরা এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করি না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি এক রাসূল প্রেরণ করেছেন, তিনিই আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলাকে ছাড়া আর কাউকে সিজদা না করতে। মুসলমানগণ বললেন, আমরা রাসূল (সা) কেও এভাবেই সালাম দিয়ে থাকি এবং নিজেরা একে অপরকে এ পদ্ধতিতেই সালাম করি। আর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, জান্নাতবাসীরাও এভাবে পরস্পর পরস্পরকে সালাম করবে। আর সিজদা, তোমাদেরকে সিজদা করে আল্লাহর সমকক্ষ বানানো থেকে আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছেই আশ্রয় চাই। নাজ্জাশী সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, খ্রিস্টধর্ম ও মূর্তিপূজা ছাড়া এটা আবার কোন্ ধর্ম আপনারা গ্রহণ করেছেন ? সাহাবীদের দল থেকে হযরত জাফর (রা) বাদশাহর প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন।

নাজ্জাশীর দরবারে হযরত জাফর (রা)-এর হৃদয়গ্রাহী ভাষণ এবং নাজ্জাশীর উপর এর প্রভাব

হে বাদশাহ নামদার ! আমরা সবাই মূর্খ ও অবুঝ ছিলাম, মূর্তির পূজা করতাম, মৃত জন্তু খেতাম, নানা ধরনের নির্লজ্জ কাজকর্মে লিপ্ত ছিলাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীর সাথে কদাচরণ করতাম। আমাদের মধ্যে যে শক্তিশালী হতো,

সে চাইত দুর্বলদের খেয়ে ফেলতে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন, আমাদের মধ্য থেকে তাঁর এক পয়গাম্বর প্রেরণ করলেন, যাঁর বংশ মর্যাদা, সত্যবাদিতা ও আমানতদারী, পবিত্রতা ও নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে আমরা ব্যাপক পরিচিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর পথে এই বলে আহ্বান করলেন যে, আমরা যেন তাঁকে এক বলে স্বীকার করি, এক বলে বিশ্বাস করি এবং বুঝি, শুধু তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করি। আর আমরা, আমাদের বাপ-দাদারা যে মূর্তি ও পাথরের পূজা করতো, তা সব কিছু একবাক্যে ছেড়ে দিই; সত্যবাদিতা, আমানতদারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করি। তিনি রক্তপাত ও নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বাঁচার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আর সব ধরনের নির্লজ্জতা থেকে, বাতিল এবং অন্যায় বলা থেকে, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা থেকে এবং কোন নিষ্পাপ ব্যক্তির প্রতি অপবাদ আরোপ থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, যেন শুধু আল্লাহরই ইবাদত করি এবং কাউকে তাঁর সাথে শরীক না করি, সালাত আদায় করি, যাকাত দান করি এবং রোযা রাখি। মোটকথা এই যে, আমরা যেন জীবন ও সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ না করি।

এছাড়া হযরত জাফর (রা) ইসলামের আরো কিছু শিক্ষার উল্লেখ করে বললেন, আমরা তাঁকে সত্য মেনেছি ও তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তিনি আল্লাহর নিকট থেকে যা কিছু এনেছেন, তার আনুগত্য ও অনুসরণ করেছি। কাজেই আমরা কেবল আল্লাহরই ইবাদত করি, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না, হালাল কাজ করি এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকি। এ কারণে আমাদের সম্প্রদায় আমাদের উপর নানা ধরনের অত্যাচার করে, নানা প্রকারে কষ্ট দেয়, যাতে আমরা এক আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দিয়ে পুনরায় পূর্ববর্তী অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতায় নিমগ্ন হই। অবশেষে আমরা যখন তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম এবং নিজেদের দীনের উপর চলা, এক আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করা আমাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ল, তখন আমরা নিজেদের জন্মভূমি ত্যাগ করলাম। আপনি আমাদের প্রতি অত্যাচার করবেন না এ প্রত্যাশায় আমরা আপনার প্রতিবেশী হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।

নাজ্জাশী বললেন, তোমাদের পয়গাম্বর আল্লাহর নিকট থেকে যে বাণী এনেছেন, তার কিছু কি তোমার মনে আছে? হযরত জাফর বললেন, হ্যাঁ। নাজ্জাশী বললেন, আচ্ছা, তা হলে এর থেকে কিছু পড়ে আমাকে শোনাও। হযরত জাফর সূরা মরিয়মের প্রথমাংস পড়ে শোনালেন। বাদশাহ এবং দরবারের অন্যান্যের চোখে পানি এসে গেল, কাঁদতে কাঁদতে বাদশাহর দাঁড়ি ভিজে গেল (বুঝা গেল যে, বাদশাহ দাঁড়ি রেখেছিলেন আর এটাই সকল নবীরই তরীকা, আল্লাহ মাফ করুন, কোন পয়গাম্বর কখনই দাঁড়ি কামাতেন না, দাঁড়ি রাখা সমস্ত নবী ও সৎকর্মশীলদের বিশেষ নিয়ম)।

হযরত জাফর (রা) তিলাওয়াত[১] শেষ করলেন, তখন নাজ্জাশী বললেন, এ বাণী আর হযরত ঈসা (আ) যে বাণী নিয়ে এসেছিলেন, দুটোই একই প্রদীপের বিচ্ছুরিত রশ্মি। আর কুরায়শ প্রতিনিধিদের পরিষ্কার বলে দিলেন যে, এ লোকদেরকে আমি কখনই তোমাদের হাতে সোপর্দ করব না, এর কোনই সম্ভাবনা নেই।

যখন আমর ইবন আস এবং আবদুল্লাহ ইবন আবূ রবীয়াহ এভাবে বাদশাহর দরবার থেকে হতাশ হয়ে বেরিয়ে আসে, তখন আমর ইবন আস বলল, আগামীকাল আমি বাদশাহর সামনে এমন কথা বলব যাতে তিনি ঐ লোকদেরকে সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ করে ছাড়েন। আবদুল্লাহ ইবন আবূ রবীয়াহ বলল, এমনটি কখনো করো না, ওদের সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে, ওরা আমাদের প্রিয় এবং আত্মীয়-স্বজন; যদিও ধর্মের দিক থেকে ওরা আমাদের বিরোধী। কিন্তু আমর ইবন আস এ কথা শুনলো না। পরের দিন এলো, আমর ইবন আস নাজ্জাশীকে বলল যে, হে বাদশাহ নামদার ! এ লোকগুলো হযরত ঈসা (আ)-এর প্রসঙ্গে অনেক খারাপ কথা বলে। নাজ্জাশী সাহাবা (রা) দের ডেকে পাঠালেন। এ সময় সাহাবীদের খুবই দুশ্চিন্তা দেখা দিল। কেউ একজন বললেন, হযরত ঈসা (আ) প্রসঙ্গে বাদশাহকে কি বলবে ? এতে সবাই একমত হয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ, আমরা তাই বলব যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) বলেছেন। যাই হোক না কেন, আমরা এর বিপরীত এতটুকুও বলব না।

তাঁরা দরবারে পৌঁছলে নাজ্জাশী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা হযরত ঈসা (আ) প্রসঙ্গে কি বল ? হযরত জাফর (রা) বললেন, আমরা তাঁর ব্যাপারে সে কথাই বলি, যা আমাদের নবী (সা) বলেন। সেটা হলো, ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল ছিলেন, আল্লাহর খাস রূহ এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বাণী ছিলেন। নাজ্জাশী মাটি থেকে একটি তৃণখণ্ড উঠিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম, মুসলমানরা যা বলল, ঈসা (আ) তা থেকে এ তৃণ পরিমাণও বেশি কিছু নন। এতে দরবারীরা অনেকে নাখোশ হলো, কিন্তু নাজ্জাশী এতে বিন্দুমাত্র পরোয়া করলেন না, পরিষ্কার বলে দিলেন, তোমরা যতই নাখোশ হও না কেন প্রকৃত ঘটনা[২] তো এটাই। আর

---

১. দালাইলে আবূ নুয়ায়ম, ১খ. পৃ. ৮১-তে আছে, হযরত জাফর (রা) সূরা মরিয়ম তিলাওয়াত করেন, নাজ্জাশী তা শোনামাত্র বুঝে ফেললেন যে, এটা সত্য এবং হযরত জাফর (রা)-কে বললেন, ওহে জাফর, এ পবিত্র কালাম থেকে কিছু আরো শোনাও। হযরত জাফর অপর একটি সূরা তিলাওয়াত করে শোনালেন। শুনেই নাজ্জাশী বললেন, অবশ্যই সত্য, তোমরা সত্যই বলেছ, আর তোমাদের নবী (সা) ও সত্য বলেছেন। আল্লাহর শপথ, তোমরা সবাই সঠিক পথেই আছো, আল্লাহর নামে এখানে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে থাকো।

২ হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর বর্ণনায় আছে, এরপর নাজ্জাশী বললেন, মারহাবা তোমাদেরকে। আর তাঁকেও, যাঁর নিকট থেকে তোমরা এসেছ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি সত্যই আল্লাহর রাসূল। অবশ্যই তিনি সেই পয়গাম্বর, যাঁর সুসংবাদ হযরত ঈসা (আ) দিয়েছিলেন। যদি বাদশাহীর দায়িত্ব না থাকত, তবে আমি অবশ্যই তাঁর খেদমতে উপস্থিত

মুসলমানদের বললেন, তোমরা নিরাপদে অবস্থান কর, এক পাহাড় স্বর্ণের বিনিময়েও আমি তোমাদেরকে নির্যাতন করা পসন্দ করি না। আর নির্দেশ দিলেন, কুরায়শদের সমুদয় উপহার-উপঢৌকন ফেরত দেয়া হোক, ওদের নযরানার আমার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কসম, আমার এই সালতানাত ও বাদশাহী আল্লাহ তা'আলা আমাকে ঘুষের বিনিময় ছাড়াই দিয়েছেন। কাজেই তোমাদের থেকে ঘুষ নিয়ে এ লোকগুলোকে কখনই তোমাদের হাতে সোপর্দ করব না।

দরবার সমাপ্ত হলো, মুসলমানেরা পরম সন্তুষ্টচিত্তে, আর কুরায়শ প্রতিনিধি অপমান-অপদস্থ হয়ে দরবার ত্যাগ করল। (মুসনাদে আহমদ ইবন হাম্বল, ১খ., পৃ. ২০১, জাফর ইবন আবূ তালিব-এর হিজরতের হাদীস; হাফিয হায়সামী বলেন, হাদীসটি আহমদ রিওয়ায়াত করেছেন যার বর্ণনাকারীগণ মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ব্যাতিত সবাই সহীহ; সরাসরি শ্রুত হিসেবে বর্ণনা করেছেন 'মাজমাউয-যাওয়ায়েদ', ৬খ. পৃ. ২৭; সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১১৫)।

এতদসমুদয় ঘটনা মুসনাদে আহমদ ও সীরাতে ইবন হিশামে বর্ণিত আছে। শুধু দরবারে সিজদা না করার ঘটনা উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১১৮-এ সংক্ষিপ্ত আকারে এবং দালাইলে আবূ নুয়াইমে, ১খ. পৃ. ৮১-তে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। আর মাজমাউয যাওয়ায়েদে 'আবিসিনিয়ায় হিজরত' অধ্যায়ে এ বিষয়ে বেশ কিছু বর্ণনা সরাসরি বিদ্যমান আছে। ৬খ. পৃ. ২৩ থেকে পৃ. ৩৩-এ দেখে নিন। ইমাম যুহরী বলেন, আমি হযরত উম্মে সালমা (রা) বর্ণিত এ বিস্তারিত হাদীস হযরত উরওয়া ইবন যুবায়র (রা)-এর নিকট উল্লেখ করলাম। উরওয়া (রা) আমাকে বললেন, নাজ্জাশীর বক্তব্যটি তোমার জানা আছে কি, 'আল্লাহ আমাকে বিনাঘুষে আমার রাজত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন' এর অর্থ কি ? আমি বললাম, না।

উরওয়া (রা) বললেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) আমাকে বলেছেন যে, নাজ্জাশীর পিতা আবিসিনিয়ার বাদশাহ ছিলেন। নাজ্জাশী ছাড়া তার আর কোন পুত্র ছিল না। বাদশাহর ভাই অর্থাৎ নাজ্জাশীর চাচার বারজন পুত্র ছিল। একবার আবিসিনিয়াবাসীর এ ধারণার উদ্রেক হলো যে, নাজ্জাশী তো তার পিতার একমাত্র পুত্র, আর বাদশাহর ভাইয়ের অধিক সন্তান। এ জন্যে বাদশাহকে হত্যা করে তার ভাই অর্থাৎ নাজ্জাশীর চাচাকে বাদশাহ বানানো উচিত, তা হলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ বংশেই বাদশাহর ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। কাজেই তারা বাদশাহকে হত্যা করে বাদশাহর ভাইকে বাদশাহ বানালো আর নাজ্জাশী তার চাচার তত্ত্বাবধানে এসে গেলেন। নাজ্জাশী ছিলেন খুবই চালাক এবং সমঝদার ব্যক্তি। এ জন্যে চাচার দৃষ্টিতে

হতাম এবং তাঁর জুতায় চুমো খেতাম। এরপর মুসলমানদের বলে দিলেন, যতদিন ইচ্ছা আমার রাজত্বে বাস কর এবং তিনি আমাদের খাদ্য এবং পোশাক প্রদানেরও নির্দেশ দিলেন। তিরমিযী বিশুদ্ধ সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন; হাদীসটির রাবীগণ বিশুদ্ধ হাদীসের রাবী। মাজমাউয-যাওয়ায়েদ, ৬খ. পৃ.৩১ 'আবিসিনিয়ার মুহাজিরীন' পরিচ্ছেদ।

নাজ্জাশীর যে মর্যাদা ছিল, অন্য কারো প্রতি তা ছিল না। সুযোগ এ পর্যন্ত পৌঁছল যে, বাদশাহর প্রতিটি কাজেই নাজ্জাশীর অন্তর্ভুক্তি দেখা যেতে শুরু হলো। আবিসিনিয়াবাসী তার এ মেধাদৃষ্টে সন্দেহ পোষণ করছিল যে, না জানি সে তার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে নেয়! এ জন্যে তারা বাদশাহর কাছে আবেদন জানালো যে, তাকে হত্যা করা হোক। বাদশাহ্ বললেন, কাল তোমরা তার পিতাকে হত্যা করেছ, আর আজ তার পুত্রকে হত্যা করতে বলছ, এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। বড়জোর এটা হতে পারে যে, তাকে আমি এখান থেকে পৃথক করে দিই।

লোকেরা এটা অনুমোদন করল এবং নাজ্জাশীকে বাদশাহর নিকট থেকে নিয়ে এক ব্যবসায়ীর কাছে ছয়শত দিরহামে বিক্রি করে ফেলল। ব্যবসায়ী নাজ্জাশীকে নিয়ে রওয়ানা হলো। সে সন্ধ্যায়ই এক দুর্ঘটনা ঘটল যে, বাদশাহর উপর বজ্রপাত হলো। বাদশাহ তো বজ্রপাতের সাথে সাথেই মৃত্যুবরণ করলেন। তখন লোকজনের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল, এবার কাকে বাদশাহ বানানো যায়। বাদশাহর বারটি পুত্রের মধ্যে কেউই মসনদে আরোহণের উপযুক্ত বলে মনে হলো না। প্রথম থেকে শেষেরটি পর্যন্ত সবাই ছিল বোকা ও নির্বোধ। এতে লোকজন এ সিদ্ধান্ত নিল যে, যদি দেশের কল্যাণ চাও, তবে নাজ্জাশীকে খুঁজে এনে সিংহাসনে বসাও। জনগণ নাজ্জাশীর জন্য ব্যবসায়ীর খোঁজে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ঐ ব্যবসায়ীর নিকট থেকে নাজ্জাশীকে ফিরিয়ে এনে সিংহাসনে বসাল। সিংহাসনারোহণের পর ঐ ব্যবসায়ী এসে প্রদত্ত মূল্য ফেরত চাইল। নাজ্জাশী তাকে ছয়শত দিরহাম ফেরত দিয়ে দিলেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) কুরায়শ প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহ আমাকে ঘুষ ছাড়াই আমার এ সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন। সম্রাট নাজ্জাশীর এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত।[১] নাজ্জাশীর এ ঘোষণার পর মুহাজিরগণ নিশ্চিন্তে আবিসিনিয়ায় অবস্থান গ্রহণ করলেন। যখন নবী করীম (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করলেন, তখন অধিকাংশ লোক সংবাদ পাওয়া মাত্র আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় ফিরে এলেন, যাদের মধ্যে চব্বিশ ব্যক্তি বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। অবশিষ্ট দুর্বলেরা হযরত জা'ফর (রা)-এর সঙ্গে সপ্তম হিজরীতে খায়বার বিজয়কালে মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হলেন। [উয়ূনুল আসার, ফাতহুল বারী, নবী (সা) ও সাহাবাগণের মদীনা হিজরত অধ্যায়]।

কুরায়শ প্রতিনিধির কাছে হযরত জা'ফর (রা)-এর তিনটি প্রশ্ন

হযরত উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, হযরত জাফর (রা) নাজ্জাশীকে বললেন, আমি ওদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই, আপনি ওদের থেকে এর উত্তর চেয়ে নিন।

১. আমরা কি কারো গোলাম যে নিজেদের প্রভুর নিকট থেকে পলায়ন করে এসেছি? যদি এমনটি হয়, তবে অবশ্যই আমরা ফিরিয়ে দেয়ার উপযুক্ত।

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৭৫।

নাজ্জাশী আমর ইবন আসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এরা কি কারো গোলাম? আমর ইবন আস বললেন, بل احرار كرام "গোলাম নন, বরং তাঁরা মুক্ত এবং সম্মানিত।"

২. হযরত জা'ফর (রা) নাজ্জাশীকে বললেন, আপনি ওদের এটাও জিজ্ঞেস করুন যে, আমরা কি সেখানে কাউকে খুন করে এসেছি ? যদি আমাদের কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এসে থাকে, তা হলে আপনি নির্দ্বিধায় নিহতের অভিভাবকের হাতে আমাদেরকে সোপর্দ করুন।

নাজ্জাশী আমর ইবন আসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, هل احرقوا دما بغير حقه "এরা কি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে এসেছে ?" আমর ইবন আস বললেন, لا قطرة من دم "এক ফোঁটা রক্তও নয়।"

৩. হযরত জা'ফর (রা) নাজ্জাশীকে বললেন, আপনি ওদের এটাও জিজ্ঞেস করুন যে, আমরা কি কারো ধন-সম্পদ নিয়ে পালিয়ে এসেছি ? আমরা যদি কারো মাল নিয়ে এসে থাকি, তবে তা পরিশোধ করে দেয়ার জন্য অবশ্যই আমি প্রস্তুত।

নাজ্জাশী আমর ইবন আসকে লক্ষ্য করে বললেন, এরা যদি কারো মাল-সম্পদ নিয়ে এসে থাকে, তবে আমি এদের অভিভাবক ও যিম্মাদার হিসেবে তা পরিশোধের দায়িত্ব নিব।

আমর ইবন আস বললেন, ولا قيراط "এরা তো কারো এক কীরাত তথা এক পয়সাও নিয়ে আসেনি।"

এবার সম্রাট নাজ্জাশী কুরায়শ প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তা হলে বল দেখি তোমাদের উদ্দেশ্যটা কি ?

আমর ইবন আস বললেন, আমরা এবং এরা একই দীনে ছিলাম। আমরা আমাদের ধর্মের উপরই আছি, আর এরা একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে।

নাজ্জাশী সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যে ধর্মকে তোমরা ছেড়ে দিয়েছ আর যে ধর্ম তোমরা গ্রহণ করেছ এটা কেমন ধর্ম ?

হযরত জা'ফর (রা) বললেন :

اما الذى كنا عليه فدين الشيطان وامر الشيطان نكفر بالله ونعبد الحجارة واما الذى نحن عليه فدين الله عز وجل نخيرك ان الله بعث الينا رسولا كما بعث الى الذين من قبلنا فاتانا بالصدق والبر ونهانا عن عبادة الاوثان فصدقناه وامنا به واتبعناه فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا وارادوا قتل النبى الصادق وردنا فى عبادة الاوثان ففررنا اليك بديننا ودمائنا ولو اقرنا قومنا لا ستقررنا فذلك خبرنا

"যে ধর্মে আমরা পূর্বে ছিলাম, তা ছিল শয়তানের ধর্ম আর শয়তানের নির্দেশ। ও ধর্মটা এমন ছিল যে, আমরা আল্লাহকে অস্বীকার করতাম, পাথরের উপাসনা করতাম আর এখন যে ধর্মের উপর অবস্থান করছি এটা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর ধর্ম।

আল্লাহ আমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যেমন পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে। আর সেই রাসূল সত্য এবং পুণ্য নিয়ে এসেছেন এবং আমাদেরকে মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করেছেন। আমরা তাঁকে সত্য বলে মেনেছি, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি। এ কারণে আমাদের সম্প্রদায় আমাদের শত্রু হয়ে গেল এবং আমাদের নবীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল, তাদের ইচ্ছা যে, আমাদেরকে তারা পুনরায় মূর্তি পূজায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এজন্যে আমরা নিজেদের ঈমান ও জীবন নিয়ে আপনার দেশে পালিয়ে এসেছি। আমাদের সম্প্রদায় আমাদেরকে দেশে থাকতে দিলে, আমরা দেশ থেকে বের হতাম না। এটাই আমাদের বক্তব্য।"[১]

হযরত জা'ফর (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা যখন আবিসিনিয়া থেকে মদীনা মুনাওয়ারা রওয়ানা হলেন, নাজ্জাশী তাদের সবারই পথ খরচা ও অতিরিক্ত কিছু উপহার-উপঢৌকনও দিলেন এবং একজন দাসও সঙ্গে দিলেন। আর বললেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে যা কিছু করেছি, হযরত নবী (সা) কে সব কিছু বলবে। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর রাসূল।' তাঁর প্রতি আমার আবেদন, তিনি যেন আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেন।"

হযরত জা'ফর (রা) বলেন, আমরা আবিসিনিয়া থেকে রওয়ানা হয়ে নবী (সা)-এর খিদমতে পৌঁছলাম। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন আমি জানি না যে, খায়বর বিজয়ে আমি বেশি খুশি হয়েছি, না জা'ফরের প্রত্যাবর্তনে। এরপর তিনি বসে পড়লে নাজ্জাশীর দূত দাঁড়িয়ে আরয করল, (হে আল্লাহর রাসূল), এই যে জা'ফর আপনার সামনে উপস্থিত, আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন আমাদের বাদশাহ তার সাথে কি ব্যবহার করেছেন।

হযরত জা'ফর বললেন, "নিঃসন্দেহে নাজ্জাশী আমাদের সাথে অতি উত্তম ব্যবহার করেছেন। এমনকি ফিরে আসার সময় আমাদেরকে বাহন দিয়েছেন এবং পথ খরচাও দিয়েছেন, আমাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, আর আমাদের সামনে ঘোষণা দিয়েছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিয়েছেন যে আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। তিনি আপনার কাছে তার জন্যে মাগফিরাতের দু'আ করার আবেদন জানিয়েছেন।" রাসূল (সা) সঙ্গে সঙ্গে উঠেই উযূ করলেন এবং তিনবার এ দু'আ করলেন : اللهم اغفر للنجاشى।

"আয় আল্লাহ ! তুমি নাজ্জাশীকে মাফ করে দাও।" আর সব মুসলমান আমিন বললেন।

হযরত জা'ফর (রা) বলেন, আমি ঐ দূতকে বললাম, যা কিছু তুমি নবী (সা)-এর এখানে দেখলে, ফিরে গিয়ে বাদশাহকে সব বলবে। তাবারানী হাদীসটি

---

১. দালাইলে আবূ নুয়াইম, ১খ. পৃ. ৮০।

আসাদ ইবন আমর....মুজালিদ সূত্রে বর্ণনা করেন, কিন্তু তারা উভয়ই যঈফ; নির্ভরযোগ্য বর্ণনা। (মাজমাউয যাওয়াইদ, ৬খ. পৃ. ৩০, আবিসিনিয়ায় হিজরত অধ্যায়)।

হযরত উমর[১] (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ, নবূয়াতের ৬ষ্ঠ বর্ষ

হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের মূল এবং প্রকৃত কারণ ছিল রাসূল (সা)-এর দু'আ।

هیچ عاشق خود نباشد وصل جو　　که نه معشوقش بود جویائے او

میل معشوقان نهانست وستیر　　میل عاشق باد وصد طبل ونفیر

"কোন প্রেমিকই নিজে নিজে মিলন প্রত্যাশী হবে না, যদি প্রেমাস্পদ তার খোঁজ-খবর না করে, প্রেমাস্পদরা চায় যে গোপন থাকুক, লড়াই করুক, আর প্রেমিক চায় মত্ততা, ঢোল পেটানো আর হৈ হুল্লোড়।"

প্রথমে রাসূল (সা) এ দু'আ করেছিলেন যে, আয় আল্লাহ ! আবূ জাহল এবং উমর ইবন খাত্তাব, এ দু'জনের মধ্যে যে তোমার কাছে বেশি প্রিয়, তার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী ও সম্মানিত কর (আহমদ ও তিরমিযী; তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ)। ইবন আসাকির বলেন, এরপর ওহীর মাধ্যমে তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আবূ জাহল ইসলাম গ্রহণ করবে না, তখন তিনি হযরত উমরের জন্য নির্দিষ্টভাবে দু'আ করলেন ঃ

اللهم ايد الاسلام بعمر بن الخطاب خاصة

"আয় আল্লাহ ! বিশেষভাবে উমরের মাধ্যমে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি কর।"

এ হাদীস সুনানু ইবন মাজাহ ও মুস্তাদরাকে হাকিমে বর্ণিত আছে। হাকিম বলেন, হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। হাফিয যাহবীও হাকিমকে সমর্থন করেছেন।

মোটকথা, হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণের মূল ও প্রকৃত কারণ তো ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আরই ফলশ্রুতি। বাকী প্রকাশ্য কারণ, হযরত উমর (রা) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো ঃ

হযরত উমর (রা) বলেন, আমি শুরুতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কঠোর বিরোধী এবং দীন ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ ও এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলাম।

بد عمررا نام ایں جابت پرست　　لیك مومن بود نامش در اَلَسْتُ

আবূ জাহল ঘোষণা করল, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা) কে হত্যা করবে, তার জন্য আমি একশত উট প্রদানের যিম্মাদার ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি সরাসরি আবূ জাহলকে

---

১. হযরত উমর (রা) আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতের পরে এবং দ্বিতীয় হিজরতের পূর্বে নবূয়াতের সপ্তম বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর কেউ কেউ লিখেছেন যে, তিনি নুবূয়াতের পঞ্চম বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করেন। [যারকানী, ১খ. পৃ. ২৭২, ফারুক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ অধ্যায়]।

প্রশ্ন করলাম, তোমার পক্ষ থেকে এ প্রতিশ্রুতি ও যিম্মাদারী কি সঠিক? আবূ জাহল বলল, হ্যাঁ। উমর বলেন, আমি তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে তরবারি নিয়ে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে একটি বাছুর নজরে পড়ল, যেটিকে লোকেরা যবেহ করার ইচ্ছা চাচ্ছিল। আমিও দেখার জন্য দাঁড়ালাম। কিন্তু কি দেখলাম ! মনে হল বাছুরের পেটের ভিতর থেকে কোন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলছে :

يا ال ذريع امر نجيع رجل - يصيح بلسان فصيح يدعو الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

"হে অনুসন্ধানকারীরা, একটি সফল কাজ হলো, এক ব্যক্তি বিশুদ্ধ ভাষায় মানুষকে আহ্বান করে এ সাক্ষ্য দিতে বলছেন, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর রাসূল।"

হযরত উমর (রা) বলেন, এ আওয়াজ শোনামাত্র মনে হলো যেন আমাকেই এ আহ্বান করা হচ্ছে, আমিই যেন ঐ ঘোষণাকারীর উদ্দেশ্য [আবূ নুয়াইম, হযরত তালহা (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) হযরত (রা) উমর থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন]।[1] আর বাছুর থেকে আওয়াজ শোনার ঘটনা সহীহ বুখারীতেও বর্ণিত হয়েছে [সহীহ বুখারী, উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ অধ্যায়]।

কিন্তু উমর তবুও নিজ উদ্দেশ্য থেকে বিরত হলেন না এবং সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন। কয়েক কদম যেতেই নঈম ইবন আবদুল্লাহ নুহহাম-এর সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে উমর, ভরদুপুরে কি উদ্দেশে কোথায় রওয়ানা দিয়েছো ? উমর বললেন, মুহাম্মদ (সা) কে হত্যা করার উদ্দেশে। নঈম বললেন, মুহাম্মদ (সা) কে হত্যা করে আপনি বনী হাশিম ও বনী যোহরা থেকে কি করে নিজকে রক্ষা করবেন ? উমর বললেন, আমার ধারণায় তুমিও সাবী (ধর্ম ত্যাগী) হয়েছ এবং নিজের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছ। নঈম বললেন, আমাকে কি বলছেন, আপনি জানেন না যে, আপনার বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইবন যায়দ উভয়ই সাবী হয়েছেন এবং আপনাদের দীন ত্যাগ করে ইসলাম কবূল করেছেন ?

এ কথা শুনেই উমর রাগে জ্বলে উঠলেন এবং বোনের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হযরত খাব্বাব (রা), যিনি তার বোন ও ভগ্নিপতিকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, উমরের আওয়াজ পেয়েই লুকিয়ে পড়লেন।

উমর ঘরে ঢুকলেন এবং বোন ও ভগ্নিপতিকে বললেন, সম্ভবত তোমরা উভয়ে সাবী হয়ে গিয়েছ ? ভগ্নিপতি বললেন, ওহে উমর, যদি তোমাদের দীন সত্য না হয়, বরং এটা ছাড়া অপর কোন দীন সত্য হয়, তা হলে বল, কি করা উচিত ? ভগ্নিপতির এ জবাব দেয়ার অপেক্ষামাত্র; উমর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৩৮।

বোন তাঁর স্বামীকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলে উমর তাঁকেও এমনভাবে প্রহার করলেন যে, তার চেহারা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। এ সময় বোন বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র, তুই যা ইচ্ছা ক্ষতি করতে পারিস কর, আমরা অবশ্যই মুসলমান হয়েছি। রে আল্লাহর দুশমন, তুই তো কেবল এ জন্যে মারছিস যে আমরা আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করেছি। ভালভাবে জেনে নে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, 'যদিও এতে তোর নাসিকা রক্তাপ্লুত হয়' (অপমান বোধ করিস)।

উমর বোনের ঈমানদীপ্ত বক্তব্যে ভাবান্তরিত হলেন। কিছুটা লজ্জানুভূতির সঙ্গে বললেন আচ্ছা, তোমরা এতক্ষণ যে কিতাবটি পড়ছিলে তা আমাকে কিছু শোনাও তো। এটা শুনতেই হযরত খাব্বাব (রা), যিনি ঘরের কোণে লুকিয়ে ছিলেন, দ্রুত বেরিয়ে এলেন। বোন উমরকে বললেন : انك رجس وانه لا يمسه الا المطهرون فقه فتوضا "তুমি তো নাপাক, আর কুরআন পাককে কেবল পবিত্র ব্যক্তিরাই ছুঁতে পারে। যাও, উযূ করে এসো।"

উমর উঠে গিয়ে উযূ-গোসল[১] করলেন এবং পবিত্র সহীফা হাতে নিলেন যাতে সূরা তাহা লিখিত ছিল, তা পাঠ করতে শুরু করলেন। যখনই এ আয়াতে পৌঁছলেন যে,

اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

"আমিই সত্যিকারের মাবূদ, আমি ছাড়া আর কোন প্রকৃত মাবূদ নেই, সুতরাং আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে নামায কায়েম কর।" তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উমর বলে উঠলেন, ما احسن هذا الكلام واكرمه "কতই না উত্তম ও পবিত্র বাক্য এটি!"

হযরত খাব্বাব (রা) উমরের এ কথা শুনে বললেন, হে উমর, তোমার জন্য সুসংবাদ, আমি আশাকরি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আ তোমার ব্যাপারেই কবূল হয়েছে। উমর বললেন, খাব্বাব, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল।

হযরত খাব্বাব উমরকে সাথে নিয়ে আরকামের গৃহ অভিমুখে চললেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবা কিরাম একত্রিত হতেন। দরজা বন্ধ ছিল। কাজেই কড়া নাড়লেন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। উমর ভিতরে আসার অনুমতি চাইছেন, এ ভয়ে কেউ দরজা খুলতে সাহস পাচ্ছিলেন না। হযরত হামযা (রা) বললেন, দরজা খুলে দাও এবং আসতে দাও, যদি আল্লাহ উমরের সাথে উত্তম ও কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তবে আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করবেন, সে ইসলাম গ্রহণ করবে আর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে। তার ব্যতিক্রম কিছু করলে তোমরা আল্লাহর ইচ্ছায় তার দুশমনি থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকবে। আল্লাহর প্রশংসা, উমরকে হত্যা করা আমাদের জন্য মোটেও অসম্ভব নয়।

---

১. এ ব্যাপরে বর্ণনাকারীদের মধ্যে মতভেদ আছে, সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, হযরত হামযা বললেন যে, উমর যদি সদুদ্দেশে এসে থাকে তবে আমরাও তার সাথে উত্তম ব্যবহার করব, আর যদি ক্ষতি করার উদ্দেশে আসে, তবে তার তরবারি দিয়েই তাকে হত্যা করব। রাসূলুল্লাহ (সা)ও দরজা খোলার অনুমতি দিলেন। দরজা খোলা হল, আর দু'ব্যক্তি আমার দু'বাহু ধরলেন এবং তাঁর সামনে এনে আমাকে দাঁড় করালেন। রাসূল (সা) ঐ দু'ব্যক্তিকে বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। অতঃপর তিনি আমার জামা ধরে নিজের দিকে টেনে নিয়ে বললেন, ওহে খাত্তাবের পুত্র ! ইসলাম গ্রহণ কর। তিনি আমার জন্য এ দু'আ করলেন : "হে আল্লাহ ! তাকে হিদায়াত দাও।"

অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, হযরত (সা) দু'আয় বলেছেন :

اللهم هذا عمر بن الخطاب اللهم اعز الدين بعمر بن الخطاب

"হে আল্লাহ ! উমর ইবন খাত্তাব উপস্থিত, তাকে দিয়ে তুমি দীনকে শক্তিশালী ও সম্মানিত কর।"

আর উমরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে উমর, তুমি কি ততক্ষণ পর্যন্ত বিরত হবে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি কোন অপমানজনক আযাব নাযিল না করবেন ?

উমর আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এ উদ্দেশেই এসেছি যে, আমি ঈমান আনব আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি আর যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, সেসবের প্রতি। اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله। "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।"

রাসূলুল্লাহ (সা) আনন্দের আতিশয্যে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দিলেন, যাতে গৃহের সবাই জেনে গেলেন যে, উমর মুসলমান হলেন। এ সমুদয় বিস্তারিত বিবরণ সীরাতে ইবন হিশাম ও উয়ূনুল আসার-এ বর্ণিত আছে।

আল্লামা যারকানী বলেন, হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণের এ বিস্তারিত বিবরণ 'মুসনাদে বাযযার', 'মু'জামে তাবারানী' ও 'দারা কুতনী'তে হযরত আনাস (রা) থেকে আর দালাইলে বায়হাকীতে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে এবং দালাইলে আবূ নুয়াইমে হযরত তালহা ও হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে।[১]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, যখন হযরত উমর ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন জিবরাঈল আমীন (আ) অবতরণ করে বলেন যে, হে মুহাম্মদ (সা), উমরের ইসলাম গ্রহণে সমস্ত আসমানবাসী আনন্দিত হয়েছে (এ বর্ণনা ইবন মাজাহ ও হাকিমের, হাকিম একে সহীহ বলেছেন। আর যাহবী বলেছেন, এতে একজন বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবন খিরাশ দুর্বল)। (দারা কুতনী)।[২]

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ২৭৬।

২ উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১২৬; তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৩খ. পৃ. ১৯৩।

হযরত উমর ইসলাম গ্রহণ করলেন, আর তখন থেকেই দীনের সম্মান ও ইসলামের অভ্যুদয় ও বিজয় শুরু হয়ে গেল। প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে মসজিদুল হারামে নামায আদায় শুরু হলো। প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু হলো। এ দিন থেকেই হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট ও প্রকাশিত হলো এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নাম রাখলেন ফারুক।[১]

چون عمر شیدائے ال معشوق شد   حق و باطل را چو دل فاروق شد

زان نشد فاروق راز هرصے گزند   که بدان تریاق فاروقیش قند

"উমর যখন সেই প্রেমাস্পদের প্রেমে মত্ত হলেন, তখন তিনি সত্য-মিথ্যার মানদণ্ডে পরিণত হলেন। এর ফলে ফারুককে কোন কিছু ক্ষতি করতে পারল না, বরং তিনি বিষকে মিষ্টিতে পরিণত করলেন।"

হযরত উমর (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তাঁর অন্তরে এ ধারণার উদ্রেক হলো যে, যদি আমি আমার ইসলাম গ্রহণের খবর এমন ব্যক্তিকে জানাই, যে কথা ছড়াতে পারদর্শী। তা হলে সবার কাছে আমার ইসলাম গ্রহণের খবর পৌঁছে যাবে। কাজেই আমি জামীল ইবন মা'মার, যে এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল, তার নিকটে গেলাম এবং বললাম হে জামীল, তুমি অবশ্যই জেনে গেছ যে, আমি মুসলমান হয়েছি এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্মে প্রবেশ করেছি। জামীল এ কথা শোনামাত্র ঐ অবস্থায়ই নিজের চাদর টেনে নিয়ে মসজিদুল হারামের দিকে দৌড় দিল। যেখানে কুরায়শ সর্দারেরা জমায়েত হয়েছিল, সেখানে পৌঁছে উচ্চৈঃস্বরে বলল, হে লোক সকল! উমর সাবী হয়ে গেছে। উমর (রা) বলেন, আমিও পিছে পিছে গেলাম এবং বললাম, এ ভুল বলছে, আমি সাবী হইনি; আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, আর মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। কথাটা কেবল শোনার অপেক্ষা, লোকজন উমরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁকে মারতে শুরু করল। ঘটনাক্রমে আস ইবন ওয়ায়েল আস-সাহমী সেখানে এসে গেলেন। আস জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটা কি ? লোকেরা বলল, উমর সাবী হয়ে গেছে। আস বললেন, তাতে হয়েছেটা কি, এক ব্যক্তি নিজের জন্য একটা কর্ম (দীন) সাব্যস্ত করে নিয়েছে, অথচ তোমরা কেন তাতে অন্তরায় হচ্ছো ? তোমরা কি মনে করেছ যে, বনী আদী তাদের লোকের (অর্থাৎ হযরত উমর) ব্যাপারটা এমনিতে ছেড়ে দেবে ? যাও, আমি উমরকে আশ্রয় দিলাম। আস উমরকে আশ্রয় দেয়ামাত্র জমায়েত হওয়া সমস্ত লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। [ইবন হিশাম, পৃ. ১২১, ইবন কাসীর বলেন, হাদীসটির সনদ উত্তম ও শক্তিশালী, যেমনটি আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ায় ৩খ. পৃ. ৮২; আর আস ইবন ওয়ায়েলের আশ্রয় দানের ঘটনা সংক্ষেপে সহীহ বুখারীতেও

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৩খ. পৃ. ১৯৩।

আছে। ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৩৫, হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ অধ্যায়]।

বনী হাশিমের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ, নিপীড়নমূলক চুক্তিপত্র লিখন ও মুহাররম মাসের অমর্যাদা, নবূয়াতের সপ্তম বর্ষ

কুরায়শের প্রতিনিধি যখন আবিসিনিয়া থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো, আর জানতে পেল যে, নাজ্জাশী হযরত জা'ফর এবং তাঁর সাথীদের যথেষ্ট সম্মান করেছেন, অপরদিকে হযরত হামযা ও হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যাতে করে কুরায়শদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। অধিকন্তু, মুসলমানের সংখ্যা দিনকে দিন বৃদ্ধি পেয়েই চলছে। কোন অস্ত্রই সত্য দীনকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে কার্যকর হচ্ছে না, তখন কুরায়শদের সমস্ত গোত্র ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি চুক্তিপত্র তৈরি করলো যে, মুহাম্মদ (সা), বনী হাশিম ও তাদের সব মিত্রের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা হোক যে না কেউ বনী হাশিমের সাথে বিয়ে-শাদী করবে না, আর না তাদের সাথে কেউ মেলামেশা করবে—যতক্ষণ না বনী হাশিম মুহাম্মদকে হত্যার জন্য আমাদের কাছে হস্তান্তর করবে।

এ মর্মে একটি ঘোষণাপত্র লিখিয়ে কাবাঘরের ভিতরে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। মানসূর ইবন ইকরামা, যে এ ধরনের নির্যাতন-নিপীড়নমূলক চুক্তিপত্রটি লিখেছিল, তার পর থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি শুরু হয়ে গিয়েছিল তার হাতের আঙ্গুল পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে অবশ হয়ে গেল; ফলে চিরদিনের মতো তার হাত কোনকিছু লিখার অযোগ্য হয়ে গেল। আবূ তালিব বাধ্য হয়ে খান্দানের সবাইমিলে 'শে'বে আবূ তালিবে' আশ্রয় নিলেন। বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব বংশের মুমিন-কাফির নির্বিশেষে সকলেই এই সামাজিক বয়কটের শিকার হলেন; মুসলমানগণ দীনের খাতিরে আর কাফিরেরা বংশীয় আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে। বনী হাশিমের মধ্য থেকে কেবল আবূ লাহাব কুরায়শদের শরীক হয়ে তাদের সঙ্গে রয়ে গেল।

একাধিক্রমে তিন বছর যাবত তাদের অবরুদ্ধ[১] জীবন কতই না দুঃখ-কষ্টের সাথে অতিবাহিত করতে হলো। এমনকি ক্ষুধার কারণে শিশুদের কান্নাকাটির আওয়াজ বাইরে থেকেও শোনা যেত। পাষাণ হৃদয়ের কাফিররা তা শুনে আনন্দ উপভোগ করতো। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা দয়ার্দ্রচিত্ত ছিল, তাদের কাছে এটা অসহনীয় বোধ হলো এবং পরিষ্কার বলে দিল, মানসূর ইবন ইকরামার উপর কি বিপদ আপতিত হয়েছে, তা কি তোমাদের চোখে পড়ে না?[২]

---

১. বলা হয়ে থাকে যে, এ অবরোধ নবূয়াতের সপ্তম বর্ষের মুহাররম মাসে শুরু হয়েছিল। (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৪৭)।

২ তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ১৩৯; উয়ূনুল আসার, সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১২২; যাদুল মা'আদ, ২খ. পৃ. ৩৬; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৪৬।

এ অবরোধকালে মুসলমানগণ বাবলা পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করেন। হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াককাস (রা) বলেন, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, দৈবক্রমে রাতে আমার পা ভেজা কোন বস্তুর উপর পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তা জিহ্বায় রেখে গিলে ফেললাম। এখনো পর্যন্ত জানি না যে, সেটি কি ছিল। হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াককাস (রা) নিজের আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার রাতে আমি প্রস্রাব করার জন্য বের হলাম, পথিমধ্যে উটের একটি শুকনো চামড়ায় হাত পড়ল। পানিতে ধুয়ে সেটি পোড়ালাম। এরপর সেটি চূর্ণ করলাম এবং পানিতে গুলিয়ে পান করলাম। তিনটি রাত্রি আমি এর সাহায্যে অতিবাহিত করেছি। অবস্থা এতদূর গড়িয়েছিল যে, কোন বাণিজ্য কাফেলা যখন মক্কায় আসতো, তখন আবূ লাহাব গিয়ে এ ঘোষণা দিয়ে বেড়াতো যে, কোন ব্যবসায়ী যেন মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গীদের নিকট প্রচলিত দামে কোন দ্রব্য বিক্রি না করে; বরং দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্য আদায় করে। এতে যদি কোন ক্ষতি বা ঘাটতি হয় আমি এর যিম্মাদার হবো। সাহাবাগণ দ্রব্যাদি ক্রয় করতে আসতেন, কিন্তু বাজার দর অপেক্ষা চড়া মূল্য দেখে খালি হাতে ফিরে যেতেন। মোট কথা, একদিকে নিজেদের অসহায়ত্ব এবং দুশমনদের প্রবল প্রতাপ, আর অপরদিকে ক্ষুধার জ্বালায় শিশুদের কান্নাকাটি ও ছটফটির করুণ দৃশ্য তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।[১]

কেউ কেউ প্রিয়জনদের এ দুঃখ দেখে অন্তরে কষ্ট অনুভব করতো, গোপনে তাদের জন্য কিছু খাদ্য-পানীয় দ্রব্যাদি পাঠাতো। একদিনের ঘটনা ঃ হাকিম ইবন হিযাম[২] তার ফুফু হযরত খাদীজা (রা)-এর জন্য একটি চাকরের সহায়তায় কিছু খাদ্যশস্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আবূ জাহল তা দেখে ফেলে বললো, তুমি কি বনী হাশিমের জন্য খাদ্যশস্য নিয়ে যাচ্ছ ! আমি কখনই তা নিয়ে যেতে দেব না এবং সবার সামনে তোমাকে অপদস্থ করব।

দৈবক্রমে আবুল বুখতারী সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি অবস্থার নাজুকতা বুঝে আবূ জাহলকে বলতে শুরু করলেন ও নিজের ফুফুর জন্য খাদ্যশস্য পাঠাচ্ছে আর তুমি কেন তাকে গালাগাল দিচ্ছ ? এতে আবূ জাহলের ক্রোধ বেড়ে গেল এবং সে বুখতারীকে যা তা বকতে শুরু করল। আবুল বুখতারী একটি উটের হাড় হাতে নিয়ে

---

১. রাউযুল উনুফ, ১খ. পৃ. ২৩২

২ হাকিম ইবন হিযাম জাহিলিয়াতের যুগ থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দোস্ত ছিলেন। নুবূয়াত প্রাপ্তির পরও তাঁর প্রতি তার ভালবাসা অটুট ছিল। মক্কা বিজয়ের কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। অনুগ্রহ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা তাঁর স্বভাব ধর্ম ছিল। হাকিম (রা) যখন হযরত মুআবিয়ার নিকট দারুন নাদওয়া একলক্ষ দিরহামে বিক্রি করেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) তাকে তিরস্কার করেন। তখন হাকিম (রা) জবাব দেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ! আমি এর বিনিময়ে বেহেশতের এক ঘর ক্রয় করেছি। আর এক লক্ষ দিরহামের সম্পূর্ণটাই দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে দেন। হাকিম (রা) একশত কুড়ি বৎসর বয়সে ৫০ অথবা ৫৪ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। (ইসাবা, ১খ. পৃ. ৩৪৯)।

আবূ জাহলের মাথায় এত জোরে আঘাত করলেন যে, তার মাথা যখম হয়ে গেল। মার খাওয়ার চেয়ে আবূ জাহলের কাছে বেশি কষ্টের কারণ ছিল যে, এ ঘটনাটি শে'বে আবূ তালিবে দাঁড়িয়ে হযরত হামযা (রা) দেখছিলেন (সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১৩২)।

তাঁদের এহেন কষ্ট ও বিপদের দরুন কিছু দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তির অন্তরে এ চুক্তিপত্রটি লংঘনের ইচ্ছা জাগলো। সবার আগে হিশাম[১] ইবন আমরের এ চিন্তা জাগলো যে, আফসোস, আমরা তো খাচ্ছি, পান করছি অথচ আমাদেরই নিকটাত্মীয়, ঘনিষ্টজনেরা চরম দুঃখ-কষ্ট ও অনাহারে দিন যাপন করছে। অতঃপর যখন রাত্রি হলো, তিনি একটি উট বোঝাই খাদ্যশস্য শে'বে আবূ তালিবে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে এলেন।

একদিন হিশাম ইবন আমর এ উদ্দেশ্যে যুহায়র[২] ইবন উমাইয়ার নিকট গেলেন। যিনি ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফুফু আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। গিয়ে বললেন, হে যুহায়র, তোমার কি এটা পসন্দনীয় যে তুমি যা খুশি খাও, পরিধান কর, বিয়ে কর, আর তোমার মামা খাদ্যকণা খুঁজে বেড়ান? আল্লাহর কসম ! যদি আবূ জাহলের মামা এবং মাতুল গোষ্ঠীর লোকের এ অবস্থা হতো তবে কখনো সে এরূপ চুক্তিনামার পরোয়া করতো না। যুহায়র বললেন, আফসোস, আমি একা একা কি করতে পারি ? যদি আমার একজন সমচিন্তার লোকও থাকতো তা হলে আমি এ কাজের জন্য প্রস্তুত আছি।

হিশাম ইবন আমর সেখান থেকে উঠে মুতঈম ইবন আদীর কাছে গেলেন। তাকেও এভাবে সহমর্মী বানিয়ে নিলেন। মুতঈমও বললেন যে, আমাদের আরো একজন সহমর্মী বানানো প্রয়োজন।

হিশাম সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং প্রথমে আবুল বুখতারীকে এবং পরে যামআ ইবন আসওয়াদকে সহমর্মী বানালেন।

যখন এ পাঁচ ব্যক্তি ঐ চুক্তিনামা ভঙ্গ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন, তখন সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন যে, কাল যখন সবাই একত্রিত হবে, তখন এ প্রসঙ্গ উপস্থাপন করা হবে। প্রভাত হলো, লোকজন মসজিদে একত্রিত হলে যুহায়র দাঁড়িয়ে বললেন, ওহে মক্কাবাসী ! বড়ই দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় যে, আমরা খাচ্ছি, পান করছি, কাপড় পরিধান করছি, বিয়ে-শাদী করছি, আর বনী হাশিম অনাহারে মরছে। আল্লাহর কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পর্কচ্ছেদের এ নিপীড়নমূলক চুক্তিপত্র ছিন্ন করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বসব না। আবূ জাহল বলল, আল্লাহর এ চুক্তিনামা কখনই ছিন্ন করা যায় না।

---

১. হিশাম ইবন আমর রবীয়া (রা) মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। (ইসাবা, ৩খ. পৃ. ৬০৫)।

২ যুহায়র ইবন আবূ উমাইয়া (রা) মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। (ইসাবা, ৩খ. পৃ. ৫৫২)।

যাম'আ ইবন আসওয়াদ বললেন, আল্লাহর কসম অবশ্যই ছিন্ন করা যাবে। যখন এ চুক্তিপত্র লিখা হচ্ছিল, তখনই আমরা সম্মত ছিলাম না। আবুল বুখতারী বললেন, যাম'আ সত্যই বলছেন, আমরা রাজী ছিলাম না। মুতঈম বললেন, নিঃসন্দেহে এ দু'জন সত্য বলছেন। হিশাম ইবন আমর পুনরায় নিজ বক্তব্য সমর্থন করলেন। আবূ জাহল সভার এ দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং বলল, এটা গত রাতের কোনো সিদ্ধান্তের ফল বলে মনে হচ্ছে ![1]

ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ তালিবকে এ সংবাদ দিলেন যে, আল্লাহর নাম ছাড়া ঐ চুক্তিনামাটির বাকী অংশ পোকায় খেয়ে ফেলেছে এবং 'হে আল্লাহ তোমার নামে' কথাটি যা সকল লিখার শুরুতে লিখা হয়ে থাকে, সেটুকু বাদ দিয়ে বাকী সকল অক্ষরই পোকায় খেয়ে ফেলেছে।

আবূ তালিব এ ঘটনা কুরায়শদের সামনে বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কখনই মিথ্যা বলেনি আর না তার কোন কথা আজ পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ব্যাস, এসো এর উপর ফয়সালা হয়ে যাক, যদি মুহাম্মদের সংবাদ সত্য হয়, তা হলে তোমরা এ যুলুম-অত্যাচার থেকে রেহাই পাবে। আর যদি ভুল প্রমাণিত হয়, তা হলে মুহাম্মদ (সা) কে তোমাদের হাতে তুলে দিতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, চাই তোমরা তাকে হত্যা কর অথবা তাকে জীবিত ছেড়ে দাও। জনগণ বলল হে আবূ তালিব, আপনি নিঃসন্দেহে ইনসাফপূর্ণ কথা বলেছেন এবং তৎক্ষণাৎ কাবাঘরে গিয়ে চুক্তিনামা চাওয়া হলো। দেখা গেল, সত্যিই আল্লাহর নাম ছাড়া বাকী সমুদয় অংশ পোকায় খেয়ে ফেলেছে। এটা দেখামাত্র অপমান ও লজ্জায় প্রত্যেকের মাথা নিচু হয়ে গেল। এভাবেই দশম নবূয়তী বর্ষে এই নিপীড়নমূলক চুক্তিপত্রের সমাপ্তি ঘটলো। আবূ তালিব ও তার সমস্ত সঙ্গী অবরোধ থেকে বেরিয়ে এলেন। এর পরে আবূ তালিব হারাম শরীফে উপস্থিত হলেন এবং তিনি ও তার সঙ্গীরা বায়তুল্লাহর পর্দা ধরে এ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ, যারা আমাদের প্রতি যুলুম করেছে, আমাদের নৈকট্যের সম্পর্ক কর্তন করেছে এবং আমাদের বেইজ্জত করেছে, তুমি তাদের থেকে এর প্রতিশোধ নিয়ে নাও।

এ রিওয়ায়াত তাবাকাতে ইবন সা'দে হযরত ইবন আব্বাস (রা), হযরত আসিম ইবন উমর ইবন কাতাদা (রা), হযরত আবূ বকর ইবন আবদুর রহমান ইবন হারিস (রা), হযরত উসমান ইবন আবূ সুলায়মান (র) এবং হযরত ইকরামা ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ১৩৯-১৪১ এবং তারিখে তাবারী, ২খ. পৃ. ২২৯)।

আবূ তালিব এ ব্যাপারে একটি কাসীদাও পাঠ করেন, যার একটি পংক্তি এই—

الم يأتكم ان الصحيفة مزقت　　وان كل مالم يرضه الله يفسد

---

১. তারিখে তাবারী, ২খ. পৃ. ২২৮; সীরাতে ইবন হিশাম,১খ. পৃ. ১৩০।

"তোমাদের কি খবর নেই যে, ঐ চুক্তিনামা ছিন্ন করা হয়েছে, আর যে বস্তু আল্লাহর নিকট অপসন্দনীয়,তা এভাবেই নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে থাকে।" (খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৫১)।

হাফিয ইবন কাসীর বলেন, যখন নবী করীম (সা) এবং বনী হাশিম শে'বে আবূ তালিবে অবরুদ্ধ ছিলেন, তখনই আবূ তালিব 'কাসীদায়ে লামিয়া' লিখেন, যা একটি বিখ্যাত কাসীদা। যেমনটি আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২খ. পৃ. ৮৬)-এ উল্লিখিত আছে।

এভাবেই তিন বছরের ধারাবাহিক বিপদের পরিসমাপ্তি ঘটলো এবং দশম নববী সালে অর্থাৎ হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে তাঁরা শে'বে আবূ তালিব থেকে বের হলেন।

(ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৪৭, تقاسم المشركين على انبى ﷺ অধ্যায়)।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর হিজরত

ঐ সময়ই,[১] মক্কার হাশিমীয়গণ যখন শেবে আবূ তালিবে অবরুদ্ধ ছিলেন, হযরত আবূ বকর (রা) আবিসিনিয়ায় হিজরতের উদ্দেশে বের হলেন (যাতে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের[২] সাথে মিলিত হতে পারেন)। যখন তিনি বারকুল গামাদ নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন 'কারা' গোত্রের সর্দার ইবনুদ-দাগুন্নার সাথে সাক্ষাত হলো।

ইবনুদ-দাগুন্না জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ বকর, কোন্ উদ্দেশে যাত্রা করেছ? আবূ বকর বললেন, আমার সম্প্রদায় আমাকে বের করে দিয়েছে। তাই আমি চাচ্ছি যে, আল্লাহর যমীনে ভ্রমণ করব আর আল্লাহর ইবাদত করব।

ইবনুদ-দাগুন্না বললেন, হে আবূ বকর, তোমার মত (ভাল) মানুষ বের হয়ে যায় না, আর এমন মানুষকেও বের করে দেয়া যায় না। তুমি দুঃস্থ মানুষদের মাল-সম্পদ দিয়ে সাহায্য কর, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, মানুষের বোঝা (ঋণ ও জরিমানা) আদায় করে দাও, মেহমানকে আপ্যায়ন কর, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বনকারী ও সাহায্যকারী ব্যক্তি। আমি তোমাকে নিজ আশ্রয়ে নিচ্ছি, তুমি ফিরে যাও। ইবনুদ-দাগুন্না কুরায়শ সর্দারদের উপস্থিতিতে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আবূ বকরের মত মানুষ দেশ থেকে বের হয়ে যায় না, আর এরূপ লোককে বহিষ্কারও করা যায় না। তোমরা কি এমন একজন মানুষকে বের করে দিচ্ছ, যে দুঃস্থদের মাল-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে,

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮০, ৮ম লাইন, অনুরূপ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৯৫।

২ بين القوسين মূল ইবারতের অংশ নয়, এটা ব্যাখ্যামূলক বাক্য, যা ফাতহুল বারী থেকে নেয়া হয়েছে। (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮০, যারকানী, ১খ. পৃ. ২৮৮)।

মানুষের ঋণের বোঝা বহন করে, মেহমানকে আপ্যায়ন করে এবং যিনি সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বনকারী ও সাহায্যকারী ? আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি।

কুরায়শগণ ইবনুদ-দাগুন্নার আশ্রয়দানকে মেনে নিল এবং বলল, আপনি আবূ বকরকে বলে দিন, তিনি যেন নিজ গৃহেই আল্লাহর ইবাদত করেন, নামায আদায় করেন, কুরআন তিলাওয়াত করেন, তবে উচ্চৈঃস্বরে নয়। উচ্চৈস্বরে নামায আদায়, উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াতে আমাদের কষ্ট হয়। এছাড়া আমাদের আশঙ্কা যে, আমাদের স্ত্রীলোক ও সন্তানরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে না পড়ে। ইবনুদ-দাগুন্না আবূ বকরকে এসব বলে চলে গেলেন। তখন থেকে তিনি নিজ গৃহেই শুধু আল্লাহর ইবাদত করতে লাগলেন। কয়েক দিন পরেই আবূ বকর নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় একটি মসজিদ বানিয়ে নিলেন, যেখানে তিনি এখানে নামায পড়বেন, কুরআন তিলাওয়াত করবেন।

কুরায়শদের সন্তান ও স্ত্রীলোকেরা এ মসজিদ দেখার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তারা অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে একের পর এক আবূ বকরকে দেখতে থাকে। যেই তাঁকে দেখছিল আবূ বকরের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো।[1] আর আবূ বকর আল্লাহর ভয়ে অধিক কান্নাকাটিকারী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু পুরুষ হওয়ার কারণে কুরআন তিলাওয়াতকালে নিজ দৃষ্টি সংযত রাখতে পারতেন না। হাজার চেষ্টা করেও চোখকে থামিয়ে রাখতে পারতেন না (এ কারণে শ্রোতারাও নিজেদের অন্তরকে সংযত রাখতে পারত না, শত চেষ্টা সত্ত্বেও আবূ বকরের তিলাওয়াতের সময় নিজেদের অন্তরকে সংযত রাখতে ব্যর্থ হতো)।

কুরায়শ সর্দারগণ যখন এ অবস্থা দেখল, তারা ঘাবড়ে গেল এবং ইবনুদ-দাগুন্নাকে দ্রুত ডেকে পাঠাল। তার কাছে তারা এ অভিযোগ করল যে, আমরা আপনার কথায় এ শর্তে আবূ বকরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম যে, তিনি নিজ গৃহে চুপে চুপে গোপনে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করবেন, উচ্চৈঃস্বরে করবেন না, নামায ও কুরআন তিলাওয়াত চুপে চুপে করবেন কিন্তু আবূ বকর এখন ঐ শর্ত ভঙ্গ করে উচ্চৈঃস্বরে নামায ও কুরআন তিলাওয়াত শুরু করে দিয়েছেন। ফলে আমরা আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের 'বিগড়ে যাওয়ার' আশংকা করছি। আপনি আবূ বকরকে বলে দিন, তিনি যেন নিজ শর্তের উপর থাকেন অথবা আপনি তার আশ্রয়দানের কথাটি প্রত্যাহার করুন। আপনার আশ্রয়দানের প্রশ্নে আমাদের সম্মতি আমরা প্রত্যাহার করতে চাই না। আবূ বকর (রা) বললেন, আমি তোমাদের নিরাপত্তা ও আশ্রয়কে ফিরিয়ে দিচ্ছি; শুধু আল্লাহ তা'আলার নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের উপর সন্তুষ্ট আছি।[2]

---

১. বুখারী শরীফ, ১খ. পৃ. ২৩৭, ৫৫২; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮১।

২ يعجبون منه وهو ينظرون বুখারীর বাক্য এরূপ যে, আরবের প্রচলিত কথায় বাক্যের শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে আসে, আমরা এ বক্তব্যে ঐ বাক্যের অর্থ এবং দলীলের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছি।

কল্যাণ কথা

ইবনুদ-দাগুন্না হযরত আবূ বকর (রা)-এর যে সমস্ত গুণ বর্ণনা করেছেন, দৃশ্যত সেগুলো ঐ গুণাবলী, যা হযরত খাদীজা (রা) নবী করীম (সা)-এর গুণ বলে চিহ্নিত করেছিলেন (যেমনটি নুবূয়াতপ্রাপ্তি অধ্যায়ে বলা হয়েছে), যা দ্বারা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ফযীলত, পূর্ণতা এবং সিদ্দীকের অবস্থান নবূয়াতের অবস্থানের নিকটতর ও সংযুক্ত হওয়ার বিষয়ে জানা যায়।

মুহাক্কিক জ্ঞানীগণের মতে সিদ্দীকের অবস্থান এবং নুবূয়াতের অবস্থানের মধ্যবর্তী আর কোন স্তর নেই, সিদ্দীকের স্তরের সমাপ্তি নুবূয়াতের হিদায়েতের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ভাল জানেন।

দুঃখ ও বিষণ্নতার বছর

আবূ তালিব এবং হযরত খাদীজাতুল কুবরার ইনতিকাল

শেবে আবূ তালিব থেকে বের হওয়ার কয়েক দিন পরে দশম নববী বর্ষের রমযান অথবা শাওয়াল মাসে আবূ তালিব ইনতিকাল করেন। আর তার তিন অথবা পাঁচ দিন পর হযরত খাদীজা (রা)-এর ইনতিকাল ঘটে।[১]

মুসনাদে আহমদ, বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈতে আছে, যখন আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় হয়ে এলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তার কাছে এলেন। আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ ইবন আবূ উমাইয়া সেখানে উপস্থিত ছিল। রাসূল (সা) বললেন, হে চাচা, আপনি একবার মাত্র لا اله الا الله বলুন, যাতে আল্লাহর সামনে আপনার জন্য শাফায়াত ও সুপারিশ করার আমার একটা অজুহাত ও প্রমাণ থাকে।

আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ ইবন আবূ উমাইয়া বলল, হে আবূ তালিব, তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ছাড়তে চাও ? আবূ তালিব لا اله الا الله বলতে অস্বীকার করলেন। আর মৃত্যুকালীন শেষ কথা যা তার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল, তা ছিল, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর আছি।

আবূ তালিব তো এ কথা বলে ইনতিকাল করলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি সদা সর্বদাই আবূ তালিবের জন্য দু'আ ও ইস্তিগফার অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করতেই থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয় :

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ২৯১, ২৯৬।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِىْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ

"নবী ও মু'মিনদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সঙ্গত নয়; যদিও তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন হোক না কেন। কারণ এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ওরা জাহান্নামী।" (সূরা তাওবা : ১১৪)

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ

"আপনি যাকে চান, হিদায়াত করতে পারেন না; বরং আল্লাহ যাকে চান, হিদায়াত দান করেন।" (সূরা কাসাস : ৫৬)

হযরত আব্বাস[1] (রা) বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার চাচার জন্য কি করলেন, যিনি আপনার সাহায্য-সহায়তাকারী ছিলেন? তিনি

১. আল্লামা সুহায়লী তাঁর রাউযুল উনূফে এবং হাফিয ইবন সায়্যিদুন-নাস তাঁর উয়ূনুল আসার গ্রন্থে (১খ. পৃ. ১৩৩) এবং হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারীতে (৭খ. পৃ. ১৪৮) বলেন, হযরত আব্বাস (রা)-এর এ প্রশ্ন দ্বারা আবূ তালিবের ঈমান আনয়ন প্রসঙ্গে ঐ রিওয়ায়াত, যা হযরত আব্বাস (রা)-এর প্রতি সম্পর্কিত করা হয়, তা সহীহ নয়। ঐ রিওয়ায়াতটি এই যে, মৃত্যুকালে আবূ তালিবের ওষ্ঠ নড়াচড়া করছিল, হযরত আব্বাস কান পেতে শোনেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলেন, আপনি যে কালেমার কথা বলছিলেন, আবূ তালিব ঐ কালেমা বলেছেন। তিনি বললেন, আমি শুনি নাই। এ জন্যে যে, যদি আব্বাস (রা) আবূ তালিবকে কালেমা শাহাদত বলতে শুনতেন তবে এ প্রশ্নের অর্থ কি ? মোট কথা, এ রিওয়ায়াত যদি সহীহও হয়, তা হলে কুরআনের আয়াত এবং বুখারী-মুসলিম এবং অপরাপর সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহের প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত ও বিশুদ্ধ সনদবিশিষ্ট হাদীসসমূহের বিপরীতে তা দলীল হতে পারে না; যদিও ঐসব বর্ণনা দুর্বল ও মুনকাতি'ও হয়। আল্লামা শিবলী ইবন ইসহাকের ঐ দুর্বল ও মুনকাতি' বর্ণনা দ্বারা বুখারী-মুসলিম এবং সিহাহ সিত্তার সমস্ত সহীহ হাদীসের বর্ণনাকে রদ করে আবূ তালিবের ঈমান আনয়ন প্রমাণ করতে চান। এ আল্লামার নিকট কিসরার প্রাসাদে ভূমিকম্পের বর্ণনা এ জন্যে অগ্রহণযোগ্য ছিল যে, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, বরং সিহাহ সিত্তাহর কোথাও এ হাদীসের পাত্তা ছিল না। কিসরার প্রাসাদের এই হাদীস সিহাহ সিত্তাহর কোথাও না থাকলেও এ হাদীসের বিরুদ্ধেও সিহাহ সিত্তাহয় একটি হরফও ছিল না। ইবন ইসহাকের এ বর্ণনার বিপরীতে সিহাহ সিত্তাহয় স্পষ্ট বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহ বিদ্যমান। স্বয়ং আল্লামার বিশ্লেষণ হলো, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক এ জন্যে সমালোচিত যে, তিনি ইয়াহূদী-নাসারা থেকে রিওয়ায়াত করতেন এবং তাদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। আমরা জানি না যে, এ ধরনের ব্যক্তির বর্ণনার দ্বারা সহীহায়ন এবং সিহাহ সিত্তাহর বর্ণনাসমূহ রদ করার প্রতি আল্লামা কিভাবে উদ্যোগী হলেন ? অধিকন্তু, আবূ তালিবের ঈমান আনয়নের প্রসঙ্গে যত বর্ণনাই আছে, এর সবগুলোই এ ধরনের বুযর্গ ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত, (যারা নাউযু বিল্লাহ), হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-কে কাফিররূপে আখ্যায়িতকারী। হাফিয আসকালানী তাঁর ইসাবা শীর্ষক গ্রন্থে (৪খ. পৃ. ১১৫) 'আবূ তালিবের প্রসঙ্গ' অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। সম্মানিত আলিমগণ ইসাবা ছাড়াও আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৩খ. পৃ. ১৪২–১৪৬) ও আল্লামা যারকানীর শারহে মাওয়াহিব (১খ. পৃ. ২৯১) দেখে নিতে পারেন।

বললেন, পায়ের গিরা পর্যন্ত আগুনে আছেন, যদি আমি সুপারিশ না করতাম তবে জাহান্নামের তলদেশে নিমজ্জিত হয়ে যেতেন (বুখারী শরীফ, আবূ তালিবের ঘটনা অধ্যায়)।

আবূ তালিব প্রসঙ্গ

আল্লামা সুহায়লী বলেন, আবূ তালিব আপাদমস্তক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহায্য-সহযোগিতায় আত্মনিবেদিত ছিলেন। কেবল চরণ যুগল ইসলামের পরিবর্তে আবদুল মুত্তালিবের অনুসরণে নিয়োজিত ছিল। এ জন্যে কেবল চরণদ্বয়ে আযাব নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর, আমাদের পা-কে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের উপর আমাদেরকে বিজয় দান কর।"

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, যখন আবূ তালিব মারা গেলেন তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) সমীপে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার পথভ্রষ্ট চাচা মারা গেছেন। তিনি বললেন, যাও, দাফন করে এসো। আমি বললাম, তিনি তো মুশরিক অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, দাফন করে এসো। এ হাদীসটি আবূ দাঊদ ও নাসাঈতে আছে। হাফিয আসকালানী[১] তাঁর ইসাবায় বলেন, ইবন খুযায়মা হাদীসটি সহীহ বলেছেন।

এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত আলী (রা) আবূ তালিবের দাফন শেষে নবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলে নবী (সা) তাকে বললেন, গোসল দিয়ে নাও। একে ভিত্তি করে ফকীহ ও আলিমগণের বক্তব্য হলো, কাফির ও মুশরিককে কাফন-দাফন করার পর গোসল করা মুস্তাহাব যেমনটি হাদীসসমূহে এসেছে।

হাফিয তুরবাশতি (র) বলেন, এ হাদীসের উপর ভিত্তি করেই মুজতাহিদ ইমামগণ, বিশেষত ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফিঈ (র) কাফিরের দাফন জায়েয বলে দলীল পেশ করেছেন। অধিকন্তু, এর উপর ভিত্তি করেই তাঁরা এ মাসয়ালাও দিয়েছেন যে, মুসলমানরা কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না। এ জন্যে যে, আবূ তালিবের চার পুত্র ছিল,তালিব, আকিল, জা'ফর এবং আলী। আবূ তালিবের পরিত্যক্ত সম্পত্তি কেবল তালিব ও আকিল পেয়েছিল, যারা পিতৃধর্মের উপর ছিল। আর জা'ফর এবং আলী (রা) সম্পত্তি পাননি, কেননা তাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন। যেমনটি আল-মুতামিদ ফিল ইতিকাদে বর্ণিত হয়েছে।[২]

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৪৮।

২ উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১৩২।

সতর্ক বাণী

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের[1] সর্বসম্মত বিশ্বাস এই যে, আবূ তালিব কুফরী অবস্থায় মারা গেছেন; যেমনটি পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে। হাফিয তুরবাশতী লিখেছেন, আবূ তালিবের কাফির হওয়া নিরবচ্ছিন্ন হাদীসের সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর পূর্ববর্তী আলিম এবং দীনের ইমামদের এটাই সিদ্ধান্ত। রাফিযীদের সিদ্ধান্ত এই যে, আবূ তালিব ঈমান নিয়ে মারা গেছেন। জানা উচিত যে, ঈমানের জন্য ভালবাসা ও আত্মোৎসর্গই যথেষ্ট নয়, নুবূয়াত ও রিসালতের সত্যায়ন এবং সাক্ষ্যদান ছাড়া মু'মিন হওয়া যায় না। অতএব এটা বুঝে নিন এবং এর উপর দৃঢ় থাকুন।

ইসলামের দাওয়াতদানের জন্য তায়েফ সফর

আবূ তালিবের পর নিজ গোত্রের অবিশ্বাসীদের থেকে তাঁর আর কোন সহমর্মী ও সাহায্যকারী রইল না। আর হযরত খাদীজা (রা)-এর বিদায় গ্রহণের পর কোন সান্ত্বনাদানকারী ও সহানুভূতি প্রদর্শনকারীও থাকলেন না। মক্কার কুরায়শদের শক্তিমত্তার দরুন বাধ্য হয়ে দশম নববী বর্ষের শাওয়াল মাসের শেষভাগে তিনি (সা) তায়েফে গমন করলেন এ জন্যে যে, সম্ভবত এ লোকগুলো আল্লাহর প্রতি হিদায়াত গ্রহণ করবে এবং দীনের সাহায্য-সহায়তাকারী হবে। হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) কে সাথে নিয়ে তিনি তায়েফ গমন করলেন।

আবদ ইয়ালিল, মাসউদ ও হাবীব—এরা ছিল তিন ভাই যারা সেখানকার নেতৃস্থানীয়দের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত উপস্থাপন করলেন। তারা কালেমার সত্য দাওয়াত শ্রবণ করার পরিবর্তে রূঢ়ভাবে তাঁকে জবাব দিল। তাদের একজন বলল, কাবার পর্দা ছিন্ন করার জন্য বুঝি আল্লাহ তোমাকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন ! আর একজন বলল, আল্লাহ্ বুঝি নবী বানানোর জন্য তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পান নাই ! একজন বলল, আল্লাহর শপথ, আমি তোমার সাথে কোন কথাই বলব না। যদি আসলেই তোমাকে আল্লাহ তাঁর রাসূল বানিয়ে পাঠিয়ে থাকেন, তবে তোমার কথার বিরোধিতা করা ভয়ংকর (কিন্তু এ নির্বোধ এটা বুঝল না যে, আল্লাহর পয়গাম্বরের সাথে ঠাট্টা-মস্করা করা এর চেয়েও বেশি কঠিন অপরাধ), আর যদি তুমি আল্লাহর রাসূল না হও, তবে তো তোমাকে সম্বোধন করার বা তোমার

---

১. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এটাই সম্মিলিত রায়। কাজেই আল্লামা শিবলীর সীরাতুন নবী (১খ. পৃ. ১৮১) এটা লিখা যে, আবূ তালিবের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে মতভেদ রয়েছে স্রেফ প্রতারণা ও ধোঁকাবাজী। আহলে সুন্নাতের মধ্যে তার কুফরীর ব্যাপারে কোনই মতপার্থক্য নেই। অবশ্য রাফিযীরা আবূ তালিবের ঈমান আনয়নের প্রবক্তা। তবে প্রকাশ থাকে যে, রাফিযীদের মতপার্থক্য গ্রহণযোগ্য নয় যারা হযরত আবূ বকর, হযরত উমর বরং সমস্ত সাহাবা কিরাম (রা) কে কাফির ও মুনাফিক মনে করে, তাদের মতপার্থক্য কেমন করে ধর্তব্য ও দৃষ্টিদানের যোগ্য হতে পারে?

প্রতি দৃষ্টি দেয়ার যোগ্যই তুমি নও। এরপর ওরা দুশ্চরিত্র বখাটে ভবঘুরে ছেলেদেরকে উস্কিয়ে দিল যে, তাঁর প্রতি তারা পাথর নিক্ষেপ করুক ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করুক। যালিমরা তখন এত পাথর নিক্ষেপ করল যে, রাসূল (সা) ভীষণভাবে আহত হলেন। আঘাতের যন্ত্রণায় যখন তিনি বসে পড়তেন, ঐ হতভাগারা তাঁর বাহু ধরে পুনরায় তাঁকে পাথর মারার জন্য দাঁড় করিয়ে দিত এবং হাসাহাসি করত।

হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা), যিনি তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন, তিনি হযরত (সা)-কে রক্ষা করতে চেষ্টা করছিলেন যে, তাঁর পরিবর্তে নিজের গায়ে সকল পাথরের আঘাত লাগুক। ফলে যায়দ ইবন হারিসার সমস্ত মাথা আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে যায়। আর নবী (সা)-এর পায়ে এমন আঘাত লাগে যে, তাঁর পা থেকে রক্ত গড়াতে থাকে।

তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে উতবা ইবন রবীয়া এবং শায়বা ইবন রবীয়ার বাগান ছিল, বিশ্রাম গ্রহণের জন্য তিনি সেখানে একটি গাছের নিচে বসে পড়লেন এবং এ দু'আ করলেন :

اللهم اليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهو انى على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين الى من تكلنى الى عدو بعيد يتجهمنى ام الى صديق قريب ملكته امرى ان لم تكن غضبانا على فلا ابالى غير ان عافيتك اوسع لى اعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلمات وصلح عليه امرالدنيا والاخرة من تنزل بى غضبك اويحل بى سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নিজের দুর্বলতা, চেষ্টার স্বল্পতা এবং মানুষের অসাবধানতার অভিযোগ করছি। আয় আরহামুর রাহিমীন! তুমি তো বিশেষভাবে দুর্বলদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী। তুমি আমাকে কার কাছে সোপর্দ করবে, কোন ভীতিপ্রদ ত্রাস সৃষ্টিকারী দুশমনের কাছে, নাকি কোন বন্ধুর কাছে যাকে আমার ও আমার কর্মের অধিকারী বানাবে। যদি তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে না থাক, তবে আমি আর কিছুরই পরোয়া করি না; বরং তোমার ক্ষমা ও নিরাপত্তা আমার কাজ সহজসাধ্য হওয়ার নিমিত্ত হবে। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার পবিত্র সত্তার কাছে যার ওসীলায় সমগ্র অন্ধকাররাশি আলোকিত হয়ে উঠে এবং এ নূরের দ্বারাই দুনিয়া ও আখিরাতের কারখানা চলে। আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার ক্রোধ এবং অসন্তোষ যাতে আমার উপর পতিত না হয় তা থেকে। আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য তোমাকেই শোনানো এবং সম্মত করানো; কেননা তোমার প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া বান্দার মধ্যে কোন মন্দ থেকে বিরত থাকা ও ভাল কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই।" (ইবন ইসহাক ও তাবারানী)।

দু'আ কবূলের জন্য তো কেবল রিসালত ও নবূয়াতের গুণই যথেষ্ট ছিল। কেননা নবীগণ মুস্তাজাবুদ-দা'ওয়াত (যাঁদের দু'আ কবূল হয়ে থাকে) হন। কিন্তু ঐ সময়ে নবূয়াতের গুণ ছাড়াও ব্যর্থতা, নির্যাতন, অসহায়ত্ব ও মুসাফিরের শর্তও অতিরিক্ত যুক্ত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বাণী :

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ

"বরং তিনিই আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে আর তিনিই বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন।" (সূরা নামল : ৬২)

আর এটাও বিবেচ্য, নির্যাতিত ও মুসাফির প্রত্যেকের ব্যাপারে পৃথক পৃথক হাদীসে এসেছে যে, মুসাফির এবং মযলুমের দু'আ নিঃসন্দেহে কবূল হয়।

بترس از آه مظلومه که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید

"মযলূমের আহাজারীকে ভয় কর, কেননা তার দু'আকে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাগত জানানো হয়।"

অতঃপর এরূপ প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী দু'আর ব্যাপারে প্রশ্নের অবকাশ কোথায়, যেখানে দু'আকারী একজন নবী ও রাসূল। একই সাথে তিনি অসহায়, নির্যাতিত, দরিদ্র এবং মুসাফিরও। এমন দু'আ তো কেবল মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়ার অপেক্ষা,[১] সাথে সাথে কবূলের দরজা খুলে গেল। ঐ উতবা এবং শায়বা, যাদের অন্তর ছিল পাথরের চেয়েও কঠিন, তারা রাসূল (সা)-এর এ অসহায়ত্ব ও নিপীড়িত অবস্থা বাগানে বসে দেখছিল। অবস্থা দেখে তাদের অন্তর কিছুটা আর্দ্র হলো, আর রক্ত সম্পর্কীয় নৈকট্যের কারণে তাদের স্নায়ুতন্ত্রে তাঁকে সহায়তা করার ভাব জাগ্রত হলো। আদ্দাসকে ডেকে নিয়ে বলল, একটি পাত্রে আঙ্গুর নিয়ে তাঁর নিকটে যাও এবং তাঁকে বল, তিনি যেন এর থেকে কমবেশি অবশ্যই আহার করেন। আদ্দাস তাঁর সামনে এনে ঐ খাঞ্চা রাখল। রাসূলুল্লাহ (সা) বিসমিল্লাহ বলে তা থেকে খেতে শুরু করলেন। আদ্দাস বলল, আল্লাহর শপথ, এ শহরে তো এমন বাক্য বলার মত কেউ নেই ! রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি কোন্ শহরের অধিবাসী আর তোমার ধর্মই বা কি ?

আদ্দাস বলল, আমি নিনেভা[২] শহরের অধিবাসী এবং ধর্মের দিক থেকে খ্রিস্টান। রাসূল (সা) বললেন, ঐ নিনেভা, যেখানে আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দা ইউনুস ইবন মাত্তা বাস করতেন ? আদ্দাস বলল, ইউনুস ইবন মাত্তা সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন ?

---

১. পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামের যে উন্নতি হয়েছে, তার সূচনা ছিল এই দু'আ, এদিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে।

২ নিনেভা মসূল এলাকার একটি শহর। (যারকানী, ১খ. পৃ. ২৯৯)।

তিনি বললেন, তিনি আমার ভাই নবী ছিলেন, আর আমিও নবী। আদ্দাস তাঁর কপাল, হাত ও পায়ে চুমো দিল এবং বলল, أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُه "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি[১] যে, আপনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।" যখন আদ্দাস তাঁর নিকট থেকে ফিরে এলো, তখন উতবা ও শায়বা বলল, তুমি ঐ ব্যক্তির হাত-পায়ে কেন চুমো দিচ্ছিলে ? এ ব্যক্তি না জানি তোমাকে তোমার দীন থেকে সরিয়ে না নেয়, তোমার ধর্ম তার ধর্ম থেকে উত্তম।[২]

হাকিম ইবন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন উতবা এবং শায়বা মক্কার কুরায়শদের সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন আদ্দাস তাদের পা ধরে বলল, আল্লাহর শপথ ! তিনি আল্লাহর রাসূল, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে এ লোকগুলোকে ধ্বংসের দিকে টেনে নেয়া হচ্ছে।

আদ্দাস (রা) বসে বসে কাঁদছিলেন, আস ইবন শায়বা ঐ পথে যাচ্ছিল, সে আদ্দাসকে জিজ্ঞেস করল, কাঁদছো কেন ? আদ্দাস বললেন, আমাদের ঐ দুই সর্দারের কারণে কাঁদছি, তারা এ সময়ে আল্লাহর রাসূলের মুকাবিলা করতে যাচ্ছে। আস ইবন শায়বা বলল, তিনি কি সত্যিই আল্লাহর রাসূল ? আদ্দাস বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, সমগ্র বিশ্বমানবের প্রতি তিনি আল্লাহর রাসূল হিসেবে এসেছেন।[৩]

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি একবার আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার উপর কি উহুদ যুদ্ধ অপেক্ষা কঠিন কোন দিন অতিবাহিত হয়েছে ? তিনি ইরশাদ করলেন, তোমার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যে কষ্ট পাওয়ার, তা তো পেয়েছি, কিন্তু সর্বাপেক্ষা কঠিনতম দিন ছিল ঐ দিন, যেদিন আমি নিজেকে আবদ ইয়ালীলের পুত্রদের সামনে উপস্থাপন করি। ওরা আমার দাওয়াত গ্রহণ করেনি। আমি সেখান থেকে অত্যন্ত চিন্তিত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরছিলাম। 'কারনুস সাআলিব' নামক স্থানে পৌঁছে কিছুটা স্বস্তি এলো, হঠাৎ যখন মাথা উঠালাম তখন দেখলাম একখণ্ড মেঘ আমার উপর ছায়াদান করছে এবং এর মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ) বিদ্যমান। জিবরাঈল সেখান থেকেই আওয়াজ দিলেন, আপনার সম্প্রদায় আপনার কথার যে উত্তর দিয়েছে, আল্লাহ তা শুনেছেন। এ সময়ে আল্লাহ তা'আলা আপনার নিকট পাহাড়ের ফিরিশতাকে প্রেরণ করেছেন, আপনি তাকে যা ইচ্ছা, নির্দেশ দিতে পারেন।

ইত্যবসরে মালিকুল জাবাল (পাহাড়ের ফেরেশতা) আমাকে আহ্বান করলেন এবং সালাম জানিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ ! আল্লাহ আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ

---

১. এ সমুদয় বর্ণনা আমরা উয়ূনুল আসার থেকে উদ্ধৃত করেছি, اشهد انك عبد الله ورسوله শুধু আদ্দাসের এ সাক্ষ্য হাফিয আসকালানী সীরাতে সুলায়মান তায়মী সূত্রে ইসাবায় (২খ. পৃ. ২৬৬) 'আদ্দাসের বক্তব্য' শিরোনামে উল্লেখ করেছেন।

২ উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১৩৪; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ ১৩৫।

৩. ইসাবা, ২খ. পৃ. ২৬৭।

করেছেন, আমি পাহাড়ের ফেরেশতা, পাহাড়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করি। আপনি যা ইচ্ছা আমাকে আদেশ দিতে পারেন। আপনি যদি আদেশ করেন তা হলে দুই পাহাড়কে (যার মধ্যবর্তী স্থলে মক্কাবাসী এবং তায়েফবাসীর অবস্থান) একত্রিত করে দিই, যাতে সমস্ত মানুষ পিষ্ট হয়ে যায়।

তিনি ইরশাদ করলেন, না, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশা করি যে, আল্লাহ ওদের বংশে এমন মানুষ সৃষ্টি করুন, যারা শুধু একক সত্তা লা-শারীক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং কাউকে তাঁর সাথে শরীক করবে না।

এ সমুদয় বর্ণনা সহীহ বুখারীর যিকরুল মালাইকা (ফেরেশতাদের কথা) অধ্যায়ে আছে, শুধু উদ্ধৃত বাক্যাবলী মু'জামে তাবারানীর রিওয়ায়াতের অনুবাদ।[১]

একটি জরুরী সতর্ক বাণী

কঠিন থেকে কঠিনতর কষ্ট পাওয়ার পরেও এ বিশ্ববাসীর প্রতি অনুগহ, দয়ার মূর্ত প্রতীক নবী করীম (সা)-এর আভিজাত্য ও অনুগ্রহ, ঐ মানুষগুলোর ধ্বংস ও বিনাশের জন্য এ কারণে দু'আ করেননি যে, যদিও এরা ঈমান আনেনি, কিন্তু তাদের বংশ থেকে আল্লাহর অনুগত, আজ্ঞাবহ, নিষ্কলুষ ও তাঁর প্রতি প্রাণ উৎসর্গকারীর জন্ম হবে।

সায়্যেদুনা হযরত নূহ (আ)-এর বিপরীত (আমার জীবন ও আত্মা তাঁর প্রতি উৎসর্গ হোক), যখন তাঁর এ আশা ভঙ্গ হয়ে গেল, আর আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে জানানো হলো যে, যাদের ঈমান আনার ছিল, তারা ঈমান এনেছে, অবশিষ্ট লোকেরা না নিজেরা ঈমান আনবে, না তাদের সন্তানদের মধ্যে আল্লাহকে মান্যকারী কোন বান্দার জন্ম হবে, তখন সায়্যেদুনা নূহ (আ) তাদের ধ্বংস ও বিনাশের জন্য দু'আ করলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وَاُوْحِىَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلاَّ مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

"আর নূহের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছিল যে, পূর্বে যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনো ঈমান আনবে না। কাজেই তুমি ওদের কার্যকলাপে চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না।" (সূরা হূদ : ৩৬)

এর পর নূহ (আ) এ দু'আ করলেন

رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ۝ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوْا اِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا

---

১. ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ২২৫।

"হে আমার প্রতিপালক, পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্যে কোন গৃহবাসীকে অবশিষ্ট রেখো না। তুমি ওদের ছেড়ে দিলে ওরা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং কেবল দুষ্কৃতকারী ও কাফির জন্ম দিতে থাকবে।" (সূরা নূহ : ২৬-২৭)

হযরত নূহ (আ) ওহীর মাধ্যমে জেনেছিলেন যে, এরা কেউ ঈমান আনবে না, আর এদের বংশধরদের মধ্যেও কেউ ঈমান আনবে না। ভবিষ্যতে যারাই পয়দা হবে, তারাই কাফির, সীমা-লংঘনকারী এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অবাধ্যই পয়দা হবে। এ জন্যে তিনি এ দু'আ করেছেন যে, হে আল্লাহ ! এক্ষণে তোমাকে অস্বীকারকারী ও মিথ্যাবাদীদের মধ্যে কাউকেই পৃথিবীতে জীবিত ছেড়ো না। এরা যদি জীবিত থাকে, তা হলে তোমার অবাধ্য হবে আর ওদের সন্তান-সন্তুতিও নাফরমান হবে। যখন ঈমান থেকেই নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন ঔদার্য ও অনুগ্রহের কোন অবকাশই অবশিষ্ট থাকল না। এ কুদরতী কারখানা ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নাম নেয়ার মত কেউ অবশিষ্ট থাকবে। যখন আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নাম নেয়ার মত কোন বান্দাই অবশিষ্ট থাকবে না, এ কারখানা তখন ওলট পালট করে দেয়া হবে।

তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন এবং জিন্নদের উপস্থিতি

প্রত্যাবর্তনকালে তিনি কয়েক দিন নাখলায় অবস্থান করেন। এক রাতে তিনি নামায পড়ছিলেন, ইত্যবসরে নাসীবীন-এর সাতজন জিন্ন ঐ পথে যাচ্ছিল, তারা তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করে এবং চলে যায়। ওদের আগমনের বিষয়ে তাঁর কিছুই জানা ছিল না। এমনকি এই আয়াত অবতীর্ণ হয় :

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا
فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ۝ قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ
مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا
دَاعِىَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ وَمَنْ
لَّا يُجِبْ دَاعِىَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ اُولٰٓئِكَ فِىْ
ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

"স্মরণ কর, আমি একদল জিন্নকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন ওরা তার কাছে উপস্থিত হলো, তখন একে অপরকে বলতে লাগল, চুপ করে শোন। যখন কুরআন পাঠ শেষ হলো, ওরা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে ওরা বলেছিল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শুনেছি, যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে

সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। যদি কেউ আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয়, তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। ওরাই তো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।" (সূরা আহকাফ ২৯-৩২)[১]

যখন তিনি মক্কার নিকটে পৌঁছলেন, তখন হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) আরয করলেন, মক্কায় কিভাবে প্রবেশ করব ? মক্কাবাসীরাই তো আপনাকে বের করে দিয়েছে। তিনি (সা) ইরশাদ করলেন, ওহে যায়দ![২] আল্লাহ তা'আলা এ মুসীবত থেকে উদ্ধারের কোন পন্থা অবশ্যই বের করে দেবেন। আর আল্লাহই তাঁর দীনের অভিভাবক ও সাহায্যকারী এবং অবশ্যই তিনি তাঁর নবীকে সবার উপরে বিজয়ী করবেন। অতঃপর তিনি হেরা গুহায় পৌঁছে আখনাস ইবন শুরায়কের নিকট প্রস্তাব পাঠালেন যে, আমি কি আপনার আশ্রয়ে মক্কায় আসতে পারি ? আখনাস বলল, আমি তো কুরায়শের মিত্র, কাজেই আমি আপনাকে আশ্রয় দিতে পারি না। পরবর্তীতে তিনি এই প্রস্তাব সুহায়ল ইবন আমরের নিকট পাঠালেন। সুহায়ল বলল, বনী কা'বের বিরুদ্ধে বনী আমের আশ্রয় দিতে পারে না। এরপর তিনি মুতইম ইবন আদীর কাছেও এ প্রস্তাব পাঠালেন যে, আমি কি আপনার আশ্রয়ে মক্কায় আসতে পারি ? মুতইম তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং নিজ পুত্রদের ও সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ডেকে বললেন, অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তোমরা হারামের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক, আমি মুহাম্মদকে আশ্রয় দিয়েছি। আর নিজেও উটে সওয়ার হয়ে হারামের নিকটে এসে দাঁড়ালেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বললেন, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আমি মুহাম্মদ (সা)-কে আশ্রয় দিয়েছি, কেউ যেন তাঁর বিরোধিতা না করে।

তিনি (সা) হারাম শরীফে পৌঁছে হাজরে আসওয়াদে চুমো দিলেন, তাওয়াফ করলেন এবং দু'রাকাত শোকরানা নামায আদায় করলেন, এরপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। মুতইম এবং তার পুত্রগণ তাঁকে ঘিরে রেখেছিল।[৩]

মুতইমের এ অনুগ্রহের ভিত্তিতে বদর যুদ্ধের দিন যুদ্ধবন্দীদের প্রসঙ্গে তিনি এ কবিতা পাঠ করেছিলেন :

لو كان المطعم بن عدى حيا ثم كلمنى فى هؤلاء التى لتركتهم له

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১৩৭।

২ প্রকৃত বাক্যগুলি ছিল ঃ يا زيد ان الله جاعل لما نوى فرجا مخرجا وان الله ناصر دينه ومظهر نبيه (তাবাকাতে ইবন সাদ, ১খ. পৃ. ১৪২)।

৩. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ১৪২; যাদুল মা'আদ, ২খ. পৃ. ৪৭।

"যদি আজ মুতইম ইবন আদী বেঁচে থাকতেন আর এ অপবিত্রদের ব্যাপারে কিছু বলতেন, তা হলে আমি তার খাতিরে এদের সবাইকে বিনাশর্তে ছেড়ে দিতাম।"
(উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১৩৬)

হযরত তুফায়ল ইবন আমর দাওসী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

এ সময়ে হযরত তুফায়ল ইবন আমর দাওসী (রা) মক্কায় আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সে সময় ইসলামের প্রচার করছিলেন। তুফায়ল শরীফ বংশীয় হওয়া ছাড়াও উচ্চমানের কবি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, সমঝদার এবং অতিথি বৎসল ছিলেন। কুরায়শদের সঙ্গে তাঁর মিত্রতার সম্পর্ক ছিল।

তিনি যখন মক্কায় এলেন, তখন কুরায়শের কিছু লোক তার নিকট এলো এবং বলল, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে। সে সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। তার কথা ঐন্দ্রজালিক ও জাদুর মত, যা পিতা-পুত্রে, ভাইয়ে-ভাইয়ে এবং স্বামী-স্ত্রীতে বিভেদ সৃষ্টি করে। আপনি তার থেকে দূরে থাকবেন। আশঙ্কা হয়, পাছে আপনি ও আপনার সম্প্রদায় এ বিপদে জড়িয়ে না পড়েন। যতটা সম্ভব আপনি ঐ লোকের কোন কথা শুনবেন না। কুরায়শরা তুফায়ল ইবন আমর দাওসীকে এতই ভয় পাইয়ে দিয়েছিল যে, তিনি নিজের দু'কানের ছিদ্রে কাপড় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে হঠাৎ করেও ঐ ব্যক্তির কথা কানে প্রবেশ না করে। (তিনি বলেন,) এমনকি লোকে আমাকে ذو القطنتين (যুল-কাতনাতায়ন) বলতে লাগল। ঘটনাক্রমে আমি একদিন মসজিদে হারামের দিকে গেলাম। দেখলাম মুহাম্মদ (সা) বায়তুল্লাহর সামনে নামায আদায় করছেন।

তুফায়ল (রা) বলেন, আমি তাঁর পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালাম। যদিও আমি চাচ্ছিলাম যে, তাঁর কোন কথা শুনব না; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা চাচ্ছিলেন যে, তাঁর কিছু কথা আমাকে শুনিয়ে দেন। অবলীলায় আমি তাঁর কিছু কথাবার্তা শুনতে পেলাম। কথাগুলো অতি উত্তম ও ভালো লাগল। তখন আমি মনে মনে বললাম, আমি তো বুদ্ধিমান পুরুষ এবং বড় কবি, তাঁর কোন বাক্যের সৌন্দর্য ও সাবলীলতাই আমার কাছে গোপন থাকবে না।

আমি তাঁর কথা অবশ্যই শুনব। যদি কোনো কথা উত্তম ও সৌন্দর্যমণ্ডিত মনে হয় তা হলে গ্রহণ করব; আর যদি মন্দ ও অবাঞ্ছিত হয় তা হলে পরিত্যাগ করব। কাজেই যখন নবী (সা) হারাম শরীফ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, আমি তাঁর পিছু নিলাম। যখন তিনি তাঁর ঠিকানায় পৌঁছলেন, আমি তাঁর খিদমতে গিয়ে আরয করলাম, আপনার সম্প্রদায় আমাকে আপনার কথা শোনা থেকে এমনভাবে ভয় দেখিয়েছে যে, আমি কানের দু'ছিদ্রে কাপড় প্রবিষ্ট করেছি, যাতে আপনার কোনো কথা শোনা না যায়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এটা নয় যে, আমি আপনার কথা শুনব না। আপনার বাণীর যেটুকু কানে পড়েছে, খুবই ভালো লেগেছে। আপনি আপনার দীন আমার সামনে

উপস্থাপন করুন। তিনি ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন এবং আমার সামনে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করলেন। এক রিওয়ায়াতে আছে যে, তিনি সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিলাওয়াত করেছিলেন। আল্লাহর শপথ! কুরআন করীমের চেয়ে উত্তম কোন বাক্য আমি কখনো শুনিনি এবং ইসলাম অপেক্ষা ইনসাফপূর্ণ ও মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী কোন দীনও পাইনি। কাজেই সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেলাম।

আমি তাঁর নিকট আরয করলাম, হে আল্লাহর নবী, আমি আমাদের সম্প্রদায়ের সর্দার। আমার ইচ্ছা, এলাকায় ফিরে গিয়ে আমি আমার সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত দেব। আপনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন তিনি যেন আমাকে কোন নিদর্শন দান করেন, যা এ ব্যাপারে আমার পরিচায়ক ও সাহায্যকারী হবে। তিনি (সা) এ দু'আ করলেন : اللهم اجعل له اية। "আয় আল্লাহ ! একে কোন নিদর্শন দান কর।"

অতঃপর আমি যখন আমার বস্তির নিকটবর্তী হলাম, আমার দু'চোখের মাঝখানে প্রদীপের মত একটি আলো সৃষ্টি হলো। আমি প্রার্থনা করলাম, আয় আল্লাহ, এ নূরকে আমার মুখমণ্ডল ছাড়া অন্য কোন স্থানে দিয়ে দিন, যাতে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা বিকৃতি মনে না করে। আর এটা মনে না করে যে, পিতৃধর্ম পরিত্যাগের কারণে এর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ঐ নূর তৎক্ষণাৎ আমার চাবুকে চলে গেল ! আর ঐ চাবুক একটি মোমবাতি এবং লণ্ঠনে পরিণত হলো।

প্রভাত হলে আমি প্রথমেই আমার পিতাকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম, আর এরপর আমার স্ত্রীকে। উভয়েই নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র করল, গোসল করল এবং ইসলাম গ্রহণ করল। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তোমার যদি এ ভয় হয় যে, প্রতিমাদের পরিত্যাগ করায় সন্তানদের কোন অমঙ্গল ঘটতে পারে, তবে আমি তার যিম্মাদার হলাম।

এরপর আমি আমার সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত দিলাম। কিন্তু দাওস সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণে গড়িমসি করতে লাগল। আমি দ্বিতীয়বার মক্কা মুকাররামায় তাঁর

---

১. এটা ইসলামের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে,এর প্রতিটি নির্দেশ ইনসাফপূর্ণ ও মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী। উগ্রতা ও শৈথিল্য থেকে পবিত্র। প্রতিটি নির্দেশেই মধ্যম পন্থা, বিবেচনা প্রসূত ও ভারসাম্যপূর্ণ। উদাহরণত ইসলাম শত্রু থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না আবশ্যিক করেছে, আর না ক্ষমা করাকে আবশ্যিক করেছে; বরং প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে এবং ক্ষমা করাকে উৎসাহিত করেছে। আর ক্ষমাকে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির অধিক নিকটবর্তী বলেছে। ইসলাম জনসাধারণের জন্য অপব্যয় ও কার্পণ্য উভয়কেই নিষিদ্ধ আখ্যায়িত করেছে। অপচয় এবং অপব্যয়ও নয়, আর কিপটেপণাও নয়, বরং যেন ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে থাকে। আর যে ব্যক্তির অন্তর আল্লাহ নির্ভরতা ও বৈরাগ্যে এতই মগ্ন যে, সম্পদ থাকা আর না থাকাটা তাদের দৃষ্টিতে একইরূপ, এই মহাপুরুষদের জন্য ইসলাম অনুমতি দিয়েছে যে, তাঁরা তাঁদের সমুদয় অর্থ-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে পারেন। এভাবে চিন্তা করুন।

খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং আরয করলাম, হে আল্লাহর নবী ! দাওস সম্প্রদায়[১] ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করেনি, আপনি তাদের বদ-দু'আ করুন। তিনি (সা) হাত তুলে এ দু'আ করলেন : اللهم اهد دوسا وائت بهم "আয় আল্লাহ দাওস সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান কর এবং মুসলমান বানিয়ে এখানে প্রেরণ কর।" আর আমাকে (তুফায়ল রা. কে) বললেন, যাও, নম্রভাবে ইসলামের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাও। হযরতের পরামর্শ অনুসারে আমি লোকদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করতে থাকলাম। সপ্তম হিজরী পর্যন্ত সত্তর অথবা আশিটি পরিবারের লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিল। আমি তাদের সাথে নিয়ে সপ্তম হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় রাসূল (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম।

মক্কা বিজয়ের পর আমি তাঁর কাছে আবেদন করলাম যে, আমর ইবন হামীমার মূর্তি ও মণ্ডপ (যুল-কফিন) জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য আমাকে অনুমতি দিন। তিনি অনুমতি দিলে তুফায়ল সেখানে গিয়ে মূর্তিগুলো জ্বালিয়ে দেন। মূর্তি জ্বালিয়ে দেয়ার সময় তিনি নিচের বাক্যগুলো পড়তে পড়তে যাচ্ছিলেন :

يا ذا الكفين لست من عبادك * ميلادنا اكبر من ميلادك *

انى خشوت النار فى فؤادك

"হে যুল-কফিন, আমি তোমার পূজাকারীদের মধ্যে নই, আমার জন্ম হয়েছে তোমার জন্মের পূর্বে; আমি তোমার মধ্যে প্রচুর আগুন ভরে দিয়েছি।"

সম্প্রদায়ের অর্ধেক লোক তো পূর্বেই মুসলমান হয়ে গেছে, অবশিষ্ট লোক মূর্তি জ্বালানোর পর শিরক ও মূর্তি পূজা থেকে তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করে।

এক রিওয়ায়াতে আছে যে, হযরত তুফায়ল (রা) যখন আপন সম্প্রদায়ে গিয়ে পৌঁছেন, তখন অন্ধকার রাত ছিল ও বৃষ্টি হচ্ছিল, পথ দেখা যাচ্ছিল না। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা এ নূর সৃষ্টি করেন। লোকেরা তা দেখে খুবই আশ্চর্য হলো এবং হযরত তুফায়লকে ঘিরে ধরল। তার চাবুকটি ছুয়ে দেখতে শুরু করল। এ নূর মানুষের আঙ্গুলে চমকাচ্ছিল।

অন্ধকার রাত হলে চাবুকটি এভাবেই আলোকিত হয়ে উঠত। এ কারণে হযরত তুফায়ল (রা) طفيل ذى النور (আলোকধারী) উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[২]

কারামত প্রসঙ্গে

আল্লাহর ওলীদের কারামত আম্বিয়া আলাইহিমুস-সালামের মু'জিযার নমুনা হয়ে থাকে। যেমনভাবে আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী আলিমগণ নবী (আ)গণের ওয়ারিস,

---

১. হাফিয আসকালানী বলেন, ঐ সময় হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ছাড়া কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। (ইসাবা, ২খ. পৃ. ২২৬)।

২ আল-ইসতিয়াব, ২খ. পৃ. ২৩১; আল-ইসাবা, ৩খ. পৃ. ২২৫; খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৩৬।

ঠিক তেমনিভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে কারামতের সোপান ও প্রকৃতির অলৌকিকত্বের নিমিত্ত তাঁরা নবী (আ)গণের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেন। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, العلماء ورثة الانبياء "আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী।" কাজেই হযরত তুফায়ল (রা)-এর এ কারামত হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযা হাতের ঔজ্জ্বল্য-এর একটি উদাহরণ বলে অনুমিত হয়। আল্লাহই অধিক প্রজ্ঞাশীল।

উপরন্তু, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা তাহরীমে সাহাবা কিরাম (রা)-এর ব্যাপারে ইরশাদ করেন :

يَوْمَ لاَ يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা) এবং তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারীদের অপদস্থ করবেন না। তাদের সামনে ও ডানে নিজেদের নূর ধাবিত হবে।" (সূরা তাহরীম : ৮)

আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, হযরত তুফায়ল (রা)-এর এই নূর ঐ নূরের নমুনা, যা কিয়ামতের দিন হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা) কে বিশেষভাবে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশেষ দু'আর বদৌলতে হযরত তুফায়ল (রা) কে এ নূর পৃথিবীতেই দেখানো হয়েছে। মহান পবিত্র আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন এবং তাঁর জানাটাই পরিপূর্ণ ও বিজ্ঞোচিত।[১]

ইসরা ও মি'রাজ

তায়েফ[২] থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আল্লাহ জাল্লা শানুহু নবী করীম (সা) কে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত এবং মসজিদে আকসা থেকে সপ্তাকাশ পর্যন্ত এ দেহ-আত্মায় জাগ্রত অবস্থায় একই রাতে সফর করান, একেই ইসরা ও মি'রাজ নামে অভিহিত করা হয়। এর বিস্তারিত বর্ণনা ইনশা আল্লাহ মু'জিযা অধ্যায়ে আসবে। তাঁর মি'রাজ সফরের ব্যাপারে কোন্ বছর এ তা অনুষ্ঠিত হয়েছে আলিমগণের মধ্যে এ নিয়ে মতপার্থক্য আছে।

এ প্রসঙ্গে আলিমগণের দশটি বক্তব্য আছে। যেমন

১. হিজরতের ছয় মাস পূর্বে মি'রাজ হয়েছে;

২. হিজরতের আট মাস পূর্বে;

৩. হিজরতের এগার মাস পূর্বে;

৪. হিজরতের এক বছর পূর্বে;

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৪খ. পৃ. ১৭৫; সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১৩৫; খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৩৫; দালায়িলে আবূ নুয়াইম, ১খ. পৃ. ৭৮; আল-ইসাবা, ২খ. পৃ. ২২০।

২ হাফিয ইবন কায়্যিম যাদুল মা'আদে তায়েফ সফরের ঘটনা বর্ণনার পর লিখেছেন, এরপরে তাঁর মি'রাজ হয়েছে। যা দ্বারা এটা জানা গেল যে, হাফিয ইবন কায়্যিমের নিকট ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা তায়েফ থেকে ফিরে আসার পর সংঘটিত হয়।

৫. হিজরতের এক বছর দু'মাস পূর্বে;
৬. হিজরতের এক বছর তিন মাস পূর্বে;
৭. হিজরতের এক বছর পাঁচ মাস পূর্বে;
৮. হিজরতের এক বছর ছয় মাস পূর্বে;
৯. হিজরতের তিন বছর পূর্বে;
১০. হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে।

এ সমুদয় বক্তব্য বিস্তারিতভাবে ফাতহুল বারীর 'মি'রাজ' অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে। প্রসিদ্ধ বক্তব্য হলো, হযরত খাদীজা (রা)-এর ওফাতের পর এবং আকাবার বায়'আতের পূর্বে মিরাজ সংঘটিত হয়েছে। যেমন প্রথমোক্ত আটটি বক্তব্য এর উপর একমত যে, হযরত খাদীজা (রা)-এর ওফাতের পর মি'রাজ হয়েছে। অধিকাংশ আলিম এ মতই পোষণ করেন। উপরন্তু, এ বক্তব্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত খাদীজা (রা) পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই ইনতিকাল করেছেন। আর এটাও স্বীকৃত যে, হযরত খাদীজা (রা) শে'বে আবূ তালিবে নবী (সা)-এর সঙ্গী ছিলেন। শে'বে আবূ তালিব থেকে বেরিয়ে আসার পর তিনি ইনতিকাল করেন। আর এটা পূর্বেই জানা গেছে যে, তিনি (সা) এবং তাঁর সঙ্গীগণ শে'বে আবূ তালিব থেকে দশম নববী বর্ষে বেরিয়ে আসেন। কাজেই এ সমুদয় বিবরণ থেকে এ ফলাফল বেরিয়ে আসে যে, মি'রাজ দশম নববী বর্ষের পর একাদশ নববী বর্ষে তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কোন এক মাসে সংঘটিত হয়েছে। এবারে বাকী রইল কোন্ মাসে তা হয়েছে। এ ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। রবিউল আউয়াল অথবা রবিউস সানী, রজব অথবা রমযান কিংবা শাওয়াল মাসে হয়েছে—এ পাঁচটি বক্তব্য রয়েছে। প্রসিদ্ধ মতামত এটাই যে, রজব মাসের সাতাশের রাতে হয়েছে। শারহে মাওয়াহিব (১খ. পৃ. ৩০৭) পর্যালোচনার পর আমার কাছে এটাই প্রতিভাত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই সমধিক জ্ঞাত।

সূক্ষ্ম কথা

দশম নববী বর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে, বিপদ এবং পরীক্ষার সমস্ত পর্যায় সমাপ্ত হয়েছে, অপমান-অপদস্থতার এমন কোন শাখা অবশিষ্ট ছিল না, যা মহান আল্লাহর রাহে বরদাশত করা হয়নি। আর প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের পথে অপমান আর নির্যাতনের প্রতিদান সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি এবং মিরাজ ও উন্নতি ছাড়া আর কী হতে পারে?

কাজেই যখন শে'বে আবূ তালিবে এবং তায়েফ সফরে অপমান-অপদস্থতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, তখন আল্লাহ জাল্লা জালালুহূ ইসরা ও মি'রাজের অতুলনীয় সম্মান ও ইযযতে তাঁকে ভূষিত করেন। এতে তিনি তাঁকে এতদূর উর্ধ্বে উঠান যে,

শ্রেষ্ঠ কৈট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা[1] হযরত জিবরাঈল (আ)-ও তাঁর পিছনে থেকে যান। তাঁকে এমন স্থান পর্যন্ত ভ্রমণ করান, যা চূড়ান্ত অর্থাৎ আরশে আযীম পর্যন্ত।

এ কারণে কিছু বিজ্ঞ ব্যক্তির বক্তব্য হলো, আরশ পর্যন্ত সফর করানো খাতামুন নুবূয়াতের প্রতিই ইঙ্গিতবহ। কেননা সমগ্র বিশ্ব আরশে গিয়ে সমাপ্ত হয়। পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহ (হাদীস) দ্বারা আরশের পর কোন সৃষ্টির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি। অনুরূপভাবে নবূয়াত ও রিসালাতের সমগ্র পরিপূর্ণতার সমাপ্তি তাঁর মাধ্যমে ঘটেছে। এটা বুঝে নিন এবং এর উপর দৃঢ় থাকুন।

মি'রাজের বিস্তারিত বিবরণ

মহান আল্লাহ বলেন :

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

"পবিত্র ঐ মহান সত্তা, যিনি স্বীয় বিশিষ্ট বান্দা [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) কে] রাত্রির সামান্যতম সময়ে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করান, যার গোটা পরিবেশকে আমি (আল্লাহ্) বরকতবিমন্ডিত করেছি। আমার নিদর্শনসমূহ দেখানোর এ সফরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে আসমানে ভ্রমণ করানো এবং সেখানকার বিশেষ বিশেষ নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করানো" যার কিছু কিছু আল্লাহ্ সূরা নাজম[2] -এ উল্লেখ করেছেন, তা শেষ নবী (সা)-এর জন্য ছিল এক অনন্য সম্মান। তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং সেখানে জান্নাত ও জাহান্নাম এবং অপরাপর সৃষ্টি বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করেন। মূলত প্রকৃত শ্রোতা এবং প্রকৃত দর্শক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, তিনি যাকে চান স্বীয় কুদরতের নিশানা দেখান। তখন ঐ বান্দা আল্লাহর দৃষ্টিতে দেখেন এবং আল্লাহর শ্রবণে শ্রবণ করেন।

---

১. তাবারানী বর্ণিত ঐ যঈফ হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,

عن ابن عباس (رضه) قال قال رسول الله الا اخبركم بافضل الملائكة جبرائيل

"হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমি কি তোমাদের এ খবর দেব না যে, সর্বোত্তম ফিরিশতা হলেন জিবরাঈল (আ) ।" (রূহুল মা'আনী, ১খ. পৃ. ৩০১)

২ যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى

"নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল, প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের নিকট, যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান। যখন বৃক্ষটি ছিল যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার, তা দ্বারা আচ্ছাদিত, তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। সে তো তার সৃষ্টিকর্তার মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল। (সূরা নাজম ঃ ১৩-১৮)।

আলিমগণের পরিভাষায় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণকে ইসরা বলে এবং মসজিদে আকসা থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত ভ্রমণকে মি'রাজ বলে। আর এ সময়ের সম্পূর্ণ সফরকে ইসরা ও মি'রাজ শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। মি'রাজকে এজন্যে মি'রাজ বলা হয় যে, মি'রাজ অর্থ সিঁড়ি। মসজিদে আকসায় পৌঁছার পর নবী (সা)-এর জন্য জান্নাত থেকে একটি সিঁড়ি আনা হয়েছিল যার মাধ্যমে তিনি আসমানে আরোহণ করেন। যেমন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসে এ সিঁড়ির উল্লেখ এসেছে।[১] পবিত্র কুরআনে তো এ ঘটনা মোটামুটি এভাবেই উল্লিখিত আছে। অবশ্য হাদীসসমূহে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে যার সার-সংক্ষেপ এরূপ :

এক রাতে নবী করীম (সা) হযরত উম্মে হানী (রা)-এর ঘরে শুয়ে আরাম করছিলেন। অবস্থা ছিল অর্ধ নিদ্রা অর্ধ জাগরণের মত, এমতাবস্থায় ঘরের ছাদ ফেটে গেল এবং ছাদ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ) অবতরণ করলেন আর তাঁর সাথে আরো ফিরিশতা ছিলেন। তাঁরা তাঁকে জাগালেন এবং মসজিদে হারামের দিকে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি হাতীমে শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। হযরত জিবরাঈল (আ) এবং হযরত মিকাঈল (আ) এসে তাঁকে জাগালেন ও যমযম কূপের পাড়ে নিয়ে গেলেন। আর সেখানে শুইয়ে সিনা চাক করলেন এবং কলব বের করে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন। আর একটি স্বর্ণের তশতরি আনা হলো যা ঈমান ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিল। ঐ ঈমান ও জ্ঞান তাঁর কলবে ভরে দিয়ে সিনা ঠিক করে দিলেন এবং দু'বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে মোহরে নুবুয়াত লাগানো হলো [যা নবী (সা)-এর শেষ নবী হওয়ার প্রামাণ্য ও প্রকাশ্য নিদর্শন ছিল]। এরপর বুররাক আনা হলো। বুররাক একটি বেহেশতী পশুর নাম, যা খচ্চর থেকে কিছুটা ছোট এবং গাধা থেকে কিছুটা বড়, শ্বেতবর্ণের বিদ্যুৎ গতিতে চলৎশক্তিসম্পন্ন ছিল। যার একেকটি পদক্ষেপ দৃষ্টিসীমার বাইরে পড়ত। যখন তার পিঠে আরোহণ করা হলো, সে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে শুরু করল। জিবরাঈল (আ) বললেন, ওহে বুররাক, এ কেমন ঔদ্ধত্য! তোমার পিঠে আজ পর্যন্ত নবী (সা) অপেক্ষা আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন কোন বান্দা আরোহণ করেনি। এতে বুররাক লজ্জায় ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে গেল এবং নবীজীকে নিয়ে রওয়ানা হলো। জিবরাঈল (আ) ও মিকাঈল (আ) তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। এহেন মর্যাদার সঙ্গে নবী (সা) রওয়ানা হলেন। আর কতিপয় রিওয়ায়াতে জানা যায়, হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা) কে বুররাকে আরোহণ করান আর নিজে নবী করীম (সা)-এর 'রাদীফ' অর্থাৎ বুররাকে তাঁর পিছনে আরোহণ করেন। (দ্র. যারকানী ও খাসাইসুল কুবরা, মি'রাজ অধ্যায়)।

---

১. যারকানী, ৬খ. পৃ. ৩৩, ৫৫।

হযরত শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল মকবূল (সা) বলেছেন ঃ আমি এমন জমি অতিক্রম করলাম যেখানে প্রচুর খেজুর গাছ ছিল। জিবরাঈল আমীন বললেন, এখানে অবতরণ করে নফল নামায আদায় করুন। আমি সেখানে নেমে নামায আদায় করলাম। জিবরাঈল আমীন বললেন, আপনার কি জানা আছে, এটা কোন্ জায়গায় নামায আদায় করলেন ? আমি বললাম, না, আমার জানা নেই। জিবরাঈল আমীন বললেন, আপনি ইয়াসরিব অর্থাৎ পবিত্র মদীনায় নামায আদায় করলেন, যেখানে আপনি হিজরত করবেন।

এরপর রওয়ানা হয়ে অপর একটি স্থানে পৌঁছলাম। জিবরাঈল (আ) বললেন, এখানেও নেমে নামায আদায় করুন। আমি নেমে নামায আদায় করলাম। জিবরাঈল আমীন বললেন, আপনি সিনাই মরুভূমিতে হযরত মূসা (আ)-এর এলাকার সন্নিকটে নামায আদায় করলেন, যেখানে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন।

অতঃপর আরেকটি ভূমি অতিক্রমকালে জিবরাঈল (আ) বললেন, এখানে নেমে নামায আদায় করুন। আমি নেমে নামায আদায় করলাম। জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি মাদাইনে নামায আদায় করলেন [যা হযরত শুয়াইব (আ)-এর আবাসস্থল ছিল]।

সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে অপর একটি স্থানে পৌঁছলাম। জিবরাঈল (আ) বললেন, নেমে নামায আদায় করুন। আমি নেমে নামায আদায় করলাম। জিবরাঈল (আ) বললেন, এটা বায়তুল-লাহম (বেথেলহেম) যেখানে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম হয়েছিল। [ইবন আবূ হাতিম, বায়হাকী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এ হাদীসটি সহীহ্ বলেছেন, বাযযার ও তাবারানী হযরত শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন]।[১]

واما قصة الصلاة بطور سيناء حيث كلم الله موسى عليه السلام فقد اخرجها النسائ عن انس بن مالك رضه

আর মূসা (আ) কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলার স্থান সিনাই পাহাড়ের সন্নিকটে নামায আদায়ের ঘটনা ইমাম নাসাঈ হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন; যেমনটি বর্ণিত হয়েছে খাসাইসুল কুবরায়, (১খ. পৃ. ১৫৩)। উপরন্তু এ সমুদয়ের বিশদ বর্ণনা আল্লামা যারকানীর শারহে মাওয়াহিব, (৬খ. পৃ. ৩৯)-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈচিত্র্যময় সফর এবং আলমে মিসালের উপমাহীন নিদর্শন

১. তিনি (সা) বুররাকে সওয়ার হয়ে চলছিলেন, পথিমধ্যে একটি বৃদ্ধাকে অতিক্রম

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৫৮; ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ১৫৩।

করলেন, সে তাঁকে আহ্বান করল। জিবরাঈল (আ) বললেন, আগে চলুন, আর ওর প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। অগ্রসর হয়ে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হলো। সেও নবীজী (সা)-কে আহ্বান জানাল। জিবরাঈল (আ) বললেন, সামনে অগ্রসর হোন। এবার সামনে অগ্রসর হয়ে একটি দলকে অতিক্রম করলেন, যারা তাঁকে নিম্নোক্ত বাক্যে সালাম জানালেন :

السلام عليك يا اول السلام عليك يا اخر السلام عليك يا حاشر

পনাকে সালাম হে প্রথম, আপনাকে সালাম হে শেষ, আপনাকে সালাম হে একত্রকারী !"

জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি ওদের সালামের উত্তর দিন। আর কিছুক্ষণ পর বললেন ঐ বৃদ্ধা মহিলা যে পথিপার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল, সে ছিল পৃথিবী। পৃথিবীর বয়স এত অল্পই অবশিষ্ট আছে, যতটুকু এ বৃদ্ধা মহিলার আয়ূ অবশিষ্ট আছে। আর ঐ বৃদ্ধ পুরুষটি ছিল শয়তান। এদের উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে ওদের প্রতি আকৃষ্ট করা। আর ঐ জামায়াত, যারা আপনাকে সালাম জানালেন, তারা ছিলেন হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা এবং হযরত ঈসা (আ)। হাদীসটি ইবন জারীর ও বায়হাকী হযরত আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[১]

২. সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা) বলেন, শবে মি'রাজে আমি মূসা (আ) কে অতিক্রমকালে দেখলাম, তিনি তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন।[২]

আর হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় আছে, নবী (সা) বলেন, শবে মি'রাজে আমি হযরত মূসা (আ), দাজ্জাল এবং দোযখের দারোগা, যাকে মালিক বলা হয়, তাকে দেখেছি। বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে : ولينظر هل كانت هذه الروية فى الارض او فى السماء والله اعلم "এ দৃশ্য তিনি যমীনে দেখেছেন নাকি আসমানে, আল্লাহই ভাল জানেন।"[৩]

৩. এমনকি পথিমধ্যে তিনি এমন একটি সম্প্রদায় অতিক্রম করেন, যাদের নখগুলো তামার তৈরি ছিল। আর তারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষ ঐ নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছিল। নবী (সা) এদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে জিবরাঈল (আ) বলেন, এরা ঐ সমস্ত লোক, যারা মানুষের মাংস খেত, অর্থাৎ মানুষের গীবত করত ও তাদের ইযযত-আব্রু (গোপনীয়তা) ফাঁস করে দিত। আহমদ ও আবূ দাঊদ হযরত আনাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৪]

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৫৫; তাফসীরে ইবন কাসীর, ৬খ. পৃ. ৮০।

২ খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৫৬।

৩. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৬০।

৪. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৫৬।

৪. নবী (সা) এরপর এক ব্যক্তিকে দেখেন, সে একটি ঝর্ণায় সাঁতার কাটছে এবং পাথরকে গ্রাস বানিয়ে আহার করছে। তিনি জিবরাঈল (আ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন, এ সুদখোর। ইবন মারদুবিয়া হযরত সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন।

৫. অতঃপর তিনি (সা) এমন এক সম্প্রদায় অতিক্রম করেন যারা একই দিনে বীজ বুঁনছে এবং একই দিনে ফসলও কাটছে। আর কাঁটার পর ক্ষেত পুনরায় পূর্বের মত হয়ে যাচ্ছে। তিনি জিবরাঈল (আ) কে জিজ্ঞেস করেন, এ কেমন ব্যাপার ! জিবরাঈল আমীন বললেন, এরা আল্লাহর পথে জিহাদকারী, এদের একটি নেকী সাতশত গুণেরও অধিক বৃদ্ধি পায়। তারা এর যা কিছুই ব্যয় করেছে, আল্লাহ তাআলা তার উত্তম বিনিময় দান করেন। এরপর তিনি এমন একটি সম্প্রদায় অতিক্রম করেন যাদের দেহ পাথর দিয়ে থেঁতলে দেয়া হচ্ছে, কিন্তু পরক্ষণেই তা পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। এভাবে বারবার একই ব্যাপার ঘটছে, কখনো শেষ হচ্ছে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? জিবরাঈল (আ) বললেন, এরা ফরয নামাযে শৈথিল্য প্রদর্শনকারী।

এরপর একদলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যাদের লজ্জাস্থানের সামনে পেছনে সামান্য বস্ত্রখণ্ড জড়ানো আছে। আর তারা উট ও গরুর মত চরিয়ে বেড়াচ্ছে। 'দারী' ও 'যাক্কুম' অর্থাৎ কাঁটা এবং জাহান্নামের পাথর খাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? জিবরাঈল (আ) বললেন, এরা নিজেদের সম্পদের যাকাত দিত না। এরপর তিনি এমন একটি সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যাদের সামনে এক হাঁড়িতে রান্না করা গোশত আর অন্য হাঁড়িতে কাঁচা ও পচা গোশত রাখা ছিল, এ লোকগুলো পচা গোশতগুলো খাচ্ছিল এবং রান্না করা গোশত খাচ্ছিল না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? জিবরাঈল (আ) বললেন, এরা আপনার উম্মতের ঐ সব লোক, যাদের ঘরে সতী-সাধ্বী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ব্যভিচারিণী ও দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের সাথে রাত্রি যাপন করে এবং সকাল পর্যন্ত তাদের কাছেই থাকে। অথবা আপনার উম্মতের ঐ সব স্ত্রীলোক যারা নিজেদের বৈধ ও পবিত্র স্বামীদের ছেড়ে কোন ব্যভিচারী ও দুশ্চরিত্র লোকের সাথে রাত কাটায়। এর পর তাঁকে এমন একটি কাঠের পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল যা রাস্তার মধ্যস্থলে, কাপড় কিংবা অন্য কোন দ্রব্যই এর নিকট দিয়ে গেলে এটি তাকে চিরে ফেলে এবং টুকরা টুকরা করে ফেলে। তিনি জিবরাঈল (আ) কে জিজ্ঞেস করলেন। জিবরাঈল (আ) বললেন, এরা আপনার উম্মতের ঐ সমস্ত লোকের উদাহরণ, যারা পথের পাশে ওঁৎ পেতে থাকে এবং পথচারীদের ছিনতাই রাহাজানি করে।

এরপর তাঁকে এমন একটি দলের পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো, যারা কাঠের একটি ভারী বোঝা একত্র করেছে, যা তারা বহন করতে সক্ষম নয়। অথচ তারা তা আরো বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। তিনি প্রশ্ন করলেন, এটা কি ? জিবরাঈল (আ) বললেন,

এরা আপনার উম্মতের ঐ সমস্ত লোক, যাদের উপর আমানতদারী ও লোকের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের দায়িত্ব ছিল, যা তারা পালন করেনি। কাজেই সে বোঝা তাদের বহন করতে হচ্ছে। অতঃপর তিনি এমন একটি দল অতিক্রম করলেন, যাদের ঠোঁট ও জিহ্বা কেঁচি দিয়ে কর্তন করা হচ্ছে। আর কাটার পরক্ষণেই তা পূর্বের ন্যায় সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। এভাবে অবিরত চলছে যা শেষ হচ্ছে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? জিবরাঈল (আ) বললেন, এরা আপনার উম্মতের খতীব ও ওয়ায়েয (যারা নিজেরা যা বলত, তা করত না—এর উদাহরণ) অর্থাৎ অপরকে ওয়ায-নসীহত করত কিন্তু নিজেরা আমল করত না। ইবন জারীর, বাযযার, আবূ ইয়ালা ও বায়হাকী এ হাদীস হযরত বারীরা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[১] লোহার কেঁচি দিয়ে ঠোঁট কর্তনের হাদীসটি ইবন মারদুবিয়া হযরত আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। এরপর তিনি এমন একটি স্থান অতিক্রম করেন, যেখানে শীতল ও সুগন্ধিযুক্ত বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। জিবরাঈল (আ) বললেন, এটা জান্নাতের খুশবু। পরক্ষণেই এমন স্থান অতিক্রম করলেন, যেখানে দুর্গন্ধ অনুভূত হচ্ছিল। জিবরাঈল বললেন, এটা জাহান্নামের দুর্গন্ধ।[২]

সতর্ক বাণী দৃশ্যত এতদ সমুদয় ঘটনা আসমানে উত্থিত হওয়ার পূর্বের, এজন্যে যে, এ সমস্ত ঘটনার উল্লেখ বুররাকে আরোহণের পরে ধারাবাহিকভাবে মসজিদে আকসায় পৌঁছার পূর্বে এসেছে। এর ফলে জানা গেল যে, এ সমস্ত আসমানে আরোহণের পূর্বের। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাসে অবতরণ[৩]

মোট কথা, এ অবস্থায় নবী (সা) বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছলেন এবং সেখানে অবতরণ করলেন। সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) বুররাককে সেই স্তম্ভের সাথে বাঁধলেন যাতে (পূববর্তী) নবী (আ)গণ নিজেদের বাহন বাঁধতেন। আর বাযযারের বর্ণনায় রয়েছে যে, জিবরাঈল (আ) আঙ্গুল দিয়ে একটি পাথর ছিদ্র করে তার সাথে বুররাক বাঁধেন। আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, বুররাক বাঁধায় উভয়েই অংশীদার ছিলেন। সম্ভবত কালের বিবর্তনে ঐ ছিদ্র বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং জিবরাঈল (আ) আঙ্গুল দিয়ে তা খুলে দেন।

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৭২; যুরকানী,৬খ. পৃ. ৪১।

২ খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৭২।

৩. যেমনটি নাসাঈ হযরত আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন [রাসূল (সা) বলেছেন] অতঃপর আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করি। সেখানে আম্বিয়া আলাইহিমুস-সালাম একত্রিত হয়েছিলেন। জিবরাঈল (আ) আমাকে এগিয়ে দেন। আর আমি তাঁদের ইমামতি করি। (ইবন কাসীর, ৬খ. পৃ. ৯)।

এরপর নবী (সা) মসজিদে আকসায় প্রবেশ করেন এবং দু'রাকআত (তাহিয়্যাতুল মসজিদ)[১] নামায আদায় করেন (মুসলিম হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন)। আর যারকানীতে (৬খ. পৃ. ৪৫) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি এবং জিবরাঈল আমীন উভয়েই মসজিদে প্রবেশ করি এবং উভয়েই দু'রাকআত নামায আদায় করি (বায়হাকী)।[২]

তাঁর মহান উপস্থিতি উপলক্ষে পূর্বেই আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম[৩] নবী (সা)-এর অপেক্ষায় উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)-ও ছিলেন।[৪]

সামান্য সময় অতিক্রান্ত না হতেই অনেক সম্মানিত ব্যক্তি মসজিদে আকসায় সমবেত হলেন। অতঃপর এক মুয়াযযিন আযান দিলেন এবং ইকামত বললেন। আমরা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম, এ অপেক্ষায় ছিলাম যে, কে ইমামতি করবেন। জিবরাঈল আমীন আমার হাত ধরে সামনে বাড়িয়ে দিলেন। আমি সবাইকে নামায পড়ালাম। যখন আমি নামায শেষ করলাম, জিবরাঈল আমীন বললেন, আপনি জানেন কি, কাদের আপনি নামায পড়ালেন ? আমি বললাম, আমার জানা নেই। জিবরাঈল আমীন বললেন, যত নবী প্রেরিত হয়েছেন, সবাই আপনার পেছনে নামায পড়েছেন। ইবন আবূ হাতিম হযরত আনাস (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অপর এক রিওয়ায়াতে আছে যে, তাঁর আগমনে ফিরিশতাগণও আসমান থেকে অবতরণ করেন; আর নবী (সা) সমস্ত নবী (আ) এবং ফিরিশতাগণের ইমামতি করেন। যখন নামায সমাপ্ত হলো, তখন ফেরেশতাগণ জিবরাঈল (আ) কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এ সাথীটি কে ? জিবরাঈল বললেন, তিনি মুহাম্মদ (সা)। হাদীসটি ইবন জারীর, বাযযার, আবূ ইয়ালা ও বায়হাকী আবুল আলিয়া সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আর অপর এক বর্ণনায় আছে, জিবরাঈল বললেন, তিনি মুহাম্মদ (সা), খাতিমুন নাবিঈন। ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছিল? জিবরাঈল বললেন, হ্যাঁ। ফেরেশতাগণ বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিরাপদে জীবিত রাখুন, অত্যন্ত উত্তম ভাই এবং উত্তম খলীফা। অর্থাৎ আমাদের ভাই এবং আল্লাহর খলীফা। এরপর নবী (সা) আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের রূহসমূহের সাথে সাক্ষাত করলেন। তাঁরা সবাই আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি জ্ঞাপন করলেন।

---

১. 'বায়নাল কাওসাইন' (بين القوسين) মুসলিম শরীফে নেই। (খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৭২)।

২ তাফসীরে ইবন কাসীর, ৬খ. পৃ. ৩০২।

৩. যারকানী, ৬খ. পৃ. ৫০।

৪. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৬৭।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রশংসা

হযরত ইবরাহীম (আ) এ বাক্য দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি জ্ঞাপন করলেন

الحمد لله الذى اتخذنى خليلا واعطنى ملكا عظيما وجعلنى امة قانتا يؤتم بى وانقذنى من النار وجعلها على بردا وسلاما

"প্রশংসা সেই পবিত্র সত্তার, যিনি আমাকে তাঁর বন্ধু বানিয়েছেন আর আমাকে বিশাল সাম্রাজ্য দান করেছেন এবং ইমাম ও নেতা বানিয়েছেন এবং আগুনকে আমার জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক করেছেন।"

হযরত মূসা (আ)-এর প্রশংসা

الحمد لله الذى كلمنى تكليما وجعل هلاك ال فرعون ونجاة بنى اسرائيل على يدى وجعل من امتى قوما يهدونى بالحق وبه يعدلون

"প্রশংসা সেই মহান পবিত্র সত্তার, যিনি বিনা মাধ্যমে আমার সাথে কথা বলেছেন এবং ফিরাউন সম্প্রদায়ের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্নকরণ ও বনী ইসরাঈলের পথ প্রদর্শন আমার হাতে করেছেন। আর আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক গোষ্ঠী তৈরি করেছেন, যারা সত্যপন্থি, সৎ পথ প্রদর্শন ও ইনসাফ করে থাকে।"

হযরত দাউদ (আ)-এর প্রশংসা

الحمد لله الذى جعل لى ملكا عظيما و علمنى الزبور ولى الحديد وسخر لى الجبال يسبحن والطير واعطانى الحكمة وفصل الخطاب

"প্রশংসা সেই মহান পবিত্র সত্তার, যিনি আমাকে বিশাল সাম্রাজ্য দান করেছেন, আমাকে যবুর কিতাব শিখিয়েছেন, লোহাকে আমার জন্য নরম করেছেন, পাহাড় ও পক্ষীকুলকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমার সাথে তারা তাসবীহ পাঠ করে। আমাকে বিদ্যা ও জ্ঞান দান করেছেন এবং মনোমুগ্ধকর বক্তব্য পেশ করার ক্ষমতা আমাকে দান করেছেন।"

হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রশংসা

الحمد لله الذى سخرلى الرياح و سخرلى الشياطين يعملون ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات وعلمنى منطق الطير واتانى من كل شئى فضلا وسخرلى جنود الشياطين والانس والطير وفضلنى على كثير من عباده المؤمنين واتانى ملكا عظيما لاينبغى لاحد من بعدى وجعل ملكى ملكا طيبا ليس فيه حساب

"প্রশংসা সেই মহান পবিত্র সত্তার, যিনি বায়ু, শয়তান ও জিন্নকে আমার অনুগত করেছেন যাতে তারা আমার নির্দেশমত চলে এবং পাখির ভাষা আমাকে শিখিয়েছেন। আর মানুষ-জিন্ন, পশু-পাখির সৈন্যদের আমার অনুগত করেছেন। আমাকে এমন বাদশাহী দান করেছেন যে, আমার পরে আর কাউকে এরূপ দেয়া হবে না আর এর জন্য আমার কোন হিসাব-নিকাশও নেয়া হবে না।"

হযরত ঈসা (আ)-এর প্রশংসা

الحمد لله الذى جعلنى كلمة وجعل مثلى مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وعلمنى الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل وجعلنى اخلق من الطين كهئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وجعلنى ابرئ الاكمه والابرص واحى الموتى باذن الله ورفعنى وظهرنى واعاذنى وامى من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان علينا سبيل

"প্রশংসা সেই মহান পবিত্র সত্তার, যিনি আমাকে তাঁর বাক্য দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, হযরত আদম (আ)-এর মত আমাকে পিতা ব্যতিত সৃষ্টি করেছেন। পাখি সৃষ্টি করার, মৃতকে জীবিত করার এবং কুষ্ঠরোগী ও মাতৃগর্ভ থেকে অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণকারীকে নিরাময় করার মুজিযা আমাকে দান করেছেন। আমাকে ইঞ্জিল কিতাব দান করেছেন, আমাকে এবং আমার মাতাকে শয়তানের প্রভাব থেকে নিরাপদ রেখেছেন, আমাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং কাফিরদের সাহচর্য থেকে আমাকে পবিত্র রেখেছেন।"

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রশংসা

الحمد لله الذى ارسلنى رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وانزل على الفرقان فيه بيان لكل شيئ وجعل امتى خير امة اخرجت للناس وجعل امتى هم الاولين والاخرين وشرح لى صدرى ووضّع عنى وزرى ورفع لى ذكرى وجعلنى فاتحا وخاتما

"প্রশংসা সেই মহান পবিত্র সত্তার, যিনি আমাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত তথা অনুগ্রহ স্বরূপ প্রেরণ করেছেন এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়েছেন, আমার প্রতি পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন যাতে তিনি দীনের সমস্ত নির্দেশাবলী, বিস্তারিত অথবা ইঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। আমার উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বানিয়েছেন এবং আমার উম্মতকে প্রথম ও শেষ উম্মত অর্থাৎ প্রকাশে শেষ ও মর্যাদায় প্রথম বানিয়েছেন। আমার বক্ষ উন্মোচন করেছেন এবং আমার স্মরণকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। আর আমাকে সূচনাকারী ও সমাপ্তকারী অর্থাৎ মূল ও আত্মা সৃষ্টিতে প্রথম এবং দৈহিক প্রকাশে সর্বশেষ বানিয়েছেন।"

হযরত নবী (সা) আল্লাহর প্রশংসা ভাষণ থেকে অবসর হলেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আ) সমস্ত নবী (আ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন : بهذ افضكم محمد ﷺ অর্থাৎ মর্যাদা ও পরিপূর্ণতার কারণে মুহাম্মদ তোমাদের সবার চেয়ে অগ্রগামী।[১]

যখন তিনি এসব সমাপ্ত করে মসজিদ আকসা থেকে বের হলেন, তখন তাঁর সামনে তিনটি পেয়ালা উপস্থিত করা হলো।[২] একটি পানির, একটি দুধের এবং একটি শরাবের, তিনি দুধের পেয়ালা গ্রহণ করলেন। জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি স্বভাব ধর্ম বেছে নিলেন। যদি আপনি শরাবের পেয়ালা গ্রহণ করতেন তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত। আর যদি আপনি পানির পেয়ালা গ্রহণ করতেন তা হলে আপনার উম্মত নিমজ্জিত হয়ে যেত। কিছু কিছু রিওয়ায়াতে আছে—মধুর পেয়ালাও দেয়া হয়েছিল, তিনি তা থেকেও কিছু পান করেছিলেন।

মোটকথা, সমুদয় বর্ণনা একত্র করা হলে জানা যায় যে, চারটি পেয়ালা উপস্থিত করা হয়েছিল। বিস্তারিত জানার জন্য 'যারকানী' গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে।[৩]

আসমানে আরোহণ

এর পর নবী (সা) হযরত জিবরাঈল (আ) এবং অপরাপর ফিরিশতাগণের সঙ্গে আসমানের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। কিছু কিছু রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, নবী (সা) পূর্বের ন্যায় বুররাকে আরোহণ করেই আসমানে উঠতে থাকেন। আর কিছু রিওয়ায়াতে জানা যায়, মসজিদে আকসায় পৌঁছার পর জান্নাত থেকে মণিমুক্তা খচিত একটি সিঁড়ির মাধ্যমে তিনি আসমানে আরোহণ করেন। আর সিঁড়ির ডানে বামে আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাঁর সহগামী ছিলেন।

قال ابن اسحاق واخبرنى من لايتهم عن ابى سعيد قال سمعت رسول ﷺ يقول لما فرغت مما كان فى بيت المقدس اتى بالمعراج ولم ار شياء قط احسن منه وهو الذى يمد اليه ميتكم عليه اذا حضر فاصعدنى فيه صاحبى حتى انتهى بى الى باب من ابواب السماء يقال له باب الحفظة الحديث

"ইবন ইসহাক বলেন, বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলতেন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ (সা)

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৭৩।

২ কিছু কিছু রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, এ তিন পেয়ালা সিদরাতুল মুনতাহার পরে উপস্থিত করা হয়েছিল। হাফিয ইবন হাজার বলেন, আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, এ পেয়ালা দু'বার উপস্থিত করা হয়েছিল, একবার মসজিদে আকসায় নামায আদায় সমাপ্তের পর এবং দ্বিতীয়বার সিদরাতুল মুনতাহায়। আর দুধ গ্রহণের বিষয়টি সত্যায়নের জন্য অতিরিক্ত তাকিদ উদ্দেশ্য ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন। (যারকানী, ৬খ. পৃ. ৪৮)।

৩. যারকানী, ৬খ. পৃ. ৪৭।

কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যখন আমি বায়তুল মুকাদ্দাসের ক্রিয়াকর্ম সমাপ্ত করলাম, তখন একটি সিঁড়ি আনা হলো। আমি এর চেয়ে উত্তম সিঁড়ি আর কখনো দেখিনি। এটা ঐ সিঁড়ি ছিল, যা দ্বারা আদম সন্তানের আত্মাসমূহ আসমানে উঠে এবং মৃত্যুকালে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি ঐ দিকে চক্ষু তুলে দেখে। আমার পথের সাথী জিবরাঈল (আ) আমাকে ঐ সিঁড়িতে উঠান। এমনকি আমি আসমানের একটি দরজায় উপস্থিত হলাম, যাকে 'বাবুল হিফয' বলে। (হাফিয ইবন কাসীরকৃত আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১১০ এবং যারকানী প্রণীত শারহে মাওয়াহিব, ৬খ. পৃ. ৫৫)।

হাফিয ইবন কাছীর[১] বলেন, হযরত (সা) বায়তুল মুকাদ্দাসের কর্মব্যস্ততা থেকে অবসর হওয়ার পর ঐ সিঁড়ি দিয়ে আসমানে গমন করেন এবং বুররাক মসজিদুল আকসার দরজায় বাঁধা ছিল। নবী (সা) আসমান থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস ফিরে এসে অবতরণ করেন এরপর ঐ বুররাকে সওয়ার হয়ে মক্কা মুকাররামায় প্রত্যাবর্তন করেন (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১১০)। আর এটাও সম্ভব যে, নবী (সা) বুররাকে সওয়ার অবস্থায়[২] ঐ সিঁড়ির দ্বারা আসমানে আগমন করেন, যেমনটি কতিপয় আলিমের মতামত। এ অবস্থায় সমস্ত বর্ণনা একই রূপ হয়ে যায়। অধিকন্তু, এ অবস্থা নবী (সা)-এর অধিক সম্মান ও মাহাত্ম্যের অনুকূল। আল্লাহই ভাল জানেন।

আলমে মালাকূত সফর এবং আসমানসমূহে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সাথে সাক্ষাত

এভাবে তিনি প্রথম আসমানে উপনীত হন। জিবরাঈল (আ) দরজা খোলান। পৃথিবীর নিকটতম আসমানের দারোয়ান জিজ্ঞেস করেন, তোমার সাথে কে ? জিবরাঈল বললেন, মুহাম্মদ (সা)। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেন, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? জিবরাঈল বললেন, হ্যাঁ। ফেরেশতা তা শুনে স্বাগত জানান এবং দরজা খুলে দেন। তিনি আসমানে প্রবেশ করেন এবং একজন অত্যন্ত বুযুর্গ ব্যক্তির দেখা পান। জিবরাঈল (আ) বললেন, তিনি আপনার আদি পিতা আদম (আ), একে সালাম করুন। তিনি তাঁকে সালাম জানান। হযরত আদম (আ) সালামের জবাব দেন এবং বলেন : مرحبا بالابن الصالح والنبى للصالح "স্বাগতম, সৎ সন্তান ও সুশীল নবীর জন্য" এবং তিনি

---

১. আর এর ইবারত এরূপ ঃ والمقصود انه ﷺ لما فرغ من امر بيت المقدس نصب له المعريج وهو السلم فصعد فيه الى الماء ولم يكن الصعود - على البراق كما يتوهمه بعض الناس بل كان البراق مربوطا على باب مسجد بيت المقدس ليرجع عليه الى مكة তাফসীরে ইবন কাসীর, সূরা বানী ইসরাঈল, ৬খ. পৃ. ২৮-এ আছে ঃ ثم نزل الى البيت المقدس ثانيا وهم (اى انبياء) معه صلى بهم ثم انه ركب البراق وكر راجعا الى مكة والله اعلم বাক্যের শেষ পর্যন্ত।

২ আল্লামা নুমানী বলেন ঃ ما المانع من انه ﷺ رقى المعراج فوق ظهر البراق بظاهر الحديث (যারকানী, ৬খ. পৃ. ৩৩)।

তাঁর কল্যাণের জন্য দু'আ করেন। এ সময় তিনি দেখেন, হযরত আদম (আ)-এর ডানে কিছু আকৃতি এবং বামে কিছু আকৃতি। যখন তিনি ডানদিকে তাকান তখন আনন্দিত হন এবং হাসেন আর যখন বামদিকে তাকান, তখন কাঁদেন। হযরত জিবরাঈল বললেন, ডানদিকে তাঁর সৎ বংশধরদের আকৃতি। এরা দক্ষিণপন্থি ও জান্নাতী, এদেরকে দেখে তিনি আনন্দিত হন। আর বামদিকে খারাপ সন্তানদের আকৃতি আছে, এরা বামপন্থি এবং অগ্নিবাসী, এদের দেখে তিনি কাঁদেন। এ সমুদয় ঘটনা সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমের বর্ণনাসমূহে আছে। আর মুসনাদে বাযযারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে, হযরত আদম (আ)-এর ডানদিকে একটি দরজা আছে, যেদিক থেকে উত্তম সুগন্ধি আসে আর একটি দরজা বাঁদিকে আছে, যেদিক থেকে খুবই দুর্গন্ধ আসে। যখন তিনি ডানদিকে তাকান, তখন আনন্দিত হন আর যখন বাঁদিকে তাকান বিমর্ষ হয়ে পড়েন (যারকানী, ৬খ. পৃ. ৬০)।

এরপর দ্বিতীয় আসমানে গমন করেন এবং ঐভাবেই জিবরাঈল (আ) দরজা খোলান। সেখানে যে দারোয়ান ছিলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সাথে কে ? জিবরাঈল বললেন, মুহাম্মদ (সা)। ঐ ফেরেশতা বললেন, তাঁকে কি আহ্বান করা হয়েছে ? জিবরাঈল বললেন, হ্যাঁ। ফেরেশতা বললেন : مرحبا نعم المجئ جاء "স্বাগতম, কত উত্তম আগমন !" এখানে তিনি হযরত ইয়াহিয়া ও হযরত ঈসা (আ) কে দেখেন। জিবরাঈল (আ) বললেন, এঁরা ইয়াহিয়া এবং ঈসা (আ), এঁদের সালাম করুন। তিনি তাঁদের সালাম জানালেন। তাঁরা দু'জনই সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন : مرحبا بالاخ الصالح والنبى الصالح "সুশীল ভ্রাতা ও সৎ নবীর জন্য স্বাগতম।" এরপর তিনি তৃতীয় আসমানে আগমন করেন এবং জিবরাঈল আমীন একইভাবে দরজা খোলান। সেখানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হয় এবং তাঁর সাথে একইভাবে সালাম-কালাম হয়। তিনি বলেন যে, হযরত ইউসুফ (আ) কে লাবণ্য ও সৌন্দর্যের এক বিরাট অংশ দান করা হয়েছে। এরপর চতুর্থ আসমানে আগমন করেন, সেখানে হযরত ইদরীস (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। এরপর পঞ্চম আসমানে আগমন করেন এবং সেখানে হযরত হারূন (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। ষষ্ঠ আসমানে আসেন এবং সেখানে হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। আর সপ্তম আসমানে আগমন করেন। সেখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাত লাভ হয়। তিনি দেখেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) বায়তুল মামূরে পিঠ দিয়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন। বায়তুল মামূর ফেরেশতাদের কিবলা, যা ঠিক কাবাগৃহের বরাবরে অবস্থিত। মোট কথা যদি সেটি ভেঙ্গে পড়ে, তা হলে কাবাগৃহের উপরেই পড়বে। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা এ গৃহ তাওয়াফ করেন। একবার তাওয়াফের পর দ্বিতীয়বার তারা এ সুযোগ পান না। জিবরাঈল (আ) বললেন, তিনি আপনার পিতা, তাঁকে সালাম করুন। তিনি তাঁকে সালাম জানালেন। হযরত ইবরাহীম (আ) সালামের

জবাব দিলেন এবং বললেন : مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح "স্বাগতম, নেক পুত্র এবং নেক নবীকে।"

সিদরাতুল মুনতাহা

এরপর তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহায় উঠানো হলো, যা সপ্তম আসমানের উপরে একটি কুলবৃক্ষ। পৃথিবী থেকে যা কিছু উপরে উত্থিত হয়, তা সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়ে সমাপ্ত হয়। এরপর আরো উপরে উঠানো হয়। আর ফেরেশতাকুল থেকে যা অবতীর্ণ হয়, তাও সিদরাতুল মুনতাহায় এসে স্থির হয়। এরপর নীচে অবতীর্ণ হয়। এ জন্যে এর নাম সিদরাতুল মুনতাহা।[১]

এ স্থানে নবী (সা) জিবরাঈল আমীনকে তাঁর প্রকৃত চেহারায় দেখেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অদৃশ্যপূর্ব ও অভাবনীয় নূরের ঝলকানি প্রত্যক্ষ করেন। এছাড়া তিনি অসংখ্য ফেরেশতা, স্বর্ণ নির্মিত কীট-পতঙ্গ ও পাখি প্রত্যক্ষ করেন, যারা সিদরাতুল মুনতাহাকে ঘিরে রেখেছিল।

জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন

জান্নাত যেহেতু সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে : عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى এ জন্যে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসে এসেছে, বায়তুল মামুরে নামায আদায়ের পর নবী (সা) কে সিদরাতুল মুনতাহায় উঠানো হয় এবং সেখান থেকে জান্নাতে উঠানো হয়। আর জান্নাত পরিভ্রমণের পর তাঁর সামনে জাহান্নাম পেশ করা হয় অর্থাৎ দেখানো হয়।[২]

আর বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ যর (রা)-এর বর্ণনায় রয়েছে নবী (সা) বলেন, আমি সিদরাতুল মুনতাহায় উপস্থিত হলাম। সেখানে অভূতপূর্ব ও অভাবনীয় রং-বেরংয়ের কিছু জিনিস দেখলাম, আমার জানা নেই যে, ওগুলো কি ছিল। এরপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো। এর গম্বুজগুলো ছিল মোতির আর এর মাটি ছিল মিশকের ন্যায়।

সরীফুল আকলামের[৩] স্থান

এরপর তাঁকে আরো উপরে নেয়া হয়, এমনকি তিনি সরীফুল আকলামের আওয়াজ শুনতে পান। লিখার সময় কলম থেকে যে শব্দ সৃষ্টি হয়, একে সরীফুল আকলাম বলে। ঐ স্থানে ভাগ্য ও নিয়তি লিখায় কলমগুলো মশগুল ছিল। সেখানে

---

১. যারকানী, ৬খ. পৃ. ১৮।

২ খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৬৯।

৩. নবী (সা)-এর সরীফুল আকলামে উপস্থিতি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবন আব্বাস ও হযরত আবূ হুবায় আনসারী (রা) কর্তৃক বর্ণিত। আর বাকী সরীফুল আকলামের সূচনা যারকানী থেকে গৃহীত।

আল্লাহর অভিপ্রায় ও নির্দেশ লিখন এবং আল্লাহর বিধানসমূহ লাওহ মাহফূয থেকে নকল করা হচ্ছিল।[১]

সতর্ক বাণী : হাদীসসমূহ বিশ্লেষণে মনে হয়, সরীফুল আকলামের স্থান সিদরাতুল মুনতাহার পরে। কেননা সরীফুল আকলামের স্থান সিদরাতুল মুনতাহায় উত্থানের পর 'সুম্মা' (অতঃপর) দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকন্তু, সিদরাতুল মুনতাহাকে এজন্যে সিদরাতুল মুনতাহা বলা হয় যে, উপর থেকে যে সমস্ত নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, তার সর্বশেষ ঘাঁটি এটিই। এতে জানা গেল যে, সিদরাতুল মুনতাহার উপরে আরো কোন স্থান আছে, যেখান থেকে বিশ্বের পরিচালনার জন্য স্রষ্টার নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হয় আর সেই ঘাঁটিটিই হলো সরীফুল আকলাম। এটি যেন স্রষ্টার নির্দেশাবলী এবং বিধানের উপমাহীন ও তুলনাবিহীন কেন্দ্র ও প্রধান কার্যালয়। সিদরাতুল মুনতাহা এবং জান্নাত-জাহান্নামের পর নবী (সা) কে এ জায়গা পরিদর্শন করানো হয়। অধিকন্তু, হাদীসসমূহে নামায ফরয হওয়ার বিধান এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে নবী (সা)-এর কথপোকথনের বিবরণ সরীফুল আকলামের বর্ণনার পরে এসেছে। এর দ্বারাও জানা ও বুঝা যায় যে, সরীফুল আকলামের অবস্থান সিদরাতুল মুনতাহার পরে অবস্থিত। মহান পবিত্র আল্লাহ তা'আলাই সমধিক জ্ঞাত।

নৈকট্য ও সৌহার্দ্য, একান্তে প্রভার প্রকাশ, দর্শন, বাক্যালাপ ও বিধানাবলী প্রদান

সরীফুল আকলামের[২] স্থান থেকে পর্দাসমূহ অতিক্রম করে নবী (সা) মহাপ্রভুর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলেন। বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর বাহন হিসেবে একটি রফরফ (অর্থাৎ একটি সুসজ্জিত সবুজ সিংহাসন) আগমন করে এবং এতে সওয়ার

---

১. যারকানী, ৬খ. পৃ. ৮৮।

২. হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারী (৭খ. পৃ. ১৬৯) মিরাজ অধ্যায়ে লিখেন ঃ وقع فی غـيـر هذه الرواية زيادات راها ﷺ بعد سدرة المنتهى لم تذكر فی هذه الرواية منها ما تقدم فی الصلاة حتى ظهرت استوى اسمع فيه صريف الاقلام -এ বক্তব্য দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সরীফুল আকলামের অবস্থান সিদরাতুল মুনতাহার পরে। আল্লামা সাফারিনী বলেন ঃ لما وصل ﷺ سدرة المنتهى غشيته سحابة فيها من كل لون فتاخر جبريل ثم عرة بالنبى ﷺ حتى وصل لمستوى مع فيه صريف الاقلام فدنا من الحضرة الالهنيه كان قاب قوسين من ذلك كذا فی شرح عقيدة الصفارينية او ادنى اى اقرب اى بل اقرب (আল-আকীদাতুস সাফারিনীয়াহ, ২খ. পৃ. ২৭১); এ বর্ণনা দ্বারাও সরীফুল আকলামের অবস্থান সিদরাতুল মুনতাহার পরে হওয়া পরিষ্কার বুঝা যায়। হাফিয আসকালানী বলেন ঃ قال القرطبى وقيل تدلى الرفرف لمحمد ﷺ حتى جلس عليه ثم دنى محمدبن ربه (ফাতহুল বারী, ৩খ. পৃ. ৪০৩, তাওহীদ অধ্যায়; যারকানী, ৬খ. পৃ. ৯৭)। (উপকারিতা) কাযী ইয়ায কিতাবুশ-শিফায় বলেন, এ পবিত্র আয়াতে মহান পবিত্র আল্লাহর নৈকট্য ও সন্নিকটে উপস্থিতি এমন, যেমন হাদীসসমূহে মহান আল্লাহ শেষরাতে কোন উপমা-উদাহরণ ছাড়াই তাজাল্লী বিকীরণের উল্লেখ এসেছে। এর দ্বারা বুঝে নিন এবং আস্থাবান হোন। (নাসীমুর রিয়ায, ২খ. পৃ. ৩৩৬)।

হয়ে রাসূল (সা) মহাপ্রভুর পরম পবিত্র সান্নিধ্যে ও একান্ত নৈকট্যে এমনকি দুই ধনু পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা নিকটে উপস্থিত হন। আল্লামা কাযী ইয়ায (র) তাঁর 'আশ-শিফা' নামক কিতাবে বলেন :

وقال ابن عباس هواى قوله تعالى دنى فتدلى مقدم وموخر فاصله فتدلى فدنا ای فتدلی الرفرف لمحمد ﷺ ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع ودنا من ربه

"হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নৈকট্য ও সৌহার্দ্যের মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এরূপ যে, প্রথমে সৌহার্দ্য ও পরে নৈকট্য। এর অর্থ হলো, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বাহন হিসেবে মিরাজের রাতে একটি রফরফ[১] অবতীর্ণ হয়। তিনি এতে উপবেশন করেন অতঃপর তাঁকে উত্তোলন করা হয়। এমনকি স্বীয় প্রতিপালকের একান্ত নিকটে পৌঁছে যান।"[২]

وفتح لی باب من ابواب السماء فرايت النور الاعظر واذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت واوحى الله الى ماشاء ان يوحى

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে আছে ঃ আমার জন্য আসমানের একটি দরজা খোলা হল। আমি বিশাল নূর দেখলাম এবং পর্দার মধ্য দিয়ে মুক্তা নির্মিত একটি রফরফ (মসনদ)-ও দেখলাম। আর অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যে কথা বলার ইচ্ছা করেন, তা আমাকে ব্যক্ত করেন।[৩]

রাসূল (সা) যখন মহান প্রতিপালকের দরবারের নৈকট্য লাভে ধন্য হলেন, তখন দয়াময় রবের উদ্দেশ্যে সিজদা করলেন (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৫৯, মি'রাজ অধ্যায়)। আর আসমান-যমীনের নূরের ঝলক বৃহৎ পর্দার বাইরে থেকে প্রত্যক্ষ করেন এবং কোন মাধ্যম ছাড়াই মহান প্রতিপালকের সাথে কথা বলে এবং নির্দেশ লাভে ধন্য ও কৃতার্থ হন فاوحى الى عبده ما اوحى।

---

১. আল্লামা শিহাব খাফফাযী বলেন, রফরফ অর্থ বিছানা জাতীয় কিছু । অথবা সবুজ চাদর অথবা মখমলের বিছানা বিশেষ। আর কেউ কেউ বলেন, রফরফ এবং زربی مبثوثة একই বস্তু। আর এ বাক্যটি পবিত্র কুরআনেও এসেছে متكئين على رفرف خضر । (নাসীমুর রিয়াষ, ২খ. পৃ. ৩৩৪; অধিকন্তু যারকানী, ৬খ. পৃ. ৯৫ ও দেখে নিতে পারেন)। (সতর্ক বাণী) রফরফের উল্লেখ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং যঈফ এবং মুনকার হাদীসসমূহে এর উল্লেখ রয়েছে। কাজেই একে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনও বলা যাবে না। হাফিয আসকালানী বলেন, ইবন আবূ হাতিম... ইবন আয়েয... ইয়াযীদ ইবন আবূ মালিক...হযরত আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে ঃ ثم انطلق حتى انتهى ابى الى شجرة فغشيتنى سحابة من كل لون فتاخر جبريل وخررت ساجدا (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৬৯)। আর যারকানী বলেন : وفی رواية فرای ربه سبحانه فخر ﷺ ساجدا الحديث (যারকানী, ৬খ. পৃ. ১০৩)।

২ নাসীমুর রিয়াষ, ২খ. পৃ. ২৬৪।

৩. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৫৭।

اخرجه الطبرانى فى السنة والحكيم عن انس قال قال رسول الله ﷺ رايت النور الاعظم فاوحى الله الى ماشاء ان يوحى

"ইমাম তাবারানী এবং হাকিম তিরমিযী হযরত আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি নূরে আযম অর্থাৎ আল্লাহর নূরকে দেখেছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি যা ইচ্ছা, ওহী প্রেরণ করলেন। অর্থাৎ কোন মাধ্যম ছাড়াই তিনি আমার সাথে কথা বললেন।" [১]

হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর এ রিওয়ায়াত দ্বারা دنا تدلى এবং فاوحى الى عبده ما اوحى -এর তাফসীরও হয়ে যায় যে, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার এমন বিশেষ নৈকট্য এবং পরিপূর্ণতা বুঝায়, যাঁর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার নূরের সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দ লাভ এবং সেই সঙ্গে বিনা মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথন ও ওহীও বুঝা যায়। এ জন্যে যে, সাক্ষাতের পর অন্যের মাধ্যমে কথা বলা অর্থহীন বরং বিনা মাধ্যমে কথা বলা এবং তা বিনা মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করাই যুক্তিযুক্ত ও উচিত কর্ম।

মোটকথা, নবী করীম (সা) মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দর্শন এবং বিনা মাধ্যমে তাঁর সাথে কথা বলে ধন্য হন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে কথা বলেন এবং তাঁর জন্য ও তাঁর উম্মতের জন্য দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ধার্য করেন। সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে যে, ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তিনটি অনুগ্রহ দানে ধন্য করেন। ১. পাঁচ ওয়াক্ত নামায, ২. সূরা বাকারার শেষ কয়েক আয়াত, অর্থাৎ সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহের সারমর্ম দান করা হয়। যার মাধ্যমে এ উম্মতের প্রতি আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ অনুগ্রহ, আনন্দ ও দান, সংক্ষেপ ও আরামদায়ক ক্ষমা ও মার্জনা এবং কাফিরদের মুকাবিলায় বিজয় ও সাহায্যের বর্ণনা যা দু'আর আকারে এই উম্মতকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহের যে দু'আ তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা আমার কাছে প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের সমস্ত দু'আ এবং আবেদন মঞ্জুর করব।

ولو لم ترد نيل مانرجو ونبطله   من فيض جودك ما علمنا الطلبا

"যদি তোমার ইচ্ছা আমার দয়ার সাগর থেকে তোমাকে না দেয়াই উদ্দেশ্য হতো, তা হলে তো আমি তোমাকে চাওয়া ও প্রার্থনা করার শিক্ষাই দিতাম না।" অর্থাৎ আবেদনের ভাষাই শিখাতাম না।

তৃতীয়ত তাঁকে এ উপহার দেয়া হয়েছে যে, তাঁর উম্মতের মধ্যে যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত না করবে, আল্লাহ তা'আলা তার কবীরা গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। অর্থাৎ কবীরা গুনাহে লিপ্তদেরকে কাফিরদের মত সর্বকালের জন্য

---

১. দুররে মানসূর, ২খ. পৃ ১২৩।

জাহান্নামে রাখবেন না; বরং কাউকে নবী (আ)-গণের সুপারিশে মাফ করবেন আর কাউকে বা মর্যাদাপ্রাপ্ত ফিরিশতাগণের সুপারিশে আর কাউকে বা নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায়। যার অন্তরে একবিন্দু পরিমাণও ঈমান থাকবে, শেষ পর্যন্ত তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে নেয়া হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-এর প্রশংসা বাক্যের মধ্যে বলেন :

فقال له ربه قد اتخذتك خليلا وحبيبا وارسلتك الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك فلا اذكر الا ذكرت معى وجعلت امتك خير امة اخرجت للناس وجعلت امتك وسطا وجعلت امتك هم الاولين والاخرين وجعلت من امتك اقواما اما قلوبهم اناجيلهم وجعلتك اول النبيين خلقا واخرهم بعثا واعطيتك سبعا من المثانى لم اعطها نبيا قبلك واعطيتك خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم اعطها نبيا قبلك واعطيتك الكوثر واعطيتك ثمانية اسهم الاسلام والهجرة والجهاد والصلاة والصدقة وصوم رمضان والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وجعلتك فاتحا وخاتما الى اخر الحديث

"তাঁকে তাঁর প্রতিপালক বললেন, আমি আপনাকে আমার বন্ধু ও প্রিয়ভাজন বানিয়েছি এবং সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়ে প্রেরণ করেছি। আর আপনার বক্ষ উন্মোচন করেছি এবং আপনার ভার লাঘব করেছি। আর আপনার স্মরণ উচ্চতর করেছি, আমার একত্ববাদের সাথে সাথে আপনার রিসালত ও দাসত্বেরও উল্লেখ করা হয়। আপনার উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মধ্যবর্তী উম্মত, ন্যায় প্রতিষ্ঠকারী ও মধ্যস্থতাকারী করেছি। আভিজাত্য ও মর্যাদার দিক থেকে সর্ব প্রথম এবং প্রকাশ ও স্থিতির দিক থেকে সর্বশেষ করেছি। আর আপনার উম্মতের কিছু লোককে এমন সৃষ্টি করেছি যে, তাদের অন্তর ও বক্ষই ইনজিল হবে। অর্থাৎ তাদের অন্তর ও বক্ষেই আল্লাহর বাণী অঙ্কিত থাকবে। আপনাকে নূরের অস্তিত্ব ও আত্মার দিক থেকে নবীদের মধ্যে প্রথম এবং প্রেরণের দিক থেকে শেষ নবী করেছি। আর আপনাকে সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ দান করেছি যা আপনার পূর্বে কোন নবীকেই দান করা হয়নি। আর আপনাকে হাউযে কাউসার দান করেছি এবং আপনার উম্মতের জন্যই বিশেষভাবে আটটি জিনিস দান করেছি....ইসলাম এবং মুসলমান উপাধি, হিজরত, জিহাদ, নামায, সাদকা, রমযানের রোযা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ। আর আপনাকে উন্মোচনকারী ও সমাপ্তকারী করেছি। অর্থাৎ নবীদের মধ্যে সর্ব প্রথম ও সর্বশেষ বানিয়েছি" (হাদীসের শেষ পর্যন্ত)।

আল্লামা ইবন জারীর তাবারী সূরা বানী ইসরাঈলের তাফসীরে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে দীর্ঘ বর্ণনা সূত্রে, যেমনটি খাসাইসুল কুবরায় রয়েছে।[১]

وقال السيوطى فى الاية للكبرى فى شرح قصة الاسرا اخرجه الحاكم وغيره ورجاله موثقون الا ان ابا جعفر الرازى وثقه بعضهم وضعفه بعضهم وقال ابو زرعة يتهم وقا الحافظ ابن كثير الا ظهر انه سيئ الحفظ

"এবং আল্লামা সুয়ূতীও তাঁর খাসাইসুল কুবরায় সূরা বানী ইসরাঈলের তাফসীরে এটি বর্ণনা করেছেন। হাকিম প্রমুখও এটি বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য কেবল আবূ জাফর আল-রাযী ব্যতিত। তাঁকে কেউ কেউ নির্ভরযোগ্য এবং কেউ কেউ যঈফ বলেছেন। আবূ যু'রআ তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন। হাফিয ইবন কাসীর বলেন, তাঁর স্মরণশক্তিতে কোন দোষ প্রকাশ পায়নি।" (পৃ. ২৬)।[২]

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা এ নিকটবর্তী স্থানে নবী (সা) কে নানা ধরনের সৌভাগ্য ও সাহায্য দানে ধন্য করেন এবং নানা ধরনের সুসংবাদ দানে আনন্দিত করেন। আর বিশেষ বিশেষ বিধান ও নির্দেশ প্রদান করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছিল, তাঁর এবং তাঁর উম্মতের প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। নবী (সা) তো এ সমুদয় বিধান ও নির্দেশ নিয়ে আনন্দিত ও সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে আসছিলেন। ফেরার পথে প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাক্ষাত হলো। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ও নির্দেশাবলী কিংবা ফরয নামায ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই বলেন নি (ফাতহুল বারী, মি'রাজ অধ্যায়)।[৩] এরপরে তিনি মূসা (আ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার প্রতি কি নির্দেশ হয়েছে ? তিনি বললেন, দিন-রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মূসা (আ) বললেন, আমি বনী ইসরাঈলকে খুবই পরীক্ষা করেছি, আপনার উম্মত দুর্বল ও স্বল্প শক্তিসম্পন্ন, তারা এ ফরয পালন করতে পারবে না। এ জন্যে আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য সংক্ষেপ করার আবেদন করুন। নবী (সা) ফিরে গেলেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট কিছু কমানোর আবেদন জানালেন। আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। আবার তিনি মূসা (আ)-এর নিকটে এলেন, তিনি আবার একই কথা বললেন। তিনি পুনরায় গিয়ে কমানোর আবেদন করলেন। এভাবে কমানোর পর যখন কেবল পাঁচ ওয়াক্ত নামায অবশিষ্ট থাকল, তখনও মূসা (আ) একই পরামর্শ দিলেন যে, গিয়ে পুনরায় কমানোর আবেদন করা হোক। তখন তিনি বললেন, আমি বারবার আবেদন

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৭৫।

২ যারকানী, শারহে মাওয়াহিব, ৬খ. পৃ. ১০৩।

৩. قال الحافظ وفى هده الروايةّ من الزيادة فانصرفت سريعا فلم يقل شيأ ثم اتيت على موسى فقال ما صنعت (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৬৯)।

করেছি, এক্ষণে আল্লাহ তা'আলার নিকট যেতে লজ্জাবোধ করছি। তিনি মূসা (আ) কে এ জবাব দিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। তখন অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ ভেসে এল যে, এটা পাঁচ কিন্তু পঞ্চাশের সমান। অর্থাৎ সওয়াবের দিক থেকে পঞ্চাশের অনুরূপ, আমার কথার কোন পরিবর্তন হয়নি। আমার জ্ঞানে এটাই সাব্যস্ত ও নির্দিষ্ট করা ছিল যে, প্রকৃত ফরয পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই, আর পঞ্চাশ থেকে পাঁচ পর্যন্ত ধাপে ধাপে কমানো বিচক্ষণতা ও কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন চিকিৎসকের চিকিৎসার ধারাবাহিকতা ও ক্রমপর্যায় কৌশল ও বিচক্ষণতার উপর নির্ভরশীল। আর রোগী তার অজ্ঞতার কারণে একে পরিবর্তন ও পাল্টানো মনে করে। আল্লাহই ভাল জানেন।

এভাবে তিনি আসমান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে এসে অবতরণ করেন। আর এখান থেকে বুররাকে আরোহণ করে প্রভাত হওয়ার পূর্বেই মক্কা মুকাররামায় পৌঁছেন। সকাল হওয়ার পর তিনি এ ঘটনা কুরায়শদের সামনে বর্ণনা করেন। তারা এটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। কেউ আবার অবাক হয়ে মাথায় হাত রাখল, কেউ আবার হাততালি দিল এবং অবাক বিস্ময়ের সাথে বলতে লাগল যে, একই রাতে বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে ফিরে এল। ওদের মধ্যে যারা বায়তুল মুকাদ্দাস দেখেছিল, তারা পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের বিভিন্ন নিদর্শন জিজ্ঞেস করা শুরু করল। আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসকে তাঁর চোখের সামনে এনে দিলেন। কাফিররা প্রশ্ন শুরু করলে তিনি দেখতে থাকেন এবং তা দেখে দেখে তাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে থাকেন। এমনকি যখন কোন কিছু প্রশ্ন করার মত আর অবশিষ্ট থাকল না, তখন বলল আচ্ছা, তা হলে পথের কোন ঘটনা বর্ণনা কর। তিনি বললেন, পথে অমুক জায়গায় বাণিজ্য কাফেলার দেখা পাই যারা সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে ফিরে আসছে। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল, যা পরে পাওয়া গিয়েছে। ইনশা আল্লাহ, তিনদিন পর ঐ কাফেলা মক্কায় পৌঁছবে আর একটি মেটে বর্ণের উট ঐ কাফেলার অগ্রগামী হবে, যার পিঠে দু'টি বড় বোঝা থাকবে। সুতরাং তৃতীয় দিন এভাবেই ঐ কাফেলা মক্কায় প্রবেশ করল এবং উট হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাও বর্ণনা করল। ওলীদ ইবন মুগীরা এসব দেখে ও শুনে বলল, এটা জাদু; লোকেরা বলল, ওলীদ যথার্থই বলেছে।[১]

সূর্য স্থিতকরণ

বায়হাকীর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছিলেন যে, অমুক বাণিজ্য কাফেলা, যারা সিরিয়া থেকে ফিরছে, আগামী বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মক্কায় পৌছে যাবে। যখন বুধবার এসে গেল, আর কাফেলা মক্কায় পৌঁছল না, আর সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হলো, নবী (সা) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'আলা সূর্যকে

১. যারকানী, ৬খ. পৃ. ১২৬।

কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে দিলেন। এমনকি কাফেলা তাঁর সংবাদ অনুসারে ঐ দিন সন্ধ্যায় মক্কায় পৌঁছে গেল।[১] কোন কোন বর্ণনার দ্বারা জানা যায়, কাফেলা প্রত্যুষে মক্কা মুকাররামায় পৌছে। সম্ভবত দুটি কাফেলা ছিল, একটি ভোরে পৌঁছে, আর অপরটি সন্ধ্যায়। আর সম্ভবত এটাও হতে পারে যে, একই কাফেলার কিছু লোক প্রভাতে মক্কায় পৌঁছে এবং কিছু লোক সন্ধ্যায়। সীরাত বিশেষজ্ঞগণের নিকট এ ঘটনা সূর্য স্থিতকরণ নামে অভিহিত। শায়খ তকীউদ্দীন সুবকী (র) বলেন :

وشمس الضحى طاعتك عند مغيبها فما غربت بل وافصتكبوقفه

এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কথার সত্যতা প্রকাশ করলেন। আর কুরায়শগণ তাঁর সততা স্বচক্ষে অবলোকন করল একং স্বকর্ণে শ্রবণ করল কিন্তু নিজেদের মিথ্যা এবং ভ্রান্তির মধ্যেই নিমজ্জিত থাকল ও বিরোধিতায় মগ্ন থাকল। কিছু লোক হযরত আবূ বকরের কাছে এলো এবং বলল, তোমার দোস্ত অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) বলছে যে, আজ রাতে আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়েছিলাম এবং ভোর হওয়ার পূর্বে ফিরে এসেছি! তুমি কি এটাও বিশ্বাস করবে ? আবূ বকর প্রশ্ন করলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কি এ কথা বলেছেন ? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথা বলে থাকেন তা হলে সম্পূর্ণ সত্যই বলেছেন। আমি এটা সত্যায়ন করছি। আর আমি তো এর চেয়ে এগিয়ে তাঁর দেয়া আসমানী খবরও সকাল সন্ধ্যায় সত্য বলে আসছি। এ দিন থেকেই তাঁর উপাধি হলো সিদ্দীক বা চরম সত্যবাদী।[২]

সূক্ষ্মতা পরিচয় গোপন রহস্য ও নির্দেশ

১. আল্লাহ তা'আলা মি'রাজের এ ঘটনা 'সুবহানাল্লাযী' দ্বারা এজন্যে শুরু করেছেন যে, যাতে কোন অসূক্ষ্ম দৃষ্টি ও অন্ধ ধারণার অনুসারীর নিকট তা অবাস্তব ও অসম্ভব মনে না হয়। আল্লাহ তা'আলা সর্ব প্রকারের দুর্বলতা ও অক্ষমতা থেকে পাক ও পবিত্র। আমরা অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারীরা যদিও কোন বস্তুকে অসম্ভব ও বিস্ময়কর মনে করি কিন্তু আল্লাহর অসীম কুদরত ও ইচ্ছার সামনে তা মোটেও কষ্টসাধ্য নয়।

نه هر جائے مرکب تواں تاختن که جاها سپر باید انداختن

অধিকন্তু, এটা এদিকেই ইঙ্গিতবাহী যে, এ ঘটনা কোন সাধারণ ঘটনা নয়, বরং এক বিশাল মু'জিযা ও কারামত যা তিনি ছাড়া আর কেউ অর্জন করেননি।

আল্লাহ জাল্লা শানুহু স্বীয় পরিপূর্ণ ক্ষমতা দ্বারা নবী (সা) কে জাগ্রত অবস্থায় এ পবিত্র শরীরকেই আসমানসমূহ ভ্রমণ করান। সকল সাহাবয়ে কিরাম, তাবিঈ ও পূর্ববর্তী আলিমগণের এটাই বিশ্বাস যে, নবী (সা)-এর এ দেহেই এবং জাগ্রত অবস্থায়

১. প্রাগুক্ত।

২ খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৭৬।

মিরাজ সংঘটিত হয়। কেবল দু'তিনজন সাহাবী ও তাবিঈ থেকে বর্ণনা করা হয় যে, এ ভ্রমণ ছিল আত্মিক (রূহানী) অথবা কোন অত্যাশ্চর্যজনক স্বপ্ন। কিন্তু সত্য এটাই যে, ইসরা ও মিরাজের সমস্ত ঘটনা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় এবং এ শরীরেই সংঘটিত হয়েছে। যদি স্বপ্ন কিংবা কাশফ-এর মাধ্যমে সংঘটিত হতো, তবে মক্কার মুশরিকগণ এতটা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত না। আর বায়তুল মুকাদ্দাসের নিদর্শন সম্পর্কেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করত না। স্বপ্নযোগে দর্শনকারীকে না কেউ নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আর না কেউ ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। অধিকন্তু 'ইসরা' শব্দটি স্বপ্ন কিংবা কাশফের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না, বরং জাগ্রত অবস্থার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন হযরত লূত (আ)-এর ঘটনায় আছে :

قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل

এবং হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা বর্ণনায় আছে ঃ فاسر بعبادى ليلا

এ উভয় ঘটনায়ই 'ইসরা' দ্বারা রাত্রিকালে জাগ্রত অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার অর্থ নেয়া হয়েছে। অধিকন্তু যদি এ মি'রাজের ঘটনা কোন স্বপ্ন হতো, তা হলে এটা নবী (সা)-এর মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত হতো না। কেননা স্বপ্নে তো ইয়াহূদী-নাসারারাও আসমান, বেহেশত, দোযখ ভ্রমণ করতে পারে। অধিকন্তু, অন্যান্য নবীদের উপর আমাদের নবী (সা)-এর যে ফযীলত, এর কারণ বিশেষভাবে দুটি—পৃথিবীতে মি'রাজ এবং আখিরাতে শাফায়াত। আর কেবল স্বপ্ন এ বিরাট ফযীলতের কারণ হতে পারে না। আলিমগণ বলেন, নবী (সা)-এর এ দুটি ফযীলত, এ দুটি সম্পদ বিনয়ের দরুন অর্জিত হয়েছে। নবী (সা) আল্লাহর কাছে বিনীত হয়েছেন, ফলে মি'রাজের মর্যাদা লাভ করেছেন। আর সৃষ্টির সাথে বিনীত হওয়ায় তাদের শাফায়াতের অধিকার লাভ করেছেন।

২. এখানে আল্লাহ তা'আলা নবী (সা)-এর বান্দা হওয়ার শান বা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, নবী কিংবা রাসূল হওয়ার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ اَسْرى بِعَبْدِه বলেছেন, اَسْرى بِنَبِيِّه وَرَسُوْلِه বলেননি এ জন্যে যে, আল্লাহর দিকে ভ্রমণের জন্য বান্দাত্বের পরিচয়ই সমীচীন যে, বান্দা সবকিছু ছেড়ে স্বীয় প্রভুর সমীপে গমন করছে। আর নবূয়ত ও রিসালতের অর্থ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি আগমন করা। কাজেই নবূয়ত ও রিসালতের উল্লেখ ঐ স্থানে মানায় যেখানে আম্বিয়ায়ে কিরাম আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি আগমন করার বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلى فِرْعَوْنَ رَسُوْلاً

"আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি এক রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ, যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফিরাউনের নিকট।" (সূরা মুযযাম্মিল : ১৫)

এখানে اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ عَبْدَنَا (তোমাদের প্রতি আমার দাস প্রেরণ করেছিলাম) বলেন নি। কেননা এ স্থলে নবী (আ)গণ পৃথিবীতে প্রেরিত হওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন;

পৃথিবী ছেড়ে তাঁর নিকট যেতে বলার বর্ণনা করেন নি। মোটকথা, এ অবস্থা ছিল আল্লাহর দিকে ভ্রমণ ও আল্লাহর দিকে গমন করার। এ জন্যে এখানে 'বান্দা' শব্দ ব্যবহার করেছেন, নবী ও রাসূল শব্দ ব্যবহার করেননি। অধিকন্তু, 'দাস' শব্দ এ জন্যেও গ্রহণ করা হয়েছে যে, যাতে অসম্পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন খ্রিস্টানদের মত মহানবী (সা)-এর মি'রাজ এবং ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণের দরুন পাছে তাঁকে কেউ খোদা ভেবে না বসে।

ইমাম রাযী স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসেম সুলায়মান আনসারীকে বলতে শুনেছি যে, মি'রাজের রাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সা) কে প্রশ্ন করেন, কোন্ উপাধি এবং কোন্ গুণ আপনার নিকট সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বলেন, দাস-এর গুণ আর তোমার বান্দা হওয়া আমার নিকট বেশি প্রিয়। এ জন্যে যখন এ সূরা অবতীর্ণ হলো, তখন ঐ পসন্দনীয় উপাধিসহ অবতীর্ণ হয়।

৩. ইসরা অর্থ যদিও রাত্রিকালে নিয়ে যাওয়া, তবুও রাত্রি শব্দ দ্বারা অতিরিক্ত ব্যাখ্যা এ জন্যে করা হয়েছে যাকে 'লা নাফিয়াহ' অনির্দিষ্ট হওয়ার দরুন চিহ্নিত ও ন্যূনতমের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে রাতের কিছু এবং ন্যূনতম অংশে যমীন এবং আসমান পরিভ্রমণ করিয়ে দেন। আর রাতকে সুনির্দিষ্টভাবে এ জন্যে বলেছেন যে, রাত স্বভাবতই নির্জনতা ও একাকীত্বের সময়। এ সময়ে আহ্বান করা অতিরিক্ত নৈকট্য ও বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করার প্রমাণ। আর এ কারণেই পবিত্র কুরআন ও হাদীসসমূহে রাত্রিতে দণ্ডায়মান হওয়া (সালাত আদায় করা) এবং তাহাজ্জুদ আদায়ের কথা বিশেষভাবে এসেছে। যেমন :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ

"এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য।" (সূরা বানী ইসরাঈল : ৭৯)

اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً وَّاَقْوَمُ قِيْلاً

"অবশ্য রাত্রিকালে উঠা বড় কঠিন এবং বাক্যস্ফূরণে সঠিক।"
(সূরা মুযযাম্মিল : ৬)

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

"তারা রাত্রির সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করতো, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো।" (সূরা যারিয়াত : ১৭-১৮)

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا

"এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশে সিজদাবনত হয়ে এবং দণ্ডায়মান থেকে।" (সূরা ফুরকান : ৬৪)

অধিকন্তু, কুরআন করীমে নবী (সা)-এর উপাধি সিরাজাম মুনীর দেয়া হয়েছে। সিরাজাম মুনীর অর্থাৎ উজ্জ্বল প্রদীপ-এর জন্য রাতই উপযুক্ত ।

قلت يا سيدى فلم توثر   الليل على بهجة النهار

قال لا استطيع تغير رسمى   هكذا الرسم فى طلوع البدور

"আমি বললাম, হে আমার প্রিয়, আপনি ভ্রমণের জন্য রাতকে কেন দিনের উপর প্রাধান্য দেন যে রাতেই বের হন, দিনে বের হন না ? জবাবে তিনি বললেন, আমি আমার প্রথা ও অভ্যেস কখনই বদল করতে পারি না, পূর্ণিমার চাঁদের রেওয়াজই হলো রাত্রে উদিত হওয়া।"

৪. মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পেছনে সম্ভবত এই কৌশল ছিল যে, উভয় কিবলারই বরকতের নূর এবং বনী ইসরাঈলের নবী (আ)গণের মর্যাদা ও কামালিয়াত নবী (সা)-এর মাঝে সন্নিবেশ ঘটানো। আর সম্ভবত এদিকেও ইঙ্গিত ছিল যে, বানী ইসরাঈলের কিবলা শীঘ্রই বনী ইসমাঈলের কর্তৃত্বে ন্যস্ত হবে এবং উম্মতে মুহাম্মদী (সা) উভয় কিবলা অর্থাৎ খানায়ে কাবা ও মসজিদুল আকসার নূর ও বরকতের ধারক-বাহক হবে। আর নবী-রাসূলগণ ও সম্মানিত ফিরিশতাগণের নবী (সা)-এর ইমামতিতে নামায আদায় করা মহানবী (সা)-এর নেতৃত্ব ও সমস্ত নবীর ইমাম হওয়ার প্রকাশ্য দলীল প্রদর্শনের উদ্দেশেই ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারের নৈকট্যপ্রাপ্তগণ যাতে নিজেদের চোখে দেখে প্রিয় নবী (সা)-এর নেতৃত্ব এবং ইমামতের সাক্ষ্য হতে পারেন।

মাসআলা

সম্মানিত নবী (আ)গণ এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাগণ নবীজী (সা)-এর পেছনে নামায আদায় করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, সবাই নীরবে তাঁর কিরাআত শ্রবণ করেছেন, তাঁর পেছনে কেউ পাঠ করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। আর কুরআনুল করীমের মর্যাদাও এমনটিই যে, তা নীরবে শুনতে হয়।

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

"যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তা শ্রবণ কর এবং চুপ থাক যাতে তোমাদের উপর অনুগ্রহ করা হয়।" এখানে لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ-এ অনুগ্রহের ওয়াদা তো চুপ করে থাকা ব্যক্তির জন্যই। আর ইমামের সাথে কিরাআত পাঠকারীদের জন্য তো অনুগ্রহের ওয়াদা নেই। এজন্যে ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমামের পেছনে কিরাআত পাঠের প্রবক্তা নন।

৫. দৃশ্যত যে নামায নবী (সা) মসজিদে আকসায় পড়িয়েছেন, তা ছিল নফল নামায। তবে কেউ কেউ বলেন, এটা ফরয নামাযই ছিল, যা মি'রাজের পূর্বে তাঁর উপর ফরয ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।[১]

---

১. যারকানী, ৬খ. পৃ. ৫৪।

বিশুদ্ধ মত এটাই যে, তা ছিল নফল নামায, কেননা রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী (সা)-এর এ ভ্রমণ ইশা এবং ফজর সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে ছিল। তিনি (সা) ইশার সালাত আদায় করে আরাম করার জন্য বিছানায় শয়ন করেছিলেন, এমন সময়ে হযরত জিবরাঈল (আ) বুররাক নিয়ে আগমন করেন এবং ফজরের পূর্বেই মক্কা মুকাররমার আসমান থেকে অবতরণ করেন ও ফজরের নামায মক্কায় আদায় করেন যেমনটি ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৫১ তে ইসরা বিষয়ক হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, আম্বিয়া (আ) ও ফিরিশতাগণের যে নামায তিনি পড়িয়েছেন তা নফল ছিল, ফরয ছিল না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

৬. হযরত জিবরাঈল (আ)-এর দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে ঘরের ছাদ দিয়ে প্রবেশ করা ছিল তাঁর বক্ষ বিদারণের প্রতি ইঙ্গিতবাহী যে, এভাবেই তাঁর বক্ষ বিদারণ করা হবে এবং অনতিবিলম্বে তা সেলাই করে দেয়া হবে।

৭. ঈমান ও হিকমত যদিও ইহজগতের হিসাবে আন্দাজ-অনুমানের বিষয়; কিন্তু পরলোকে এসবকেও দেহধারী বানানো হবে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, কিয়ামতের দিন সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান দুটি মেঘখণ্ডের মত দৃশ্যমান হবে এবং তা পাঠকারীদের উপর ছায়াদান করবে, মৃত্যুকে মেষের আকৃতিতে আনা হবে ইত্যাদি। (বিস্তারিত জানার জন্য যুরকানী অধ্যয়ন করুন।)[১]

৮. বক্ষ বিদারণের রহস্য এবং নির্দেশ পুস্তকের প্রথমদিকে অতিক্রান্ত হয়েছে, সেখানে দেখে নিতে পারেন।

৯. আসমানে নির্দিষ্ট কয়েকজন বিশিষ্ট নবী (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় নির্ধারণ এক বিশেষ অবস্থার ইঙ্গিতবাহী ছিল, যে সব অবস্থা নবী (সা)-এর পরবর্তী জীবনে পর্যায়ক্রমে সামনে আসবে। যেমন স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী আলিমগণের ব্যাখ্যা এরূপ, যে নবী (আ) কে স্বপ্নে দেখা যায়, তাঁর জীবনের অবস্থা তার সামনে আসবে। প্রথম আসমানে তিনি হযরত আদম (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। যেহেতু তিনি ছিলেন প্রথম নবী এবং আদি পুরুষ, এ জন্যে সর্ব প্রথমে তাঁর সাথে সাক্ষাত করানো হয়েছে। আর এ সাক্ষাতে ইঙ্গিত ছিল হিজরতের প্রতি যে, হযরত আদম (আ) একটি শত্রুর কারণে আসমান এবং জান্নাত থেকে পৃথিবীতে হিজরত করেন, অনুরূপভাবে তিনিও মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করবেন। আর আদম (আ)-এর মতই প্রকৃত জন্মভূমি থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া প্রকৃতিগতভাবে দুঃখজনক হবে।

দ্বিতীয় আসমানে হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

أَنَا أَقْرَبُ النَّاسِ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ

---

১. প্রাগুক্ত, ৬খ. পৃ ২৮-৩০।

"সমস্ত নবী (আ)-এর মধ্যে আমি ঈসা (আ)-এর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। আমার এবং তাঁর মধ্যে কোন নবী নেই।"

অধিকন্তু, হযরত ঈসা (আ) শেষ যামানায় দাজ্জালের জন্য আসমান থেকে অবতরণ করবেন এবং উম্মতে মুহাম্মদীর একজন মুজাদ্দিদ হওয়ার কারণে মুহাম্মদী শরীআত প্রতিষ্ঠিত করবেন। আর কিয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আ) তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত অনুসারীসহ প্রিয় নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হবেন, মুখ্য শাফা'আতের আবেদন জানাবেন, এসব কারণে হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করানো হয়েছে। আর হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য কেবল নৈকট্যের কারণেই ছিল। হযরত ঈসা (আ) ও হযরত ইয়াহিয়া (আ) ছিলেন পরস্পর খালাতো ভাই। এ সাক্ষাতে ইঙ্গিত ছিল ইয়াহূদীদের দ্বারা প্রদত্ত কষ্ট ও আঘাত পৌঁছানোর প্রতি। কেননা ইয়াহূদীগণ তাঁকে উত্যক্ত করার জন্য উদ্যত হবে এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য নানা ধরনের কূট-কৌশল ও ছল-চাতুরী করতে থাকবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যেমনভাবে ঈসা (আ)-কে ইয়াহূদী-অইয়াহূদীদের দুশমনি থেকে নিরাপদ রেখেছেন, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকেও ওদের দুশমনি থেকে নিরাপদ রাখবেন।

তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। এ সাক্ষাতের দ্বারা ইঙ্গিত এদিকে ছিল যে, ইউসুফ (আ) যেমন তাঁর ভাইদের দ্বারা কষ্ট পেয়েছিলেন, নবী (সা)ও তেমনি নিজ ভাইদের দ্বারা কষ্ট পাবেন এবং শেষ পর্যন্ত বিজয় লাভ করবেন ও তাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করবেন। কাজেই মক্কা বিজয়ের দিন তিনি কুরায়শদেরকে ঐ বাক্যে সম্বোধন করেছেন, যে বাক্য দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদের সম্বোধন করেছিলেন। সুতরাং ইরশাদ করেছেন :

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ اِذْهَبُوْا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ اَىِ الْعُتَقَاءُ

"আজকের দিনে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন, তিনি আরহামুর রাহিমীন। যাও, তোমরা মুক্ত।"[1]

অধিকন্তু, উম্মতে মুহাম্মদী যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাদের চেহারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর অনুরূপ হবে।

আর হযরত ইদরীস (আ)-এর সাথে সাক্ষাতের দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত ছিল যে, তিনি (সা) বিভিন্ন রাজন্যবর্গের প্রতি ইসলামের দাওয়াতসহ পত্র প্রেরণ করবেন। কেননা পত্র ও লিখনীর প্রথম আবিষ্কারক ছিলেন হযরত ইদরীস (আ)। খোদ হযরত ইদরীস (আ)-এর প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا এসেছে। কাজেই তাঁর

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৬৩।

সাথে সাক্ষাতে ইশারা এদিকে ছিল যে, নবী (সা) কেও আল্লাহ তা'আলা উচ্চতর মর্যাদা, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন। সুতরাং যখন তিনি রোমের বাদশাহর প্রতি দাওয়াতনামা লিখেন, তখন রোম সম্রাট ভীত হয়ে পড়েন। যেমনটি সহীহ বুখারীতে আবূ সুফিয়ানের বক্তব্য ঃ

امر امر ابن ابى كبشة حتى يخافه ملك نبى الاصفر

আর হযরত হারূন (আ)-এর সাথে সাক্ষাতে এদিকে ইঙ্গিত ছিল যে, যেমনভাবে সামিরী ও গো-বৎস পূজারীরা হযরত হারূন (আ)-এর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছিল, যার পরিণতিতে আল্লাহ্র নির্দেশে ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, অনুরূপভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়ে আগত কুরায়শের সত্তর সর্দারকে বদর যুদ্ধে হত্যা করা হয় এবং সত্তরজনকে বন্দী করা হয়, আরনীনকে হত্যা করা হয় ধর্মত্যাগী হওয়ার কারণে।

আর হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাতে এদিকে ইঙ্গিত ছিল যে, হযরত মূসা (আ) যেমন সিরিয়ায় অত্যাচারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধের জন্য গিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান করেছিলেন, অনুরূপভাবে নবী (সা)ও জিহাদ ও যুদ্ধের জন্য সিরিয়ায় প্রবেশ করবেন। সুতরাং তিনি তাবূক যুদ্ধের উদ্দেশে সিরিয়ায় প্রবেশ করেন এবং দুমাতুল জন্দলের নেতা জিযিয়া প্রদান করে সন্ধির আবেদন জানান। তিনি (সা) তার আবেদন মঞ্জুর করেন। আর যেভাবে হযরত মূসা (আ)-এর পর সিরিয়া হযরত ইউশা (আ)-এর হাতে বিজিত হয়েছিল, একইভাবে নবী (সা)-এর পর হযরত উমর (রা)-এর হাতে সম্পূর্ণ সিরিয়া বিজিত হয় এবং ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয়লাভ করে।

আর সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। নবী (সা) দেখেন, হযরত ইবরাহীম (আ) বায়তুল মামূরে হেলান দিয়ে বসে আছেন। বায়তুল মামূর সপ্তম আসমানে অবস্থিত একটি মসজিদ, যা কাবাগৃহের বরাবর উপরে বিদ্যমান। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশতা এখানে হজ্জ ও তাওয়াফ করেন। যেহেতু হযরত ইবরাহীম (আ) কাবাগৃহের প্রতিষ্ঠাতা, সেহেতু তাঁকে এ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তাঁর সাথে এ অনন্য সাক্ষাতকার ছিল নবী (সা)-এর বিদায় হজ্জের প্রতি ইঙ্গিতবাহী যে, রাসূল (সা) ওফাতের পূর্বে বায়তুল্লাহর হজ্জ আদায় করবেন। আর স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী আলিম-গণের নিকট স্বপ্নে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দেখা হজ্জ করার সুসংবাদ স্বরূপ।

এ রহস্য ও নির্দেশনা ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৬২; রাউযুল উনুফ, ১খ. পৃ. ২৫০ এবং যারকানীর শারহে মাওয়াহিব, ৬খ. পৃ. ৬৭-৭২ থেকে নেয়া হয়েছে। শ্রদ্ধেয় জ্ঞানান্বেষীগণ ! মূলের প্রতি ফিরে আসুন। ইবন মুনীর বলেন, এ পর্যন্ত সাতটি মি'রাজ হল। অষ্টম মি'রাজ হয় সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত। এতে মক্কা বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল, যা অষ্টম হিজরীতে বিজিত হয়। নবম মি'রাজ হয় সিদরাতুল মুনতাহা থেকে সরীফুল আকলাম পর্যন্ত। এ মি'রাজে তাবূক যুদ্ধের প্রতি ইশারা ছিল, যা নবম

হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। আর দশম মি'রাজ রফরফ এবং নৈকট্য এবং চরম নৈকট্য পর্যন্ত ছিল, যেখানে আল্লাহ তা'আলার দর্শন এবং বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছিল। দশম মি'রাজে যেহেতু আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ হয়েছিল, সেহেতু তা এদিকে ইঙ্গিতবাহী ছিল যে, হিজরী দশম বর্ষে নবী (সা)-এর ওফাত হবে এবং সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর দর্শন লাভ হবে। আর তিনি এ পার্থিব আবাস ত্যাগ করে পরম বন্ধুর সাথে মিলিত হবেন। যেমনটি হাফিয সুয়ূতী প্রণীত আর রিসালার পৃ. ৪৫, মি'রাজের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে।

১০. হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা নবী (আ)গণের দেহকে যমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। যমীন তাঁদের দেহ হজম করতে পারে না। এ জন্যে নবী (আ)-গণের পবিত্র দেহের নির্দিষ্ট আবাস তাঁদের কবরসমূহ। রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক আম্বিয়ায়ে কিরামকে বায়তুল মুকাদ্দাসে এবং আসমানসমূহে দেখার দ্বারা হয়তো তাঁদের রূহসমূহকে দেখা বুঝানো হয়েছে, অথবা পূর্ণাঙ্গ দেহসহ সাক্ষাতও বুঝানো উদ্দেশ্য হতে পারে যে, মহানবী (সা)-এর সম্মান ও মর্যাদার কারণে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে সশরীরে মসজিদে আকসায় এবং আসমানসমূহে আহ্বান করা হয়েছিল। যেমন পবিত্র কুরআনে আছে : وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ "আর আল্লাহ তা'আলা এ কাজে মোটেই অক্ষম নন।"

আর কতিপয় আলিমের মত হলো, তাঁদের আসল দেহ কবরেই ছিল; বরং আল্লাহ তা'আলা নতুন দেহ তৈরি করে সে দেহেই নবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য তাদের একত্রিত করেন। অবশ্য হযরত ঈসা (আ)-কে আসমানে প্রকৃত দেহ সহই দেখেছেন। কেননা তাঁকে প্রকৃত দেহ সহই আসমানে উত্তোলন করা হয়েছে। একইভাবে হযরত ইদরীস (আ)-কেও তাঁর প্রকৃত দেহের সাথেই দেখেছেন। কেননা তাঁকেও জীবিত তুলে নেয়া হয়েছে।[১]

১১. ঐ রাতেই তাঁর এবং তাঁর উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়। তিনি (সা) 'শুনলাম ও আনুগত্য করলাম' বলে রওয়ানা হন। প্রত্যাবর্তনকালে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়, কিন্তু তিনি কিছুই বলেননি। এরপর হযরত মূসা (আ) কে অতিক্রম করেন। তিনি এ ফরয সংক্ষিপ্ত করিয়ে নেয়ার পরামর্শ দেন। কারণ ছিল এই যে, ভালবাসার মাকাম হচ্ছে সম্মতি ও সন্তুষ্টির মাকাম, উৎসর্গের মাকাম। আর বাক্যালাপের মাকাম হলো গর্বিতের মাকাম। এ জন্যে হযরত খলীলুল্লাহ (আ) নিশ্চুপ ছিলেন। আর হযরত কালীমুল্লাহ (আ) সংক্ষেপকরণের পরামর্শ দেন। খলীলুল্লাহ (আল্লাহর বন্ধু) চুপ থাকেন আর কালীমুল্লাহ (আল্লাহর সাথে বাক্যালাপকারী) কথা বলেন।

১২. হযরত মূসা (আ) এর পরামর্শের ভিত্তিতে হুযূর (সা) বারবার সংক্ষেপকরণের আবেদন জানাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায অবশিষ্ট থাকলো,

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ.১৬২; যারকানী, ৬খ. পৃ. ৭২-৭৩।

তখন নবী (সা) বললেন, আমার লজ্জা করছে। লজ্জার কারণ এটাই ছিল যে, তিনি এর পূর্বে নয়বার সংক্ষেপকরণের আবেদন করতে গিয়ে দেখেন যে, প্রত্যেকবার পাঁচ ওয়াক্ত নামায কমে যায়, কাজেই যখন কমতে কমতে কেবল পাঁচ ওয়াক্তই অবশিষ্ট থাকলো, তখন যদি এর পরও সংক্ষেপকরণের আবেদন করা হয়, তা হলে এ আবেদনের অর্থ এই হবে যে, এ পাঁচ ওয়াক্তও প্রত্যাহার করে নেয়া হবে এবং ফরযের এমন কোন অংশ অবশিষ্ট থাকবে না যা অবশ্য পালনীয়ের উদাহরণ হতে পারে। এ কারণে রাসূল (সা) লজ্জাবোধ করেন এবং পুনরায় যেতে অস্বীকার করেন।

১৩. আসমানে আরোহণের পূর্বে নবী (সা)-এর বক্ষ বিদারণ করা হয়েছে, যমযমের পানিতে তা ধৌত করা হয়েছে এবং এতে ঈমান ও প্রজ্ঞা ভরে দিয়ে সেলাই করে দেয়া হয়েছে, যাতে করে এ পরম ও চূড়ান্ত পবিত্রতার পর সর্বোত্তম ইবাদত ফরয হওয়ার নির্দেশ দেয়া যায়।

১৪. আসমানী সফরে তিনি আল্লাহর ফেরেশতাগণকে বিভিন্ন ইবাদতে নিমগ্ন দেখতে পান। কিছু সংখ্যক কিয়ামের অবস্থায় হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন, কতিপয় রুকূ অরস্থায় রয়েছেন এবং কখনই মাথা উত্তোলন করেন না, কিছু সংখ্যক সর্বদাই সিজদারত অবস্থায় আছেন, আর কিছু সংখ্যক সব সময় বসা অবস্থায়ই রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এ সমুদয় শর্ত নামাযের একই রাকাআতে একত্র করে দেন, যাতে করে উম্মতের ইবাদত সমস্ত ফিরিশতার ইবাদতের সমষ্টি ও সার-সংক্ষেপে পরিণত হয়।[1]

পবিত্র কুরআনে রয়েছে যে, প্রত্যেক বস্তু সব সময়ই আল্লাহর তাসবীহ ও প্রশংসায় নিয়োজিত রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন :

وَاِنْ مِنْ شَيْئٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لاَيَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ

"আর প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারো না।" (সূরা বানী ইসরাঈল : ৪৪)

বিশ্বের কোন একটি মুহূর্তও আল্লাহর প্রশংসা ছাড়া অতিক্রান্ত হয় না, আর প্রকাশ থাকে যে, বিশ্বের সবার তাসবীহ একইরূপ নয়, বরং তা বিভিন্ন প্রকারের। বৃক্ষ এবং লতা-গুল্মের তাসবীহ সব সময় কিয়াম অবস্থায় হয়ে থাকে, পশু এবং চতুষ্পদ জন্তুর তাসবীহ সব সময় রুকূ অবস্থায় হয়ে থাকে, পোকা-মাকড়ের তাসবীহ সব সময় সিজদার অবস্থায় হয়ে থাকে, সদা-সর্বদা তাদের ললাট যমীনের সাথে লেগে থাকে এবং পাথর ও শীলাখণ্ডের তাসবীহ সব সময় বসা অবস্থায় হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নামাযে প্রশংসা এবং তাসবীহের সমস্ত প্রকারকে একত্রিত করে দিয়েছেন।

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৬৮।

অধিকন্তু, মানুষ মূল উপাদান চতুষ্টয়ের সমষ্টি, এ জন্যে তার ইবাদতও কিয়াম, বৈঠক, রুকূ ও সিজদা এ শর্ত চতুষ্টয়ের সমষ্টি করা হয়েছে। আর যেহেতু আল্লাহর ব্যাপারে ঔদাসীন্যের কারণ পাঁচটি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পাঁচটি, এ জন্যে একদিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে।

১৫. মি'রাজের রাত্রিতে মহানবী (সা) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দর্শন লাভে ধন্য হয়েছেন কিনা, এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যদি দর্শন লাভ করেই থাকেন, তবে তা কি চাক্ষুস দর্শন ছিল, নাকি আত্মিক দর্শন অর্থাৎ কপালের চোখ দিয়ে দেখেছেন, নাকি অন্তরের চোখ দিয়ে। আর মানস চক্ষু দিয়ে দেখা ভিন্ন জিনিস এবং চর্ম চক্ষু দিয়ে দেখা ভিন্ন জিনিস। প্রসিদ্ধ সাহাবা এবং তাবিঈগণের অভিমত হলো তিনি (সা) চর্ম চক্ষু দিয়েই মহান পরওয়ারদিগারের দর্শন লাভ করেছেন। আর হকপন্থী আলিমগণের নিকট এ বক্তব্যই প্রসিদ্ধ এবং সত্য। এ জন্যে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, স্বয়ং নবী (সা)-কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন ? তিনি বলেন হ্যাঁ, আমি শবে মি'রাজে আমার প্রভুকে দেখেছি।

اخرج احمد بسند صحيح عن ابن عباس قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ رَاَيْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ

"মুসনাদে আহমদে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন : আমি আমার সর্বশক্তিমান প্রভুকে দেখেছি।"[১]

واخرج الطبرانى فى السنة والحكيم عن انس قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ رَاَيْتُ النُّوْرَ الْاَعْظَمَ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَىَّ مَاشَاءَ

"তাবারানী তাঁর 'সুন্নাহ' গ্রন্থে এবং হাকিম হযরত আনাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আমি বিশাল নূর দেখেছি, এর পর আল্লাহ আমার প্রতি যা ইচ্ছা ওহী করলেন।"[২]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে এক মারফূ রিওয়ায়াতে[৩] জানা যায় যে, শবে

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ.১৬১।

২. তাফসীরে দুররে মানসূর, ৬খ. পৃ.১২৩।

৩. পূর্ণ বর্ণনাটি এরূপ : اخرج ابن جرير عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ رَأَيْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ باحْسنِ صُوْرَةَ الى ان كان قال ما كنت الفواد ما راى فجعل نور بصرى فؤادىَ فنظرت اليه بفوادى التهى "ইবন জারীর হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আমার সর্বশক্তিমান প্রভুকে উত্তম সূরতে দেখেছি।" (তাফসীরে দুররে মানসূর, ৬খ. পৃ.১২৪)।

মি'রাজে তাঁর চাক্ষুস ও আত্মিক উভয় প্রকার দর্শনই লাভ হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পরিপূর্ণ কুদরতের দ্বারা চোখের আবরণকে দর্শনীয় নূরের মধ্যে এভাবে মিশ্রিত করে দেন যে, নবী (সা)-এর চাক্ষুস দর্শন এবং রূহানী দর্শনের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।

کلام سرمدی بے نقل بشنید　　خداوند جہاں رابے جہت دید

وراں دیدن کہ حیرت حاملش بود　　دلش در چشم وچسمش در دلش بود

"চিরন্তনী বাক্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না, আল্লাহর ইচ্ছায় বিশ্বের কেউ কোন মাধ্যম ছাড়াই তাঁকে দেখতে পায়। যদিও এ দেখা আশ্চর্যজনক, তবুও চোখ তাঁর অন্তরে এবং অন্তর তাঁর চোখে পরিণত হয়েছিল।"

হযরত নিযামী (র) বলেন :

کلامیکہ بے الہ امد شنید　　لقائے کہ آں دیدنی بود دید

چنانچہ دیدکز حضرت ذوالجلال　　نہ زانسوجہت بد نہ زیں سو خیال

"যে কথা মাধ্যম ছাড়া শ্রুত হয়, সে সাক্ষাতে যা দেখার, তিনি তা দেখলেন। হযরত (সা) যুল-জালাল (আল্লাহ তা'আলা)-কে এমনভাবে দেখলেন যে, এর কোন দিকও ছিল না, আর তা কল্পনায়ও ছিল না।"

হযরত জামী (র) বলেন :

بدید انچہ از دیدن برون بود　　مپرس از ماز کیفیت کہ چون بود

نہ چندی وگنجد آنجا و نہ چونی　　فروبند از کمی لب وزفزونی

شنید انگہ کلامے نہ باواز　　معانی در معانی راز با راز

نہ آگاہی از وکام وزباں را　　نہ ہمراہی از ونطق وبیاں را

"তিনি দেখলেন, যা ছিল দর্শনের বাইরে; সেই দেখার ধরন কি ছিল,আমার কাছে জিজ্ঞেস কর না। সেখানে 'কি' বা 'কতক্ষণ' কিংবা 'কেমন' এর অবকাশ ছিল না, 'স্বল্পতা' এবং 'আধিক্য' নিয়ে কথা বলা বন্ধ কর, তখন একটা কথা শুনলেন তবে আওয়াজ সহকারে নয়; তা ছিল অর্থের মধ্যে অর্থ, রহস্যের মধ্যে রহস্য। মুখ বা রসনা জানে না এর স্বরূপ, ভাষা বা বর্ণনার সাধ্য নেই তা বর্ণনা করার।"

হাফিয তুরবশতী তাঁর 'আল-মুতামিদ ফিল-মুতাকিদ' গ্রন্থে লিখেন যে, আত্মিকভাবে দেখা অর্থাৎ রূহানী দর্শনের অর্থ কেবল জানা বা ধারণা করাই নয়, কেননা এটা তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পূর্ব থেকেই অর্জিত হয়েছিল। বরং এর ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা)-এর অন্তরে এভাবে দর্শন দেন, যেমনটি দর্শন কপালের চোখ দিয়ে দেখার মাধ্যমে অর্জিত হয়। অথবা এর অর্থ এই যে, চোখ অন্তরের সাহায্যে এবং অন্তর চোখের আনুকূল্য এবং সম্মিলিতভাবে দর্শনের সৌভাগ্যে ধন্য হয়েছেন।

দর্শনের সময় চোখ অন্তরের সাথে এবং অন্তর চোখের সাথে ছিল, একে অপর থেকে পৃথক ছিল না। মোটামুটি কথা এটুকুই, আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

বিধর্মীদের আপত্তি ও এর জবাব

বিধর্মীগণ হুযূর (সা)-এর সশরীরে মি'রাজ গমনের ব্যাপারে যে আপত্তি করেছে, সামষ্টিকভাবে তা হলো এই যে, প্রাচীন দর্শনমতে আসমান ছিন্ন ও ছিদ্র করা অসম্ভব বলা হয়েছে, আর আধুনিক দর্শনে তো আসমানের অস্তিত্বই অস্বীকার করা হয়েছে। কাজেই আসমানের অস্তিত্বই যেখানে প্রমাণিত নয়, সেখানে দৈহিকভাবে মি'রাজের প্রমাণ করা কিভাবে সম্ভব হবে ? অধিকন্তু, নব্য ও প্রাচীন উভয় দর্শনই এ বিষয়ে একমত যে, পৃথিবীর কিছুটা উপরে শৈত্যস্তর রয়েছে এবং প্রাচীন দার্শনিকদের মতে রয়েছে অগ্নিস্তর, আর এ দু'স্তর ভেদ করে কোন শারীরী জীবদেহের পক্ষে নিরাপদ, সুস্থ জীবিতাবস্থায় ঐ দূরত্ব অতিক্রম করা অসম্ভব। কাজেই আসমানে উত্থানও অসম্ভব হবে। আর কেউ কেউ বলেন, স্থূল দেহের পক্ষে এত উঁচুতে এত দ্রুত ভ্রমণ করাও জ্ঞানত অসম্ভব।

জবাব

এ সবই তাদের কল্পনা ও খেয়াল; বাস্তবে কোন বিষয়ই অসম্ভব নয়। هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ - انْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ যে ব্যক্তি এ সমস্ত বিষয়কে অসম্ভব মনে করে, সে তার দাবিতে সত্যবাদী হলে যেন প্রমাণ পেশ করে।

১. সকল নবী (আ) এবং সমস্ত আসমানী কিতাব এ ব্যাপারে একমত যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং আসমান টুকরা টুকরা হয়ে ফেটে পড়বে। اذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ اذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ "যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।" (সূরা ইনফিতার : ১, সূরা ইনশিকাক ১) আর নবী (আ)গণের পক্ষে কোন অসম্ভব বিষয় সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে একমত হওয়া সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অসম্ভব। অধিকন্তু, প্রাচীন দার্শনিকগণের মতে গ্রহের উপরিস্তর ছিন্ন করার যে প্রশ্ন রয়েছে, সম্মানিত মুতাকাল্লিমগণ এর পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন।

২. বাকি রইল নব্য দার্শনিকদের আসমানের অস্তিত্ব অস্বীকার করার প্রশ্ন। এটা কিন্তু মহাশূন্য অনুভবের প্রমাণ হতে পারে না। সমস্ত বিজ্ঞ পণ্ডিত এ ব্যাপারে একমত যে, কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর না হওয়াটা এর অস্তিত্বহীনতার প্রমাণ নয়। অন্যথায় আসমান-যমীনের অজস্র বস্তু অস্বীকার করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়বে, যে সব বস্তু আমাদের দৃষ্টি এবং জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে গোপন এবং লুক্কায়িত। খোদ পণ্ডিতবর্গ এ ব্যাপারেও একমত যে, কারো অজ্ঞতা-মূর্খতা অপরের জন্য প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে না।

৩. আজকাল নতুন নতুন ধরনের নানা প্রকার যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হচ্ছে যা দ্বারা কোন বস্তুকে বাইরের উষ্ণতা ও শীতলতার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখা সম্ভব।

আর আল্লাহ তা'আলার কুদরত তো এর চেয়ে অনেক উচ্চ ও উন্নত পর্যায়ের। কাজেই তুচ্ছ মাটি আর মহাশূন্যের সাথে রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'আলার তুলনা কোথায় ? সরকারি বাগানে এমন বৃক্ষও বিদ্যমান, যার গোড়ায় পানির পরিবর্তে আগুন জ্বালানো হয়। এ বৃক্ষ আগুনের উষ্ণতায় সবুজ শ্যামল থাকে। যদি আগুনের উষ্ণতা কমে যায়, তা হলে শুকিয়ে যায়। সমুদ্রের এক প্রকার কীট আগুনে জন্মলাভ করে। এটা আগুনে জ্বলেও যায় না, মরেও না; বরং আগুনই তার জন্য জীবনীশক্তি এবং আগুন থেকে পৃথক হওয়াটা তার জন্য মৃত্যুর কারণ।

৪. সহস্র মণ ওজনের উড়োজাহাজের আসমানে উড্ডয়ন এবং ঘন্টায় হাজারো মাইল পরিভ্রমণ সমস্ত দুনিয়ার সামনে বিদ্যমান, কাজেই মাত্র একজন মানুষের উর্ধ্বে আরোহণ এবং ভ্রমণের ব্যাপারে কেন তারা মাথা ব্যথা ও অস্বস্তিতে ভোগেন !

৫. আজকাল এমন লিফটও আবিষ্কৃত হয়েছে যে, বিদ্যুতের একটি সুইচ টিপলেই মিনিটের মধ্যে শত মনযিলের শেষ বালাখানায় নিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা কি এ ধরনের একটি সিঁড়ি বা লিফট বানাতেও অক্ষম, যা তাঁর কোন খাস বান্দাকে যমীন থেকে মিনিটের মধ্যে আসমানে পৌঁছে দিতে পারে ?

৬. বিশিষ্ট আবিষ্কারকদের পক্ষ থেকে একের পর এক ঘোষণা আসছে যে, বিজ্ঞান ও দর্শনের মাধ্যমে আজ অবধি যা আবিষ্কৃত হয়েছে, তা নিতান্তই সামান্য। ভবিষ্যতে যা আবিষ্কার করার আশা করা যায়, তা এসব থেকে কয়েক হাজার গুণ বেশি। এমনকি এ পর্যন্ত ঘোষণা আসছে যে, অদূর ভবিষ্যতে আমরা গ্রহ-নক্ষত্রে পৌঁছে যাব।

আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে যে, আমাদের সংস্কৃতিবান ভ্রাতৃবর্গ, যারা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রাহক ও খরিদ্দার, তারা এ খবরগুলো খুবই আনন্দের সাথে শোনেন এবং শোনান। কিন্তু যখন উম্মী নবী (সা)-এর মি'রাজের খবর শোনেন, তখন রকম রকম সন্দেহ এবং কুমন্ত্রণা তাদের সামনে এসে যায়। ইউরোপের ওহীকে তারা বিনা বিচার-বিবেচনায় গ্রহণ করেন, কিন্তু আল্লাহর ওহীর মধ্যে সন্দেহ পোষণ করেন ও সন্দেহের সৃষ্টি করেন !

৭. ইয়াহূদীদের নিকট হযরত ইলইয়া (আ)-এর এ নশ্বর দেহ সহ জীবিত আসমানে উঠে যাওয়া এবং খ্রিস্টানদের নিকট হযরত ঈসা (আ)-এর জীবিত আসমানে উঠে যাওয়া এবং শেষ যামানায় আসমান থেকে অবতরণ স্বীকৃত বিষয়। অনুরূপভাবে হযরত নবী করীম (সা)-এর মুবারক দেহ নিয়ে আসমানে আরোহণ এবং অবতরণ কুরআন-হাদীস, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। যদি আসমানে গমন জ্ঞানত অসম্ভব হতো, তবে সাহাবা এবং তাবিঈগণ কখনই এ ব্যাপারে একমত হতেন না।

হজ্জের মওসুমে ইসলামের দাওয়াত

যখন তিনি দেখলেন যে, কুরায়শগণ তাদের সেই শত্রুতায় নিমজ্জিত রয়েছে। কাজেই যখন হজ্জের মওসুম আসে এবং দূর প্রান্ত থেকে লোকজন আগমন করে, তখন তিনি নিজেই তাদের অবস্থানস্থলে চলে যেতেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিতেন, সত্য দীনকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানাতেন। তিনি তো মানুষকে তাওহীদ-একত্ববাদ, সত্য ও নিষ্ঠার প্রতি আহ্বান জানাতেন, আর তাঁর চাচা আবূ লাহাব, যার নাম ছিল আবদুল উযযা ইবন আবদুল মুত্তালিব, সে নিজের সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে নবী (সা)-এর পিছে পিছে বলে ফিরত যে, হে লোক সকল ! দেখ, এ ব্যক্তি তোমাদেরকে লাত-উযযা থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায় এবং নব আবিষ্কার ও ভ্রষ্টতার প্রতি তোমাদেরকে আহ্বান করে। তোমরা কখনই এর অনুসরণ করবে না।

মোটকথা, তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট ইসলামকে পেশ করেন এবং ইসলামকে সাহায্য-সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। এতে কেউ নম্রভাবে জবাব দেয় আর কেউবা শক্ত এবং রূঢ়ভাবে। কেউ কেউ বলল, আমরা এ শর্তে আপনার সাহায্য-সহযোগিতা করব যে, যদি আপনি জয়লাভ করেন তা হলে আমাদেরকে আপনার খলীফা বানাবেন। তিনি বললেন, এটা আমার এখতিয়ারে নয়; বরং আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন বানাবেন। ঐ লোকগুলো বলল, ভাল কথা! আমরা আপনার সঙ্গী হয়ে নিজেদের গর্দান কাটাব, নিজেদের বক্ষকে আরবদের তীরের নিশানা বানাব, আর যখন আপনি সফলকাম হবেন তখন অন্য কেউ আপনার খলীফা ও উত্তরাধিকারী হবে।[১] বনী যাবল ইবন শায়বান সম্প্রদায়ের কাছে তিনি গেলেন, হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা) তাঁর সঙ্গী ছিলেন। মাফরুক ইবন উমর এবং হানী ইবন কাবীসা ঐ সম্প্রদায়ের সর্দারদের মধ্যে ছিল। হযরত আবূ বকর (রা) মাফরুককে সম্বোধন করে বললেন, তোমার কাছে কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবূয়াত ও রিসালাতের সংবাদ পৌঁছেনি ? এই যে, যিনি আমার সাথে, ইনিই আল্লাহর রাসূল। মাফরুক বলল, হ্যাঁ, আমি তাঁর কথা শুনেছি। হে কুরায়শ ভাই, আপনি কিসের প্রতি আহ্বান জানান ? তিনি অগ্রসর হয়ে বললেন, আল্লাহ এক এবং তাঁর কোন শরীক নেই আর আমাকে তাঁর রাসূল এবং বাণীবাহক মান্য কর আর এ দীনের সাহায্য কর। কুরায়শগণ আল্লাহর নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেছে, আল্লাহর রাসূলকে মিথ্যা বলেছে আর বাতিলের নেশায় হক থেকে বিমুখ হয়েছে। আর وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ "আল্লাহই সবচে' বেশি অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত।" অর্থাৎ এ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিতের তো বিন্দু পরিমাণও প্রয়োজন নেই যে, তোমরা তাঁর দীন গ্রহণ কর, এর সাহায্য-সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ কর। তবে হ্যাঁ, যদি নিজেদের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা কর, তবে সত্য ও সুপথকে গ্রহণ কর এবং বাতিল ও ভ্রষ্ট পথ ত্যাগ করো। মাফরুক

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৪৮।

বলল, আপনি আর কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেন? নবীজি (সা) তখন এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ مِنْ اِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

"আপনি বলুন, এসো, আমি তোমাদেরকে ঐ বিষয় পাঠ করে শোনাই, যা তোমাদের রব তোমাদের প্রতি নিষিদ্ধ করেছেন। (আর তা হলো :) আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, পিতামাতার সাথে সদাচরণ করবে, দারিদ্র্যের ভয়ে নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে না, আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকে রিযক দিয়ে থাকি। আর গোপনে বা প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না। বৈধভাবে ছাড়া আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন এমন কোন প্রাণীকে হত্যা করবে না। এগুলোই তোমাদের প্রতি উপদেশ, যাতে তোমরা অনুধাবন কর।" (সূরা আন'আম : ১৫১)

মাফরুক বলল, আল্লাহর শপথ ! এ বাক্যতো কোন মর্ত্যবাসীর নয়। হে কুরায়শ ভ্রাতা ! আপনি আর কি কি বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেন ? তখন তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আদেশ করেন ইনসাফ এবং অনুগ্রহ করার, প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করার। আর অশ্লীল, অসত্য এবং বিদ্রোহাত্মক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়াকে তিনি নিষেধ করেন। তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হলো, যাতে তোমরা স্মরণ কর।" (সূরা নাহল : ৯০)

মাফরুক বলল, আল্লাহর শপথ, আপনি খুবই উত্তম চরিত্র এবং পসন্দনীয় কর্মের প্রতি আহ্বান করেছেন। কিন্তু অপারগতা হলো আমি আমার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা না করে তাদের অসাক্ষাতে আপনার সাথে কোন চুক্তি করা সমীচীন মনে করি না। কি জানি ওরা এ চুক্তি গ্রহণ করবে, না প্রত্যাখ্যান করবে। এ ছাড়াও আমরা রোম সম্রাটের প্রভাবাধীন, সম্রাটের সাথে আমরা চুক্তি করেছি যে, নতুন কোন কাজই তাকে না জানিয়ে আমরা করব না। আমার প্রবল ধারণা, যদি আমরা আপনার সাথে এ ধরনের কোন চুক্তি করি, তবে তা অবশ্যই সম্রাটের অপসন্দ হবে।

মাফরুকের এ ধরনের সত্য ও সাদাসিধে কথা নবী (সা)-এর খুবই পসন্দ হলো। তাই বললেন, আল্লাহ তাঁর দীনের নিজেই সাহায্যকারী, আর যে ব্যক্তি এ দীনের পৃষ্ঠপোষকতা করবে, অচিরেই আল্লাহ তাকে রোম সম্রাটের সম্পদ ও সাম্রাজ্যের

উত্তরাধিকারী বানাবেন।[1] এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাত ধরে মজলিস থেকে উঠে পড়লেন এবং আওস ও খাযরাজ সম্প্রদায়ের যে সব লোক মদীনা মুনাওয়ারা থেকে এসেছে, তাদের বৈঠকে উপস্থিত হলেন। (যেমন শীঘ্রই তাদের বর্ণনা আসছে) তারা ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করার ওয়াদা করলেন।[2]

হাফিয আসকালানী বলেন, হাকিম, আবূ নুয়াইম ও বায়হাকী হাসান সনদে হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে হযরত আলী (ক) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৭১; وفود الانصار الى النبى ﷺ بمكة وبيعة العقبة অধ্যায়)।

সতর্ক বাণী : হাফিয আবূ নুয়াইম ইস্পাহানী বলেন, মাফরূক ইসলাম গ্রহণ করেছিল কি না আমার জানা নেই।[3]

হযরত আয়াস ইবন মু'আযের ইসলাম গ্রহণ

ঐ বছরেই আবুল হায়সার আনাস ইবন রাফে' কতিপয় যুবক সহ এ উদ্দেশে মক্কায় আগমন করে যে, খাযরাজ সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় কুরায়শের কোন গোত্রকে মিত্র বানানো যায় কি না। ঐ যুবকদের মধ্যে আয়াস ইবন মু'আযও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের নিকট গেলেন এবং বললেন, যে উদ্দেশে এসেছ, তার চেয়ে উত্তম কিছু আমি তোমাদের সামনে পেশ করছি। আবুল হায়সার এবং তার সঙ্গীগণ বললেন, সেটা কি? নবীজি (সা) বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আমাকে এ জন্যে প্রেরণ করেছেন যে, আমি তাঁর বান্দাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করব যেন বান্দারা কেবল আল্লাহরই ইবাদত করবে, কোন বস্তুকে কোনভাবেই তাঁর সাথে শরীক করবে না। আর আল্লাহ আমার প্রতি একটি কিতাব নাযিল করেছেন। এরপর তিনি কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং তাদের সামনে ইসলাম পেশ করলেন।

আয়াস ইবন মু'আয বললেন, ওহে স্বগোত্রীয়গণ, আল্লাহর কসম, যে কাজের উদ্দেশে আমরা এসেছি, এটা তার চাইতে উত্তম। আবুল হায়সার কঙ্কর তুলে আয়াসের মুখে নিক্ষেপ করল এবং বলল, আমরা এ কাজের জন্য আসিনি। আয়াস চুপ হয়ে গেলেন, আর নবী (সা) মজলিস থেকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওরা মদীনায় ফিরে গেল। কিছুদিন যেতে না যেতেই আয়াস ইবন মু'আয ইনতিকাল করলেন। মৃত্যুকালীন সময়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ' ইত্যাদি কালেমা তাঁর মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল। উপস্থিত সকলেই তা শুনছিল। এতে কারো কোন সন্দেহ ছিল না যে, তিনি মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন।[4]

---

১. বিশ্ববাসী দেখেছে যে, আল্লাহ তা'আলা সাহাবা কিরাম (রা) কে সামান্য কয়েক দিনের মধ্যেই রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের অধিকারী বানিয়েছেন।

২. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ৪৬৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১৪৩।

৩. উসদুল গাবা, ৪খ. পৃ. ৪০৯।

৪. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১৪৮; আল-ইসাবা, ১খ. পৃ. ৯১।

হাফিয হায়সামী বলেন, আহমদ ও তাবারানী ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।[১]

মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলামের সূচনা (১১শ নববী বর্ষ)

মদীনার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল আওস ও খাযরাজ সম্প্রদায়ভুক্ত, যারা ছিল মুশরিক ও মূর্তিপূজক। আর এদের সাথে কিছু ইয়াহূদীও বাস করত, যারা ছিল আহলি কিতাব ও শিক্ষিত। মদীনায় ইয়াহূদীরা যেহেতু সংখ্যালঘু ছিল, কাজেই যখন তাদের সাথে আওস বা খাযরাজের ঝগড়া-বিবাদ লেগে যেত। তখন ইয়াহূদীরা বলত, শীগগিরই আখিরী নবী প্রেরিত হতে যাচ্ছেন, আমরা তাঁর আনুগত্য করব এবং তাঁকে সাথে নিয়ে আমরা তোমাদেরকে 'আদ ও ইরাম জাতির মত ধ্বংস ও পর্যুদস্ত করব।

যখন হজ্জের মওসুম এলো, খাযরাজের কিছু লোক মক্কায় আগমন করল। এটা ছিল নুবূয়াতের ১১শ বর্ষ। হযরত রাসূল (সা) তাদের কাছে গেলেন এবং ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন, তাদের সামনে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করেন। এ ব্যক্তিগণ তাঁকে দেখামাত্র চিনে ফেললেন এবং পরস্পরকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম, ইয়াহূদীরা যাঁর উল্লেখ করে থাকে, তিনি সেই নবী। দেখ, এমনটি না হয় যে, সৌভাগ্য ও মর্যাদার দিক থেকে ইয়াহূদীরা যেন আমাদের অগ্রগামী হয়ে না যায়। আর ঐ বৈঠক থেকে উঠার পূর্বেই তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা তো আপনার প্রতি ঈমান আনলাম, আর ইয়াহূদীদের সাথে আমাদের প্রায়ই ঝগড়া হয়। যদি আপনি অনুমতি দেন তো আমরা ফিরে গিয়ে তাদেরও ইসলামের দাওয়াত দিতে পারি। যদি ওরাও এ দাওয়াত গ্রহণ করে আর এ অবস্থায় তারা এবং আমরা একতাবদ্ধ হই, তা হলে অতঃপর আপনার চেয়ে শক্তিশালী কেউ হবে না। এ ঈমান আনয়নকারী ছিলেন খাযরাজ গোত্রের ছয় ব্যক্তি, নিম্নে তাঁদের নাম দেয়া হল :

১. হযরত আস'আদ ইবন যুরারা (রা),
২. হযরত আউফ ইবন হারিস (রা),
৩. হযরত রাফি ইবন মালিক ইবন আজলান (রা),
৪. হযরত কুতায়বা ইবন আমির (রা)
৫. হযরত উকবা ইবন যুরারা (রা)
৬. হযরত জাবির[২] ইবন আবদুল্লাহ ইবন রাবাব (রা)

---

১. মাজমু'আ-উয-যাওয়ায়িদ, ৬খ. পৃ. ৩৬০।

২ তিনি অপর জাবির, জাবির নামে যে সাহাবী প্রসিদ্ধ, তিনি হচ্ছেন জাবির ইবন আবদুল্লাহ ইবন হারাম (রা)। (যারকানী, ১খ. পৃ.৩১১)।

কতিপয় জীবনী লিখক হযরত জাবির-এর পরিবর্তে হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।[১] ফাতহুল বারী; وفود الانصار الى النبى ﷺ بمكة وبيعة العقبة অধ্যায়।[২]

এ ছয় ব্যক্তিত্ব রাসূল (সা)-এর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁরা যে বৈঠকেই বসতেন, সেখানেই নবী (সা)-এর উল্লেখ করতেন। প্রচারণা এ পর্যন্ত পৌঁছে যে, মদীনার কোন গৃহ এবং কোন মজলিস তাঁর উল্লেখ থেকে বাদ ছিল না।

আনসারদের প্রথম বায়'আত (১২শ নববী বর্ষ)

যখন পরবর্তী বৎসর এলো, যা ছিল নবূয়াতের দ্বাদশতম বর্ষ, বার ব্যক্তি নবীজির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। পাঁচজন তো পূর্ববর্তীদের মধ্যেই, আর বাকি সাতজন ছিলেন নতুন। যাঁদের নাম নিম্নরূপ :

১. হযরত আস'আদ ইবন যুরারা (রা),
২. হযরত আউফ ইবন হারিস (রা),
৩. হযরত রাফি' ইবন মালিক (রা),
৪. হযরত কুতায়বা ইবন আমির (রা),
৫. হযরত উকবা ইবন যুরারা (রা) এ বৎসর হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ ইবন রাবাব (রা) উপস্থিত ছিলেন না;
৬. হযরত মু'আয ইবন হারিস (রা) [অর্থাৎ হযরত আউফ ইবন হারিস (রা)-এর ভাই];
৭. হযরত যাকওয়ান[৩] ইবন আবদুল কায়েস (রা),
৮. হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা),
৯. হযরত ইয়াযীদ ইবন সা'লাবা (রা),
১০. হযরত আব্বাস ইবন উবাদা ইবন নাযলা (রা),
১১. হযরত আবুল হায়সাম মালিক ইবন তায়হান (রা),
১২. হযরত উয়াইম ইবন সাঈদা (রা)।

এ বার ব্যক্তিত্ব নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং মিনায় আকাবার সন্নিকটে নবী (সা)-এর হাতে এ মর্মে বায়'আত হন যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করব না, চুরি এবং যিনা করব না, সন্তানদের হত্যা করব না, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও দুর্নাম করব না। এটা ছিল আনসারদের প্রথম বায়'আত, যাকে আকাবার প্রথম বায়'আত বলা হয়।

---

১. ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৫০।

২ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১৪৮।

৩. যাকওয়ান (রা) মক্কায়ই থেকে যান, পরে হিজরত করে মদীনায় যান। এ জন্যে কেউ কেউ তাঁকে মক্কী হিসেবে গণ্য করেছেন।

এঁরা যখন বায়'আত করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতে উদ্যত হন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম ও হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা) কে কুরআন মজীদ এবং ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষাদানের জন্য তাঁদের সঙ্গে প্রেরণ করা হয় এবং তাঁরা মদীনায় পৌঁছে হযরত আস'আদ ইবন যুরারা (রা)-এর গৃহে অবস্থান গ্রহণ করেন। হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা) লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং মদীনার মুসলমানদের নামাযে ইমামতি করতেন। তিনিই ছিলেন ইমাম। একদিন হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা) লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, অনেক লোক একত্রিত হয়েছিল।

উসায়দ ইবন হুযায়র যখন এ খবর পেলেন, খোলা তরবারি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আপনি এখানে কেন এসেছেন, আমাদের নারী ও শিশুদের কেন বিভ্রান্ত করছেন ? আপনার এখান থেকে চলে যাওয়াই উত্তম।

হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা) বললেন, যদি সম্ভব হয়, তবে দয়া করে সামান্য সময় এখানে বসুন, আমি যা বলি মেহেরবানী করে শুনুন। যদি পসন্দ হয় গ্রহণ করবেন, আর না হলে চলে যাবেন। উসায়দ ইবন হুযায়র বললেন, এটা অবশ্য আপনি ইনসাফপূর্ণ কথাই বলেছেন। এ বলে তিনি বসে পড়লেন। হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা) ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করলেন এবং পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করলেন। শুনে উসায়দ ইবন হুযায়র বললেন, مَا اَحْسَنَ هٰذَا الْكَلَامُ وَاَجْمَلَهُ "কত উত্তম, কতই না চমৎকার কালাম !" এবং জিজ্ঞেস করলেন এ ধর্মে প্রবেশ করতে হলে কি করতে হয় ? মুস'আব (রা) বললেন, প্রথমে শরীর এবং পোশাক পবিত্র করুন এবং গোসল করুন। এরপর কালেমা শাহাদাত পাঠ করুন এবং নামায আদায় করুন।

উসায়দ (রা) তৎক্ষণাৎ উঠে পোশাক পবিত্র করে গোসল করলেন এবং কালেমা শাহাদাত পাঠ করে দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন। এরপর বললেন, আর এক ব্যক্তি আছেন, সা'দ ইবন মু'আয, যদি তিনি মুসলমান হন, তা হলে আওস সম্প্রদায়ের কেউই অমুসলমান থাকবে না। আমি এখনই গিয়ে তাকে আপনার নিকট প্রেরণ করছি। সা'দ ইবন মু'আয উসায়দ (রা) কে আসতে দেখেই বললেন, যে উসায়দ এখান থেকে গেল, এ যেন সে উসায়দ নয়! নিকটে পৌঁছলে সা'দ উসায়দকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করলে ? উসায়দ বললেন, আমি তো তার কথায় ক্ষতিকর কিছু পাইনি। সা'দ ইবন মু'আয এতে রাগান্বিত হলেন। তরবারি খুলে নিয়ে নিজেই সেখানে উপস্থিত হলেন এবং আস'আদ ইবন যুরারা (রা) কে সম্বোধন করে বললেন, যদি তোমার সাথে আমার নৈকট্য না থাকত এবং যদি তুমি আমার খালাত ভাই না হতে, তা হলে এখনই এ তলোয়ার দিয়ে ফয়সালা করে দিতাম। সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করার জন্য তুমিই ওদের এখানে এনেছ।

মুস'আব (রা) বললেন, ওহে সা'দ, এটা কি হতে পারে না যে, তুমি এখানে কিছুক্ষণ বসে আমার কথা শুনবে, পসন্দ হলে গ্রহণ করবে, আর না হলে যা খুশি

করবে ? সা'দ "তুমি ইনসাফের কথাই বলেছ" বলে বসে পড়লেন। মুস'আব (রা) তার সামনে ইসলাম উপস্থাপন করলেন এবং পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করলেন। শোনামাত্রই সা'দের রং পরিবর্তন হয়ে গেল। বললেন, এ ধর্মে প্রবেশের পথ কি ?

মুস'আব (রা) বললেন, প্রথমে শরীর এবং পোশাক পবিত্র করুন এবং গোসল করুন। এরপর কালেমা শাহাদাত পাঠ করুন এবং দু'রাকাআত নামায আদায় করুন। সা'দ (রা) তৎক্ষণাৎ উঠে পোশাক পবিত্র করে গোসল করলেন এবং কালেমা শাহাদাত পাঠ করে দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন। আর এখান থেকে উঠে সোজা নিজের কওমের বৈঠকে ফিরে গেলেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা দূর থেকেই দেখে বুঝে ফেলল যে, সা'দ পরিবর্তিত হয়ে গেছেন। মজলিসে পৌঁছে তিনি নিজ সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা আমাকে কেমন মনে কর ? সবাই সমস্বরে বলল, তুমি আমাদের সর্দার, মতামত গ্রহণকারী, প্রসিদ্ধ, সবচে' উত্তম ও মর্যাদাবান। সা'দ বললেন আল্লাহর কসম, আমি সে পর্যন্ত তোমাদের সাথে কথা বলব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনে আসছ। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হলো না, বনী আবদুল আশহাল গোত্রের এমন কোন পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক অবশিষ্ট থাকলো না যারা মুসলমান হয়নি।[১]

বনী আবদুল আশহাল গোত্রের মাত্র এক ব্যক্তি আমর ইবন সাবিত, যার উপাধি ছিল উসায়রিম। তিনি ইসলাম গ্রহণে বিরত রয়ে গেলেন। তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেই জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন ও শহীদ হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রসিকতা করে বলতেন, বল তো ঐ ব্যক্তি কে ছিলেন, যিনি এক ওয়াক্ত নামাযও পড়েননি, অথচ জান্নাতে পৌঁছে গেছেন।

যখন লোকেরা জবাব না দিত, তখন নিজেই বলতেন, তিনি হলেন বনী আবদুল আশহাল গোত্রের উসায়রিম (রা)। [ইবন ইসহাক হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাসান সনদে এক দীর্ঘ হাদীসে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন]।[২]

হযরত রিফা'আ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত রিফা'আ ইবন রাফে যুরাকী (রা) বলেন, ছয় আনসারীর মক্কায় আগমনের পূর্বেই আমি এবং আমার এক খালাত ভাই মু'আয ইবন আফরা মক্কায় আগমন করি এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত করি। তিনি আমাদের সামনে ইসলাম পেশ করেন এবং বলেন, রিফা'আ, বল দেখি আসমান, যমীন ও পাহাড়গুলো কে সৃষ্টি করেছেন ? আমি বললাম, আল্লাহ। তিনি বললেন, স্রষ্টা ইবাদতের হকদার, নাকি সৃষ্টি ? আমি বললাম,

---

১. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১৫৮; উপরন্তু ইবন হিশাম, তাবারী, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া।

২ যারকানী, ১খ. পৃ.৩১৬।

স্রষ্টা। তিনি বললেন, তা হলে এ মূর্তিগুলো তোমাদের ইবাদত করবে এবং তোমরা আল্লাহর উপাসনা করবে। এ জন্যে যে, এ মূর্তিগুলো তোমাদের সৃষ্টি এবং তোমাদেরকে আল্লাহ পয়দা করেছেন। আর আমি তোমাকে এক আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান জানাচ্ছি। তোমরা আল্লাহকে এক স্বীকার কর এবং কেবল তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী কর, আমাকে আল্লাহর রাসূল ও নবী বলে স্বীকার কর, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, যুলুম-অত্যাচার ছেড়ে দাও। আমি বললাম, নিঃসন্দেহে আপনি উন্নততর কর্ম এবং পবিত্র চরিত্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আমি তাঁর নিকট থেকে উঠে হারাম শরীফে পৌঁছলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে বললাম : اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল।" (হাকেম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটি সহীহ হাদীস; খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ.১৮২)।

মদীনা মুনাওয়ারায় জুমু'আর জামাআত

ঐ বৎসরই হযরত আস'আদ ইবন যুরারা (রা) মদীনা মুনাওয়ারায় জুমু'আর জামাআত কায়েম করেন। তিনি যখন দেখলেন যে, ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের একত্রিত হওয়ার জন্য সপ্তাহে একটি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট আছে। ইয়াহূদীরা শনিবারে এবং খ্রিস্টানেরা রোববারে এক জায়গায় একত্রিত হয়। এ জন্যে তাঁর ধারণা হলো যে, মুসলমানদের জন্যও সপ্তাহে একটি দিন এভাবে নির্দিষ্ট করা করা যায়, যে দিন সব মুসলমান একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিকির ও শোকর করবে, নামায আদায় করবে এবং তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করবে। আস'আদ ইবন যুরারা (রা) এ জন্যে শুক্রবারটি বেছে নিলেন এবং ঐ দিন সবাইকে নামায পড়ালেন।

আবদ ইবন হুমায়দ ইবন সিরীন সূত্রে সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

মোটকথা, সাহাবায়ে কিরাম (রা) শুধু নিজেদের ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রথমত জুমু'আ কায়েম করলেন এবং দ্বিতীয়ত জুমু'আর দিনটি, যাকে জাহিলী যুগে আরূবা অর্থাৎ ইয়াওমে আরূবা বলত। এ দিনের নাম 'ইয়াওমুল জুমু'আ' নির্ধারণ করেন। আল্লাহ তা'আলার ওহী এ উভয় ইজতিহাদকেই অনুমোদন করে। যে প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

"হে মু'মিনগণ, জুমু'আর দিনে যখন নামাযের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ কর।"

(সূরা জুমু'আ : ৯)

যা দ্বারা জুমু'আ ফরয হওয়ার বিষয়টিও জানা গেল এবং এটাও জানা গেল যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে 'ইয়াওমুল জুমু'আ' নামটিই পসন্দনীয়। আল্লাহর ওহী

জাহিলী যুগে প্রচলিত 'ইয়াওমে আরূবা' নামটি প্রত্যাখ্যান করে এবং আনসারীগণ যে নামটি নির্ধারণ করেছেন, অবলীলায় তা ব্যবহার করে। আর এ রীতি সূচনা দ্বারা আনসারীগণের ইজতিহাদ প্রশংসনীয় অনুমোদন লাভ করে।

আর এর মাত্র কয়েক দিন পরেই জুমু'আ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক নির্দেশনামা হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা) বরাবরে পৌঁছে যে, সবাই মিলে দ্বিপ্রহরের পর আল্লাহর দরবারে দু'রাকাআত নামাযের মাধ্যমে নৈকট্য হাসিল কর। [দারু কুতনী হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ শব্দমালা যারকানীর, ১খ. পৃ. ৩১৫]।

হযরত আবদুর রহমান ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা) বলেন, আমার পিতা কা'ব ইবন মালিক (রা) যখনই জুমু'আর আযান শুনতেন, আস'আদ ইবন যুরারা (রা)-এর জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতেন। আমি একবার তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মদীনায় সর্বপ্রথম আস'আদ ইবন যুরারা (রা)-ই আমাদেরকে জুমু'আ পড়িয়েছেন।

ফায়েদা : আল্লামা সুহায়লী বলেন, ইসলামে সর্বপ্রথম আস'আদ ইবন যুরারা (রা)-ই জুমু'আর প্রতিষ্ঠা করেন এবং জাহিলী যুগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রপিতামহ কা'ব ইবন লুয়াই জুমু'আ প্রতিষ্ঠা করেন, যেমনটি নবী (সা)-এর নসবনামার বর্ণনায় অতিক্রান্ত হয়েছে।

আনসারদের দ্বিতীয় বায়'আত (১৩শ নববী বর্ষ)

এর পরবর্তী বছর যখন এলো, সেটা ছিল নবূয়াতের ১৩শ বছর। হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা) মুসলমানদের একটি দলসহ হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররামায় যাত্রা করলেন। মুসলমানগণ ছাড়া আওস এবং খাযরাজ গোত্রীয় মুশরিকগণ, যারা তখনো ইসলামের গণ্ডিভুক্ত হয়নি, তারাও হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সংখ্যায় তারাই ছিল বেশি, চারশ'রও অধিক। আর প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল পচাত্তর, যাদের মধ্যে তিহাত্তর জন ছিলেন পুরুষ এবং দু'জন ছিলেন স্ত্রীলোক–যাঁরা নবী (সা)-এর হাতে ঐ ঘাঁটিতেই বায়'আত হন, যেখানে পূর্ববর্তীগণ বায়'আত হয়েছিলেন। এ বায়'আতের নাম আকাবার দ্বিতীয় বায়'আত। আল্লামা ইবনুল জাওযী (র) বায়'আতে অংশগ্রহণকারী মহাত্মাগণের যে নাম উল্লেখ করেছেন, তা পচাত্তর থেকে কিছু বেশি। যেগুলো নিম্নরূপ :

আলিফ বর্ণ

১. হযরত আস'আদ ইবন যুরারা (রা), ২. হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা),
৩. হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র (রা), ৪. হযরত আওস ইবন সাবিত (রা),
৫. হযরত আওস ইবন ইয়াযীদ (রা),

বা বর্ণ

৬. হযরত বারা' ইবন মা'রূর (রা), ৭. হযরত বিশর ইবন বারা ইবন মারূর (রা),

৮. হযরত বশীর ইবন সা'দ (রা),
৯. হযরত বুহায়র ইবন হায়সাম (রা),

সা বর্ণ

১০. হযরত সাবিত ইবন জাযা (রা), ১১. হযরত সালাবা ইবন আদী (রা),
১২. হযরত সালাবা ইবন গানামা (রা),

জীম বর্ণ

১৩. হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম (রা), ১৪. হযরত জাবির ইবন সাখরা (রা),

হা বর্ণ

১৫. হযরত হারিস ইবন কায়স (রা),

খা বর্ণ

১৬. হযরত খালিদ ইবন যায়দ (রা), ১৭. হযরত খালিদ ইবন আমর ইবন আবূ কা'ব (রা),
১৮. হযরত খালিদ ইবন আমর ইবন আদী (রা), ১৯. হযরত খালিদ ইবন কায়স (রা), (কেবল ওয়াকিদীর বর্ণনামতে)।
২০. হযরত খারিজা ইবন যায়দ (রা), ২১. হযরত খাদীজ ইবন সালামা (রা),
২২. হযরত খাল্লাদ ইবন সুয়ায়দ ইবন সালাবা (রা),

যাল বর্ণ

২৩. হযরত যাকওয়ান ইবন আবদে কায়স (রা), (আকাবার উভয় বায়'আতে অংশগ্রহণকারী)।

রা বর্ণ

২৪. হযরত রাফি' ইবন মালিক ইবন আজলান (রা), ২৫. হযরত রিফা'আ ইবন রাফি ইবন মালিক (রা),
২৬. হযরত রিফা'আ ইবন আবদুল মুনযির (রা), ২৭. হযরত রিফা'আ ইবন আমর (রা),

যা বর্ণ

২৮. হযরত যিয়াদ ইবন উবায়দ (রা), ২৯. হযরত যায়দ ইবন সাহল আবূ তালহা (রা),

সীন বর্ণ

৩০. হযরত সা'দ ইবন যায়দ ইবন মালিক আল-আশহালী (রা), (কেবল ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে)। ৩১. হযরত সা'দ ইবন খায়সামা (রা),

৩২. হযরত সা'দ ইবন রবী (রা), ৩৩. হযরত সা'দ ইবন উবাদাহ্ (রা)
৩৪. হযরত সালমা ইবন সালামা ৩৫. হযরত সালীম ইবন আমর (রা), ইবন ওয়াক্কাশ (রা),
৩৬. হযরত সিনান ইবন সায়ফী (রা), ৩৭. হযরত সাহল ইবন উতায়ক (রা),

শীন বর্ণ

৩৮. হযরত শামর ইবন সা'দ (রা),

সাদ বর্ণ

৩৯. হযরত সায়ফী ইবন সাওয়াদ (রা),

যোয়াদ বর্ণ

৪০. হযরত যাহহাক ইবন যায়দ (রা), ৪১. হযরত যাহহাক ইবন হারিসা (রা),

তোয়া বর্ণ

৪২. হযরত তুফায়ল ইবন নু'মান (রা),

যোয়া বর্ণ

৪৩. হযরত যাহীর ইবন রাফে' (রা),

আইন বর্ণ

৪৪. হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা), ৪৫. হযরত আব্বাদ ইবন কায়স (রা),
৪৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনায়স (রা), ৪৭. হযরত আব্বাস ইবন নায়লা (রা),
৪৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবন রবী' (রা) ৪৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা (রা);
৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা), (আযানের স্বপ্নদ্রষ্টা)। ৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম (রা),
৫২. হযরত আবস ইবন আমির (রা), ৫৩. হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইবন তাহমান (রা), (অর্থাৎ আবুল হায়সাম ইবন তাহমানের ভ্রাতা; কেউ কেউ তাঁর নাম 'উবায়দ' স্থলে 'আতীক' বলেছেন)।
৫৪. হযরত উকবা ইবন আমর (রা), ৫৫. হযরত উকবা ইবন আমির (রা)
৫৬. হযরত উকবা ইবন ওহাব (রা), ৫৭. হযরত উবাদা ইবন হাযম (রা),
৫৮. হযরত আমর ইবন হারিস (রা), ৫৯. হযরত আমর ইবন গাযিয়্যা (রা),
৬০. হযরত আমর ইবন উমায়র (রা), ৬১. হযরত উমায়র ইবন হারিস (রা),
৬২. হযরত আওফ ইবন হারিস (রা), ৬৩. হযরত উয়ায়ম ইবন সাঈদাহ (রা),

ফা বর্ণ

৬৪. হযরত ফারওয়া ইবন আমর (রা),

ক্বাফ বর্ণ

৬৫. হযরত কাতাদা ইবন নু'মান (রা), ৬৬. হযরত কুতবাহ ইবন আমির (রা), (ইবন ইসহাক ব্যতীত সবাই তাঁর উল্লেখ করেছেন)।
৬৭. হযরত কায়স ইবন আমির (রা), ৬৮. হযরত কায়স ইবন আবূ সা'সা' (রা),

কাফ বর্ণ

৬৯. হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা),

মীম বর্ণ

৭০. হযরত মালিক ইবন তায়হান আবুল হায়সাম (রা),
৭১. হযরত মালিক ইবন আবদুল্লাহ ইবন জুশূম (রা),
৭২. হযরত মাসঊদ ইবন ইয়াযীদ (রা),
৭৩. হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা),
৭৪. হযরত মুয়ায ইবন হারিস (রা), (মাতা আফরার নামে পরিচিত)।
৭৫. হযরত মু'আয ইবন আমর আল-জমূহ (রা),
৭৬. হযরত মাকাল ইবন মুনযির (রা),
৭৭. হযরত মান ইবন আদী (রা),
৭৮. হযরত মাঊয ইবন হারিস (রা), (উম্মে আফরা নামে পরিচিত)।
৭৯. হযরত মুনযির ইবন আমর (রা),

নূন বর্ণ

৮০. হযরত নু'মান ইবন হারিসা (রা),
৮১. হযরত নু'মান ইবন আমর (রা),

হা বর্ণ

৮২. হযরত হানী ইবন নায়্যার আবূ বুরদাহ (রা),

ইয়া বর্ণ

৮৩. হযরত ইয়াযীদ ইবন সা'লাবাহ (রা),
৮৪. হযরত ইয়াযীদ ইবন খিযাম (রা),
৮৫. হযরত ইয়াযীদ ইবন আমির (রা),
৮৬. হযরত ইয়াযীদ ইবন মুনযির (রা),
৮৭.হযরত নাসীবাহ বিনতে কা'ব(রা),
৮৮.হযরত আসমা বিনতে আমর (রা)।

এ সমুদয় নাম আমরা আল্লামা ইবনুল জাওযী প্রণীত কিতাব 'তালকীহ', পৃ. ২১৫ থেকে উদ্ধৃত করেছি। আল্লামা ইবন হিশাম তার সীরাতে এবং হাফিয ইবন সায়্যিদুন-নাস তাঁর 'উয়ূনুল আসার' গ্রন্থে প্রায় এই নামই উল্লেখ করেছেন। কেবল আট দশটি নাম নিয়ে হেরফের আছে।

মুসনাদে আহমদে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) মানুষের ঘরে ঘরে, বাজারে এবং মেলায় গিয়ে লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং বলতেন : من يؤونى ومن ينصرنى حتى ابلغ رسالة ربى وله الجنة "কে আছে, যে আমাকে আশ্রয় দেবে, কে আছে, যে আমাকে সাহায্য করবে, যাতে আমি আল্লাহর বাণী প্রচার করতে পারি, তার জন্য জান্নাত রয়েছে।" কিন্তু কোন নিরাপত্তাদানকারী বা সাহায্যকারী পাওয়া যেত না। এমনকি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইয়াসরিব থেকে তাঁর নিকট প্রেরণ করলেন। আমরা তাঁকে সত্য বলে মেনে নিলাম এবং আশ্রয় দান করলাম। আমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই তাঁর খিদমতে উপস্থিত হতো, সে মুসলমান হয়ে ফিরে আসত। যখন মদীনার ঘরে ঘরে ইসলাম পৌঁছে গেল, তখন আমরা পরামর্শ করলাম, শেষ পর্যন্ত ক'দ্দিন আমরা আল্লাহর রাসূল (সা) কে এ

অবস্থায় থাকতে দেব যে, তিনি মক্কার পর্বতে-কন্দরে ভীত-পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুরবেন। (কাজেই) আমাদের মধ্য থেকে সত্তর ব্যক্তি মক্কায় এলেন... হাদীসের শেষ পর্যন্ত। হাফিয ইবন কাসীর বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটির সনদ উত্তম। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১৫৯)। আর হাফিয হায়সামী বলেন, হাদীসটি আহমদ ও বাযযার বর্ণনা করেছেন, আহমদের বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনাকারী। (মাজমা-উয-যাওয়ায়েদ, ৬খ. পৃ. ৪৬)। কাফেলা মক্কায় পৌঁছলে মুসলমানগণ গোপনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে এ পয়গাম পৌঁছালেন যে, আমরা হযরতের কদমবুসি করার সৌভাগ্য অর্জন করতে ইচ্ছুক। তিনি আইয়ামে তাশরীকের সময় রাত্রিতে ঐ পবিত্র ঘাঁটিতে মিলিত হওয়ার ওয়াদা করলেন, যেখানে বিগত বছরে দ্বাদশ ব্যক্তি তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণে ধন্য হয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) আগমন করলেন, আর তাঁর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা) তাঁর সঙ্গী ছিলেন। হযরত আব্বাস যদিও তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেননি, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) কে সাহায্য-সহযোগিতা করাকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করতেন। বসামাত্র হযরত আব্বাস আনসারদের উদ্দেশ্য করে বললেন যে, মুহাম্মদ (সা) স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র (মানুষ যদিও তাঁর দীনের বিরোধী ছিল, কিন্তু যে সম্মান ও শ্রদ্ধাভরে তাঁকে দেখত, তা কারো ভাগ্যে জোটেনি)। আর আমরা তাঁর সহায়তা ও সাহায্যকারী। তিনি তোমাদের ওখানে যেতে চান। যদি তোমরা তাঁকে পূর্ণ সাহায্য ও হিফাযত করতে পারো এবং আমৃত্যু এর উপর অবিচল থাকো, তবে উত্তম। অন্যথায় এখনই সাফ সাফ বলে দাও।

আনসারীগণ বললেন, আপনি যা বললেন, তা আমরা শুনলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা) কে সম্বোধন করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদের কাছে কি চান, আমরা এ জন্য উপস্থিত আছি যে, আপনি নিজের জন্য এবং আল্লাহর জন্য যা ইচ্ছা, আমাদের থেকে ওয়াদা নিন।

তিনি (সা) বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাচ্ছি এবং ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। তিনি কুরআন থেকে তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদেরকে বলছি যে, তোমরা আল্লাহরই ইবাদত-বন্দেগী কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। আর নিজের সঙ্গীদের জন্য চাই যে, আমাদেরকে আশ্রয় দান কর। যেভাবে নিজেদেরকে, নিজেদের সন্তান-সন্তুতি এবং স্ত্রীলোকদেরকে হিফাযত কর, সেভাবেই আমাদের হিফাযত কর। আনন্দে কিংবা বিষাদে, শান্তি কিংবা কষ্টে, দারিদ্র্যে কিংবা স্বচ্ছলতায়, সর্বাবস্থায় আমার আনুগত্য করবে এবং যা বলবো, শুনবে। আনসারীগণ বললেন, যদি আমরা এমনটি করি, তবে আমাদের জন্য কি পুরস্কার রয়েছে ? তিনি বললেন, জান্নাত (অর্থাৎ আখিরাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত)। আনসারীগণ বললেন, আমরা সবই মেনে নিলাম, আসুন, বায়'আতের জন্য পবিত্র হাত বাড়িয়ে দিন। হযরত আবুল হায়সাম ইবন তায়হান (রা) আরয করলেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ, আমার কিছু নিবেদন আছে। আর তা এই যে, আমাদের এবং ইয়াহূদীদের মাঝে কিছু কিছু সম্পর্ক আছে। আপনার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে ঐ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এমনটি তো হবে না যে, যখন আল্লাহ্ আপনাকে বিজয় এবং সাহায্য নসীব করবেন, তখন আপনি মক্কা মুকাররামায় প্রত্যাবর্তন করবেন আর আমাদেরকে (ছটফট করা অবস্থায়) এখানে ছেড়ে যাবেন। এটা শুনে আল্লাহর নবী (সা) হাসলেন এবং বললেন :

"কখনই নয়, তোমাদের আত্মা আমার আত্মা, তোমরা আমার এবং আমি তোমাদের, যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা, তাদের সাথে আমারও শত্রুতা, যাদের সাথে তোমাদের মিত্রতা, তাদের সাথে আমারও মিত্রতা।"

এ কথার পর সবাই অত্যন্ত সন্তুষ্টি ও আগ্রহের সাথে বায়'আতের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন।[1]

বায়'আতের জন্য সর্বপ্রথম কে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন; এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবন সা'দের একটি বর্ণনার দ্বারা সমুদয় বিভিন্ন মত একত্রিত হয়ে যায়। সুলায়মান ইবন নুজায়ম বলেন, যখন আওস এবং খাযরাজের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ হলো যে, কে সর্বপ্রথম তাঁর পবিত্র হাতে বায়'আত হয়েছেন। তখন কেউ কেউ বললেন, এর সঠিক জ্ঞান হযরত আব্বাস (রা)-এর হবে। কেননা তিনি ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা উচিত।

হযরত আব্বাস (রা) বলেন, সর্বপ্রথম হযরত আস'আদ ইবন যুরারা (যিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান ও ধন্য) তাঁর পবিত্র হাতে বায়'আত করেন। এরপর হযরত বারা' ইবন মা'রূর (রা) এবং তাঁর পর হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র (রা)।[2]

হযরত আব্বাস ইবন উবাদা আনসারী (রা) (বায়'আতকে মযবুত ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে) বললেন, "ওহে খাযরাজ গোত্র, তোমাদের জানা আছে কি, কোন্ বিষয়ের উপর তোমরা বায়'আত করছ? মনে করো যে, আরব ও অনারবের মধ্যে যুদ্ধের জন্য বায়'আত করছ। যদি ভবিষ্যতে বিপদাপদে ঘাবড়ে গিয়ে বায়'আত ভেঙে দেয়ার খেয়াল করে থাকো, তা হলে এখনই ছেড়ে দাও। বিপদের মুখে ছেড়ে দিলে, আল্লাহর কসম, তা হবে দুনিয়া ও আখিরাতে অপদস্থতার কারণ। যদি তোমরা অনাগত বিপদ ও কাঠিন্যের মুকাবিলা করার হিম্মত রাখো, আর নিজেদের জানমালের বাজী রেখে নিজেদের শপথ ও প্রতিজ্ঞায় অবিচল থাকতে পারো, তা হলে আল্লাহ তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ ও সাফল্য দান করবেন।" সবাই বললেন, হ্যাঁ, এর উপরই তো আমরা বায়'আত করছি। তাঁর জন্য জানমাল উৎসর্গে

---

১. হাফিয আসকালানী বলেন, ঘটনাটি ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন ও ইবন হিব্বান একে সহীহ বলেছেন। ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ.১৭৩।

২ আল্লামা যারকানী বলেন, বায়হাকী শা'বী থেকে শক্তিশালী সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তাবারানী ও আহমদ এটি বর্ণনা করেন। (যারকানী, ১খ. পৃ. ৩১৭)।

আমরা কুণ্ঠিত নই, বিপদে ভীত হয়েও আল্লাহর কসম, আমরা এ বায়'আতকে বর্জন করতে প্রস্তুত নই।[১]

নকীব নির্বাচন

যখন সবাই বায়'আত গ্রহণ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে বারজন নকীব নির্বাচন করেছিলেন। অনুরূপভাবে আমিও হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ইঙ্গিতে তোমাদের মধ্য থেকে বারজন নকীব নির্বাচন করছি। অতঃপর ঐ বারজনকে সম্বোধন করে বললেন যে, তোমরা স্ব-স্ব গোত্রের অভিভাবক ও যিম্মাদার, যেমন হাওয়ারীগণ ঈসা (আ) এর পক্ষে অভিভাবক ছিলেন।[২]

নকীবগণের নাম, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দিন এবং তাঁদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করান যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত

যে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে রাসূলুল্লাহ (সা) নকীব নির্বাচিত করেছিলেন, তাঁদের পবিত্র নামসমূহ নিম্নরূপ :

১. হযরত আস'আদ ইবন যুরারা (রা), ২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা),
৩. হযরত সা'দ ইবন রবী' (রা), ৪. হযরত রাফে' ইবন মালিক (রা),
৫. হযরত আবূ জাবির আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা), ৬. হযরত বারা' ইবন মা'রূর (রা),
৭. হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা), ৮. হযরত মুনযির ইবন আমর (রা),
৯. হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা), ১০. হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র (রা),
১১. হযরত সা'দ ইবন খায়সামা (রা), ১২. হযরত রিফা'আ ইবন আবদুল মুনযির (রা)।

আর কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তি রিফা'আর পরিবর্তে আবুল হায়সাম ইবন তায়হান (রা)-এর নাম উল্লেখ করেন। ইমাম মালিক (র) বলেন, আমাকে আনসারীদের মধ্যে জনৈক শায়খ বলেছেন যে, নকীব নির্বাচনের সময় জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ইশারায় বলে দিচ্ছিলেন, অমুককে ঘোষক নির্বাচন করুন।[৩]

ইমাম যুহরী বলেন, নবী (সা) আনসারদের সম্বোধন করে বলেন, আমি তোমাদের মধ্য থেকে বারজন নকীব নির্বাচন করব। তোমাদের মধ্যে যেন কেউ এ ধারণা না করে যে, আমাকে কেন নকীব বানানো হলো না। তা এ জন্যে যে, আমি কেবল আদিষ্ট, যেমন নির্দেশ, তেমনই করব। আর জিবরাঈল আমীন (আ) তাঁর পাশে বসা ছিলেন। যাকে নকীব বানানো উদ্দেশ্য ছিল, তার দিকেই তিনি ইশারা করছিলেন।[৪]

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ.১৫৬।

২ ইবন সা'দ, ১খ. পৃ.১৫০।

৩. যারকানী, ১খ. পৃ.৩১৭।

৪. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ.২৭৭।

প্রভাত হলে এ সংবাদ যখন মক্কায় ছড়িয়ে পড়ল, মক্কার কুরায়শগণ তখন ইয়াসরিববাসীর কাফেলার মূর্তি পূজক ও মুশরিক সদস্যদের এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। যেহেতু তাদের এ বিষয়ে কিছুই জানা ছিল না, সেহেতু তারা এ সংবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং বলল, এ সংবাদ পুরোপুরিই মিথ্যা। যদি এমনটি হতো তা হলে আমরা অবশ্যই অবগত হতাম।[১]

পরে এ কাফেলা মদীনায় যাত্রা করল। তারা প্রস্থানের পর কাফিররা এ খবরের সত্যতা অবহিত হলো। তারা আনসারদের ধরার জন্য ধাবিত হলো। কিন্তু ততক্ষণে তারা নাগালের বাইরে চলে যায়। ফলে কেউ ধরা পড়ল না। কেবল হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) পিছনে ছিলেন। মাঝপথ থেকে তাঁকে ধরে এনে ওরা খুব মারধর করলো। হযরত জুবায়র ইবন মুতইম (রা) এসে তাঁকে ছাড়িয়ে নিলেন।[২]

বায়'আত কি ?

বায়'আত بَيْعٌ (বায়'উন) শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বিক্রি করা, আর শরীয়তের পরিভাষায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের সন্তুষ্টি ও ভালবাসার সাথে নিজের ইচ্ছা, কামনা-বাসনা, জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে বিক্রি করে দেয়ার নাম বায়'আত।

কাজেই যখন এ বায়'আত হতে যাচ্ছিল, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদের প্রতি যা খুশি, শর্ত আরোপ করুন, কিন্তু এটা তো বলুন যে, এর বিনিময়ে আমরা কি পাব ? তিনি বললেন, জান্নাত। হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) আরয করলেন : رَبِحَ الْبَيْعُ لَانَقِيْلُ وَلَانَسْتَقِيْلُ, "খুবই লাভজনক ক্রয়-বিক্রয়, আমরা এটা কম হওয়া বা বাতিল হওয়ায় সন্তুষ্ট হব না।"

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ - ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের থেকে তাদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে কখনো (শত্রুদের) হত্যা করে আর কখনো বা নিহত হয়। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা

---

১. ইবন হিশাম, ১খ. পৃ.১৫৭।

২ প্রাগুক্ত।

যে সওদা করেছ. সেজন্য আনন্দ কর, আর এটাই মহাসাফল্য।" (সূরা তাওবা ১১১; ফাতহুল বারী. ৬খ. পৃ. ২, কিতাবুল জিহাদ)

জান্নাতে একটি বাজার বসবে, যারা এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার হাতে নিজেদের জান-মাল বিক্রি করে দিয়েছে, আর সমস্ত জান ও মাল তাঁর হাওয়ালা করে দিয়েছে, সে সেখানে তার বিনিময় পাবে এবং ঐ বাজারে যা খুশি, বিনামূল্যে গ্রহণ করতে পারবে। কেননা সে তো মূল্য (জান ও মাল) পূর্বেই পরিশোধ করে দিয়েছে।

জনৈক আরব কবি এ কথাই ব্যক্ত করেছেন তাঁর কবিতায় :

وحى على السوق الذى فيه يبلقى ار   محبون ذاك السوق للقوم معلم

فماشئت خذ منه بلاثمن له   فقد اسلف التجار فيه واسلموا

(حاوى الارواح)

একটি জরুরী সতর্ক বাণী

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বায়'আতের সময় কেবল পুরুষদের সাথে মুসাফাহা করতেন, স্ত্রীলোকদের সাথে মুসাফাহা করতেন না। তাদের থেকে শুধু মৌখিক শপথ গ্রহণ করে বলতেন, যাও, তোমাদের বায়'আত নেয়া হলো।[১]

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন :

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْه مِنَ الْمُؤْمِنَات بِهٰذَا الْاٰيَة يَقُوْلُ اللّٰهُ يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَات يُبَايِعُوْنَكَ الٰى قَوْله غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ فَمَنْ اَقَرَّ هٰذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَات قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ قَدْ بَايَعْتكَ كَلاَمًا وَلاَوَاللّٰه مَا مَسَّتْ يَدَهُ يَدَ اَمْرَاَةٍ قَطُّ فِى الْمُبَايَعَة مَا يُبَايِعُهُنَّ اِلاَّ بِقَوْلِه قَدْ بَايَعْتُكِ عَلٰى ذٰلكَ

"যে সকল স্ত্রীলোক হিজরত করে আসত, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আয়াত অনুসারে পরীক্ষা করতেন। যে স্ত্রীলোক সে শর্তাবলী গ্রহণ করত যা ঐ আয়াতে উল্লিখিত আছে, তাকে বায়'আত করে নিতেন এবং বলতেন, আমি তোমাকে কথার মাধ্যমে বায়'আত করে নিয়েছি। আল্লাহর শপথ, তাঁর পবিত্র হাত বায়'আত গ্রহণের সময় কোন স্ত্রীলোকের হাত স্পর্শ করেনি, শুধু মৌখিকভাবে কথার মাধ্যমে বায়'আত সম্পন্ন করতেন।"[২]

আর মুসনাদে আহমদ ও তাবারানীকৃত মুজামে হযরত আসমা বিনত আয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

---

১. ইবন হিশাম, ১খ. পৃ.১৬৩।

২ সহীহ বুখারী, ২খ. পৃ. ৭২৬।

إِنِّى لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ وَلٰكِنْ آخُذُ عَلَيْهِنَّ مَا أَخَذَ اللّٰهُ عَلَيْهِنَّ

"আমি স্ত্রীলোকদের সাথে মুসাফাহা করি না, শুধু আল্লাহর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করি।"

এ রিওয়ায়াত হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) সূত্রে তাবাকাতে ইবন সা'দ, মুসনাদে আহমদ এবং তিরমিযীতেও এসেছে। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। কাজেই আজকাল কোন কোন পীরের এর বিরোধী যে সব কাজ প্রচলিত আছে, ইসলাম এর বিরুদ্ধে। এর দ্বারা প্রতারিত হবেন না।[1]

আনসারীদের কাফেলা যখন মক্কা থেকে মদীনা পৌঁছল, তখন ইসলামের ঘোষণা দিলেন। মদীনার অধিকাংশ গোত্র পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু কিছু কিছু বৃদ্ধ ব্যক্তি পূর্বেকার মূর্তিপূজায় কঠোরভাবে নিবেদিত ছিল। এদের মধ্যে বনী সালামা গোত্রের সর্দার আমর ইবন জামুও ছিলেন। তার পুত্র মু'আয ইবন আমর ইবন জামু এইমাত্র মক্কা থেকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে ফিরছিলেন। আমর ইবন জামু কাঠের একটি মূর্তি বানিয়ে রেখেছিলেন, যাকে তিনি খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। এক রাতে খোদ তার পুত্র মু'আয ইবন আমর, মু'আয ইবন জাবাল এবং বনী সালামার কতিপয় মুসলমান যুবক আমরের মূর্তিটিকে নিয়ে গিয়ে একটি চৌবাচ্চায় উপুড় করে রেখে দিলেন। প্রভাত হলে আমর ইবন জামু দেখলেন, তার স্বঘোষিত খোদা উধাও হয়ে গেছে। আফসোস করে বললেন, না জানি কে আমার প্রভুকে নিয়ে পলায়ন করেছে। আর এর খোঁজে এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন। দেখলেন, সেটি একটি চৌবাচ্চায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সেখান থেকে বের করে একে গোসল করালেন এবং সুগন্ধি লাগালেন। যখন পরবর্তী রাত এল, ঐ ব্যক্তিগণ আবারো অনুরূপ কাজই করলেন যে, সেটিকে একটি গর্তে ফেলে দিলেন। প্রভাত হলে আমর ইবন জামু এটি খুঁজে নিয়ে এলেন, গোসল করালেন এবং সুগন্ধি লাগালেন।

যখন পরপর কয়েক দিন একই কাণ্ড ঘটল, তখন আমর ইবন জামু একটি তরবারি এনে ঐ মূর্তির কাঁধে রেখে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, আমি জানি না, কোন্ ব্যক্তি তোমার সাথে এমন ব্যবহার করে। তোমার মাঝে যদি কোন কল্যাণ ও গুণপনা থেকে থাকে, তা হলে এই তরবারি থাকল, তুমি নিজে তোমাকে রক্ষা কর। যখন রাত্রি হলো, তখন লোকে ঐ মূর্তির ঘাড় থেকে তরবারি সরিয়ে নিল এবং একটি মৃত কুকুর ও মূর্তিটিকে একই রশি দিয়ে বেঁধে একটি গর্তের উপর লটকিয়ে রাখল। সকালে যখন দেখলেন মূর্তিটি উধাও হয়েছে, আমর ইবন জামু এর খোঁজে বের হলেন। দেখলেন, ঐ মূর্তি এবং একটি মৃত কুকুর একই রশিতে বাঁধা অবস্থায় কূপের উপর ঝুলছে। এ দেখে তাঁর দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল এবং (মূর্তিটিকে উদ্দেশ্য করে) বললেন, আল্লাহর শপথ, যদি তুমি খোদা হতে, তবে এমন অপদস্থ হতে না।

---

১. কানযুল উম্মাল, ১খ. পৃ.২৬।

তিনি ইসলাম কবূল করলেন এবং এজন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শোকর আদায় করলেন যে, তিনি তাকে স্বীয় অনুগ্রহে পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন, অন্ধকে চক্ষুষ্মান বানিয়েছেন এবং তিনি এ.কবিতা বললেন :

وَاللّٰهِ لَوْ كُنْتُ اِلٰهًا لَمْ تَكُنْ ۞ اَنْتَ وَكَلْبُ وَسْطَبِئْرٍ فِى قَرَنَ

أُفْ لِمَلْقَاكَ اِلٰهًا مُسْتَدَنْ[১] ۞ اَلْاٰنَ فَتَّشْنَاكَ عَنْ سُوْءِ الْغَبَنْ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِّى ذِىْ الْمِنَنْ ۞ اَلْوَاهِبِ الرَّزَّاقِ دَيَّانَ الدِّيْنِ

هُوَ الَّذِىْ اَنْقَذَنِىْ مِنْ قَبْلِ اَنْ ۞ اَكُوْنُ فِى ظُلْمَةِ قَبْرٍ مُرْتَهَنْ

بِاَحْمَدَ الْمَهْدِىْ النَّبِىِّ الْمُؤْتَمَنْ

"আল্লাহর কসম, যদি তুমি খোদা হতে, তবে কূপের উপর একই রশিতে বাঁধা অবস্থায় ঝুলন্ত থাকতে না। তোমার খোদায়িত্বের জন্য আফসোস, আজ আমার কাছে আমার আহাম্মকী ও ভ্রান্ত ধারণা ধরা পড়ল। সমস্ত প্রশংসা সর্বশক্তিমান ঐ আল্লাহ তা'আলার, যিনি খুবই অনুগ্রহশীল, রিযকদাতা এবং প্রতিদান প্রদানকারী। আমি কবরের অন্ধকারে প্রোথিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহর হিদায়েতপ্রাপ্ত নবী মুহাম্মদ আমীন (সা)-এর বরকতে হিদায়েত লাভ করি। তিনিই আমাকে এ ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেছেন।"[২]

অধিকন্তু, তিনি এ কবিতাও পাঠ করেন :

اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مِمَّا مضى ۞ وَاَسْتَنْقِذُ اللّٰهَ من نَارِهِ

وَاُثْنِىْ عَلَيْهِ بِنَعْمَائِهِ ۞ اِلٰهَ الْحَرَامِ وَاَسْتَارِهِ

فَسُبْحَانَهُ عَدَدَ الْخَاطِئِيْنَ ۞ وَقَطْرِ السَّمَا وَمِدْرَارِهِ

هَدَانِىْ وَقَدْ كُنْتُ فِىْ ظُلْمَةٍ ۞ حَلِيْفَ مَنَاةَ وَاَحْجَارِهِ

وَاَنْقَذَنِى بَعْدَ شَيْبِ الْقَذَا ۞ ل من شَيْنِ ذَاكَ وَمِنْ غَارِهِ

فَقَدْ كِدتُ اَهْلَكَ فِىْ ظُلْمَةِ ۞ تَدَارَكَ ذَاكَ بِمِقْدَارِهِ

فَحَمْدًا وَشُكْرًا لَهُ مَا بَقِيْتُ ۞ اِلٰهَ الْاَنَامِ وَجَبَّارِهِ

"পূর্বে কৃত গুনাহরাশির জন্য আমি আল্লাহর নিকট তাওবা করছি এবং জাহান্নামের আগুন থেকে পানাহ চাচ্ছি। আর তাঁর নিয়ামতসমূহের শোকর আদায় করছি, যিনি বায়তুল হারাম এবং এর পর্দাসমূহের প্রভু। আর আমি তাঁর প্রশংসায় তাসবীহ এবং

---

১. অর্থাৎ বায়তুল্লাহর খিদমত এবং এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন। –রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ.২৮।

২. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১৬৫; ইবন হিশাম, ১খ. পৃ.১৫৮।

পবিত্রতা বর্ণনা করছি পাপীদের পরিমাণে আর বৃষ্টির ফোঁটার পরিমাণে। তিনি আমাকে সুপথ প্রদর্শন করেছেন এ অবস্থায় যে, আমি শিরকের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলাম আর ছিলাম মানাত ও এর সমগোত্রীয় প্রস্তরখণ্ডের মদদগার। বার্ধক্যের অবস্থায় আল্লাহ আমাকে এ ত্রুটি (মূর্তি পূজা) থেকে নিবৃত্ত করেন, এমতাবস্থায় যে, এ মূর্তিপূজার তমসা এবং মূর্খতার দরুন আমি ধ্বংস হয়ে যাব, ঈমান আনয়ন হলো আমার জন্য এর প্রতিষেধক। ইয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, যতদিন আমি জীবিত থাকি ততদিন পর্যন্ত সবসময় আমি তোমার প্রশংসা, স্তুতি ও শোকর করতেই থাকব। এর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনই আমার উদ্দেশ্য।"[১]

দ্রষ্টব্য : আল্লাহ তা'আলার নিয়ম এটাই যে, যখন নবী (আ) ও মুমিনগণ বিরোধিতাকারী ও মিথ্যাচারীদের অস্বীকৃতি ও মিথ্যাচারের সীমা অতিক্রম করে এবং নবীর সহচর ও অনুসারীগণের উপর বিপদ-মুসীবতের চূড়ান্ত পর্যায়ের কিছু অবশিষ্ট না থাকে, এমন কি পয়গাম্বরগণও তাদের সংশোধনের ব্যাপারে প্রায় নিরাশ হয়ে যান, তখন আল্লাহ তা'আলার সাহায্য-সহযোগিতা অবতীর্ণ হয়। যেমন আল্লাহ বলেন :

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনো তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি ? অর্থ-সঙ্কট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমন কি রাসূল ও তাঁর সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে ? হ্যাঁ, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।" (সূরা বাকারা : ২১৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

حَتّٰۤى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَاۤءَهُمْ نَصْرُنَا

"অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হলেন এবং মানুষ চিন্তা করল যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এলো।"

(সূরা ইউসুফ : ১১০)

অনুরূপভাবে যখন তাঁর এবং তাঁর সাহাবীগণের উপর মুসীবত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেল এবং তায়েফ ভ্রমণ তাদের সংশোধনের ব্যাপারে তাঁর অন্তরে এক ধরনের নৈরাশ্য সৃষ্টি করল, তখন তাঁদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের লক্ষণ প্রকাশ পেল এবং আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সহায়তা এসে পৌঁছলো। তা ছিল এই যে, আল্লাহ

---

১. দালাইলে আবূ নুয়াইম, ২খ. পৃ. ১১০।

তা'আলা আনসারগণকে তাঁকে এবং তাঁর দীনকে সাহায্য ও সহযোগিতা দানের জন্য মদীনা থেকে প্রেরণ করলেন। তারা এলেন এবং তাঁকে সাহায্য সহযোগিতার জন্য তাঁর পবিত্র হাতে বায়'আত গ্রহণ করে ফিরে গেলেন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

মদীনায় হিজরত, আল্লাহ তাঁর নূরকে বর্ধিত করুন

যেভাবে নবূয়াতের সূচনা সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে হয়েছিল, তেমনিভাবে হিজরতের সূচনাও সত্য স্বপ্নের মাধ্যমেই হয়েছিল। প্রথমে নবী (সা) কে স্বপ্নযোগে হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছিল। স্থানের নাম বলা হয়নি, বরং মোটামুটিভাবে কেবল এতটুকু দেখানো হয়েছিল যে, তিনি একটি খেজুর বাগান সমৃদ্ধ সবুজ-শ্যামল ভূমির দিকে হিজরত করছেন। ফলে তাঁর ধারণা হলো যে, সম্ভবত তা 'ইয়ামামা' কিংবা 'হিজর' হবে। তিনি এরূপ সফরের প্রতি দোদুল্যমান ছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহর ওহী মদীনা মুনাওয়ারা নির্দিষ্ট করে দেয়। তখন তিনি সাহাবীগণকে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন।[১]

অপর একটি হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা নবী (সা)-এর প্রতি এ ওহী নাযিল করলেন যে, মদীনা, বাহরাইন ও কিন্নাসরিন, এ তিন শহরের মধ্যে যে শহরেই গিয়ে আপনি অবস্থান করবেন, সেটাই হবে আপনার দারুল হিজরা বা হিজরত-ভূমি। তিরমিযী এবং বায়হাকী হযরত জারীর (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যেমনটি আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৩খ. পৃ. ১৬৮-তে বর্ণিত হয়েছে।

দ্রষ্টব্য : সম্মানিত মেহমানের সামনে যেমন বিভিন্ন স্থান ও ব্যবস্থাদি পেশ করা হয়, যাতে তিনি যা ইচ্ছা পসন্দ করে নিতে পারেন, অনুরূপভাবে সম্মান ও মর্যাদার কারণে নবী (সা)-কে হিজরতের জন্য বিভিন্ন স্থান দেখানো হয় আর শেষ পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারা চিহ্নিত ও নির্বাচিত করা হয়। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, আকাবার বায়'আত পরিপূর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীগণকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ শোনামাত্র গোপনভাবে হিজরতের ধারা শুরু হয়ে যায়। সর্ব প্রথম নবী (সা)-এর দুধ ভাই হযরত আবূ সালমা ইবন আবদুল আসাদ মাখযূমী (রা) নিজ স্ত্রী-সন্তান সহ হিজরতের ইচ্ছা করেন। কিন্তু হিজরত করাও খুব সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। যে ব্যক্তিই হিজরতের ইচ্ছা করতেন, কুরায়শগণ পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করত যাতে হিজরত করতে না পারেন। অন্যথায় ওরা নিজেদের অত্যাচার-উৎপীড়নের অনুশীলন কাদের উপর চালাবে? কাজেই যখন হযরত আবূ সালমা স্বীয় স্ত্রী ও সন্তান সহ হিজরতের প্রস্তুতি নিলেন, উটের পিঠে মাল-সামান বেঁধে নিলেন এবং স্ত্রী-সন্তানদের উটের পিঠে তুলেও দিলেন, এ সময় ওরা জেনে ফেলল। তাঁর স্ত্রী উম্মে সালমার (যিনি আবূ সালমার ইনতিকালের

---

১. যুরকানী, ১খ. পৃ. ৩১৮।

পর উম্মুল মু'মিনীনের অন্তর্ভুক্ত হন) আত্মীয়-স্বজন এসে বলল, তোমার নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তোমার আছে, কিন্তু আমাদের মেয়েকে তুমি নিয়ে যেতে পারো না। এ বলে তারা হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর হাত ধরে টেনে নামিয়ে নিল। আর এদিকে আবূ সালমার আত্মীয়-স্বজন এসে পৌঁছল এবং বলল, এ সন্তান আমাদের বংশের, সুতরাং এদের কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। ওরা উম্মে সালমার কোল থেকে সন্তান কেড়ে নিল। ফলে মা-বাবা এবং সন্তান পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আর হযরত আবূ সালমা (রা) একাকী মদীনার পথে যাত্রা করলেন। হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, প্রভাত হলেই আমি আল-বাতহায় গিয়ে বসে পড়তাম এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁদতে থাকতাম। এভাবে যখন একটি বছর কেটে গেল, তখন আমার মাতুল গোষ্ঠীর এক ব্যক্তির আমার প্রতি দয়া হল। সে বনী মুগীরাকে বলল, এ মিসকীনের জন্য তোমাদের দয়া হয় না ? ফলে বনী মুগীরা আমাকে মদীনা গমনের অনুমতি দান করে এবং বনী আসাদ আমাকে আমার সন্তান ফিরিয়ে দেয়। আমি সন্তানকে কোলে নিয়ে উটে আরোহণ করে একাকী মদীনার পথে যাত্রা করলাম।

যখন 'তানঈম' নামক স্থানে পৌঁছলাম, উসমান[1] ইবন তালহার সাথে সাক্ষাত হলো। আমাকে একাকী দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্‌দিকে যাওয়া হচ্ছে ? আমি বললাম, মদীনায় নিজ স্বামীর কাছে যাচ্ছি। বললেন, তোমার সাথে কেউ নেই ? আমি বললাম, لَا وَاللّٰهِ اِلَّا اللّٰهُ وَبُنَيَّ هٰذَا "আল্লাহর কসম, আল্লাহ এবং এ শিশু সন্তান ছাড়া কেউ নেই।" এ কথা শুনে উসমান ব্যথিত হলেন এবং উটের লাগাম ধরে আগে আগে চলতে শুরু করলেন। যখন কোন মনযিলে পৌঁছত, উটটি বসিয়ে তিনি পিছনে সরে যেতেন। যখন আমি নেমে পড়তাম, তিনি উটটি নিয়ে দূরে কোন গাছের সাথে বেঁধে নিজে ঐ গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতেন। যাত্রার সময় হলে উট নিয়ে এসে বসিয়ে দিয়ে নিজে পেছনে সরে যেতেন এবং বলতেন, আরোহণ কর। আমি সওয়ার হলে তিনি লাগাম ধরে চলতে থাকতেন। আবার যখন কোন মনযিল আসত, তিনি এরূপই করতেন। এমনকি এভাবেই মদীনায় পৌঁছে গেলাম। যখন দূর থেকে কুবার ঘরবাড়ি দৃষ্টিগোচর হলো, তখন তিনি বললেন, এ বস্তিতেই তোমার স্বামী থাকেন, আল্লাহর বরকতের সাথে ঐ বস্তিতে প্রবেশ কর। আমাকে স্বামীর কাছে পৌঁছে দিয়ে তিনি মক্কায় ফিরে গেলেন। আল্লাহর কসম, আমি উসমান ইবন তালহার চেয়ে শরীফ কোন ব্যক্তি দেখিনি।[2]

---

১. হযরত উসমান ইবন তালহা (রা) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদের সাথে মদীনায় হিজরত করেন। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত উসমান ইবন তালহা (রা) শাহাদতবরণ করেন। (রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ.২৮৪)।

২. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১৬৯।

এরপর হযরত আমির ইবন রবীয়া (রা) স্বীয় স্ত্রী হযরত লায়লা বিনতে খায়সামা (রা) সহ, অতঃপর হযরত আবূ আহমদ ইবন জাহশ (রা) এবং তাঁর ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহশ (রা) ঘরে তালা লাগিয়ে নিজ নিজ স্ত্রী-পরিজন সহ হিজরত করেন।

উতবা এবং আবূ জাহল দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিল, লোকজন একে একে মক্কা ত্যাগ করছে। মক্কার ঘরগুলো খালি এবং পরিত্যক্ত হয়ে যাচ্ছে। এ দেখে উতবার মন ব্যথিত হয়ে উঠল এবং নিঃশ্বাস ফেলে বলল :

كُلُّ دَارٍ وَاِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهَا   يَوْمًا سَتُدْرِكُهَا النَّكبَاءُ وَالْحُوْبُ

"প্রত্যেক গৃহ তা যতদিনেই বসবাসপূর্ণ ও আনন্দে গমগম করে উঠুক, কিন্তু একদিন না একদিন তা জনশূন্য ও বিষাদময় হয়ে যায়।"

অতঃপর বলল, এ সব কিছুই আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্রের কর্ম, যে আমাদের দলের মধ্যে মতপার্থক্য প্রবেশ করিয়েছে।

এরপর হযরত উকাশা ইবন মিহসান (রা), হযরত উকবা ইবন ওহাব (রা), হযরত শুজা ইবন ওহাব (রা), হযরত আরবাদ ইবন জুমায়রা (রা), হযরত মুনকিয ইবন নাবাতা (রা), হযরত সাঈদ ইবন রুকায়শ (রা), হযরত মিহরায ইবন নাযলা (রা), হযরত ইয়াযীদ ইবন রুকায়শ (রা), হযরত কায়স ইবন জাবির (রা), হযরত আমর ইবন মিহসান (রা), হযরত মালিক ইবন আমর (রা), হযরত সাফওয়ান ইবন আমর (রা), হযরত সাকীফ ইবন আমর (রা), হযরত রবীয়া ইবন আকতাম (রা), হযরত যুবায়র ইবন উবায়দ (রা), হযরত তামাম ইবন উবায়দা (রা), হযরত সাখরা ইবন উবায়দা (রা) এবং হযরত মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন জাহশ (রা)।

আর স্ত্রীলোকদের মধ্যে ছিলেন, হযরত যয়নব বিনতে জাহশ (রা), হযরত উম্মে হাবীবা বিনতে জাহশ (রা), হযরত জুযামা বিনতে জান্দল (রা), হযরত উম্মে কায়স বিনতে মিহসান (রা), হযরত উম্মে হাবীব বিনতে সুমামা (রা), হযরত উমায়না বিনতে রুকায়শ (রা), হযরত সাখবারা বিনতে তামীম (রা) এবং হযরত হামনা বিনতে জাহশ (রা)।

এঁদের হিজরতের পরপরই হযরত উমর (রা) এবং হযরত আয়্যাশ ইবন আবূ রবীয়া (রা) কুড়িজন অশ্বারোহীর সাথে মদীনা যাত্রা করেন।

হযরত হিশাম ইবন আস (রা)-ও হযরত উমর (রা)-এর সাথে হিজরতের ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁর গোত্রের লোকজন বাধার সৃষ্টি করে এবং তাঁকে হিজরত করা থেকে বিরত রাখে।

যখন হযরত উমর (রা) এবং হযরত আয়্যাশ ইবন আবূ রবীয়া (রা) মদীনায় পৌঁছে যান, তখন আবূ জাহল ইবন হিশাম এবং হারিস ইবন হিশাম (আবূ জাহলের ভাই, যিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন) উভয়ে মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হয় এবং বলে,

তোমার মা তো শপথ করেছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে না দেখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত চুলও আঁচড়াবে না এবং রোদ থেকে ছায়ায়ও যাবে না। এ কথা শুনে আয়্যাশের মন ব্যথিত হলো এবং তিনি আবূ জাহলের সাথে ফিরে চললেন। আবূ জাহল পথিমধ্যেই আয়্যাশের পানির মশক বেঁধে ফেলল এবং মক্কায় এনে তাঁকে দীর্ঘ দিন ধরে বন্দী করে রেখে নানা প্রকারে কষ্ট দিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামাযে কুনূতে নাযেলা পাঠ করতেন এবং তাঁর মুক্তির জন্য দু'আ করতেন :

اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ابى ربيعة

"আয় আল্লাহ ! তুমি ওলীদ ইবন ওলীদ, সালমা হিশাম এবং আয়্যাশ ইবন আবূ রবীয়াকে মুশরিকদের যুলুম-অত্যাচার থেকে নাজাত দাও।"

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁদের নাজাত দিলেন এবং তাঁরা পালিয়ে মদীনা পৌঁছলেন। যে সমস্ত ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর সাথে হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিলেন, তাঁদের নাম নিম্নরূপ :

হযরত যায়দ[1] ইবন খাত্তাব (রা) (হযরত উমর-এর বড় ভাই), সুরাকার দু'পুত্র হযরত আমর ইবন সুরাকা (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন সুরাকা (রা), হযরত খুনায়স ইবন হুযাফা সাহমী (রা), হযরত সাঈদ ইবন আমর ইবন নুফায়ল (রা), হযরত ওয়াকিদ ইবন আবদুল্লাহ তামিমী (রা), হযরত খাওলা ইবন খাওলা (রা), হযরত মালিক ইবন আবূ খাওলা (রা), বুকায়রের চার পুত্র হযরত আয়াস ইবন বুকায়র (রা), হযরত আমির ইবন বুকায়র (রা), হযরত আকিল ইবন বুকায়র (রা) এবং হযরত খালিদ ইবন বুকায়র (রা) হিজরত করে মদীনা পৌঁছেন।

এরপর হিজরতের এক ধারাবাহিকতা শুরু হয়। হযরত তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা), হযরত সুহায়ব ইবন সিনান (রা), হযরত হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা), হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা), হযরত আবূ মারসাদ কুনায ইবন হুসায়ন (রা), হযরত উনায়স (রা), হযরত আবূ কাবশা (রা), হযরত উবায়দা ইবন হারিস (রা) এবং তাঁর দু'ভাই হযরত তুফায়ল ইবন হারিস (রা) ও হযরত হুসায়ন ইবন হারিস (রা), হযরত মিসতাহ ইবন উসাসা (রা), হযরত সুয়াইত ইবন সা'দ (রা), হযরত তুলাইব ইবন উমায়র (রা), হযরত খাব্বাব ইবন আরাত (রা), হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা), হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা), হযরত আবূ সাবরা

---

১. হযরত যায়দ ইবন খাত্তাব (রা) প্রথম যুগের মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হিজরী দ্বাদশ বর্ষে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। হযরত উমর (রা)-এ নিকট যখন তাঁর শাহাদতের খবর পৌঁছে, তখন হযরত উমর খুবই ব্যথিত হন এবং বলেন, যায়দ দুটি উত্তম কাজেই আমার অগ্রগামী । তিনি আমার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আমার পূর্বেই শাহাদত লাভ করেন। (যারকানী, ১খ. পৃ. ৩২০)।

ইবন আবূ রুহম (রা), হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা), হযরত আবূ হুযায়ফা ইবন উতবা (রা), আবূ হুযায়ফার মুক্ত দাস হযরত সালিম (রা), হযরত উতবা ইবন গাযওয়ান (রা) ও হযরত উসমান ইবন আফফান (রা) হিজরত করে মদীনা পৌঁছেন। মোট কথা, ধীরে ধীরে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম হিজরত করে মদীনা পৌঁছে যান।

মক্কায় হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট কেবল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত আলী (ক) ছাড়া কেউই অবশিষ্ট ছিলেন না। তবে কিছু সংখ্যক অসহায় নিরাশ্রয় মুসলমান, যাঁরা কাফিরদের নির্যাতনের থাবায় আটকা পড়েছিলেন, তাঁরা ছাড়া।[১]

'দারুন নাদওয়ায়'[২] কুরায়শদের বৈঠক এবং রাসূল (সা) কে হত্যা করার পরামর্শ

কুরায়শগণ যখন দেখল যে, সাহাবীগণ ধীরে ধীরে হিজরত করে মদীনা চলে গেলেন, আর রাসূল (সা)ও আজকালের মধ্যেই প্রস্থানোদ্যত, তখন পরামর্শের জন্য নিম্নবর্ণিত কুরায়শ নেতৃবৃন্দ 'দারুন নাদওয়ায়' সমবেত হয় ঃ উতবা ইবন রবীয়া, শায়বা ইবন রবীয়া, আবূ সুফিয়ান ইবন হারব, তাইমা ইবন আদী, জুবায়র ইবন মুতইম, হারিস ইবন আমির, নাযর ইবন হারিস, আবুল বুখতারী ইবন হিশাম, যাম'আ ইবন আসওয়াদ, হাকীম ইবন হিযাম, আবূ জাহল ইবন হিশাম, হাজ্জাজের দু'পুত্র নবীয়াহ ও মুনবিয়াহ, উমায়্যা ইবন খালফ প্রমুখ। অভিশপ্ত শয়তান সেখানে এক বৃদ্ধের আকৃতিতে উপস্থিত হয় এবং দরজায় এসে দাঁড়ায়। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? সে বলল, আমি নজদের একজন শায়খ, তোমাদের কথাবার্তা শুনতে ইচ্ছুক। যদি সম্ভব হয় তবে স্বীয় মতামত ও পরামর্শ দিয়ে তোমাদের সাহায্য করব।

লোকেরা তাকে গৃহে প্রবেশের অনুমতি দিল এবং আলোচনা শুরু হলো। কেউ একজন বলল, তাঁকে কোন বদ্ধ কুঠরিতে আটক করে রাখা হোক। শায়খ নজদী

---

১. ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১৬৩।

২ মক্কায় এটি ছিল প্রথম গৃহ যা কুসাই ইবন কিলাব বিশেষ পরামর্শ সভার জন্য তৈরি করেছিলেন। যেখানে একত্রিত হয়ে লোকজন পরামর্শ করত। কুসাই ইবন কিলাবের পর তা বনী আবদেদ্দারের অধিকারে আসে এবং এ বংশের হযরত হাকিম ইবন হিযাম (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আমীর মুআবিয়া (রা)-এর খিলাফতকালে হাকিম (রা) তা এক লক্ষ দিরহামে বিক্রি করেন। তাঁর কতিপয় বন্ধু-বান্ধব এ মর্মে অভিযোগ করেন যে, পিতা-পিতামহের ঐতিহ্যের ধারক একটি স্মৃতিচিহ্নকে তুমি নিজ হাতে হারিয়ে ফেললে ? হাকিম (রা) বিজ্ঞতাসূচক জবাব দিলেন যে, আল্লাহর কসম, আল্লাহ-ভীতি ও পরহেযগারী ছাড়া সমস্ত মর্যাদা ও আভিজাত্য খতম হয়ে গিয়েছে। আল্লাহর শপথ, আমি জাহিলী যুগে এক মশক শরাবের বিনিময়ে এটি কিনেছিলাম, আর এক্ষণে তা এক লক্ষ দিরহামে বিক্রি করলাম। তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি এ এক লক্ষ দিরহামের সম্পূর্ণটাই আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিচ্ছি। বল, ক্ষতিটা কি হলো। মুয়াত্তার সনদ সূত্রে দারু কুতনী হাদীসটি বর্ণনা করেন। (যারকানী, ১খ. পৃ. ৩২১)।

বলল, এ সিদ্ধান্ত সঠিক নয় এ জন্যে যে, তাঁর সঙ্গীগণ যদি তা শুনতে পায়, তা হলে তোমাদের উপর হামলা করবে এবং তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। কেউ বলল, তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হোক। শায়খ নজদী বলল, এ সিদ্ধান্ত তো পুরোটাই ভুল। তোমরা কি তাঁর সৌন্দর্য ও মাধুর্যমণ্ডিত, হৃদয়গ্রাহী ও মনকে আচ্ছন্নকারী কথা শোননি ? যদি তাঁকে এখান থেকে বের করে দেয়া হয়, তা হলে আশংকা আছে যে, অপর শহরের লোকেরা তাঁর কথা শুনে ঈমান আনবে এবং তাঁরা সবাই মিলে তোমাদের উপর চড়াও হবে।

আবূ জাহল বলল, আমার সিদ্ধান্ত হলো না তাঁকে বন্দী করা হবে, আর না তাঁকে বহিষ্কার করা হবে; বরং প্রতিটি গোত্র থেকে এক-একজন যুবক নির্বাচন করা হোক, আর তারা সবাই মিলে একযোগে মুহাম্মদ (সা) কে হত্যা করুক। এত করে মুহাম্মদ (সা)-এর খুনের দায় সকল গোত্রের উপর বর্তাবে আর বনী আবদে মানাফ সমস্ত গোত্রের বিরুদ্ধে একা লড়াই করতে সক্ষম হবে না, বরং অগত্যা তারা রক্তপণের দ্বারা এ বিষয় নিষ্পত্তি করবে।

শায়খ নজদী বলল, কসম আল্লাহর, রায় তো এটাই। আর সভায় উপস্থিত সবাই এ রায়কে খুবই পসন্দ করল।[1]

আর এটাও সিদ্ধান্ত হলো যে, কাজটা আজ রাতের মধ্যেই শেষ করতে হবে। এদিকে সভা সমাপ্ত হলো আর ওদিকে হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহর বাণী নিয়ে উপস্থিত হলেন :

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ

"স্মরণ কর, কাফিরগণ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা করার অথবা নির্বাসিত করার জন্য এবং তারা ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহও কৌশল করেন। আর আল্লাহই কুশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" (সূরা আনফাল : ৩০)

আর সমুদয় ঘটনা তাঁকে অবহিত করেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি পৌঁছে যায়। সাথে এ দু'আ শিখিয়ে দেয়া হয় :

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

"বল, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সাথে এবং আমাকে নিষ্ক্রান্ত করাও কল্যাণের সাথে এবং তোমার নিকট হতে আমাকে দান করো সাহায্যকারী শক্তি।" (সূরা ইসরা : ৮০)

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ১৫২; উয়ূনুল আসার, ১খ.পৃ.১৭৭।

তিরমিযী হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং তিনি একে সহীহ বলেছেন এবং হাকিমও মুস্তাদরাকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ.১৭৭ ও যারকানী, ১খ. পৃ. ৩২৪)

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) হযরত জিবরাঈল (আ) কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সাথে কে হিজরত করবে ? জিবরাঈল বললেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। এটি হাকিমের বর্ণনা এবং তিনি বলেন, এর সনদ সহীহ, আর যাহবী বলেন, হাদীসটি সহীহ-গরীব।[১]

সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) দুপুর বেলায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর গৃহে আগমন করেন এবং বলেন আমাকে হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবূ বকর আরয করলেন, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ অধমের কি আপনার সহযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হতে পারে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

ইবন ইসহাকের বর্ণনামতে, এ কথা শুনে আবূ বকর কেঁদে ফেলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এর আগে আমার ধারণা ছিল না যে, খুশির দরুনও কেউ কাঁদতে পারে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) পূর্বে থেকেই হিজরতের উদ্দেশ্যে দুটি উট প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। চার মাস থেকে সেগুলোকে বাবলা পাতা খাওয়ানো হচ্ছিল। তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, (আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক) এ দুটির মধ্য থেকে যেটি আপনার পসন্দ হয়, গ্রহণ করুন; আমি আপনাকে হাদিয়া দিচ্ছি। তিনি বললেন, আমি বিনামূল্যে গ্রহণ করব না।

তাবারানীর মু'জাম গ্রন্থে হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আবূ বকর বললেন উত্তম, যদি আপনি মূল্য দিয়ে নিতে চান তবে মূল্য দিয়েই গ্রহণ করুন।[২]

এর অর্থ হলো, আমার নিজস্ব ইচ্ছা বলতে কিছুই নেই, আমার সমস্ত ইচ্ছা ও সমস্ত আগ্রহ আপনারই ইঙ্গিতের আজ্ঞাবহ।

এ স্থলে কিছু লোকের মনে এ সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) উটনীর মূল্যের চেয়েও পবিত্র সত্তার [নবী (সা)]-এর জন্য অধিক ব্যয় করেছিলেন এবং নবী (সা) তা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং সহীহ বুখারীর হাদীসে এসেছে, [রাসূল (সা) বলেছেন] আবূ বকর তার জান ও মাল দিয়ে আমার যতটা উপকার করেছেন, অন্য কেউ তা করেনি।

আর তিরমিযীতে রয়েছে, [রাসূল (সা) বলেছেন] যে ব্যক্তি আমার প্রতি যতটা অনুগ্রহ করেছে, আমি তার প্রতিদান দিয়েছি। কেবল আবূ বকর ছাড়া, তার অনুগ্রহের

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ.২২৬।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮৩।

বদলা কেবল কিয়ামতের দিন আল্লাহই দেবেন। এ জন্যে সন্দেহ হয় যে, ঐ সময় তিনি উটনীর মূল্য দেয়ার প্রতি কেন জোর দিয়েছিলেন।

এর উত্তর হলো, হিজরত একটা বড় ধরনের ইবাদত, আল্লাহ তা'আলা ঈমানের পরেই এর উল্লেখ করেছেন। এ জন্যে তিনি এ বিরাট ইবাদতে কাউকে অংশীদার করতে চাননি। তিনি চাচ্ছিলেন যে, আল্লাহর রাহে হিজরত শুধু নিজের জান ও মাল দ্বারা আদায় হোক।[১]

ফায়েদা

ওয়াকিদী বলেন, ঐ উটনীটির নাম ছিল কাসওয়া। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, এর নাম ছিল জুদ'আ। (বুখারী বাবু গাযওয়াতুর রাজী')।[২]

ওয়াকিদী বলেন, ঐ উটনীটির মূল্য ছিল আটশত দিরহাম। আল্লামা যারকানী বলেন, বিশুদ্ধ মত হলো এর মূল্য ছিল চারশত দিরহাম, আটশত দিরহাম ছিল দুটি উটনীর মূল্য।

অতএব হযরত আয়েশা (রা) এর এক রিওয়ায়াতে এর সমাধান দেয়া হয়েছে যে وَكَانَ اَبُوْبَكْرٍ اشْتَرَاهُمَا بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ "আবূ বকর (রা) দুটি উটনী আটশত দিরহাম দিয়ে কিনেছিলেন।"[৩]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত জিবরাঈল (আ) এসে নবী (সা) কে কুরায়শদের পরামর্শের খবর দেন এবং এ পরামর্শ দেন যে, আজ রাতটি আপনি নিজ গৃহে থাকবেন না (বায়হাকী)।[৪]

সুতরাং যখন রাত এলো এবং অন্ধকার ছেয়ে গেল, তখন কুরায়শরা[৫] কৃত ওয়াদা মাফিক এসে তাঁর গৃহ ঘিরে ফেলল, যাতে তিনি যখন ঘুমিয়ে পড়বেন তখন হামলা করতে পারে। নবী (সা) হযরত আলী (রা) কে নির্দেশ দিলেন যে, আমার সবুজ চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে পড়। আর ভয় করো না, কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কুরায়শগণ যদিও তাঁর দুশমন ছিল, কিন্তু তাঁকে সত্যবাদী ও আমানতদার বলেই জানত এবং নিজেদের গচ্ছিত দ্রব্য তাঁরই কাছে জমা রাখত। তিনি এ সমস্ত আমানত হযরত আলী (রা)-এর যিম্মায় দিয়ে দিলেন যাতে প্রভাতে এ আমানত এর মালিকদের পৌঁছে দিতে পারেন।

---

১. রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ.৩।

২ যারকানী, ১খ. পৃ.৩২৭।

৩. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ১৫৩।

৪. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৮৫।

৫. যে সমস্ত ব্যক্তি তাঁর গৃহ ঘেরাও করে রেখেছিল, তাদের নাম নিম্নরূপ ঃ আবূ জাহল, হাকাম ইবন আস, উকবা ইবন আবূ মুয়াইত, নাযর ইবন হারিস, উমায়্যা ইবন খালফ, ইবন আতিয়্যা, যাম'আ ইবন আসওয়াদ, তায়মা ইবন আদী, আবূ লাহাব, উবাই ইবন খালফ, হাজ্জাজের দু'পুত্র নবিয়্যাহ ও মুনাব্বাহ। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ.১৫৪)।

অভিশপ্ত আবূ জাহল বাইরে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে লোকদের বলছিল যে, মুহাম্মদ (সা)-এর ধারণা হলো, যদি তোমরা তাঁর অনুসরণ কর, তা হলে পৃথিবীতে আরব ও আজমের বাদশাহ হবে আর মৃত্যুর পর উন্নত জান্নাত লাভ হবে। আর যদি ঈমান না আনো, তা হলে পৃথিবীতে তাঁর অনুসারীদের হাতে নিহত হবে এবং মৃত্যুর পর জাহান্নামে জ্বলবে।

নবী আকরাম (সা) নিজ গৃহে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং বললেন, হ্যাঁ, আমি তাই বলছি আর তুমিও তাদেরই মধ্যকার একজন, যে পৃথিবীতে আমার অনুসারীদের হাতে নিহত হবে এবং মৃত্যুর পর জাহান্নামে জ্বলবে। আর ঐ মুষ্টি মাটির উপর সূরা ইয়াসীনের আয়াত فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ "অতঃপর তাদের আচ্ছন্ন করে ফেললাম; ফলে তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না" পর্যন্ত পাঠ করে তাদের মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাদের চোখে পর্দা দিয়ে দিলেন এবং তিনি ওদের সামনে দিয়েই চলে গেলেন কিন্তু কেউই দেখতে পেল না।[১]

তিনি ওদের সামনে থেকে বেরিয়ে হযরত আবূ বকর (রা)-এর গৃহে গেলেন এবং তাঁকে সাথে নিয়ে সাওর পাহাড়ের পথ ধরলেন। সেখানে গিয়ে একটি গুহায় আত্মগোপন করলেন।

ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর গৃহের পাশ দিয়ে অতিক্রম করাকালে কুরায়শদের দলকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কেন দাঁড়িয়ে আছ এবং কার অপেক্ষা করছ ? ওরা বলল, আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর অপেক্ষা করছি যে, তিনি বেরোলেই তাঁকে হত্যা করব। লোকটি বলল, আল্লাহ তোমাদের ব্যর্থ করুন, মুহাম্মদ (সা) তো তোমাদের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে চলে গেছেন।

যখন প্রভাত হলো এবং হযরত আলী (রা) তাঁর বিছানা থেকে উঠলেন, তখন ওরা বলতে থাকল, আল্লাহর কসম, ঐ ব্যক্তি সত্য কথা বলেছিল; এবং অত্যন্ত লজ্জিতভাবে হযরত আলী (রা) কে প্রশ্ন করল, মুহাম্মদ (সা) কোথায় ? হযরত আলী (রা) বললেন, আমি জানি না।[২]

এ রিওয়ায়াত তাবাকাতে ইবন সা'দে হযরত আলী (রা), হযরত ইবন আব্বাস (রা), হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা), হযরত আয়েশা বিনতে কুদামা (রা) এবং হযরত সুরাকা ইবন জুশুম (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

ফায়েদা

কুরায়শ কাফিরগণ সমস্ত রাত তাঁর গৃহ তো ঘিরে রেখেছিল, কিন্তু তারা গৃহের অভ্যন্তরে এ জন্যে প্রবেশ করেনি যে, স্ত্রীলোক থাকতে পারে এমন কোন গৃহে প্রবেশ করাকে তারা দূষণীয় মনে করত। পরে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা মুকাররামা থেকে

---

১. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১৭৯।

২ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ.১৭৬।

রওয়ানা হলেন তখন একটি টিলার উপর উঠে মক্কার দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং বললেন :

وَاللّٰهِ اِنَّكَ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ وَاَحَبُّ اَرْضِ اِلَى اللّٰهِ وَلَوْلاَ اَنِّىْ اُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ

"আল্লাহর কসম, অত্যন্ত উত্তম এ যমীন, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় যমীন, যদি আমাকে বহিষ্কার করা না হতো, আমি এখান থেকে কখনই বের হতাম না।" হাকিম বলেন, হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের নিকট সহীহ।[১]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ঐ সময় এ কথা বলেছিলেন :

مَا اَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَاَحَبَّكِ اِلَىَّ وَلَوْلاَ اَنَّ قَوْمِىْ اَخْرَجُوْنِىْ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ

"তুমি কতই না পবিত্র শহর, আর আমার কাছে বড়ই প্রিয়, যদি আমার কওম আমাকে বের করে না দিত, আমি অন্য কোন জায়গায় আশ্রয় নিতাম না।" হাদীসটি ইমাম আহমদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদীসটি সহীহ বলেছেন।[২]

ফায়েদা

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেল যে, মক্কা মুকাররামা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে উত্তম। আর এটাই অধিকাংশ আলিমদের অভিমত।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা হযরত আসমা (রা) সফরের জন্য নাশতা প্রস্তুত করেন। তাড়াতাড়ি করার কারণে রশির বদলে ফিতা ছিঁড়ে নাশতার পোটলা বেঁধে দেন।[৩] ঐ দিন থেকে হযরত আসমা (রা) 'যাতুন-নাতাকায়ন' (দুই ফিতার অধিকারিণী) নামে অভিহিত হন। ইবন সা'দ-এর বর্ণনায় আছে যে, তিনি এক টুকরা দিয়ে নাশতার পোটলা বাঁধেন এবং আরেক টুকরা দিয়ে মশকের মুখ বেঁধে দেন। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর, যিনি ছিলেন আবূ বকরের প্রিয় পুত্র এবং যুবক, তিনি সারা দিন মক্কায় অবস্থান করতেন এবং রাত্রিবেলা কুরায়শদের খবরাদি পৌঁছিয়ে দিতেন এবং হযরত আবূ বকরের মুক্ত দাস হযরত আমির ইবন ফুহায়রা বকরী চরাতেন আর ইশার সময়ে এসে রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত আবূ বকর (রা) কে দুধপান করাতেন।[৪]

---

১. মুস্তাদরাক, ৩খ. পৃ.৭।

২ যারকানী, ১খ. পৃ. ৩২৮।

৩. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ১৫৪।

৪. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১৮৪।

আবদুল্লাহ ইবন আরিকত[১] দুয়ালীকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পথপ্রদর্শক নিয়োগ করা হয়, যাতে অজ্ঞাত পথ দিয়ে তাঁদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়। আবদুল্লাহ ইবন আরিকত যদিও ধর্মীয় দিক থেকে কাফির ও মুশরিক ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত আবূ বকর (রা) তার প্রতি নির্ভর ও আস্থা রেখেছিলেন (সহীহ বুখারী, হিজরত অধ্যায়)। আর উটনী দুটি তাকে সোপর্দ করা হয়, যাতে সে তৃতীয় দিনে সে দুটিকে নিয়ে সাওর গুহায় উপস্থিত হয় এবং তাঁদের নিয়ে মদীনায় রওয়ানা হতে পারে।

ফায়েদা

রাস্তা স্বয়ং হুযূর (সা)-ই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এবং কাফিরকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সহযাত্রী করেছিলেন, যাতে সে তাঁর উটের লাগাম ধরে অগ্রসর হয়। এর দ্বারা জানা গেল যে, যদি কোন কাফির বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার থেকে সেবা গ্রহণ করা জায়েয। এ কাফির হুযূর (সা)-এর মজুর এবং আজ্ঞাবহ ছিল। আল্লাহ থেকে পানাহ চাই, নেতা ও সর্দার ছিল না। এ হাদীস থেকে কাফিরদের দ্বারা মজুরীর বিনিময়ে কাজ করানো ও সেবা গ্রহণ বৈধ বলে জানা গেল। কিন্তু কাফির ও মুশরিককে নিজের নেতা ও সর্দার মনোনীত করা বৈধ বলে এর দ্বারা কখনই প্রমাণিত হয় না।

সাওর গুহা

মোট কথা, রাতের বেলায়ই এ দুই শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয়ে সাওর গুহার দিকে যাত্রা করেছিলেন। 'দালাইলে বায়হাকী'তে মুহাম্মদ ইবন সীরীন থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি গুহার দিকে রওয়ানা হলেন, তখন তাঁর গুহার সাথী, নিখাদ প্রাণের বন্ধু, বিশিষ্ট সঙ্গীর অস্থিরতা ও অস্বস্তি ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের। কখনো তিনি তাঁর সামনে চলছিলেন, কখনো পিছনে, কখনো ডাইনে আবার কখনো বামে। শেষ পর্যন্ত তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওহে আবূ বকর, এ কি ব্যাপার কখনো আগে চলছ, আর কখনো পিছে ? আবূ বকর আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যখন মনে হয় পিছন থেকে কেউ হয়ত আপনার সন্ধানে আসছে, তখন পিছে চলি। আর যখন মনে হয়, কোন বাঁকে কেউ ওঁৎ পেতে আছে তখন সামনে চলি। তিনি (সা) ইরশাদ করলেন, ওহে আবূ বকর, এর দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য এটাই যে, তুমি নিহত হও আর আমি বেঁচে থাকি ? আবূ বকর (রা) আরয করলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ; ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এটাই চাই যে, আপনি রক্ষা পান আর আমি নিহত হই। যখন গুহার নিকটে পৌঁছলেন, তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সামান্য অপেক্ষা করুন, আমি ভিতরটা

---

১. ইমাম নববী বলেন, আবদ ইবন আরিকত ইসলাম গ্রহণ করেছে কিনা, তা আমার জানা নেই। (ওয়াফা উল ওয়াফা, ১খ. পৃ. ১৬৯)।

পরিষ্কার করে নিই। হাফিয আসকালানী এ রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করে বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আবূ মুলায়কা এবং হাসান বসরী (র) থেকে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।[১]

দালাইলে বায়হাকীতে যাবতা ইবন মিহসান থেকে বর্ণিত যে, হযরত উমর (রা)-এর সামনে যখন হযরত আবূ বকর (রা)-এর উল্লেখ করা হতো, তখন তিনি বলতেন, আবূ বকর (রা)-এর এক রাত ও এক দিনের ইবাদত উমরের সারা জীবনের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। রাত বলতে ঐ গুহার রাতের ঘটনা বুঝানো হতো যা এখনই বলা হয়েছে। আর দিন বলতে ঐ দিনের কথা বলা হয়েছে, যখন নবী (সা) ওফাত লাভ করেছেন এবং আরবের অনেক গোত্র ধর্মত্যাগী হয়ে গেল সেই সময়ে আমি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আরয করলাম, হে রাসূলের খলীফা, আপনি কিছুটা নমনীয় হোন এবং সমঝোতার মাধ্যমে কাজ করুন। আবূ বকর রাগান্বিত হয়ে বললেন : خيار فى الجاهلية وخوار فى الاسلام "জাহিলিয়াতের যামানায় তো তুমি শক্তিশালী ও সাহসী ছিলে, আর ইসলামে প্রবেশ করে ভীরু হয়ে গেলে !" বল দেখি, সত্যিকারের কোন্ বিষয়ে ওদের সাথে সমঝোতা করব ? রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন এবং ওহী বন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম, যদি ঐ লোকেরা সে রশিটি পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করে, যা রাসূলুল্লাহর সময় দিয়ে থাকত, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। উমর (রা) বলেন, অতঃপর আমরা আবূ বকরের নির্দেশে জিহাদ করি এবং আল্লাহ তা'আলা আবূ বকরের মাধ্যমে ঐ সমস্ত লোককে ইসলামে পুনঃ প্রবেশ করান, যারা ইসলাম থেকে পলায়ন করেছিল। এটাই ছিল আবূ বকরের সেই দিন, যার বিনিময় উমর (রা) তাঁর সমস্ত জীবনের ইবাদত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন।[২]

আর এ রিওয়ায়াত মুস্তাদরাকে হাকিমেও বর্ণিত আছে। হাকিম বলেন, যদি এ রিওয়ায়াত মুরসাল না হতো, তা হলে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ হতো। হাফিয যাহবী বলেন, হাদীসটি সহীহ মুরসাল। হযরত আবূ বকর (রা) প্রথমে গুহায় অবতরণ করেন এবং এরপর রাসূলুল্লাহ (সা)ও অবতরণ করেন। আর আল্লাহর হুকুমে গুহার মুখে এক মাকড়সা এসে জাল বোনে। এ রিওয়ায়াত তাবাকাতে ইবন সা'দ-এ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা), হযরত ইবন আব্বাস (রা), হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (রা), হযরত আয়েশা বিনতে কুদামা (রা) এবং হযরত সুরাকা ইবন জুশুম (রা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি সূত্রের বর্ণনাকারীগণ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী।

মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলে হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে, কুরায়শগণ সারা রাত তাঁর গৃহ ঘেরাও করে রাখে। যখন সকাল হলো, তখন

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮৫।

২ দুররে মানসূর, ৩খ. পৃ. ২৪১।

হযরত আলী (রা) কে তাঁর বিছানা থেকে উঠতে দেখল। ওরা তাঁর বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল যে, তিনি কোথায়। হযরত আলী (রা) জবাব দিলেন, আমার জানা নেই। তখনই তারা তাঁর সন্ধানে দিকে দিকে ছুটে গেল। খুঁজতে খুঁজতে গুহা পর্যন্ত পৌঁছল। তখন গুহার প্রবেশ পথে মাকড়সার জাল দেখে বলল :

فَرُّوْا عَلَى بَابِهِ نَسَجَ الْعَنْكَبُوْتِ فَقَالُوْا لَوْ دَخَلَ هُنَا لَمْ يَكُنْ نَسِيْجُ الْعَنْكَبُوْتِ عَلَى بَابِهِ

"যদি এর মধ্যে কেউ প্রবেশ করত, তবে মাকড়সার জাল অবশিষ্ট থাকত না।"

হাফিয আসকালানী[১] বলেন, হাদীসটির সনদ হাসান।[২] হাফিয ইবন কাসীর আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া গ্রন্থে বলেন, এর সনদ হাসান, গুহার মুখে মাকড়সার জাল তৈরির ঘটনা সম্বলিত যতগুলো বর্ণনা পাওয়া যায়, সবগুলোই উত্তম সনদে বর্ণিত।

আবূ মুস'আব মক্কী বলেন, আমি হযরত আনাস ইবন মালিক (রা), হযরত যায়দ ইবন আরকাম (রা) এবং হযরত মুগীরা ইবন শুবা (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সাওর গুহায় আশ্রয় নিলেন, তখন আল্লাহর নির্দেশে তাঁর সামনে একটি বৃক্ষ এগিয়ে এলো আর একজোড়া বন্য কবুতর এসে সেখানে ডিম দিল। মুশরিকগণ যখন খুঁজতে খুঁজতে গুহা পর্যন্ত পৌঁছল, তখন কবুতরের বাসা দেখে ফিরে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের থেকে ওদেরকে নিরাশ করলেন।[৩]

সতর্ক বাণী

এ ঘটনা হাদীসের কিতাবসমূহে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে। যদিও কতিপয় বর্ণনাকারী দুর্বল, কিন্তু ঐক্যবদ্ধভাবে তা শক্তিশালী ও মযবূত হয়ে যায়, যা মুহাদ্দিসীন পরম্পরায় 'হাসান লি-গায়রিহী' পর্যায়ে পৌঁছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী এবং মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা) আমাকে বলেন, যখন আমি এবং রাসূলুল্লাহ (সা) গুহায় ছিলাম আর কুরায়শগণ রখুঁজতে খুঁজতে গুহার মুখে এসে দাঁড়াল, তখন আমি তাঁকে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওদের মধ্যে কারো দৃষ্টি যদি নিজের পায়ের দিকে পড়ে, তা হলে অবশ্যই আমাদের দেখে ফেলবে। তিনি ইরশাদ করলেন :

---

১. হাফিয আসকালানীর বাক্যগুলো ছিল এরূপ ঃ 'আহমদ হাদীসটি হযরত আব্বাস (রা) থেকে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।' আর হাফিয ইবন কাসীর মুসনাদে আহমদের বর্ণনা বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করে বলেন ঃ وهذا اسناد حسن وهو من وجود ما روى قصة نسج العنكبوت على فم الغار وذالك من حماية الله رسول الله ﷺ (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ ১৮১)।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮৪।

৩. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ১৫৪।

مَا ظَنُّكَ يَا اَبَابَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اَللّٰهُ ثَالِثُهُمَا "ওহে আবূ বকর, ঐ দুয়ের ব্যাপারে তোমার কি ধারণা, যার তৃতীয়জন হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা ?"

অর্থাৎ আমরা কেবল দু'জনই নই, বরং আমাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন, যিনি আমাদেরকে ঐ শত্রুদের ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখবেন।

যুহরী এবং উরওয়া ইবন যুবায়র থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি দেখলেন আবূ বকর খুবই বিমর্ষ এবং চিন্তিত, তখন ইরশাদ করলেন : لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا "তুমি মোটেও চিন্তান্বিত হবে না, অবশ্যই আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।"

আর আবূ বকরের অন্তরের প্রশান্তির জন্য দু'আও করলেন। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে আবূ বকরের প্রতি এক বিশেষ প্রশান্তি ও এক বিশেষ স্বস্তি দান করে আয়াত নাযিল হলো। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اِذْهُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর স্বীয় প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সেনাবাহিনী দিয়ে যা তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন, আল্লাহর কথাই সর্বোপরি। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবা ৪০; দালাইলে আবূ নুয়াইম, পৃ. ১১২; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ.১০, মানাকিবে আবূ বকর অধ্যায়)।

সূক্ষ্ম তত্ত্ব কথা

(تحقيق نزول آية الغار درباره يار غار سيد الابرار عليه افضل الصلوات واكمل التحيات وعلى آله وازواجه الطاهرات وعلى اصحابه الذين هم كانوا نجوم الهداية للبريات لاسيما على صاحبه فى الغار وفى الحيات وبعد الممات ورفيقه فى الدنيا وصاحبه على الحوض وفى روضات الجنات)

এর পূর্বে আমরা গুহা সম্পর্কিত আয়াতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব কথা পাঠকদের উপহার দিব। এটাই যথার্থ মনে করি যে, প্রথমত সম্পূর্ণ আয়াতটি তরজমাসহ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যাতে পাঠকবর্গের বুঝতে কোন কষ্ট পেতে না হয়। তা হলো এই :

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর তবে স্মরণ কর, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিরগণ তাকে বহিষ্কার করেছিল এবং সে ছিল দুইজনের একজন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, [অর্থাৎ সফরে কেবল দু'জনই ছিলেন, একজন রাসূল (সা) এবং অপরজন আবূ বকর সিদ্দীক (রা), এ দু'জন ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তি সঙ্গী ছিল না, যার নিকট থেকে কোন সাহায্যের আশা করা যেতে পারে]। সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন (অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ও নিরাপত্তা আমাদের সাথে আছে)। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার উপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সেনাবাহিনী দিয়ে যা তোমরা দেখনি (অর্থাৎ প্রকাশ্য কোন কারণ ছাড়াই সৈন্য দ্বারা সাওর গুহার হিফাযত করেন) এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন (যে গুহার কিনার থেকে দুশমনদের ব্যর্থতার সাথে ফিরিয়ে দেন), আল্লাহর কথাই সর্বোপরি। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (যে তিনি স্বীয় নবী এবং তাঁর সাথীকে দুশমনের চক্র থেকে বের করে নিরাপদে মদীনা পৌঁছে দেন)।" (সূরা তাওবা ঃ ৪০)

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর যে ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করেছেন, উম্মতের কারো ভাগ্যে তার এক-দশমাংশও জোটেনি। আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর যে ফযীলত এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, এক্ষণে আমরা তা সামষ্টিকভাবে বর্ণনা করব।

[১]

নিকৃষ্ট কাফিরগণ যখন মুহাম্মদ (সা) কে হত্যা করার জন্য সিদ্ধান্ত নিল এবং সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে হত্যা করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হলো, তখন আল্লাহর নির্দেশে তিনি হিজরতের ইচ্ছা করলেন এবং আল্লাহর নির্দেশেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কে নিজের সফরসঙ্গী করলেন। যদি পরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট আবূ বকর নিষ্ঠাবান, প্রকৃত ঈমানদার এবং নবী (সা)-এর সত্যিকারের আশিক না হতেন, তা হলে এ সংকটময় মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা কখনই তাঁকে সঙ্গে নেয়ার অনুমতি দিতেন না। অনুরূপভাবে স্বয়ং পয়গাম্বরেরও যদি তাঁর সত্যবাদিতা, ভালবাসা, আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা না থাকত, তা হলে কখনই আবূ বকর সিদ্দীককে এ ধরনের সফরে নিজের সফরসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করতেন না।

[২]

হযরত আলী (রা), হাসান বসরী এবং সুফিয়ান সাওরী (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সাহায্য না করার জন্য সারা বিশ্বের প্রতি অসন্তুষ্ট হন; কিন্তু শুধু আবূ বকরকে এ অসন্তুষ্টির বাইরে রাখেন। আর কেবল বাইরে রাখাই নয়, বরং সংকটপূর্ণ দুঃসময়ে রাসূল (সা) কে সাহচর্যদান, সঙ্গ এবং সাহায্য করার জন্য তাঁর উল্লেখ প্রশংসার সাথে করেছেন।

[৩] ثَانِىَ اثْنَيْنِ দু'জনের দ্বিতীয়জন

আল্লাহ তা'আলা 'দু'জনের দ্বিতীয়জন' বাক্য দ্বারা প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা)-এর পর মর্যাদার দিক থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, 'দু'জনের দ্বিতীয়জন' শব্দটি এ কথার দলীল যে, নবী করীম (সা)-এর পর খলীফা আবূ বকর (রা)-ই হবেন। কেননা, খলীফা বাদশাহর পরবর্তীজনই হয়ে থাকেন।[১]

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন নবী করীম (সা) হযরত হাসসান ইবন সাবিত (রা)-কে বললেন, তুমি কি আবূ বকরের নামেও কোন কবিতা বলেছ? হাসসান বললেন, হ্যাঁ। নবী (সা) বললেন, বল, আমি শুনছি। হাসসান বললেন :

وثانى اثنين فى الغار المنيف وقد   طاف العدويه اصعد الجبلا

وكان حب رسول الله قد علموا   من البرية لم يعدل به رجلا

ইবন আদী ও ইবন আসাকির ইমাম যুহরী সূত্রে হযরত আনাস (রা) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

[৪] اِذْهُمَا فِى الْغَارِ যখন তারা ছিল গুহায়

আল্লাহ তা'আলা 'যখন তারা ছিল গুহায়' বাক্য দ্বারা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর গুহার বন্ধু হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করে দিয়েছেন, তখন থেকেই 'গুহার বন্ধু' বাক্যটি প্রবাদ বাক্য হিসেবে প্রচলিত হয়েছে। যে ব্যক্তি বন্ধুর সুখে-দুঃখে তার হক আদায় করে, পরিভাষাগতভাবে তাকে 'গুহার বন্ধু' বলা হয়।

[৫] لِصَاحِبِه তার সাথীর জন্য

আল্লাহ তা'আলা 'তার সাথীর জন্য' বাক্য দ্বারা আবূ বকরের সাহাবী হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। আর শী'আ এবং সুন্নী উভয়ে এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে اِذْهُمَا فِى الْغَارِ শব্দ দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা)-ই উদ্দেশ্য। আরবী ভাষায় 'সাহিব' এবং 'সাহাবী' সমার্থবোধক। 'সাহিব' এবং 'সাহাবী' শব্দের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর এ মর্যাদা কেবল আবূ বকর (রা)-ই লাভ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাহাবী হওয়ার বিষয়টি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

আর এর উপর ভিত্তি করে যে সকল সাহাবীর সাহাবী হওয়া মুতাওয়াতির হাদীস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত, তাঁদের ব্যাপারেও হুকুম এটাই। অর্থাৎ কোন কারণে তাঁদের সাহাবিয়ত অস্বীকৃতি কুরআনের, সেই স্বীকৃতি অস্বীকৃতিরই নামান্তর। অবশ্য বুযুর্গগণের সাহাবী হওয়া 'খবরে আহাদ' দ্বারা প্রমাণিত, তাঁদের ব্যাপারে অস্বীকৃতিকে কুফরী বলা যাবে না, তবে বিদ'আতী বলা যাবে।

১. তাফসীরে কুরতুবী, ৮খ. পৃ. ১৪৭।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সময়ে এক ব্যক্তি সূরা তাওবা তিলাওয়াত করতে করতে যখন এ আয়াতে পৌঁছলেন : اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ। তখন আবূ বকর সিদ্দীক কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, ঐ 'সাহিব' আমিই।[১]

[৬] لَا تَحْزَنْ চিন্তিত হয়ো না

যখন মক্কার মুশরিকগণ রাসূল (সা) কে খুঁজতে খুঁজতে গুহা পর্যন্ত পৌঁছল, তখন গুহার ভিতর থেকে আবূ বকরের দৃষ্টি তাদের প্রতি পড়ল। তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যদি আমি মারা যাই, তা হলে কেবল একটিমাত্র ব্যক্তি ধ্বংস হবে। কিন্তু শত্রুদের দুর্ভাগ্যগুণে যদি আপনি মারা যান, তবে সমস্ত উম্মত বরবাদ হয়ে যাবে। ঐ সময় নবী (সা) আবূ বকর (রা) কে সান্ত্বনাদানের উদ্দেশে বলেছিলেন ঃ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا "হে আবূ বকর, তুমি চিন্তিত হয়ো না, মনকে সান্ত্বনা দাও এবং নিশ্চিত জান যে, আল্লাহ অবশ্যই আমাদের সাথে আছেন।"[২]

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (র) 'হাদিয়াতুশ-শী'আ' গ্রন্থে লিখেন, لَا تَحْزَنْ শব্দটি, যার অর্থ হলো তুমি চিন্তিত হয়ো না, এ বাক্যটি হযরত আবূ বকরের সত্যিকারের প্রেমিক এবং সত্যনিষ্ঠ মু'মিন হওয়ার কথা প্রমাণ করে। অন্যথায় তাঁর চিন্তিত হওয়ার কি প্রয়োজন ছিল।

মোটকথা এই যে, আবূ বকরের নৈরাশ্য ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া এবং দুশমনদের দেখে কেঁদে ফেলা, এ সব কিছুই ছিল রাসূল (সা) কে ভালবাসা এবং নৈকট্যের কারণে। যদি আবূ বকরের নিজের জানের ভয় হতো, তা হলে চিন্তার স্থলে ভয়ের বাক্য ব্যবহৃত হতো। এ জন্যে যে, আরবী ভাষায় 'হুযন' শব্দটি চিন্তা, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ এবং আশাভঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর যেখানে প্রাণের ভয় কিংবা ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেখানে তারা ভয়ের শব্দই ব্যবহার করে থাকে। কাজেই হযরত মূসা (আ) যখন তূর পাহাড়ে গেলেন এবং পয়গাম্বরী লাভ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ) কে নির্দেশ দিলেন যে, তোমার লাঠিটি মাটিতে ফেল। মাটিতে ফেলায় তা এক বিরাট সাপ হয়ে গেল। আর মূসা (আ) এতে ভীত হয়ে এমনভাবে পলায়ন করতে থাকলেন যে, পিছনে ফিরে পর্যন্ত দেখছিলেন না। সে সময় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন يَا مُوْسٰى لَا تَخَفْ اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ "ওহে মূসা, ভয় করো না, আমার নিকটে আমার রাসূলগণ ভয় করে না। (সূরা নামল : ১০)

এর দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, ঐ সাপের দ্বারা মূসা (আ) নিজের প্রাণের আশংকা করছিলেন বলেই পলায়ন করছিলেন। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা সান্ত্বনা দেন যে, 'ভয় করো না'। আর এ কথা বলেননি যে, 'ভীত ও চিন্তিত হয়ো না'। তদ্রুপ

১. তাফসীরে ইবন জারীর, ১খ. পৃ. ৯৬।

২ রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ.৪।

অনিচ্ছাকৃতভাবে যখন মূসা (আ)-এর হাতে এক কিবতী মারা গেল এবং ফিরাউনের লোকজন এজন্যে তাঁকে মেরে ফেলার ইচ্ছা করল, তখন মূসা (আ) ভয় পেয়ে সেখান থেকে আত্মগোপন করলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন : فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا "মূসা ভীত হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল।"

আর আল্লাহর কালামে অনেক স্থানে 'খাওফ' (ভয়) শব্দটি বিদ্যমান, যেখানেই শব্দটি আছে, সেখানে এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর যেখানে চিন্তা বুঝানো হয়েছে, সেখানে 'হুযন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা যখন হযরত ইয়া'কূব (আ) কে বলল, 'আশঙ্কা হচ্ছে, আপনি ইউসুফের শোকে মরে না যান।' তখন হযরত ইয়া'কূব (আ) বললেন : اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ

"আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর কাছে নিবেদন করছি।"

এ স্থানে তিনি 'হুযন' শব্দ ব্যবহার করেছেন; 'খাওফ' ব্যবহার করেননি। এ ছাড়াও অনেক আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'হুযন' এবং 'খাওফ' ভিন্ন অর্থবোধক। যেমন আল্লাহ বলেন : تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا

"তাদের প্রতি ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে বললো, তোমরা ভীত হয়ো না এবং চিন্তিতও হয়ো না।"

যদি 'হুযন' এবং 'খাওফ'-এর একই অর্থ হতো তা হলে নির্দিষ্টভাবে বলার কি প্রয়োজন ছিল ? শুদ্ধ এটাই যে, 'হুযন' এক বস্তু এবং 'খাওফ' আর এক বস্তু। খাওফ তাকেই বলে যা কিছুটা সামনে আসার আশঙ্কা রয়েছে; আর غم (চিন্তা) বলে মনের বাসনা কার্যত বেহাত হয়ে যাওয়াকে।

অধিকন্তু, 'চিন্তা' 'খুশির' বিপরীতে বলা হয় আর 'ভয়' 'প্রশান্তি'র বিপরীতে। উদাহরণত, যখন কারো কোন প্রিয় ও আপনজন মারা যায়, তখন তার যে অবস্থা দাঁড়ায় তাকে 'গুম' (চিন্তা) বলে; কেউই একে খাওফ (ভীতি) বলে না।

আর যদি কারো পুত্র দেয়ালে আরোহণ করে এবং সেখান থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে, তবে ঐ আশঙ্কাকে অবশ্যই খাওফ বা ভয় বলবে, কোন নাদানই একে 'চিন্তা' বলবে না। অবশ্য বিপদের প্রাক্কালে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকেই চিন্তা বলে এবং ভয় বিপদ আসার পরবর্তী অবস্থার নাম।

আর যদি আমরা আমাদের শী'আ বন্ধুদের খাতিরে لاَ تَخَفْ-এর অর্থ لاَ تَحْزَنْ-ই বুঝি, তাতেও আমাদের কিছুমাত্র লোকসান নেই। এ জন্যে যে, তখন অর্থ হবে ওহে আবূ বকর, ভয় করো না। প্রকাশ্য অবস্থা এই যে, আবূ বকর যে ভীত হবেন এবং তাঁর জীবন যে সংশয়াপন্ন হবে এবং তা এ কারণে হবে যে, কাফিরদের সাথে তাঁর দুশমনি থাকবে আর সে দুশমনি ঈমান ও ইসলামের জন্যেই। অন্যথায় রাসূল

(সা)-এর সান্ত্বনাদানের কী প্রয়োজন ছিল, তাও আবার এ পর্যন্ত বলে যে, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন !

[৭] اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকর (রা) কে لَا تَحْزَنْ (চিন্তিত হয়ো না–ভয় করো না) বলার পর সান্ত্বনা দেন যে, তুমি নিরাশ ও চিন্তিত হয়ো না, اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের সাথে আছেন)। আর প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তো মুসলমানদেরই পক্ষাবলম্বন ও সাহায্য করেন। اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ (নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের সাথে রয়েছেন) اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (নিশ্চয়ই আল্লাহভক্ত মুত্তাকী বা সাবধানীদের সাথে রয়েছেন), اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُحْسِنِيْنَ (নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে রয়েছেন) এবং এ ধরনের বাক্যাবলীর দ্বারা আল্লাহর কালাম ভরপুর।

কাজেই আল্লাহর বাণী : اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (যখন সে তার সঙ্গীকে বলল ভয় করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন) দ্বারা এ বলেও সতর্ক করে দিলেন যে, কেবল রাসূল নন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথেও কাফিররা শত্রুতা পোষণ করে। অন্যথায় রাসূল (সা) কেন তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং আল্লাহ তা'আলাই বা কেন তাঁর সাথে থাকবেন বলছেন। আমাদের জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে এভাবে আছেন, যেভাবে তিনি তাঁর রাসূলের সাথে আছেন। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা مَعَنَا "আমাদের সাথে" শব্দ দ্বারা উভয়কে সাহায্য করার কথা বলেছেন। এটা বলেননি যে, اِنَّ اللّٰهَ مَعِى وَمَعَكَ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার সাথে ও তোমার সাথে আছেন।" যার অর্থ দাঁড়ায় 'আল্লাহ্ আমার সাথে আছেন এবং তোমার সাথেও আছেন।' কাজেই এর দ্বারা আরও প্রকাশিত হয়ে গেল যে, আল্লাহ যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলেন, ঠিক সেভাবেই হযরত সিদ্দীক (রা)-এর সাথেও ছিলেন।

অধিকন্তু, اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন" বাক্যটি বিশেষ্য বাচক বাক্য হওয়ার কারণে স্থায়ী এবং চলমান হওয়ার প্রমাণ দেয়। যার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, আল্লাহর সাহায্য, সাহচর্য ও অনুগ্রহ সদাসর্বদার জন্যই তাঁর সাথে থাকবে এবং আল্লাহ কখনই তাঁর থেকে পৃথক হবেন না।

ফিরাউন যখন হযরত মূসা (আ)-এর পশ্চাদ্ধাবন করল, তখন হযরত মূসা (আ)-এর সঙ্গীগণ বলল : اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ "নিঃসন্দেহে আমরা তো ধরা পড়তে যাচ্ছি।"

মূসা (আ) বললেন, كَلَّا اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ "কখনই নয়, নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমার সঙ্গে আছেন, তিনি অবশ্যই আমাকে পথ বাতলে দেবেন।"

মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার সাহচর্যকে একবচনের শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, مَعِى অর্থাৎ (তিনি আমার সাথে আছেন), বহুবচনের শব্দ অর্থাৎ مَعَنَا

(তিনি আমাদের সবার সাথে আছেন) ব্যবহার করেননি। উদ্দেশ্য এটাই যে, মূসা (আ) আল্লাহর সাহচর্য ও সাহায্যকে নিজের সত্তার সাথে নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন, নিজ উম্মতের জন্য এতে কোন অংশ বা হিসসা দেননি। আর নবী করীম (সা) বাক্যটিতে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ ওহে আবূ বকর, তুমি চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের উভয়ের সাথে আছেন। তিনি আল্লাহর সাহচর্য ও সাহায্যকে নিজের সাথে নির্দিষ্ট করে নেননি, বরং স্বীয় বিশিষ্ট প্রিয় বন্ধু ও সহযাত্রীকেও এর অংশীদার করেছেন।

অধিকন্তু, মূসা (আ)-এর জন্য সাহচর্য ছিল দাসের প্রতি তার প্রভুর সাহচর্য, এ জন্যে মূসা (আ) আল্লাহকে 'রব' (প্রভু) হিসেবেই সম্বোধন করেছেন إِنَّ مَعِيَ رَبِّي (আমার সাথে আমার প্রভু পরোয়ারদিগার রয়েছেন)।

আর নবী করীম (সা) এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইলাহ-এর সাহচর্য ছিল, যাকে নবী করীম (সা) আল্লাহ শব্দযোগে বলেছেন إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (অবশ্যই আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন)। তিনি আল্লাহ তা'আলার সাহচর্যকে মর্যাদাবান ও সর্বোচ্চ গুণবাচক নামে উল্লেখ করেছেন যা সমস্ত পূর্ণ গুণবাচক নামের সমষ্টি। আর মূসা (আ) 'রব' নামের মাধ্যমে আল্লাহর সাহচর্য চেয়েছেন। মাওয়াহিবের বর্ণনামতে যা আল্লামা আরিফুল-লিসান (র) বর্ণনা করতে চেয়েছেন, এটাই তার সারসংক্ষেপ ও সারমর্ম।

[৮] فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ আল্লাহ তাঁর প্রতি প্রশান্তি নাযিল করেন

আল্লাহ তাঁর প্রতি প্রশান্তি নাযিল করেন এবং তাঁর বরকতে আবূ বকর (রা) কেও এর অংশ প্রদান করেন। যেমন বায়হাকীর এ রিওয়ায়াতে আছে যে, নবী করীম (সা) আবূ বকরের জন্য দু'আ করেন, ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আবূ বকরের প্রতি প্রশান্তি নাযিল হয়। (খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৮৫)।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, প্রশান্তি এখানে সন্তুষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা হারবী বলেন, প্রশান্তি একটি বিশেষ বস্তুর নাম, যা তিনটি বস্তুর সমষ্টির দ্বারা হয়ে থাকে ঃ নূর, কুওয়াত (শক্তি) এবং রূহ।

নূর দ্বারা আত্মা আলোকিত ও উজ্জ্বল হয়, ঈমানের প্রমাণ এবং বিশ্বাসের তাৎপর্য তার সামনে প্রকাশিত হয়, সত্য এবং মিথ্যা, হিদায়েত এবং গুমরাহী, সন্দেহ এবং বিশ্বাসের পার্থক্য তার সামনে উদ্ভাসিত হয়।

শক্তি (কুওয়াত) দ্বারা সংকল্প ও ধৈর্য সৃষ্টি হয়। পরাক্রমশালী আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের সময় বিশেষ আনন্দ লাভ হতে থাকে। এ শক্তির কারণেই আত্মা প্রবৃত্তির সমস্ত চাহিদা ও দাবির বিপরীতে বিজয়ী এবং কৃতকার্য হয়ে থাকে। আর রূহ দ্বারা আত্মায় আয়ু ও জীবন সৃষ্টি হয় যে কারণে আলস্যের স্বপ্ন ছেড়ে আল্লাহর বান্দা জাগ্রত হয়ে আল্লাহর পথে সাবধানী পথিক হয়ে যায়।

বুখারী ও মুসলিমে আছে, খন্দকের যুদ্ধে মহানবী (সা)-এর মুখে হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার এ রাজায (কবিতা) উচ্চারিত হচ্ছিল :

اَللّٰهُمَّ لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا

"হে আল্লাহ! তোমার অনুগ্রহ না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না, আর না সাদকা দিতাম, না নামায পড়তাম। কাজেই তুমি আমাদের উপর প্রশান্তি নাযিল কর।" (বিস্তারিত জানার জন্য মাদারিজুস সালিকীন, ২খ. পৃ.২৭৮ দেখুন)

প্রসিদ্ধ বক্তব্য এটাই যে, عَلَيْهِ শব্দটি দ্বারা নবী (সা)-কে বুঝানো হয়েছে। আর ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, عَلَيْهِ শব্দটি দ্বারা সাথী অর্থাৎ আবূ বকর (রা) কে বুঝানো হয়েছে। কেননা صَاحِبِهِ শব্দটি নিকটবর্তী এবং যমীর (সর্বনাম) নিকটবর্তী শব্দের দিকে সম্পৃক্ত করা বেশি ভাল। অধিকন্তু, فَاَنْزَلَ-এর ফা অক্ষরটি এ প্রমাণ দেয় যে, এটি 'চিন্তিত হয়ো না' বাক্যের অধীন। আর এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে যখন আবূ বকর সিদ্দীক খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন, তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি নাযিল করলেন, যাতে তাঁর আত্মা প্রশান্ত হয় এবং চিন্তা ও পেরেশানী দূর হয়ে যায়।[১]

ইমাম রাযীও তাঁর তাফসীরে কাবীরে এ মতই গ্রহণ করেছেন যে, فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ বাক্যে عَلَيْهِ-এর যমীর (সর্বনাম) আবূ বকরের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আল্লামা সুহায়লী বলেন, অধিকাংশ মুফাসসিরের নিকট عَلَيْهِ-এর যমীর আবূ বকরের প্রতি সম্পৃক্ত। এ জন্যে যে, নবী করীম (সা)-এর তো পূর্বে থেকেই প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি অর্জিত ছিল। আর কতিপয় আলিমের নিকট এর যমীর নবী করীম (সা)-এর প্রতি সম্পৃক্ত এবং আবূ বকর (রা) এতে স্বাভাবিকভাবে অন্তর্ভুক্ত। হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট রক্ষিত কুরআনের কপিতে এভাবে আছে : فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِمَا এখানে عَلَيْهِ এর স্থলে عَلَيْهِمَا দ্বিবচনের শব্দ এসেছে।[২]

[৯] وَاَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا তাঁকে শক্তিশালী করেন এমন এক সেনাবাহিনী দ্বারা, যাদের তোমরা দেখনি

"তাকে (আল্লাহ্) শক্তিশালী করেন এমন এক সেনাবাহিনী দ্বারা, যাদের তোমরা দেখনি।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সাওর গুহায় ফেরেশতা দিয়ে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করেন যার কারণে মুশরিকদের অন্তরে এমন ভীতির সঞ্চার হয়েছিল যে, তাদের গুহার ভিতরে দেখার সাহস হয়নি। যেমনিভাবে আসহাবে কাহফের গুহার ভিতরেও আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ ভীতি ছিল, যার কারণে কোন ব্যক্তিই ঐ গুহার ভিতরে উঁকি মেরে দেখতে পারেনি।

---

১. রূহুল মা'আনী, ১০খ. পৃ. ২৭।

২. রাওযুল উনুফ, ২খ. পৃ. ৫।

যেমন আল্লাহ বলেন :

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

"তাকিয়ে ওদের দিকে দেখলে, তুমি পিছন ফিরে পলায়ন করতে আর ওদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে।" (সূরা কাহফ : ১৮)

সুতরাং 'মু'জামে তাবারানী'তে হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন কুরায়শগণ তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে গুহা পর্যন্ত পৌঁছল, তখন আবূ বকর আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ লোকেরা, যারা সম্পূর্ণ গুহার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, নিশ্চয়ই আমাদের দেখে ফেলবে। তিনি বললেন কখনই নয়, ফিরিশতাগণ নিজেদের পাখা দিয়ে আমাদের ঢেকে রেখেছে। এ সময়ে এক ব্যক্তি গুহার সামনে বসে পেশাব করতে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ বকরকে বললেন, এ ব্যক্তি যদি আমাদের দেখত, তা হলে আমাদের সামনে বসে পেশাব করত না। অনুরূপভাবে মুসনাদে আবূ ইয়া'লায় হযরত আয়েশা (রা) হযরত আবূ বকর (রা) থেকে এ বর্ণনা করেছেন।

কতিপয় আলিম وَاَيَّدَهٗ -এর যমীর (সর্বনাম) হযরত আবূ বকরের প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন। যার সত্যতা হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে পাওয়া যায়। যাতে নবী করীম (সা) বলেছেন যে, يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْكَ وَاَيَّدَكَ الخ "ওহে আবূ বকর, আল্লাহ তোমাকে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি দান করেছেন এবং তোমাকে শক্তি ও সাহায্য-সমর্থন দিয়েছেন।"

[১০] وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ তিনি কাফিরদের বক্তব্যকে হেয় করেন, আল্লাহর কথাই সর্বোপরি। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়

তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন, তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন যে, শত্রুদেরকে গুহার প্রান্ত থেকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দেন ও অদৃশ্য শক্তি দ্বারা তাঁকে হিফাযত করেন। গুহায় ফিরিশতাদের পাহারায় নিয়োজিত করেন। আর এক মাকড়সার জালকে, যাকে গৃহের আপদ বলা হয়, তারই মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে নিরাপত্তার মাধ্যম বানিয়ে দেন আর আল্লাহর কথাই সর্বদা উচ্চে ও সমুন্নত থাকে। আল্লাহ তাঁর নবীকে তাঁর সঙ্গীসহ গুহা থেকে সুস্থ ও নিরাপদে মদীনা পৌঁছে দেন। আর পথে যে সুরাকা তাঁকে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে সাক্ষাত করেছিল, সে স্বয়ং তাঁর আনুগত্যের আঁচলে বাঁধা এবং বন্দী, সব সময়ের জন্য বান্দায় পরিণত হলো। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তাঁর কুদরত ও প্রজ্ঞা সবার উপর বিজয়ী এবং তাঁর অদৃশ্য সাহায্য, সাহচর্য এবং নাযিলকৃত ফেরেশতা, যাঁরা প্রশান্তি নিয়ে এসেছিলেন সব কিছু তারই প্রভাব।

প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গের নিকট এটা স্পষ্ট যে, গুহার সাথী, আত্মোৎসর্গকারী সুহৃদ আল্লাহ নবীর বন্ধুত্বের ফলে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য, প্রশান্তি, স্বস্তি এবং ফিরিশতাদের সাহায্যের ভাগ পেয়েছেন, তার মর্যাদা অপরিসীম।

অতএব যে আল্লাহ হিজরতের সফরে প্রকাশ্য কোন অবলম্বন ছাড়াই স্বীয় নবীকে হিফাযত করেছেন এবং অপর স্থানেও স্বীয় নবীর হিফাযত করতে সক্ষম। কারো এটা ধারণা করার অবকাশ নেই যে, আল্লাহ তাঁর নবী এবং নবীর সঙ্গীকে গুহায় হিফাযত করতে অপরের সাহায্য ও কৃপার মুখাপেক্ষী।

منت منه که خدمت سلطان همی کنی   منت شناس ازوکه بخدمت بداشتت

"তুমি বাদশাহের সেবা করছো বলে এটাকে তাঁর প্রতি করুণা জ্ঞান করো না; বরং তোমাকে সেবার সুযোগ দানের জন্য বাদশাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"

সারকথা

আল্লাহ তা'আলা ঐ আয়াতে হিজরতের সফরে আবূ বকরের বন্ধুত্বের ঘটনা যে মর্যাদার সাথে বর্ণনা করেছেন, এটা তাঁর মর্যাদা এবং আত্মোৎসর্গের সনদ ও সাক্ষ্য, যা তাঁর চরম দুশমনরাও স্বীকার করে। এ প্রসঙ্গে 'হামলায়ে হায়দারীর' কয়েক চরণ কবিতা পাঠকদের উপহার দেয়া যাচ্ছে :

چنین گفت راوی که سالار دین   چو سالم بحفظ جهان آفرین
زنزدیك آن قوم پر مکر رفت   بسوئے سرائے ابوبکر رفت
پئے هجرت اونیز آماده بود   که سابق رسولش خبر داده بود
نبی بر در خانه اش چوں رسید   بکوشش ندائے سفر درکشید
چو بوبکر زاں حال آگاه شد   زخانه بروں رفت وهمراه شد
گرفتند پس راه یثرب به پیش   نبی کند نعلین از پائے خویش
بسرپنجه آں راه رفتن گرفت   پئے خودز دشمن نهفتن گرفت
چو رفتند چندے زد امان دشت   قدوم فلك سائے مجروح گشت
ابوبکر انگه بدوشش گرفت   ولے زیں حدیث است جائے شگفت
که درکس چنان قوت آئد پدید   که بار نبوت تواند کشید
برفتد القصه چندے دگر   چوگر دید پسید انسان سحر
بجستند جائیکه باشد پناه   زچشم کسان دریکسوز راه
بدید ندغارے وراں تیره شب   که خواندے عرب غار ثورش لقب
گرفتند در جوف آن غار جائے   ولے پیش بنهاد بوبکر پائے

بهر جاکه سوراخ یار خز دید قبارا بدرید وآن رخز چید
بدینگونه تاشد تمام آں قبا یکے رخنه نگرفته ماند ازقضا
بران رخنه گویندان یار غار کف پائے خودرا نمود استوار
نیامد جزاو این شرف از کسے که دور از خرومی نماید بسے
بغار اندروں درشب تیره فام چسان دید سوراخهارا تمام
دران تیره شب یك بیك چون شمرد یکئے کا امدافزون بروپافشرد
نیاید چنین کارے ازغیراو بدینمان چو پرداخت از رفت درد
در آمد رسول خدا هم بغار نشتند یك جابهم هر دو یار

"বর্ণনাকারী বলেন, ঐ প্রতারক জাতির নিকট থেকে দীনের সিপাহসালার যখন মহান স্রষ্টার হিফাযতে সহী-সালামতে চলে গেলেন, তখন প্রথমে তিনি আবূ বকরের গৃহের পানে গেলেন। হিজরতের জন্য তিনিও প্রস্তুত ছিলেন; কেননা পূর্বে রাসূল তাকে এ ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছিলেন। নবীজি যখন তাঁর দরজায় উপস্থিত হলেন, তাঁকে হিজরত সফরের সংবাদ দিলেন। আবূ বকর ঐ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং হযরতের সঙ্গী হলেন। অতঃপর ইয়াসরিবের পথে অগ্রসর হলেন। নবীও তাঁর পাদুকা পরে নিলেন। সর্বান্তকরণে তিনি চলতে আরম্ভ করলেন। দুঃশাসনের কাছ থেকে আত্মগোপন করার চেষ্টা করলেন। পাহাড়ের প্রান্ত ধরে যখন কিছুদূর গেলেন, তাঁর পবিত্র কদম আহত হয়ে পড়ল। এরপর আবূ বকর তাঁকে কাঁধে তুলে নিলেন। কিন্তু এ কথাটি আশ্চর্যজনক বলেই মনে হয়। কেননা কার মাঝে এমন শক্তি হবে যে, তিনি নবূয়াতের বোঝা বহন করতে পারবেন? মোটকথা, তাঁরা আরো কিছুদূর অগ্রসর হলেন। এমন এক স্থানে গেলেন, যা আশ্রয় কেন্দ্র হবে। যারা তাঁদের খুঁজছিল, তাদের চোখের আড়াল হবেন। রাতের সেই অন্ধকারে একটি গুহা দেখলেন, আরবরা যাকে সাওর গুহা বলেই জানে। সেই গুহার পেটে হযরত (সা) আশ্রয় নিলেন। কিন্তু সেখানে প্রথম আবূ বকরই প্রবেশ করলেন। সেখানে যখন কোন গর্ত বা ফাঁক দেখতে পেলেন, নিজ জামা ছিঁড়ে সে গর্তের মুখ বন্ধ করলেন। এভাবে জামার কাপড় পুরোটা শেষ হয়ে গেল, কিন্তু একটা গর্ত ঘটনাক্রমে বাকি ছিল। বলা হয় যে, সেই গর্তের মুখে গুহার সাথী (আবূ বকর) নিজের পা রাখলেন। তিনি ছাড়া আর কারো এ মর্যাদা ও সৌভাগ্য অর্জিত হয়নি যে, ঘন অন্ধকার রাতে গুহার অভ্যন্তরে গর্তগুলো তিনি দেখতে পেলেন পুরোপুরি। রাতে গর্তগুলো এক এক করে গণনা করলেন। এভাবে সবকিছু ঠিকঠাক করলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল গুহায় প্রবেশ করলেন এবং দুই সাথী একত্রে বসলেন।"

এ রিওয়ায়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হলো যে, হযরত নবী (সা) এ বিপদসঙ্কুল সফরে আবূ বকরকে নিজের সঙ্গী করেছেন। প্রথমে তিনি নিজে আবূ বকর সিদ্দীকের

গৃহে গিয়েছেন এবং সেখান থেকে উভয়ে একসাথে রওয়ানা হয়েছেন। আবূ বকর (রা) নবী (সা) কে নিজ বাহনে আরোহণ করিয়েছেন, নিজে প্রথমে গুহায় নেমেছেন এবং তা পরিষ্কার করেছেন, নিজের চাদর ছিড়ে এর ছিদ্রগুলো বন্ধ করেছেন। আর একটি ছিদ্র বাকি থাকায় নিজের পায়ের তলা দিয়ে তা বন্ধ করেছেন। এ সমুদয় কাজই আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সততা, নিষ্ঠা, ভালবাসা এবং বন্ধুত্বের প্রমাণ ও উদাহরণ। অতঃপর এ তিনদিন তিনি গুহায় অবস্থান করেন এবং খাবার আসতো হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ঘর থেকে। আর তৃতীয় দিন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পুত্র দুটি উটনী নিয়ে গুহায় উপস্থিত হন। একটিতে হযরত (সা) নিজে আরোহণ করেন এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কে নিজের সাথে আরোহণ করান। অপরটিতে আবূ বকর সিদ্দীকের আযাদকৃত দাস আমির এবং উষ্ট্র চালক আরোহণ করেন। এভাবেই তাঁরা মদীনা মুনাওয়ারা রওয়ানা হন। সুতরাং 'হামলায়ে হায়দারী'র লেখকও এভাবে তা বর্ণনা করেছেন :

پغار اندروں تاسه روز وسه شب　　بسر بردآن شر بفرمان رب
شدے پور بوبکر هنگام شام　　رساندے درآں غارآب وطعام
نمودے هم ازحبال اصحاب شر　　حبیب خدائے جهان را خبر
که هستند در جستجو آں گروه　　شب وروز درشهر وصحرا وکوه
دگر رائیے بود عامر بنام　　که کردے شبانی به بیت الحرام
که او نیز اسلام آورده بود　　زابریق توفیق می خور ده بود
شدے شب به نزد بشیر ونذیر　　ببردے برش هدیه جامی رشیر
جزیشان دگر از صدیق وعدو　　نبد هیچکش واقف از راز او
نبی گفت پس پور بوبکر را　　که اے چون پدر اهل صدق وصفا
دوجمازه باید کنون راه وار　　که مارارساند به یثرب دیار
برفت از برش پور بوبکر زود　　بدنبال کارے که فرموده بود
بگفتش فلاں روز وقت سحر　　دو جمازه بهر پیمبر ببر
از وجمله دار ایں سخن چوں شنود　　دو جمازه در دم مهیا نمود
تهی شد ازان قوم آن کوه ودشت　　رسول خدا عازم راه گشت
بصبح چهارم بر آمد زغار　　دو جمازه آور ده بدجمله دار
نشست از بریك شتر شاه دین　　ابوبکر راکرده باخود قرین
بر آمد برآن دیگر حمله وار　　بهمراه اوگشت عامر سوار

"আল্লাহর নির্দেশে সেই বাদশাহ গুহার ভেতরে তিন দিন তিন রাত অবস্থান করলেন, সন্ধ্যা হলে আবূ বকরের পুত্র আসতেন, সেই গুহায় পানি ও খাবার পৌঁছাতেন। দুষ্ট লোকদের অবস্থার খবরাখবরও আল্লাহর হাবীবকে জানাতেন। বলতেন, ঐ লোকেরা তাঁদের সন্ধানে আছে, রাত-দিন, শহরে-প্রান্তরে-পাহাড়ে। আমির নামে একজন রাখাল ছিলেন, যিনি বায়তুল হারাম এলাকায় রাখালী করতেন, তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মদীরা পান করেছিলেন তাওফীকের পানপাত্র থেকে। রাতের বেলা বাশীর ও নাযীর-এর কাছে আসতেন, তাঁর জন্য হাদিয়া নিয়ে আসতেন দুধের পেয়ালা। এরা ছাড়া বন্ধু ও শত্রুদের মধ্যে কেউ তাদের খবরাখবর জানত না। নবীজি আবূ বকরের পুত্রকে বললেন, ওহে, তুমিও তোমার পিতার মত সৎ ও নিষ্ঠাবান। এখন আমাদের দুটি উটনী দরকার, যা আমাদেরকে ইয়াসরিবে পৌঁছে দেবে। আবূ বকরের পুত্র তখন যে কাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন তা পালন করতে ছুটে গেলেন। রাখালকে বললেন, অমুক দিন সাহরীর সময় দুটি উটনী পয়গাম্বরের জন্য নিয়ে এসো। এ কথা শোনামাত্র তারা সময়মত দুটি উটনী হাযির করল। সেই পর্বতে আর কোন লোক নেই, আল্লাহর রাসূল সফরে প্রতীজ্ঞ হলেন। দুটি উটনীতে সওয়ার হয়ে চতুর্থ দিনের প্রভাতে গুহা থেকে বের হলেন। দীনের বাদশাহ বসলেন একটি উটনীর উপর, আর পেছনে নিলেন আবূ বকরকে; আর অপর উটনীতে উষ্ট্র চালকের সাথে সওয়ার হলেন আমির।"

গুহা থেকে প্রত্যাবর্তন

তিনদিন তিনি ঐ গুহার মধ্যেই ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ[১] ইবন আবূ বকর সমস্ত দিন মক্কায় থাকতেন এবং মুশরিকদের সংবাদাদি সংগ্রহ করতেন আর রাতে এসে খবরাদি জানিয়ে দিতেন এবং ভোরেই সেখান থেকে বেরিয়ে যেতেন। আমির[২] ইবন ফুহায়রা (হযরত আবূ বকরের মুক্ত দাস) ইশার পর যখন অন্ধকার হয়ে আসত, তখন বকরিগুলো নিয়ে সেখানে উপস্থিত হতেন যাতে তাঁরা প্রয়োজনমত দুধপান করতে পারেন। এভাবে তিনটি রাত গুহায় অতিক্রান্ত হয়। তিনদিন পর আবদুল্লাহ[৩]

---

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর (রা) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর প্রিয় পুত্র ছিলেন। তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁর পিতার খিলাফতকালে পিতার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেন। (ইসাবা, ২খ. পৃ. ২৮৩)।

২. হযরত আমির ইবন ফুহায়রা (রা) প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণের অন্তর্ভুক্ত। তুফায়ল ইবন আবদুল্লাহর গোলাম ছিলেন, যে তাঁকে খুবই কষ্ট দিত। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে তুফায়লের নিকট থেকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন। বদর ও উহুদ যুদ্ধে শরীক হন এবং বীরে মাউনার যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর লাশ আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং পরে পুনরায় যমীনে নামিয়ে দেয়া হয়। (ইসাবা এবং অন্যান্য গ্রন্থ)।

৩. হাফিয আবদুল গনী মুকাদ্দাসী, আল্লামা সুহায়লী এবং আল্লামা নববী বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আরিকত ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আমরা কোন সহীহ সূত্রে এমন খবর পাইনি, আর এটাই সত্য। অবশ্য ওয়াকিদীর বর্ণনামতে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। (যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৩৯; ইসাবা, ২খ. পৃ. ২৭৪)।

ইবন আরিকত দু'আলী (যাকে মজুরীর বিনিময়ে পথপ্রদর্শনের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল) ওয়াদামাফিক প্রত্যুষে দুটি উটনী নিয়ে গুহার নিকট উপস্থিত হয় এবং সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ পথ ছেড়ে অপরিচিত পথে তাঁদের নিয়ে উপকূল বরাবর চলতে থাকে (বুখারী শরীফ, বাবুল হিজরাত)।

হযরত নবী করীম (সা) একটি উটনীতে এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) অপর উটনীটিতে আরোহণ করেন। মুক্ত দাস হযরত আমির ইবন ফুহায়রাকে খিদমত করার জন্য সাথে নেন এবং নিজের পিছনে বসান। আবদুল্লাহ ইবন আরিকত[১] আপন উটে আরোহণ করে পথ দেখিয়ে আগে আগে চলতে থাকে।[২]

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র) বলেন, একটি উটনীর উপর রাসূলুল্লাহ (সা) সওয়ার হন এবং আবূ বকরকে পিছনে বসিয়ে নেন। আর অপর উটনীটিতে আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর এবং আমির ইবন ফুহায়রা আরোহণ করেন।[৩] কিন্তু প্রথম বক্তব্যটিই সঠিক। এ জন্যে যে, হাফিয আসকালানী তাঁর 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, এ সফরে নবী করীম (সা) ও আবূ বকর (রা)-এর সাথে আমির ইবন ফুহায়রা (রা) ছাড়া আর কোন সঙ্গী ছিলেন না। আর তৃতীয় উটে আবদুল্লাহ ইবন আরিকত আরোহণ করে এবং সাধারণ প্রশস্ত রাস্তা ছেড়ে অপ্রসিদ্ধ পথে অগ্রসর হন।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর কাছে চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিল। আল্লাহর রাস্তায় এবং ক্রীতদাসদের কিনে কিনে মুক্ত করে দিয়ে এর সমুদয় অর্থই ব্যয় হয়ে গিয়েছিল, যার মধ্যে মাত্র পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল, তাও হিজরতের সময় সাথে নিয়েছিলেন। মদীনায় এসে মসজিদে নববীর জন্য জায়গা ক্রয়, ইত্যাদি কাজে সমুদয় অর্থ নিঃশেষ হয়ে যায়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, মৃত্যু-কালে আবূ বকর (রা) একটি দীনার কিংবা একটি দিরহামও অবশিষ্ট রেখে যাননি।[৪]

আবদুল্লাহ ইবন আরিকত রাসূল (সা) এবং আবূ বকর (রা) সহ মক্কার নিম্নাঞ্চল থেকে বেরিয়ে উপকূলের দিকে অগ্রসর হয় এবং আসগালে উসফান অতিক্রম করে মনযিলের পর মনযিল পার হয়ে কুবায় প্রবেশ করে।[৫]

---

১. আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর (রা) মক্কায়ই থেকে যান আর আবদুল্লাহ ইবন আরিকত পথপ্রদর্শক হিসেবে তাঁর সাথে মদীনা গমন করে। মদীনা থেকে ফিরে এসে উভয় বুযুর্গের নিরাপদে মদীনা পৌঁছার সংবাদ হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর (রা) কে অবহিত করে। এ খবর পাওয়ার পর আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর (রা) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর পরিবার-পরিজন নিয়ে মদীনায় যাত্রা করেন।

২ যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৪০।

৩. মাদারিজুন নুবূয়াত, ২খ. পৃ. ৮৫।

৪. ইসাবা, ২খ. পৃ. ৩৪২।

৫. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮৬।

ফায়েদা

রাসূলে করীম (সা) যখন নিজের গৃহ থেকে বের হয়ে আবূ বকরের গৃহে আসেন এবং তাঁকে সাথে নিয়ে সাওর গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করেন, তখন কাফিরেরা এসে তাঁর গৃহ ঘেরাও করে। যখন সেখানে তাঁকে পেল না, তখন তাঁর সন্ধানে নিমগ্ন হলো, স্থানে স্থানে মানুষ পাঠাল এবং খুঁজতে খুঁজতে সাওর গুহার মুখে উপস্থিত হলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মাকড়সার জাল দ্বারা ঐ কাজ করলেন যা শত-সহস্র লৌহ বেষ্টনীও করতে পারে না। তিনদিন পর্যন্ত তিনি গুহায় আত্মগোপন করে থাকলেন, আর কাফিররা তিনদিন পর্যন্ত খোঁজাখুঁজিতে লিপ্ত থাকল। যখন কাফিররা নিরাশ হয়ে গেল ও ব্যর্থ হয়ে বসে পড়ল এবং ঐ ঘোষণা প্রচার করল যে, মুহাম্মদ (সা) অথবা আবূ বকর (রা) কে যে ব্যক্তি ধরে আনবে, তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে। এরপরেও যখন কোন সাফল্য এলো না, তখন অনুসন্ধানে ভাটা পড়ল। রাসূল (সা) ও আবূ বকর (রা) তখন গুহা থেকে বেরিয়ে উপকূলবর্তী পথে মদীনায় রওয়ানা হয়ে গেছেন। মানুষ আবূ বকরকে ভালভাবেই চিনত, তবে রাসূল (সা) কে খুব একটা চিনত না। পথিমধ্যে যে ব্যক্তির সাথেই দেখা হতো, সেই আবূ বকরকে জিজ্ঞেস করত, সঙ্গে তিনি কে, যিনি তোমার সামনে বসে আছেন? আবূ বকর বলতেন, هٰذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِى السَّبِيْلَ "ইনি সেই ব্যক্তি, যিনি আমাকে পথ দেখাচ্ছেন।" আর তাঁর অর্থ মনে করতেন যে, আখিরাত ও কল্যাণের পথ দেখাচ্ছেন। (বুখারী শরীফ, ১খ. পৃ. ৫৫৬)

রওয়ানা হওয়ার তারিখ

বায়'আতে আকাবার প্রায় তিন মাস পর পয়লা রবিউল আউয়াল তিনি মক্কা মুকাররামা থেকে রওয়ানা হন। হাকিম বলেন, মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি সোমবারে মক্কা থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সোমবারেই মদীনায় পৌঁছেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবন মূসা খাওয়ারিযমী বলেন, তিনি মক্কা থেকে বুধবারে বের হন। হাফিয আসকালানী বলেন, বিশুদ্ধ এটাই যে তিনি বুধবারে মক্কা থেকে বের হন, তিনদিন গুহায় অবস্থান করেন এবং সোমবারে গুহা থেকে বের হয়ে মদীনা মুনাওয়ারা রওয়ানা হন।[১]

হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) বলেন, তাঁর রওয়ানা হওয়ার পর কিছু লোক আমার পিতার গৃহে আগমন করে, যাদের মধ্যে আবূ জাহলও ছিল, তারা জিজ্ঞেস করল, তোমার আব্বা কোথায়? আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি জানি না। আবূ জাহল আমাকে এমন জোরে চপেটাঘাত করল যে, আমার কানের দুল ছিঁড়ে পড়ে গেল।[২]

---

১. যারকানী, পৃ. ৩২৫।

২ সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১৭২।

হযরত উম্মে মা'বাদ (রা)-এর ঘটনা

গুহা থেকে বেরিয়ে তিনি মদীনা মুনাওয়ারার রাস্তা ধরেন। পথে উম্মে মা'বাদ-এর তাঁবু অতিক্রম করেন। উম্মে মা'বাদ ছিলেন একজন অত্যন্ত ভদ্র এবং অতিথি সেবক। তাঁবুর চত্বরে বসে থাকতেন। নবীজির কাফেলার লোকেরা এসে উম্মে মা'বাদকে গোশত এবং খেজুর ক্রয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু কিছুই পেল না। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৃষ্টি যখন ঐ তাঁবুর প্রতি পড়ল, তখন তাঁবুর একদিকে একটি বকরি দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এটি কেমন বকরি ? উম্মে মা'বাদ বললেন, এ বকরিটি রোগা এবং দুর্বল হওয়ার কারণে বকরি পালের সাথে জঙ্গলে যেতে পারে না। তিনি (সা) বললেন, এতে কিছু দুধ আছে। উম্মে মা'বাদ বললেন, এর মধ্যে কোত্থেকে দুধ আসবে ? তিনি বললেন, আমাকে এর দুধ দোহনের অনুমতি দেয়া হোক। উম্মে মা'বাদ বললেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, যদি এতে দুধ থাকে তবে আপনি অবশ্যই দোহন করে নিন। হযরত (সা) 'বিসমিল্লাহ' বলে এর স্তনে পবিত্র হাত রাখলেন। স্তন দুধে ভরে গেল এবং তিনি দুধ দোহন করতে শুরু করলেন। একটি বড় পাত্র (যা দ্বারা আট দশ ব্যক্তি তৃপ্ত হতে পারে) দুধে পূর্ণ হয়ে গেল। প্রথমে তিনি উম্মে মা'বাদকে দুধ পান করালেন, এমনকি উম্মে মা'বাদ তৃপ্ত হলেন। এরপর তিনি তাঁর সঙ্গীদের পান করালেন এবং সবশেষে নিজে পান করলেন। এরপর তিনি পুনরায় দোহন করলেন। এমনকি ঐ বড় পাত্রটি ভরে গেল। তিনি পাত্রটি উম্মে মা'বাদকে দান করলেন এবং তাকে বায়'আত করে রওয়ানা হলেন। যখন সন্ধ্যা হলো এবং উম্মে মাবাদের স্বামী আবূ মা'বাদ জঙ্গলে বকরী চড়িয়ে ফিরে এলেন, দেখলেন, একটি বড় 'ভাণ্ড' দুধে ভর্তি! খুবই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে উম্মে মা'বাদ, এ দুধ এলো কোত্থেকে? এ বকরির তো দুধের নাম-নিশানাও ছিল না। উম্মে মা'বাদ বললেন, এ পথে আজ এক পবিত্র পুরুষ গমন করেছেন, আল্লাহর কসম, এ সব তাঁরই বরকতে। আর তিনি সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। আবূ মা'বাদ বললেন, অন্তত তাঁর কিছু অবস্থা তো বর্ণনা কর। উম্মে মা'বাদ তাঁর পবিত্র আকৃতি, তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি সাহস এবং চমৎকার একটা পরিচিতি তুলে ধরলেন যা মুস্তাদরাকে বিস্তারিত বর্ণিত আছে।

আবূ মা'বাদ বললেন, আমি বুঝে ফেলেছি, আল্লাহর কসম, তিনি ঐ কুরায়শী ব্যক্তি, আমিও অবশ্যই তাঁর খিদমতে উপস্থিত হব। এদিকে তো ঘটনা এই, অন্যদিকে অদৃশ্য ঘোষক কর্তৃক মক্কায় এই কবিতা আবৃত্তি করা হচ্ছিল। এর শব্দ শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু পাঠককে দেখা যাচ্ছিল না। কবিতাটি এই :

جَزَى اللّٰهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِه   رَفِيْقَيْنِ حَلاَّ خَيْمَتَىْ أُمِّ مَعْبَدِ

"আল্লাহ তা'আলা এ উভয় বন্ধুকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, যারা উম্মে মা'বাদের তাঁবুতে অবতরণ করেছিল।"

هُمَا نَزَلاَ هَا بِالْهُدٰى فَاهْتَدَتْ بِه   فَقَدْ فَازَ مَنْ اَمْسٰى رَفِيْقَ مُحَمَّدٍ

"উভয়ে হিদায়াত নিয়ে অবতরণ করেছিল, আর উম্মে মা'বাদ হিদায়াত গ্রহণ করেছে এবং লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-এর এ সফরে সঙ্গী হয়েছে অর্থাৎ আবূ বকর (রা)"

لِيَهْنَ اَبَا بَكْرٍ سَعَدَةُ جَدِّهِ بِصُحْبَتِهِ مَنْ يُسْعِدِ اللّٰهُ يَسْعَدِ

"আবূ বকর তার সাহচর্য ও বন্ধুত্বের দরুন কল্যাণ ও সৌভাগ্য অর্জন করেছে। ঐ আবূবকরকে ধন্যবাদ, যাকে আল্লাহ সৌভাগ্যবান করেন, সে অবশ্যই সৌভাগ্যবান হবে।"

لِيَهْنَ بَنِى كَعْبٍ مَقَامِ فَتَاتِهِمْ........وَمَقْعَدُهَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِمَرْصَدِ

"কল্যাণ হোক বনী কা'ব-এর এবং তাদের স্ত্রীলোকদের মর্যাদা, আর ঈমানদারদের জন্য তাদের ঠিকানা কাজে আসা"

سَلُوا اُخْتَكُمْ عَنْ شَاتِهَا وَاِنَائِهَا فَاِنَّكُمْ اِنْ تَسْأَلُوا الشَّاةَ تَشْهَدِ

"তুমি নিজের বোনের কাছে তার বকরি এবং পাত্রের অবস্থা তো জিজ্ঞেস কর, যদি তুমি বকরিকেও জিজ্ঞেস কর তবে বকরীও সাক্ষ্য দেবে"

دَعَاهَا بِشَاةٍ حَائِلٍ فَتَحَلَّبَتْ عَلَيْهِ صَرِيْحًا ضَرَّةُ الشَّاةِ مُزْبِدُ

"তিনি তার কাছে একটি বকরি চাইলেন, অতঃপর সে এতটা দুধ দিল যে, হাত ভর্তি হয়েছিল।"

فَغَادَرَهَا رَهْنًا لَدَيْهَا لِحَالِبٍ يُرَدِّدُهَا فِىْ مَصْدَرٍ ثُمَّ مَوْرِدُ

"এরপর তিনি বকরিটি তারই কাছে রেখে আসেন যে প্রত্যেক গমনাগমনকারীর জন্য দুধ দোহন করে।"

হযরত হাসসান ইবন সাবিত (রা)-এর কাছে যখন অদৃশ্য ঘোষকের এ কবিতা পৌঁছল, তখন এর জবাবে হাসসান এই কবিতা বললেন :

لَقَدْ خَابَ قَوْمٌ غَابَ عَنْهُمْ نَبِيُّهُمْ وَقُدِّسَ مَنْ يَسْرِى اِلَيْهِ وَيَغْتَدِىْ

"অবশ্যই হৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারাই যাদের মধ্য থেকে তাদের পয়গাম্বর চলে গেছেন অর্থাৎ কুরায়শ। আর পাক-পবিত্র হলো তারাই যারা সকাল-সন্ধ্যায় ঐ নবীর খিদমতে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ আনসার।"

تَرَحَّلَ عَنْ قَوْمٍ فَضَلَّتْ عُقُوْلُهُمْ وَحَلَّ عَلٰى قَوْمٍ بِنُوْرٍ مُجَدَّدِ

"ঐ নবী এক সম্প্রদায়কে ত্যাগ করেছেন, তাদের জ্ঞান তো বরবাদ হয়ে গেছে, আর অপর সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর এক একটি নতুন নূর নিয়ে অবতরণ করেছেন।"

هَدَاهُمْ بِهِ بَعْدَ الضَّلَالَةِ رَبُّهُمْ فَاَرْشَدَهُمْ مَنْ يَتْبَعُ الْحَقَّ يَرْشُدُ

"পথভ্রষ্টতার পর আল্লাহ ঐ নূর দিয়ে তাদের পথ প্রদর্শন করেন, আর যারা সত্যের অনুসরণ করবে, তারা হিদায়াত পাবে।"

وَهَلْ يَسْتَوِىْ ضَلَالُ قَوْمٍ تَسَفَّهُوْا عَمًى وَهُدَاةُ يَهْتَدُوْنَ بِمُهْتَدِ

"আর পথভ্রষ্ট এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি কি এক সমান হতে পারে ?"

وَقَدْ نَزَلَتْ مِنْهُ عَلٰى اَهْلِ يَثْرِبُ رِكَابُ هُدًى حَلَّتْ عَلَيْهِمْ بِاَسْعُدِ

"আর ইয়াসরিববাসীদের উপর হিদায়াতের কাফেলা সৌভাগ্য ও কল্যাণ নিয়ে অবতরণ করেছেন.।"

نَبِىٌّ يَرٰى مَالاَ يَرَ النَّاسُ حَوْلَهُ وَيَتْلُوْ كِتَابَ اللّٰهِ فِىْ كُلِّ مَشْهَدِ

"তিনি নবী, তাঁর ঐসব জিনিসও নজরে আসে, যা তাঁর পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তির নজরে আসে না, আর তিনি মজলিসে সবার সামনে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করেন।"

وَاِنْ قَالَ فِىْ يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ فَتَصْدِيْقُهَا فِى الْيَوْمِ اَوْ فِىْ ضُحَى الْغَدِ

"আর যদি তিনি কোন অদৃশ্যের খবর শোনান, তবে তা আজই অথবা আগামীকাল সকাল পর্যন্ত এর বাস্তবতা ও সত্যতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।"

এ রিওয়ায়াত বিভিন্ন সাহাবা কিরাম থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। উম্মে মা'বাদ, আবূ মা'বাদ (অর্থাৎ উম্মে মা'বাদের স্বামী), হুবায়শ ইবন খালিদ (রা), অর্থাৎ উম্মে মা'বাদের ভাই, আবূ সলীত বদরী (রা) ও হিশাম ইবন হুবায়শ ইবন খালিদ-এর মধ্যে প্রথমোক্ত চারজনের সাহাবী হওয়ার ব্যাপার স্বীকৃত এবং সকলেই একমত। হিশাম ইবন খালিদ ইবন হুবায়শের সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। ইবন হিব্বান হিশামকে সাহাবীগণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, হিশাম হযরত উমর (রা) থেকে (হাদীস) শুনেছেন। (ইসাবা, ৩খ. পৃ. ৬০৩)

১. উম্মে মা'বাদ (রা)-এর রিওয়ায়াত ইবন সাকান উল্লেখ করেছেন। (ইসাবা, উম্মে মা'বাদ-এর জীবনী, বাবুল কুনা)

২. আর আবূ মা'বাদ (রা)-এর রিওয়ায়াত ইমাম বুখারী তাঁর 'তারিখে' এবং ইমাম ইবন খুযায়মা তাঁর 'সহীহ'-এ উল্লেখ করেছেন। (ইসাবা, আবূ মা'বাদ-এর জীবনী, বাবুল কুনা এবং ইবন সা'দ, তাবাকাত, ১খ. পৃ. ১৫৫-তে এবং হাকিম তাঁর মুস্তাদরাকে, ৩খ. পৃ. ১১-এ উল্লেখ করেছেন)।

৩. হুবায়শ ইবন খালিদ (রা)-এর রিওয়ায়াত বাগাবী, ইবন শাহীন, ইবন সাকান, তাবারানী, ইবন জিদ্দা প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।[১]

হুবায়শ (রা)-এর রিওয়ায়াত হাফিয ইবন সায়্যিদুন-নাসও তাঁর 'উয়ূনুল আসার' গ্রন্থে নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন। অধিকন্তু, হুবায়শ ইবন খালিদ (রা)-এর রিওয়ায়াত হাফিয মিযযী (র) বিস্তারিতভাবে তাঁর 'তাহযীবুল-কামাল' গ্রন্থে নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন।[২]

---

১. ইসাবা, ১খ. পৃ. ৩১০।

২. তাহযীবুল কামাল, ১খ. পৃ. ৩৪, (তাহযীবুল কামাল বিশ্বখ্যাত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, এর হাতে লিখা পাণ্ডুলিপি হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্যের আসফিয়া কুতুবখানায় রক্ষিত আছে। আমি সেখান থেকে উপকৃত হয়েছি)। –গ্রন্থকার।

৪. আবূ সলীত বদরী (রা)-এর রিওয়ায়াত উয়ূনুল আসারে উল্লিখিত আছে।

৫. হিশাম ইবন হুবায়শ (রা)-এর রিওয়ায়াত মুস্তাদরাকে উল্লেখ আছে। হাকিম এ রিওয়ায়াত প্রসঙ্গে বলেন, এ হাদীসটির সনদ সহীহ। এরপর হাকিম এ হাদীসটি অন্যান্য সনদের সাথেও বর্ণিত বলে প্রমাণ করেন (মুস্তাদরাক, ৩খ. পৃ. ১০)। এ সনদগুলো চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে সহীহ হওয়ার শর্ত পাওয়া না গেলেও একত্রিতভাবে উপকারী, শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য হতে পারে।

হাফিয ইবন আবদুল বার তাঁর 'আল-ইস্তিয়াবে' বলেন, উম্মে মা'বাদের ঘটনা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ বিভিন্ন সাহাবায়ে কিরামের এক বিরাট জামায়াত বর্ণনা করেছেন।

এছাড়াও এ বর্ণনার প্রায় নিকটতর, বরং চাক্ষুস বর্ণনা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যা হাকিম তাঁর 'ইকলীলে' এবং বায়হাকী তাঁর 'দালাইলুন নুবূয়াতে' উল্লেখ করেছেন। আর হাফিয ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১৯১-এ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এর সনদ হাসান। পার্থক্য কেবল এতটুকুই যে, এ বর্ণনায় উম্মে মা'বাদের নাম উল্লেখ নেই, কেবল 'জনৈক স্ত্রীলোকের ঘটনা' বলে বর্ণনা করেছেন, যা মূলত উম্মে মা'বাদের সাথেই মিলে যায়।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক এবং ইমাম বায়হাকীর অভিমত এই যে, এ ঘটনা বাস্তবে উম্মে মা'বাদেরই ঘটনা। আর হাফিয মুগালতাঈর অভিমত যে, এটি উম্মে মা'বাদ ভিন্ন অপর কারো ঘটনা। মহান পবিত্র আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।[1]

৬. অধিকন্তু, এ বর্ণনা কায়স ইবন নু'মান থেকে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত আছে। এ প্রসঙ্গে হাফিয হায়সামী বলেন, হাদীসটি বাযযার বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য (মাজমাউয-যাওয়াইদ)।[2]

ঐ আবূ মা'বাদ খুযাঈ থেকে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) তাঁর মুসনাদে অট্টহাসি বিষয়ক হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি এই :

ابو حنيفة عن منصور بن زاذان الوسطى عن الحسن عن معبد بن ابى سعيد الخزاعى عنه ﷺ قال بينما هو فى الصلوة اذاقبل اعمى يريد الصلوة فوقع فى زبية فاستضحك القوم فقهقهوا فلما انصرف ﷺ قال من كان منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلوة

"আবূ হানীফা.... মা'বাদ ইবন আবূ সাঈদ খুযাঈ (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন তাঁর সাথে নামাযে ছিলাম, এমন সময় এক অন্ধ ব্যক্তি নামাযের উদ্দেশে আসছিল, সে একটি গর্তে পড়ে গেল। তখন সবাই হেসে

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ ১৯০।

২ যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৪৯।

উঠল, এমনকি অট্টহাস্য করল। নবী (সা) নামায শেষে বললেন যে তোমাদের মধ্যে অট্টহাসি হেসেছে, সে যেন পুনরায় উযূ করে এবং নামায আদায় করে।"

(ফাতহুল কাদীর, ১খ. পৃ. ৩৫, কিতাবুত তাহারাত, নাওয়াকিযে উযূ অধ্যায়)

সুরাকা ইবন মালিকের ঘটনা

কুরায়শগণ এ ঘোষণা দিয়েছিল যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা) অথবা আবূ বকর (রা) কে হত্যা অথবা বন্দী করে আনতে পারবে,তাদের প্রত্যেকের বিনিময়ে পৃথক পৃথকভাবে একশত করে উট পুরস্কার দেয়া হবে। (মুস্তাদরাক, ৩খ. পৃ.৬)। সুরাকা ইবন মালিক ইবন খাস'আম বলেন, আমি আমার বৈঠকে বসা ছিলাম, এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি রাত্রিকালে উপকূল এলাকা দিয়ে কয়েক ব্যক্তিকে যেতে দেখেছি। আমার ধারণা যে, তারা মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর সঙ্গীগণই হবেন।

সুরাকা বলেন, আমি নিজের মনে মনে বুঝে নিয়েছিলাম যে, নিঃসন্দেহে তিনিই হবেন। কিন্তু তাকে এ বলে দুর্বল করে দিলাম যে, এরা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সঙ্গীগণ নন বরং অন্য কেউ হবে। উদ্দেশ্য ছিল যে, এই ব্যক্তি কিংবা অপর কেউ এটা শুনে কুরায়শের পুরস্কার হাতিয়ে না নেয়। এর একটু পর আমি বৈঠক থেকে উঠলাম এবং দাসীকে বললাম, ঘোড়া নিয়ে অমুক টিলার নিচে অপেক্ষা কর। আর আমি আমার বর্শা নিয়ে ঘরের পিছন দিয়ে বের হলাম এবং ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দ্রুত ছুটলাম। যখন সুরাকা তাঁর নিকটে পৌঁছল, তখন আবূ বকর (রা) তাকে দেখতে পেলেন এবং ঘাবড়িয়ে গিয়ে বললেন, এক্ষণে আমরা ধরা পড়তে যাচ্ছি। এ ব্যক্তি আমাদের খোঁজে আসছে। তিনি বললেন, অবশ্যই নয়, لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا "তুমি চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ অবশ্যই আমাদের সাথে রয়েছেন।"

আর তিনি সুরাকার জন্য বদ-দু'আ[1] করলেন। সাথে সাথে সুরাকার ঘোড়ার হাঁটু[2] পর্যন্ত শক্ত পাথুরে যমীনে বসে গেল। সুরাকা বললেন, নিশ্চিত যে, এটা আপনাদের দু'জনার বদদু'আর ফল। আপনারা দু'বুযুর্গ আমার জন্য দু'আ করুন। আল্লাহর কসম, আমি আপনাদের সাথে ওয়াদা করছি যে ব্যক্তি আপনাদের খোঁজে আসবে, আমি তাকে ফিরিয়ে দেব।

তিনি দু'আ করলেন, আর সাথে সাথে যমীন ঘোড়ার পা মুক্ত করে দিল। আমি বুঝে ফেললাম, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাঁকে বিজয় দান করবেন। আর কুরায়শগণ যে তাঁকে হত্যা অথবা গ্রেফতারের জন্য শত উট পুরস্কার ঘোষণা করেছে, সে খবরও তাঁকে অবহিত করলাম এবং আমার সাথে যে পাথেয় ছিল, তা তাঁর খিদমতে পেশ

---

১. বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে, তিনি এ বলে বদদু'আ করেছিলেন যে, "আয় আল্লাহ, ওকে ধসিয়ে দাও।" আর অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহ, তুমি যেভাবে ইচ্ছা, আমাদের সাহায্য কর।" (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮৭)।

২ অপর বর্ণনায় আছে, পেট পর্যন্ত ধসে গিয়েছিল। (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮৮)।

করলাম। তিনি তা গ্রহণ করলেন না। অবশ্য এটা বললেন যে, আমাদের কথা কারো কাছে প্রকাশ করো না।

অতিরিক্ত নিশ্চয়তার জন্য আমি আরয করলাম, আপনি আমার নিরাপত্তা ও ক্ষমার ব্যাপারে কিছু লিখে দিন। তাঁর নির্দেশে আমির ইবন ফুহায়রা এক টুকরা চামড়ায় আমাকে ক্ষমা করার কথা লিখে দিলেন[১] এবং সামনে অগ্রসর হলেন। আর আমিও নিরাপত্তা পত্র নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলাম। পথে তাঁর অনুসন্ধানকারী যে ব্যক্তির সাথেই দেখা হতো, তাকেই এ বলে ফিরিয়ে দিতাম যে, তোমাদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই, আমি দেখে এসেছি। (বুখারী শরীফ, ১খ. পৃ. ৫১০, ৫১৫ ও ৫৫৭)।

এ ব্যাপারে সুরাকা আবূ জাহলকে উদ্দেশ্য করে বললেন

اباحكم والله لو كنت شاهدا   لامر جوادى حين ساخت قوائمر

"ওহে আবূ জাহল, আল্লাহর কসম, যদি তুমি ঐ সময় উপস্থিত থাকতে, যখন আমার ঘোড়ার পাগুলো যমীনে দেবে যাচ্ছিল,

علمت ولم تشكك بان محمدا   نبى ببرهان فمن ذايقا ومه

"তা হলে তুমি বিশ্বাস করতে আর এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকতো না যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর নবী, আল্লাহ তাঁকে দলীল প্রমাণসহ প্রেরণ করেছেন, কে তাঁর মুকাবিলা করতে সক্ষম"?[২]

ফায়েদা

নবী করীম (সা)-এর মু'জিযা হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযারই অনুরূপ। কারূন যেভাবে মূসা (আ)-এর দু'আয় যমীনে ধসে গিয়েছিল, অনুরূপভাবে হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর দু'আয় সুরাকার ঘোড়াও যমীনে ধসে গিয়েছিল। এ ঘটনার পর হযরত (সা) নির্ভয়ে পথ চলতে শুরু করলেন।

অবশেষে যখন তিনি মদীনার নিকটে পৌঁছলেন, তখন হযরত যুবায়র (রা)-এর বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে তাঁর সাথে সাক্ষাত ঘটে। হযরত

---

১. একটি হাদীসে আছে, তিনি সুরাকাকে বলেছিলেন, হে সুরাকা, ঐ সময় তোমার অবস্থা কেমন হবে, যখন তুমি কিসরার (প্রাচ্যের সম্রাট) কাঁকন তোমার হাতে পরবে? সুতরাং যখন হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতকালে প্রাচ্য বিজিত হলো এবং কিসরার মুকুট, কাঁকন এবং অন্যান্য অলঙ্কারাদি মসজিদে নববীতে হযরত উমরের সামনে ঢেলে দেয়া হলো, তখন তিনি বললেন, সুরাকাকে ডাক। সুরাকাকে উপস্থিত করা হলে হযরত উমর (রা) সুরাকাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হাত উঠাও, প্রশংসা সেই মহান যাত পাকের, যিনি পরম প্রতিপত্তিশালী কিসরার হাতের কাঁকন নিয়ে সুরাকা নামক এক সাধারণ ব্যক্তির হাতে পরালেন। এরপর তিনি সমস্ত অলঙ্কার মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। (যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৪৮; ইসাবা, সুরাকা ইবন মালিকের জীবনী; ইবন আবদুল বারকৃত আল-ইস্তিয়াব, ২খ. পৃ. ১২০)।

২. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮৯; রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ৬।

যুবায়র (রা) তাঁর জন্য এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর জন্য শ্বেতবর্ণের পোশাক উপহার দেন। এ বর্ণনা ইমাম বুখারী (র)-এর।

ইবন আবূ শায়বার বর্ণনার দ্বারা জানা যায় যে, হযরত তালহা (রা)ও এ দু'বুযুর্গের জন্য পোশাক দিয়েছিলেন।[১]

বুরায়দা আসলামীর ঘটনা

কিছুটা সামনে অগ্রসর হলে সুরাকার মত বুরায়দা আসলামীও সত্তরজন অশ্বারোহী সহ তাঁর সন্ধানে বের হন, যাতে করে কুরায়শের নিকট থেকে একশত উট পুরস্কার পাওয়া যায়। যখন বুরায়দা তাঁর নিকটে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে ? বুরায়দা বললেন, আমি বুরায়দা। নবী (সা) হযরত আবূ বকরের দিকে তাকিয়ে ফাল নির্ধারণের মত করে বললেন يَا اَبَا بَكْرٍ بَرْدِ اَمْرُنَا وَصَلُحَ "ওহে আবূ বকর, আমাদের কাজ শীতল ও সঠিক হয়েছে।"

এরপর বললেন, তুমি কোন্ গোত্রের ? বুরায়দা বলল, আমি আসলাম গোত্রের। তিনি (সা) হযরত আবূ বকরের দিকে তাকিয়ে ফাল নির্ধারণের মত করে বললেন سَلِمْنَا "আমরা নিরাপদ।" এরপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আসলাম গোত্রের কোন্ শাখার ? বুরায়দা বললেন, বনী সাহমের। তিনি বললেন, خرج سهمك "তোমার অংশ বেরিয়ে এসেছে।" অর্থাৎ ইসলামে তোমার অংশ আছে। বুরায়দা বললেন, আপনি কে? তিনি বললেন : اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ "আমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ এবং আল্লাহর রাসূল।" বুরায়দা বললেন, اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

বুরায়দা মুসলমান হলেন এবং ঐ সত্তর ব্যক্তি, যারা বুরায়দার সঙ্গী ছিলেন, সবাই ইসলাম গ্রহণে ধন্য হলেন। বুরায়দা (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মদীনায় প্রবেশকালে আপনার সামনে একটি পতাকা থাকা উচিত। তিনি স্বীয় পাগড়ি খুললেন এবং বর্শার মাথায় বেঁধে বুরায়দাকে দিলেন। যে সময় নবী (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হন, বুরায়দা পতাকা হাতে তাঁর সামনে ছিলেন (বায়হাকী তাঁর দালাইলে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এবং একই সনদে ইবন আবদুল বার তাঁর 'আল-ইস্তিয়াবে' হযরত বুরায়দা আসলামীর ভাষ্যে উপস্থাপন করেন)।[২]

তাঁর আগমনের সংবাদ পূর্বেই মদীনায় পৌঁছেছিল। মদীনার প্রতিটি মানুষ তাঁকে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে (প্রতিদিন প্রভাতে) 'হিরা' নামক স্থানে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। দুপুর হয়ে গেলে তারা নিজেদের ঘরে ফিরে যেত। প্রতিদিন তারা এ কাজই করত। একদিন তারা অপেক্ষা করার পর ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় এক ইয়াহূদী

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮৯।

২ যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৪৯।

টিলার উপরে তাঁর আগমনের পবিত্র চিহ্ন দেখে অজ্ঞাতসাবে চিৎকার দিয়ে বলল, يَا بَنِىْ قَيْلَةُ هٰذَا جَدُكُمْ "ওহে কায়লার[১] সন্তানেরা, তোমাদের উদ্দিষ্ট এবং সৌভাগ্যের প্রতীক এসে গেছেন।"[২]

পারস্য কবির ভাষায় :

اینك آن سر و خر امان می رسد — اینك ان گلبرگ خندان می رسد
شاباش اے خسته هجران — بلا کرپئے درد تو درمان می رسد
شوق کن اے بلبل گلزار عشق — کان گل نواز گلستان می رسد
دردل افسرده روحے می دمد — مروه تن رامزده حان می رسد
تازه باش اے تشنه وادی غم — کز برایت آب حیوان می رسد
دور شوائے ظلمت شام فراق — کا افتاب وصل تابان می رسد

"মনোরম ভঙ্গিতে তিনি আসলেন, ফুল বাগানের পরিচর্যাকারী এসে গেছেন, সাবাস ওহে পথশ্রান্ত পথিক, তোমার চিকিৎসা ব্যবস্থা এসে গেছে। ওহে ফুল-মেলার বুলবুল, তুমি আনন্দ কর। ফুল বাগানের মালির আগমনে হৃদয়ে স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছে, মুর্দা দিলে প্রাণের সুসংবাদ এস গেছে। ওহে ব্যথিত অন্তর, তোমার জন্য আবে হায়াত এসে গেছে। রাতের আঁধার দূরীভূত হয়ে গেছে, মিলনের প্রদীপ্ত সূর্য এসে গেছে।"

সংবাদটি কেবল কানে আসার অপেক্ষা ছিল, আনসারগণ তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য উদ্বেলিত হৃদয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল এবং আমর ইবন আউফ গোত্রের এলাকা তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল।

পবিত্র মদীনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে একটি জনবসতি আছে, যাকে কুবা বলে। এখানে আনসারদের কয়েকটি গোত্র বসবাস করত। এদের মধ্যে আমর ইবন আউফের বংশ ছিল প্রসিদ্ধ। আর এ বংশের সর্দার ছিলেন কুলসুম ইবন হাদম। নবী (সা) সেখানে পৌঁছে কুলসুম ইবন হাদমের গৃহে উঠলেন আর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খুবায়ব ইবন উসাফের গৃহে অবস্থান নিলেন। চারদিক থেকে আনসারগণ আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সাথে আসছিলেন এবং প্রত্যয় ও মহব্বতের সাথে তাঁকে সালাম জানাতে আসছিলেন।

হযরত আলী (রা) নবী (সা)-এর রওয়ানা হওয়ার পর তিনদিন পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেন। আর রাসূল (সা) যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর নিকট গচ্ছিত আমানত হযরত আলীর হাতে সোপর্দ করে এসেছিলেন, সে আমানতসমূহ ফেরত দিয়ে তিনি

---

১. কায়লা আনসারদের প্রপিতামহী অর্থাৎ আওস এবং খাযরাজ গোত্রের পিতামহীর নাম। (যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৫০)।

২. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮৯।

কুবায় এসে পৌঁছান এবং নবী (সা)-এর সাথে কুলসুম ইবন হাদমের গৃহে অবস্থান নেন।[১]

তাকওয়ার মসজিদ প্রতিষ্ঠা

কুবায় আগমনের পর সর্বপ্রথম তিনি যে কাজটি করেন তা হলো, একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সর্বপ্রথম নবী (সা) স্বয়ং একটি পাথর এনে কিবলা বরাবর স্থাপন করেন। তাঁর পরে হযরত আবূ বকর (রা) এবং আবূ বকরের পর হযরত উমর (রা) এক একটি পাথর স্থাপন করেন। এরপর অপরাপর সাহাবায়ে কিরাম (রা) পাথর আনয়ন করে স্থাপন শুরু করেন এবং নির্মাণ কাজ শুরু হয়। সাহাবায়ে কিরামের সাথে তিনিও বড় বড় পাথর আনতে শুরু করেন এবং কোন কোন সময় পাথর যাতে পড়ে না যায়, এজন্যে পবিত্র পেটের সাথে লাগিয়ে নিতে থাকেন। সাহাবায়ে কিরাম আরয করেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি রাখুন, আমরা উঠাচ্ছি। তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। এ মসজিদেরই শানে এ আয়াতটি নাযিল হয় :

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ

"যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার উপর, সেটিই তোমার সালাত আদায়ের জন্য অধিক যোগ্য। সেখানে এমন লোক আছে, যারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পসন্দ করেন।" (সূরা তাওবা : ১০৮)

যখন এ আয়াত নাযিল হল, তখন তিনি আমর ইবন আউফকে জিজ্ঞেস করলেন ওটা কোন্ ধরনের পবিত্রতা, যে ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা করেন?

বনী আমর আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা ঢিলা দ্বারা ইস্তিনজা করার পর পানির দ্বারাও পবিত্রতা অর্জন করি। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ কাজ পসন্দ করে থাকবেন।

রাসূল (সা) বললেন হ্যাঁ, এটাই সে আমল, যে জন্য তোমাদের প্রশংসা খোদ আল্লাহ তা'আলা করেছেন। তোমাদের উচিত যে, তোমরা এ কাজটিকে নিজেদের জন্য আবশ্যকীয় করে নাও এবং সব সময় এর উপর আমল করতে থাক (রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ১১০)।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতি শনিবারে বাহনে আরোহণ করে অথবা পায়ে হেঁটে কুবার মসজিদ দেখতে আসতেন এবং সেখানে দু'রাকাআত নামায আদায় করতেন। হযরত সাহল ইবন হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১৭৪।

ব্যক্তি নিজ গৃহে উযূ করে (পদব্রজে) আসে এবং মসজিদে কুবায় এসে দু'রাকাআত নামায আদায় করে, সে উমরার সওয়াব পাবে (ইবন মাজাহ)।

হিজরতের তারিখ

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, যে দিন মহানবী (সা) হিজরত করে কুবা এসে পৌছান, ঐ দিন ছিল শনিবার, ১২ই রবিউল আউয়াল, ১৩ নববী বর্ষ। আর সীরাত বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মতে তিনি মক্কা মুকাররমা থেকে ২৭ সফর, বুধবার রওয়ানা হন। তিন দিন সাওর গুহায় অবস্থান করে ১লা রবিউল আউয়াল, সোমবারে মদীনা মুনাওয়ারা রওয়ানা হন এবং উপকূলবর্তী পথে অগ্রসর হয়ে ৮ই রবিউল আউয়াল, সোমবার দ্বিপ্রহরে কুবা পল্লীতে উপস্থিত হন। আল্লামা ইবন হাযম এবং হাফিয মুগালতাঈ এ বক্তব্যই গ্রহণ করেছেন।[১]

ইসলামী তারিখের সূচনা

ইমাম যুহরী বলেন, ঐ দিন থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশে ইসলামী তারিখ গণনার সূচনা হয়। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন, তখন রবিউল আউয়াল থেকে তারিখ লিখার নির্দেশ দেন। হাকিম এ বর্ণনা তাঁর 'ইকলীলে' উল্লেখ করেন। কিন্তু বর্ণনাটি মু'দাল (معضل) বা জটিল। প্রসিদ্ধ বর্ণনা হল, হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে ইসলামী তারিখ গণনার সূচনা হয়। শা'বী এবং মুহাম্মদ ইবন সীরীন থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হযরত উমর (রা) কে লিখে পাঠান, আপনার নির্দেশসমূহ আমাদের কাছে পৌঁছে, কিন্তু এতে তারিখ লিখা থাকে না। হযরত উমর (রা) ১৭ হিজরীতে তারিখ নির্ধারণের ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সহযোগিতা কামনা করেন। কেউ বলেন, তারিখের সূচনা নুবূয়াতের সূচনা থেকে করা উচিত; কেউ বলেন হিজরত থেকে; আর কেউ বলেন, মহানবী (সা)-এর ওফাতের দিন থেকে। হযরত উমর (রা) বলেন, তারিখের সূচনা হিজরতের দিন থেকেই হওয়া উচিত। এজন্যে যে, হিজরতের মাধ্যমেই হক ও বাতিলের পার্থক্য সূচিত হয়। সম্মিলিতভাবে সবাই এ রায় পসন্দ করেন।

কিয়াস-এর দাবি তো এটাই ছিল যে, রবিউল আউয়াল মাসই হিজরী সালের প্রথম মাস হওয়া উচিত। কেননা এ মাসেই তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন। কিন্তু রবিউল আউয়ালের পরিবর্তে মুহররম মাসকে প্রথম মাস এজন্যে করা হয় যে, তিনি (সা) মুহররম মাস থেকেই হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। আনসারগণ দশই যিলহজ্জ তাঁর হাতে বায়'আত হন এবং যিলহজ্জের শেষ তারিখে তারা মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তাদের প্রত্যাবর্তনের কয়েক দিন পরেই হিজরতের ইচ্ছা করেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে হিজরতের অনুমতি দেন। এ কারণে হিজরী

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৫১।

সনের প্রথম মাস মুহররমকে করা হয়েছে। এছাড়া হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রা) হযরত উমর (রা) কে পরামর্শ দেন যে, হিজরী সনের সূচনা মুহররম মাস থেকেই হওয়া উচিত।

কেউ বললেন, রমযানুল মুবারক থেকেই বছরের সূচনা হওয়া উচিত। হযরত উমর (রা) বললেন, মুহররমই এজন্যে উপযুক্ত, কারণ হজ্জ থেকে মানুষ মুহররম মাসেই প্রত্যাবর্তন করে। এর উপরই সবাই একমত হন।

(বাবুত-তারীখ, ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২০৯; তারীখে তাবারী, ২খ. পৃ. ২৫২; যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৫২; উমদাতুল কারী, ৮খ. পৃ. ১২৮)।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে সূরা ওয়াল-ফাজর-এর তাফসীরে বলা হয়েছে, এখানে 'ফাজর' শব্দ দ্বারা মুহররম মাসকে বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা বছরের সূচনা হয়।[১]

ইমাম সারাখসী 'সিয়ারুল কাবীর'-এর শরাহতে লিখেছেন, হযরত উমর (রা) যখন তারিখ নির্দিষ্ট করার উদ্দেশে সাহাবায়ে কিরামকে একত্রিত করেন, তখন কেউ পরামর্শ দেন যে, তারিখের সূচনা মহানবী (সা)-এর শুভ জন্ম থেকে করা উচিত, কিন্তু হযরত উমর (রা) এ প্রস্তাব পসন্দ করলেন না। কেননা এটা খ্রিস্টানদের অনুরূপ হয়ে যায় যে, তাদের তারিখ হযরত ঈসা (আ)-এর শুভ জন্ম থেকে গণনা করা হয়।

কেউ কেউ বলেন যে, নবী (সা)-এর ওফাতের তারিখ থেকে ধার্য করা হোক। এটাও হযরত উমর (রা) অপসন্দ করলেন এ জন্যে যে, তাঁর ওফাত তো একটি বড় দুর্ঘটনা এবং বড় ধরনের মুসীবত। এ দিন থেকে তারিখ সূচনা করা ঠিক নয়।

আলোচনা-পর্যালোচনার পর সবাই এ ব্যাপারে একমত হয়ে যান যে, হিজরতের দিন থেকেই তারিখ নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। হযরত ফারূকে আযম (রা) এ রায়টি পসন্দ করলেন এ জন্যে যে, হিজরতের দ্বারাই হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে এবং ইসলামের প্রসার অর্থাৎ দু' ঈদ এবং জুমু'আ প্রকাশ্যে আদায় করা সম্ভব হয়েছে (যেমনটি শরহে সিয়ারুল কাবীরে বর্ণিত হয়েছে, ৪খ. পৃ. ৬৩)।

কুবায় কয়েক দিন অবস্থানের পর জুমু'আর দিনে তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় গমনের ইচ্ছা করলেন এবং উটে সওয়ার হলেন। পথিমধ্যে বনী সালিম গোত্র সেখানে পৌঁছার পর জুমু'আর সময় হয়ে গেল। তিনি সেখানেই জুমু'আর নামায আদায় করলেন। এটাই ছিল ইসলামে তাঁর প্রথম খুতবা এবং প্রথম জুমু'আর নামায।

খুতবাতুত-তাকওয়া (প্রথম খুতবা এবং প্রথম জুমু'আর নামায)

এটা ছিল সেই খুতবা, যার প্রতিটি শব্দ বিশুদ্ধতা ও উত্তম শব্দ চয়নের কৃতিত্বে পরিপূর্ণ। আর যার প্রতিটি শব্দই ছিল রুগ্ন আত্মার জন্য আরোগ্যদানকারী এবং মৃত আত্মার জন্য অমীয় সুধা। যার প্রতিটি বাক্য ছিল স্বাদের দিক দিয়ে পরম উপাদেয় এবং সুমধুর।

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২০৭।

(اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) اَحْمَدُهُ وَاَسْتَعِيْنُهُ وَاَسْتَغْفِرُهُ وَاَسْتَهْدِيْهِ وَاُؤْمِنُ بِهِ وَلاَ اَكْفُرُ وَاُعَادِيْ مَنْ يَكْفُرُهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَرْسَلَهُ بِالْهُدٰى وَالنُّوْرِ وَالْمَوْعِظَةِ عَلٰى فِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَقِلَّةٍ مِنَ الْعِلْمِ وَضَلاَلَةٍ مِنَ النَّاسِ وَانْقِطَاعٍ مِنَ الزَّمَانِ وَدُنُوٍّ مِّنَ السَّاعَةِ وَقُرْبٍ مِّنَ الْاَجَلِ - مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى وَفَرَّطَ وَضَلَّ ضَلاَلاً بَّعِيْدًا وَاُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهُ خَيْرُ مَا اُوْصِىْ بِهِ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمُ اَنْ يَّحُضَّهُ عَلَى الْاٰخِرَةِ وَاَنْ يَّاْمُرَهُ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاحْذَرُوْا مَا حَذَّرَكُمُ اللّٰهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلاَ اِلاَّ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ نَصِيْحَةٌ وَلاَ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ذِكْرٰى وَاِنَّ تَقْوَى اللّٰهِ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ عَلٰى وَجَلٍ وَمَخَافَةٍ مِنْ رَبِّهِ عَوْنُ صِدْقٍ عَلٰى مَا تَبْغُوْنَ مِنْ اَرِ الْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُّصْلِحِ الَّذِىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ مِنْ اَمْرِهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ لاَيَنْوِىْ بِذٰلِكَ اِلاَّ وَجْهَ اللّٰهِ يَكُنْ لَهُ ذِكْرًا فِىْ عَاجِلِ اَمْرِهِ وَذُخْرًا فِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ حِيْنَ يَفْتَقِرُ الْمَرْءُ اِلٰى مَاقَدَّمَ وَمَا كَانَ مِنْ سِوٰى ذٰلِكَ يَوَدُّ لَوْ اَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيْدًا - وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ وَالَّذِىْ صَدَّقَ قَوْلَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ لاَخُلْفَ لِذٰلِكَ فَاِنَّهُ يَقُوْلُ عَزَّ وَجَلَّ مَايُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَا اَنَا بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيْدِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِكُمْ وَاٰجِلِهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ فَاِنَّهُ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا وَاِنَّ تَقْوَى اللّٰهِ يُوْقِىْ مَقْتَهُ وَيُوَقِّىْ عُقُوْبَتَهُ وَيُوْتِىْ سَخْطَهُ وَاِنَّ تَقْوَى اللّٰهِ يُبَيِّضُ الْوُجُوْهَ وَيُرْضِى الرَّبَّ وَيَرْفَعُ الدَّرَجَتَهُ خُذُوْا لِحَظِّكُمْ - وَلاَتُفَرِّطُوْا فِىْ جَنْبِ اللّٰهِ قَدْ عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ كِتَابَهُ وَنَهَجَ لَكُمْ سَبِيْلَهُ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَيَعْلَمَ الْكَاذِبِيْنَ فَاَحْسِنُوْا كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ وَعَادُوْا اَعْدَاءَهُ - وَاجْتَبَاكُمْ وَسَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِيْنَ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْىٰ مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ فَاَكْثِرُوْا ذِكْرَاللّٰهِ وَاعْمَلُوْا لِمَا بَعْدَ الْيَوْمِ فَاِنَّهُ مَنْ يُّصْلِحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ يَكْفِهِ اللّٰهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يَقْضِىْ عَلَى النَّاسِ وَلاَيَقْضُوْنَ عَلَيْهِ وَيَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ وَلاَيَمْلِكُوْنَ مِنْهُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ

"(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের), আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং হিদায়াত কামনা করছি। তাঁর প্রতি ঈমান আনছি এবং তাঁর সাথে কুফরী করছি না, বরং তাঁর সাথে কুফরীকারীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করি, আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল: যাকে আল্লাহ হিদায়াত, নূর, হিকমত এবং উপদেশ সহ প্রেরণ করেছেন। এমন সময় আমি প্রেরিত হয়েছি, যখন নবী ও রাসূল প্রেরণের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়েছিল, পৃথিবীতে জ্ঞানের নামটুকু কেবল অবশিষ্ট ছিল, মানুষ ছিল ভ্রষ্টতায় নিমগ্ন, আর কিয়ামত ছিল নিকটবর্তী। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করল, তারা হিদায়াত লাভ করল। আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী করল, তারা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হলো এবং সংকীর্ণতা ও কঠিন ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হলো। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ভীতির নসীহত করছি। কারণ এ হচ্ছে এক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের সর্বোত্তম নসীহত। এ নসীহত তাকে পরকালের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং তাকে আল্লাহ ভীতি ও পরহেযগারীর নির্দেশ দেয়। অতএব তোমরা ঐ বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে, যা থেকে আল্লাহ তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করেছেন, আল্লাহ ভীতির চেয়ে বেশি কোন উপদেশ এবং নসীহত নেই, আর নিঃসন্দেহে তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতি আখিরাতের ব্যাপারে প্রকৃত সাহায্যকারী এবং বন্ধু। যে ব্যক্তি নিজের প্রকাশ্য এবং গোপন বিষয়সমূহ আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে, যাতে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও রেযামন্দী লাভই উদ্দেশ্য থাকে এবং তাতে কোন পার্থিব উদ্দেশ্য ও কর্ম না হয়, তখন তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা ও নিষ্ঠা পার্থিব জীবনে তার সম্মান ও মর্যাদার নিমিত্তে পরিণত হয় আর মৃত্যুর পর তা হয় পরকালের পাথেয়। কারণ যখন কোন ব্যক্তি সৎকর্মের প্রত্যাশী হয় এবং তাকওয়া বিরোধী কর্মের ব্যাপারে তার কামনা-বাসনা হয় যে, এর ও আমার মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি হলে তা কতই না উত্তম হতো। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তিমত্তার দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করেন। এর কারণ হলো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি নিতান্ত অনুগ্রহশীল। তিনি তাঁর বক্তব্যে সত্যবাদী এবং প্রতিশ্রুতি পালনকারী। তাঁর বক্তব্য এবং প্রতিশ্রুতি অলঙ্ঘনীয়। আল্লাহর ওয়াদা পরিবর্তিত হয় না। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যাচারীও নন। কাজেই দুনিয়া এবং আখিরাতে, প্রকাশ্যে এবং গোপনে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং মহা পুরস্কার দান করেন। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, নিঃসন্দেহে সে পরম সাফল্য অর্জন করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ভীতি এমন বস্তু, যা আল্লাহর গযব, তাঁর প্রতিশোধ, তাঁর শাস্তি এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা করে। আর আল্লাহ ভীতিই কিয়ামতের দিন মানুষের চেহারাকে উজ্জ্বল ও আলোকিত করবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণে পরিণত হবে। কাজেই আল্লাহ ভীতির যে পরিমাণ অংশ সংগ্রহ

করতে পার করে নাও, এতে হ্রাস করো না। আল্লাহর আনুগত্যে কোন প্রকার কার্পণ্য করো না। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শিক্ষার জন্য কিতাব প্রেরণ করেছেন এবং হিদায়াতের পথ তোমাদের সামনে পরিস্ফূটিত করেছেন, যাতে তোমরা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পার। সুতরাং যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, সেভাবে তোমরাও সুন্দর ও উত্তমরূপে তাঁর আনুগত্য কর, তাঁর শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ কর। আর তাঁর পথে প্রয়োজনে জিহাদ কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে পরীক্ষিত ও নির্দিষ্ট করেছেন এবং তোমাদের নাম 'মুসলিম' অর্থাৎ মনেপ্রাণে 'অনুগত' ও 'আদেশ পালনকারী' রেখেছেন। কাজেই এ নামের মর্যাদা রক্ষা কর। আল্লাহর নিয়ম এটাই যে, যারা ধ্বংস ও বরবাদ হবে, তারা এর কারণও সৃষ্টি করবে এবং কারণের দরুনই তারা ধ্বংস হবে। আর যারা জীবিত থাকবে, তারাও কারণ প্রতিষ্ঠা ও তা দর্শন করেই জীবিত থাকবে। কোন রক্ষা, কোন শক্তি এবং কোন উদ্যম আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। অতএব অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর কর এবং আখিরাতের জন্য কাজ কর। যে ব্যক্তি নিজের কাজকর্ম আল্লাহর উপর সোপর্দ করবে, আল্লাহ্ মানুষের দ্বারা তার সহায়তা করাবেন, কেউ তার অনিষ্ট করতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ তো মানুষের জন্যই প্রযোজ্য, আর মানুষ তো আল্লাহকে নির্দেশ দিতে পারে না। আল্লাহই সমস্ত মানুষের মালিক, আর মানুষ আল্লাহর কোন কিছুরই মালিক নয়। কাজেই তোমরা নিজেদের কাজকর্ম আল্লাহর সন্তুষ্টি মাফিক কর, মানুষের ধান্দায় পড়ো না। আল্লাহ্ সবাইকে সাহায্য করবেন। আল্লাহু আকবার, ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।"[১]

দ্রষ্টব্য এটাই হযরত রাসূল (সা)-এর প্রথম খুতবা যা তিনি হিজরতের পর দিয়েছিলেন। তের বছর নির্যাতিত জীবন যাপনের পর যে খুতবা দেয়া হচ্ছে, এর একটি শব্দও স্বীয় দুশমনদের প্রতি অভিসম্পাত বা অভিযোগপূর্ণ ছিল না। তাকওয়া, পরহেযগারী ও আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি ছাড়া কোন শব্দই নবীর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়নি। তিনি ছিলেন "নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত"-আল্লাহর এ বাণীর জীবন্ত প্রতিভূ। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সালাত ও বরকত এবং অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

জুমু'আর সালাত থেকে অবসর হয়ে তিনি স্বীয় উষ্ট্রীতে আরোহণ করেন ও হযরত আবূ বকর (রা) কে নিজের পেছনে বসিয়ে নেন এবং মদীনার পথে যাত্রা করেন। আর আনসারগণের এক বিরাট বাহিনী অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তাঁর সামনে পেছনে ডানে ও বামে চলতে থাকেন।[২]

প্রত্যেক ব্যক্তিরই কামনা ছিল, যদি নবী (সা) আমার গৃহে অবতরণ করতেন! সকল দিকেই এই আগ্রহ ও মহব্বত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার

---

১. তারিখে তাবারী, ২খ. পৃ. ২২৫; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২১৩।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৯৫।

গরীবালয় আপনার জন্য প্রস্তুত। তিনি প্রত্যেকের জন্য দু'আ করছিলেন এবং বলছিলেন, এই উষ্ট্রী আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট, কাজেই সে যেখানে বসবে, আমি সেখানেই অবস্থান করব।[১] পারস্য কবির ভাষায় :

رشتشه درگرونم افگنده دوست　　　می بردهر جاکه خاطر خواء اوست

লাগাম তিনি সম্পূর্ণ ঢিলে করে দিয়েছিলেন, কোনদিকেই পবিত্র হাত দিয়ে লাগাম টানছিলেন না। উৎসাহ-উদ্দীপনা এতটা ছিল যে, স্ত্রীলোকগণও নবী (সা)-এর সৌন্দর্য দেখার জন্য ছাদে উঠে গিয়েছিলেন এবং এ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন :

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا　　　مِنْ ثَنِيَاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا　　　مَادَعَ لِلّٰهِ دَاعِ
اَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا　　　جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمَطَاعِ

"সানিয়া উপত্যকা থেকে আমাদের নিকট চতুর্দশ রজনীর চাঁদ উদিত হয়েছে, যখন পর্যন্ত আল্লাহকে ডাকার মত কেউ অবশিষ্ট থাকবে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আমাদের উপর অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। হে মহান প্রেরিত পুরুষ ! আপনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন বিষয় নিয়ে এসেছেন, যার আনুগত্য আমাদের জন্য অপরিহার্য।"

বনী নাজ্জারের বালিকাদের আবৃত্তি

نَحْنُ جَوَارُ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ　　　يَا حَبَّذَا مُحَمَّدً مِنْ جَارَ

"আমরা বনী নাজ্জারের বালিকা দল আর আমাদের প্রতিবেশী মুহাম্মদ (সা) কত উত্তম প্রতিবেশী !"

আর আনন্দ ও খুশিতে ছোট বড় সবার মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল :

جَاءَ نَبِىُّ اللّٰهِ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

"আল্লাহর নবী আমাদের মাঝে এসেছেন, আল্লাহর রাসূল আমাদের মাঝে এসেছেন।"

সহীহ বুখারীতে হযরত বারা' ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি মদীনাবাসীকে আর কোন ব্যাপারে এতটা আনন্দিত হতে দেখিনি, যতটা আনন্দিত হতে দেখেছি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনে। সুনানু আবূ দাউদে হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় উপস্থিত হন, তখন হাবশীরা তাঁর আগমনের আনন্দে তাদের বর্শা নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিল।

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৯২।

হযরত আনাস (রা) বলেন, যখন নবী (সা) মদীনায় আগমন করলে মদীনার আনাচে কানাচে আলোকিত হয়ে উঠেছিল, আর যখন তিনি ইনতিকাল করলেন, সেদিন সবকিছু ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাঁকে কবর মুবারকে রেখে হাতের মাটি ঝাড়াও শেষ হয়নি, প্রত্যেকে অন্তরে পরিবর্তন অনুভব করছিল। (ইমাম তিরমিযী তাঁর 'মানাকিব' অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং একে সহীহ-গরীব বলে মন্তব্য করেন, ইবন মাজাহও হাদীসটি 'জানাযা' অধ্যায়ে বর্ণনা করেন)।

মোটকথা, উষ্ট্রী নিজস্ব ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে চলছিল, আর ঐ মহান ব্যক্তিবর্গ তাঁর আশপাশে, ডানে-বামে চলছিলেন, যাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি থেকেই তাঁর এবং তাঁর নবীর প্রতি প্রেম ও ভালবাসার জন্য নির্বাচিত ও নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন আর অন্যান্যের জন্য তাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র স্থানও অবশিষ্ট রাখেননি। আল্লাহর শপথ! এ যা কিছু বলছি, তা সর্বৈব বাস্তব, এতে অতিরঞ্জন কিংবা উপমার কোন নাম-নিশানাও নেই। সাহাবায়ে কিরাম (রা) নিঃসন্দেহে এমনটিই ছিলেন। তিনি চলছিলেন আর তাঁর প্রেমে মত্ত ও একনিষ্ঠ সঙ্গীগণের দৃষ্টি পথে গালিচার মত বিস্তৃত হয়ে চলছিল। যে ব্যক্তিই নিজ ভক্তি শ্রদ্ধা ও দৃঢ় ভালবাসার আতিশয্যে উটনীর লাগাম ধরতে উদ্যত হতেন, তখন নবী (সা) বলতেন : دَعُوهَا فَانَّهَا مَامُورَةٌ "একে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট।"

শেষ পর্যন্ত উটনী বনী নাজ্জার মহল্লায় (যারা তাঁর মাতামহী গোষ্ঠীর আত্মীয়-স্বজন ছিলেন) ঐ স্থান পর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হলো, যেখানে বর্তমানে মসজিদে নববীর দরজা অবস্থিত। তিনি কিন্তু উট থেকে অবতরণ করলেন না। কিছুক্ষণ পর উটনী পুনরায় উঠল এবং হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা)-এর গৃহের দরজায় গিয়ে বসে পড়ল। আর কিছুক্ষণ পর উঠে পুনরায় পূর্বের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল ও নিজের গর্দান জমিতে বিছিয়ে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) উটনী থেকে অবতরণ করলেন আর হযরত আবূ আয়্যূব (রা) তাঁর মালপত্র নিয়ে নিজ গৃহে গেলেন।[১]

ফারসী কবি বলেন :

مبارک منزلے کان خانه راماهے چنیں باشد

همایون کشورے کان عرصه راشاه بسے چنین باشد

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যক্তিগত আগ্রহও ঐ দিকেই ছিল যে, তিনি বনী নাজ্জারেই অবতরণ করেন, যা ছিল তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের মাতুল বংশ। তাঁর আগমনের কারণে এর ইযযত ও আভিজাত্য অর্জিত হয়, যেমনটি সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় জানা যায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ অভিপ্রায়কে অলৌকিকভাবে পূর্ণ করেন যে, উটনীর লাগাম তাঁর হাত থেকে ছাড়িয়ে দেয়া হয়, যাতে তিনি নিজ ইচ্ছামাফিক কোনদিকে একে লাগাম দ্বারা চালিত করতে না পারেন, আর না তিনি কোন বিশেষ

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৫৬, ৩৫৭; উয়ূনুল আসার; ফাতহুল বারী, ৭খ, পৃ. ১৯২।

গৃহকে নিজ অবতরণের জন্য নির্দিষ্ট করেন, যাতে তাঁর নিষ্কলুষ ও একনিষ্ঠ আত্মা নিজ প্রবৃত্তি ও অভিলাষ থেকে পুরোপুরি পবিত্র থাকে। আর যাতে বুঝা যায় যে, প্রকৃতিগতভাবে তাঁর কোন বিশেষ ইচ্ছা কিংবা ঝোঁক ছিল না; বরং উটনী আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল আদিষ্ট, যেখানে আল্লাহর হুকুম হবে, সেখানেই সে থামবে। তিনি ছিলেন আল্লাহর ইশারার অপেক্ষায় অপেক্ষমান। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছাও পূর্ণ করেন এবং সাহাবা কিরামের জন্য এভাবে অবতরণকে একটি অলৌকিক ঘটনা ও নিদর্শনে পরিণত করেন যার বরকতে তাঁদের অন্তর দীর্ঘশ্বাস, বিদ্বেষ, ঝগড়া এবং মনোকষ্ট থেকেও পবিত্র থাকে। আর তারা ভালভাবেই বুঝে নেন যে, হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা)-এর গৃহ নির্বাচন তাঁর পক্ষ থেকে নয়, বরং এ নির্বাচন ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

"এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন, আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহকারী।"[১] অধিকন্তু, ইয়েমেনের বাদশাহ তুব্বা[২] যখন মদীনার যমীন অতিক্রম করছিলেন, তখন তাঁর সহগামী ছিলেন চারশত তাওরাত বিশেষজ্ঞ আলিম। সমস্ত আলিমই এ দাবি করতে শুরু করলেন যে, আমাদেরকে এ যমীনেই থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক। বাদশাহ এর কারণ জিজ্ঞেস করায় তারা বললেন, আমরা আম্বিয়া (আ)-এর বিবরণের পৃষ্ঠাসমূহে এ কথা লিখিত পেয়েছি যে, শেষ যামানায় একজন নবী পয়দা হবেন, যাঁর নাম হবে মুহাম্মদ, আর এ যমীনই হবে তাঁর হিজরতের স্থান। বাদশাহ তাদের সবাইকে সেখানে অবস্থানের অনুমতি দান করেন এবং প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক ঘর তৈরি করিয়ে দেন, প্রত্যেককে বিয়ে করিয়ে দেন এবং সবাইকে দেন প্রচুর ধন-সম্পদ। এছাড়া তিনি নবী (সা)-এর জন্য একটি বিশেষ গৃহ নির্মাণ করান যে, যখন শেষ যামানার নবী (সা) হিজরত করে এখানে আসবেন, তখন এ গৃহে অবস্থান করবেন। এছাড়া তিনি নবী (সা)-এর নামে একটি পত্রও লিখেন, যাতে স্বীয় আনুগত্য ও তাঁকে দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। পত্রের সার-সংক্ষেপ ছিল এরূপ

شَهِدْتُ عَلٰى اَحْمَدَ اَنَّهُ رَسُوْلٌ مِنَ اللّٰهِ بَارِىَ النَّسَمِ

فَلَوْ مُدَّ عُمْرِىْ اِلٰى عُمُرِهِ لَكُنْتُ وَزِيْرًا لَهُ وَابْنَ عَمٍّ

وَجَاهَدْتُ بِالسَّيْفِ اَعْدَاءَهُ وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ غَمٍّ

১. যাদুল মা'আদ, ২খ. পৃ. ৫৫।

২. এ বর্ণনার দ্বারা জানা যায় যে, তুব্বা নেককার ব্যক্তি ছিলেন। যেমনটি انتم خير ام قوم تبع আয়াতের তাফসীরে কতিপয় সাহাবা ও তাবিঈ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আহমদ (সা) প্রকৃতই আল্লাহর রাসূল, যদি আমার বয়স ঐ পর্যন্ত পৌঁছায়, তা হলে আমি অবশ্যই তাঁকে প্রত্যায়ন করব এবং তাঁর সাহায্যকারী হব। তাঁর শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করব এবং তাঁর পেরেশানী দূর করব।"

তুব্বা এ পত্রটি মোহরাঙ্কিত করেন এবং জনৈক আলিমের নিকট সোপর্দ করে বললেন, যদি তুমি ঐ শেষ যামানার নবী (সা) কে পাও, তা হলে আমার এ নিবেদন তাঁর কাছে পেশ করবে। অন্যথায় তোমার সন্তানদের নিকট তা সোপর্দ করে এ ওসীয়তই করবে, যা আমি তোমাকে করছি।

হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) ঐ আলিমের বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং এ গৃহও ঠিক ঐ গৃহটি ছিল, যা ইয়েমেনের বাদশাহ তুব্বা কেবল ঐ উদ্দেশে নির্মাণ করিয়েছিলেন যে, শেষ যামানার নবী (সা) যখন হিজরত করে আসবেন তখন ঐ গৃহে উঠবেন। আর বাদবাকি আনসারগণ সেই চারশ' আলিমেরই সন্তান-সন্তুতি ছিলেন। কাজেই আল্লাহর নির্দেশে উটনী ঐ গৃহের দরজায় এসে দণ্ডায়মান হলো, যা তুব্বা পূর্বেই তাঁর উদ্দেশে নির্মাণ করিয়েছিলেন।

শায়খ যয়নুদ্দীন মারাগী বলেন যদি বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা)-এর গৃহে উঠেননি, বরং আপন গৃহেই উঠেছিলেন তা হলে ভুল হবে না। এজন্যে যে, এ গৃহ তো তাঁরই জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। সে গৃহে হযরত আবূ আয়্যূব (রা)-এর অবস্থান ছিল তো কেবল তাঁর শুভাগমনের অপেক্ষা করা পর্যন্ত।

বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর শুভাগমণের পর আবূ আয়্যূব (রা) ঐ পংক্তিমালা লিখিত পত্রটি তুব্বার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে হস্তান্তর করেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।[১]

হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) নবী (সা)-এর নিকট আরয করলেন যে, আপনি উপর তলায় অবস্থান করুন আর আমরা নিচের ঘরগুলোতে থাকি। কিন্তু তাঁর খিদমতে সব সময় লোকজন আনাগোনা করবে। এতে যদি হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) নিচে অবস্থান করেন তা হলে এ আসা-যাওয়ায় তাদের কষ্ট হবে, এ ধারণা করে তিনি দ্বিতলে অবস্থানের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না; বরং নিচে থাকাই পসন্দ করলেন। ফলে আমরা উপর তলায় থাকা শুরু করলাম। একবার ঘটনাক্রমে পানির পাত্র ভেঙ্গে গেল। পানি নিচে গড়িয়ে যাবে এ আশঙ্কায় ঘাবড়ে গিয়ে আমি এবং উম্মে আয়্যূব তাড়াতাড়ি নিজেদের লেপ দিয়ে পানি শোষণের ব্যবস্থা নিলাম। কেননা পানি শোষণের জন্য এ ছাড়া আমাদের আর কোন কাপড় ছিল না। আমরা প্রতিদিন তাঁর জন্য খাবার তৈরি করে পাঠাতাম। তিনি খাওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ ফেরত পাঠাতেন। খাবারের যে অংশে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আঙুলের চিহ্ন দেখা যেত, আমি ও উম্মে আয়্যূব বরকত লাভের উদ্দেশে সেখানে আঙুল দিয়ে খাবার গ্রহণ করতাম।

---

১. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১২৪।

একবার আমরা খাবারে রসুন ও পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। ফলে তিনি খাবার ফেরত পাঠালেন। দেখলাম তাতে পবিত্র আঙুলের চিহ্ন নেই। আমি ত্রস্তে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি খাবার ফেরত পাঠিয়েছেন, যাতে আপনার আঙুলের চিহ্ন নেই। আমি এবং উম্মে আয়্যুব বরকত লাভের উদ্দেশে ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ জায়গা থেকেই খাদ্য গ্রহণ করি, যেখানে আপনার পবিত্র আঙুলের স্পর্শ থাকে। তিনি ইরশাদ করলেন, এ খাবারে আমি পেঁয়াজ ও রসুনের গন্ধ পাচ্ছিলাম। তোমরা খাও। আমাকে যেহেতু ফিরিশতাগণের সাথে কথা বলতে হয়, সেহেতু এটা খাওয়া আমি অপসন্দ করি। আবূ আয়্যুব (রা) বলেন, এর পর আর কোন সময়ই আমরা তাঁর খাবারে পেঁয়াজ-রসুন অন্তর্ভুক্ত করিনি।[১]

নবী (সা)-এর খিদমতে ইয়াহূদী আলিমদের উপস্থিতি

মহানবী (সা) যখন মদীনা মুনাওয়ারায় এলেন, তখন ইয়াহূদী আলিমগণ বিশেষভাবে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং পরীক্ষামূলকভাবে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে থাকলেন। কেননা ইয়াহূদী আলিমগণ পূর্ববর্তী নবী (আ) গণের প্রদত্ত বিভিন্ন সুসংবাদ দ্বারা শেষ যামানার নবী (সা)-এর আগমন সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। আর তারা এটাও জানতেন যে, মূসা (আ) যে নবী আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন, তিনি শীঘ্রই 'বাতহায়' আত্মপ্রকাশ করবেন। তারা এ অপেক্ষায়ই ছিলেন। সুতরাং হিজরতের বর্ণনায় অতিক্রান্ত হয়েছে যে, নবী (সা) যখন প্রথমবার আনসারদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন, তখন তারা পরস্পর পরামর্শ করল এবং বলল, সম্ভবত ইনিই সেই নবী যাঁর আগমন সম্পর্কে ইয়াহূদীরা আলোচনা করে। যাতে এমন না হয় যে, এ ফযীলত ও সৌভাগ্যের ব্যাপারে তারা আমাদের অগ্রগামী হয়ে যায় (দ্র. ফাতহুল বারী وفود الانصار الى النبى ﷺ بمكة অধ্যায় এবং বায়'আতে আকাবা, আরো দ্রষ্টব্য, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১৪৮)।

জানা গেল, ইয়াহূদী আলিমদের এ ব্যাপারে জানা ছিল যে, মূসা (আ) যে নবীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তাঁর আগমন সন্নিকটবর্তী। কাজেই তারা বিশেষভাবে তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে আগমন করলেন। ভাগ্য যাঁর নসীবে প্রসন্নতা লিখে রেখেছে, তা তাঁকে দেখামাত্র চিনে ফেললেন যে, তিনিই সেই সত্যিকারের নবী, যাঁর সুসংবাদ পূর্ববর্তী নবী (আ) গণ দিয়েছিলেন। কাজেই বিলম্বমাত্র না করে সাথে সাথে ঈমান আনয়ন করলেন। আর যাদের ভাগ্যে বঞ্চনা লিখা ছিল, তারা বঞ্চিতই রয়ে গেল।

১. ইবন আয়েয হযরত উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, ইয়াহূদী আলিমগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হুয়াই ইবন আখতাবের ভাই ইয়াসীর ইবন আখতাব নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং তাঁর কথা শোনেন। এরপর ফিরে গিয়ে

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১৭৬।

নিজ সম্প্রদায়কে বলেন : اطيعونى فان هذا النبى الذى كنا ننتظر । "আমার কথা শোন, অবশ্যই তিনি সেই নবী, যাঁর প্রতীক্ষা আমরা করছিলাম। তিনি এসে পড়েছেন। কাজেই তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আন।"

কিন্তু তার ভাই হুয়াই ইবন আখতাব এর বিরোধিতা করে। সম্প্রদায়ের মধ্যে হুয়াইকে সবচে' বড় এবং নেতা মনে করা হতো। সম্প্রদায়ের লোকজন তারই অনুসরণ করত। তার উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে এবং সত্য গ্রহণে তাকে বাধা দান করে। সম্প্রদায়ের লোকজন তারই অনুসরণ করল এবং তার কথা শুনলো। আর আবূ ইয়াসীরের কথা শুনলো না।[১]

২. সাঈদ ইবন মুসায়্যিব হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) যখন মদীনা মুনাওয়ারা আগমন করেন, তখন ইয়াহূদী আলিমগণ বায়তুল মাদারিসে (ইয়াহূদীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম) একত্রিত হয়ে পরামর্শ করল যে, এ ব্যক্তির [রাসূল (সা)-এর প্রতি খারাপ ইঙ্গিত করে] নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।

৩. বায়হাকী হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ইয়াহূদী আলিম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে এমন সময় উপস্থিত হলেন, যখন তিনি সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি বললেন, "ওহে মুহাম্মদ ! কে আপনাকে এ সূরা শিখিয়েছেন ?" তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে শিখিয়েছেন। এতে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐ ইয়াহূদী আলিম দ্রুত তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেলেন। গিয়ে নিজ সম্প্রদায়কে বললেন, মুহাম্মদ কুরআন তিলাওয়াত করছেন। মনে হলো এটা ঐ কিতাব, যা মূসা (আ)-এর প্রতি নাযিল হওয়া তাওরাতের মতই। এর পর তিনি ইয়াহূদীদের একটি বড় দল সহ তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তারা তাঁর চেহারা-সূরত দেখেই চিনে ফেললেন, ইনি সেই নবী যাঁর আগমনের সুসংবাদ তাওরাতে প্রদত্ত হয়েছে। তারা তাঁর দু'বাহুর মধ্যস্থলে মোহরে নবূয়াত দেখলেন এবং তিনি যে সূরা ইউসুফ পাঠ করছিলেন, তা মনোযোগের সাথে শুনলেন ও বিস্মিত হয়ে গেলেন। তাঁরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেন।[২]

৪. ইবন ইসহাক ও বায়হাকী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, একবার নবী (সা) ইবন সুরিয়াকে (ইয়াহূদী আলিম) বললেন আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি সত্যি সত্যি বল যে, বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে তাওরাতে প্রস্তরাঘাতে হত্যার নির্দেশ আছে কি না ? ইবন সুরিয়া বললেন :

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২১৩।

২ প্রাগুক্ত।

اَللّٰهُمَّ نَعَمْ اَمَا وَاللّٰهُ يَا اَبَا الْقَاسِمْ اِنَّهُمْ لَيَعْرِفُوْنَ اَنَّكَ نَبِىٌّ مُرْسَل وَلٰكِنَّهُمْ يَحْسَدُوْنَكَ

"আয় আল্লাহ! নিঃসন্দেহে তাওরাতে এরূপই নির্দেশ আছে। আর ওহে আবুল কাসিম ! আল্লাহর কসম করে বলছি, কিতাবধারীগণ খুব ভাল করেই জানে এবং চিনে যে, আপনিই সেই প্রেরিত নবী। কিন্তু ওরা আপনার ব্যাপারে পরশ্রীকাতর।" (খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৯৩)।

৫. আবদুল্লাহ ইবন আহমদ তাঁর 'যাওয়াইদে মুসনাদ' গ্রন্থে হযরত জাবির ইবন সামুরা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, একবার জনৈক বহিরাগত ব্যক্তি[১] এল এবং সাহাবায়ে কিরামের নিকট নবী (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল যে, তোমাদের ঐ সঙ্গী কোথায়, যিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করেন। আমি তাকে কিছু প্রশ্ন করব, যাতে বুঝা যাবে তিনি নবী কিনা। ইতোমধ্যে নবী (সা) সামনে এসে পড়লেন। তখন আগন্তুক তাঁকে বলল, আপনার কাছে যে ওহী আসে তা আমাকে শোনান। তিনি তার সামনে আল্লাহর কিতাব থেকে কিছু পাঠ করে শোনালেন। আগন্তুক তা শোনামাত্র বলল, আল্লাহর শপথ ! এ তো ঐ ধরনের কালাম যা মূসা (আ) এনেছিলেন।[২]

অনুরূপভাবে আরো অনেক ইয়াহূদী আলিম, যেমন যায়দ ইবন সানা প্রমুখ তাঁর খিদমতে উপস্থিত হন এবং ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন।[৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ[৪]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) তাওরাতের একজন প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ)-এর বংশোদ্ভূত। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল হুসায়ন, ইসলাম গ্রহণের পর নবী (সা) তাঁর নাম আবদুল্লাহ ইবন সালাম রাখেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) যখন মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন, তখন এ খবর শোনামাত্র আমি তাঁকে দেখার জন্য উপস্থিত হলাম এবং فَلَمَّا رَأَيْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ اَنَّ وَجْهَهُ لَيْس بِوَجْهِ كَذَّابُ "তাঁর চেহারা মুবারক দেখামাত্র চিনে ফেললাম যে, (তিনি তাওরাতে উল্লেখিত সেই নবী) এ কোন মিথ্যা ভাষীর চেহারা হতে পারে না।" তাঁর মুখ থেকে প্রথম বাক্য যা আমি শুনলাম, তা ছিল

---

১. অনারব সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ব্যক্তি।

২. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৯৪

৩. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২১৪।

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৩১০-৩১২-তে দ্রষ্টব্য।

أَيُّهَا النَّاسُ أَطْعِمُوْا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلاَمَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاس نِيَام تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ

"ওহে লোক সকল! ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়াও, পরস্পরে সালামের প্রসার ঘটাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো এবং রাতে (নফল) নামায পড়, যখন সাধারণ মানুষ নিদ্রিত থাকে, তা হলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" হাদীসটি তিরমিযী এবং হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং উভয়ে একে সহীহ বলেছেন।

'দালাইলে বায়হাকী'তে হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাম, তাঁর গুণাবলী ও তাঁর দৈহিক অবয়ব সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত ছিলাম, কিন্তু কারো কাছে তা প্রকাশ করিনি।

যখন তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করলেন এবং আমি এ সংবাদ শুনলাম, তখন আমি একটি খেজুর গাছে আরোহণ করেছিলাম। আনন্দে সেখান থেকেই আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিলাম।

আমার ফুফু খালিদা বিনতে হারিস বললেন, যদি তুমি মূসা (আ)-এর (আগমনের) সংবাদ শুনতে, তবুও এর চেয়ে বেশি আনন্দিত হতে না। আমি বললাম, অবশ্যই। তিনিও মূসা (আ)-এরই ভ্রাতা, তিনিও ঐ দীন নিয়েই প্রেরিত, যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন মূসা (আ)। আমার ফুফু বললেন, ওহে ভ্রাতুষ্পুত্র, তিনি কি সেই নবী, যাঁর খবর তোমরা শুনে আসছিলে যে, তিনি কিয়ামতের সন্নিকটে প্রেরিত হবেন ? আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনিই সেই নবী। আমি ঘর থেকে বের হয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং ইসলাম গ্রহণে ধন্য হলাম। ফিরে এসে আমি গোত্রের সব লোককে ইসলামের দাওয়াত দিলাম। সবাই ইসলাম গ্রহণ করল।[১]

দ্রষ্টব্য 'কিয়ামতের সন্নিকট' বলতে ঐসব হাঙ্গামা ও দুর্ঘটনা বুঝানো হয়েছে, যা কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাবে। আর কিয়ামতের সূচনা বা ভূমিকা হিসেবে এ সব ঘটনা সংঘটিত হবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন : نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ "সে তো আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।" (সূরা সাবা : ৪৬)

নবী (সা) বলেছেন, بُعِثْتُ اَنَا وَالْقِيَامَةُ كَهَاتَيْنِ "আমার আগমন ও কিয়ামত দুটি পাশাপাশি ঘটনা।" (রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ২৫)।

অতঃপর আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) ! আমার গোত্র আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানার পূর্বেই আপনি আমাকে একটি গোপন কুঠরীতে বসিয়ে রাখুন এবং আমার অগোচরে ইয়াহূদীদেরকে আমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। কেননা ইয়াহূদীরা বড়ই অপবাদ রটনাকারী সম্প্রদায়। সুতরাং যখন ইয়াহূদীরা তাঁর খিদমতে এলো, তখন তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালামকে একটি কুঠরীতে বসিয়ে রেখে তাদের উদ্দেশে বললেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়, আল্লাহকে ভয় কর। ঐ সত্তার

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৯৭।

কসম, যিনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই, তোমরা ভাল করেই জান যে আমি সত্যিই আল্লাহর রাসূল এবং সত্য নিয়ে এসেছি। কাজেই তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। ইয়াহূদীরা বলল, আমরা জানি না। তিনি তিনবার একই প্রশ্ন করলেন। প্রত্যেকবারই ইয়াহূদীরা একই কথা বলতে থাকে। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন সালাম কিরূপ ব্যক্তি ? ইয়াহূদীরা বলল, তিনি আমাদের সর্দারের পুত্র সর্দার, আমাদের মধ্যে সব চে' বড় আলিম এবং বড় আলিমের পুত্র, আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র।

হযরত (সা) বললেন, যদি আবদুল্লাহ ইবন সালাম আমার উপর ঈমান আনে, তা হলে কি তোমরা আমাকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করবে ? ইয়াহূদীরা বলল, আবদুল্লাহ ইবন সালাম কখনই ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি বললেন, অবশ্যই সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইয়াহূদীরা বলল, কখনই না, অসম্ভব, তিনি কখনই মুসলমান হতে পারেন না। তিনি বললেন, ওহে ইবন সালাম, বেরিয়ে এসো। আবদুল্লাহ ইবন সালাম اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ [আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি (ঘোষণা করছি) যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল] বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন। আর ইয়াহূদীদের সম্বোধন করে বললেন, ওহে ইয়াহূদী সম্প্রদায়, আল্লাহকে ভয় কর। ঐ পবিত্র সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তোমরা ভাল করেই জান যে, তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সত্যসহ আগমন করেছেন। এ কথা শোনামাত্র ইয়াহূদীরা বলল, তুমি মিথ্যুক ও কাযযাব; আমাদের মধ্যে সবচে' মন্দ ব্যক্তি এবং মন্দ ব্যক্তির পুত্র (বুখারী শরীফ)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ

"বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এ কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে নাযিল হয়ে থাকে, আর তোমরা এতে অবিশ্বাস কর, অথচ বনী ইসরাঈলের একজন এর অনুরূপ কিতাব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে; আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছো, (তোমাদের পরিণাম কি হবে?) নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিমদের সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (সূরা আহকাফ : ১০)।[১]

হযরত মায়মূন ইবন ইয়ামীন (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত মায়মূন ইবন ইয়ামীন (রা) ছিলেন নেতৃস্থানীয় ইয়াহূদীদের মধ্যে একজন। তিনি নবী (সা) কে দেখে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। তাঁর অবস্থাও হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)-এর মত হয়েছিল।

---

১. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ২০৭।

হযরত মায়মূন ইবন ইয়ামীন (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, আপনি ইয়াহূদীদেরকে আহ্বান করুন এবং আমাকে বিচারক মানুন, ওরা আমার প্রতি আকৃষ্ট হবে। মায়মূন একটি গোপন কক্ষে আড়ালে চলে গেলেন এবং ইয়াহূদীদেরকে ডাকার জন্য লোক প্রেরণ করলেন। তারা এলো এবং হযরতের সাথে কথাবার্তা বলল। রাসূল (সা) বললেন, তোমরা আমার ও তোমাদের মধ্যে বিচারক হিসেবে তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তিকেই সালিশ মনোনীত কর। ইয়াহূদীরা বলল, আমরা মায়মূন ইবন ইয়ামীনকে বিচারক মনোনীত করতে সম্মত আছি। তিনি যে ফয়সালা করবেন, আমরা তা গ্রহণ করব। তিনি খবর দিয়ে মায়মূনকে ডেকে আনালেন। মায়মূন এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল, কিন্তু ইয়াহূদীরা (মুহূর্তের মধ্যে তাদের পূর্ব কথা থেকে সরে আসে এবং) তা সত্য বলে মেনে নিতে অস্বীকার করল।[1] (اتيان اليهود النبى ﷺ حين قدم المدينة অধ্যায়)

হযরত সালমান ইবন ইসলাম[2] (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

তাঁর নাম সালমান। ডাকনাম আবূ আবদুল্লাহ, 'সালমান আল-খায়র' উপাধিতে প্রসিদ্ধ। যেন সালমান ছিলেন সারা অবয়বে উত্তম। পারস্য সাম্রাজ্যের রাম হুরমুয

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১১৩।

২ হাফিয আসকালানী বলেন, হযরত সালমান ফারসী (রা)-কে সালমান ইবন ইসলাম এবং সালমান ইবন খায়রও বলা হয়। অর্থাৎ ইসলাম তাঁর কাছে পিতৃতুল্য এবং তিনি ইসলামের পুত্রস্বরূপ। [ইসাবা, ২খ. পৃ. ৬২, হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর জীবন চরিত]। হাফিয ইবন কায়্যিম (র) বলেন, যদি হযরত সালমানের নাম জিজ্ঞেস কর তবে তা আবদুল্লাহ, যদি বংশধারা জিজ্ঞেস কর তা হলে তা ইবনুল ইসলাম, অর্থাৎ ইসলামের পুত্র, যদি তাঁর সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, তবে তা হল ফকিরী। মসজিদই তাঁর দোকান, তাঁর উপার্জন হলো ধৈর্য, তাঁর পোশাক হলো, আল্লাহভীতি, তাঁর শয্যা হলো জাগরণ, তিনি হলেন ইসলামের নিকটজন [রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী, সালমান আমাদের]। যদি তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, তা হলে তাঁর উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সত্তা, আল্লাহর সন্তুষ্টিই তাঁর কাম্য। যদি জিজ্ঞেস কর, কোথায় যাচ্ছেন, তা হলে বুঝে নাও তিনি জান্নাতের দিকেই যাচ্ছেন। যদি জানতে চাও এ সফরে তাঁর পথ-প্রদর্শক ও রাহনুমা কে, তবে জেনে রাখ, তাঁর পথ-প্রদর্শক হলেন মুত্তাকীদের ইমাম, আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবতার পথ প্রদর্শনকারী, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের নেতা, নবী-রাসূলদের সমাপ্তকারী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, তাঁর সঙ্গীগণ ও সহধর্মিণীগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

اِذَا نَحْنُ اَدْ لَجْنَا وَاَنْتَ اِمَامُنَا كَفٰى بَالْمَطَايَا طِيْبُ ذِكْرَاكَ حَادِيًا

وَاِنْ نَحْنُ اَضْلَلْنَا الطَّرِيْقَ وَلَمْ تَجِدُ دَلِيْلاً كَفَانَا نُوْرُ وَجْهِكَ هَادِيًا

"যদি আমরা অন্ধকার রাত্রিতে পথ চলি আর তুমি আমাদের নেতা হও, তা হলে উটের হুদীর জন্য তোমার পবিত্র যিকরই যথেষ্ট, যদি আমরা পথ হারিয়ে বসি, আর কোন পথ প্রদর্শক না পাই, তবে তোমার হেরার নূর আমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য সম্পূর্ণই যথেষ্ট।"(ইবন কায়্যিম কৃত ফাওয়াইদ, পৃ. ৪১)।

এলাকার 'জাঈ' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন পারস্য সম্রাটের বংশধর। যদি কেউ তাঁকে প্রশ্ন করত, আপনি কার পুত্র ? তিনি জবাব দিতেন, انا سلمان بن الاسلام। (আমি ইসলামের পুত্র সালমান)। (ইবন আবদুল-বার কৃত আল-ইসতিয়াব, ২খ. পৃ. ৫৬; ইসাবার হাশিয়া)। অর্থাৎ ইসলামই আমার আত্মিক অস্তিত্বের কারণ আর এটাই আমার অভিভাবক। কত উত্তম পিতা আর কত উত্তম পুত্র !

হযরত সালমান (রা) দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি হযরত ঈসা ইবন মরিয়ম (আ) কে পেয়েছিলেন। আর কেউ কেউ বলেন, ঈসা (আ)-এর যামানা তো নয়; বরং তাঁর একজন হাওয়ারী (সাহায্যকারী) ও অছী (উপদেষ্টার) যামানা পেয়েছিলেন। হাফিয যাহবী বলেন, তাঁর বয়স সম্পর্কে যত ধরনের বক্তব্যই পাওয়া যাক না কেন, সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, তাঁর বয়স ছিল দু'শো পঞ্চাশ বছরেরও বেশি।

আবুশ শায়খ তাঁর 'আল-ইসবাহানী'তে লিখেন, হযরত সালমান (রা) সাড়ে তিন'শ বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু দু'শো পঞ্চাশ বছরের ব্যাপারে তো কোন সন্দেহই নেই [আল-ইসাবা, ২খ. পৃ.৬২, হযরত সালমান (রা)-এর জীবন চরিত]। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, সালমান ফারসী (রা) আমাকে তাঁর নিজ যবানীতে ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন যে, আমি পারস্য দেশের 'জাঈ' নামক একটি গ্রামের অধিবাসী ছিলাম। আমার পিতা ছিলেন নিজ গ্রামের শাসক। আর তিনি আমাকে সবচে' বেশি ভালবাসতেন। যেভাবে কুমারী মেয়েদের হিফাযত করা হয়, সেভাবে তিনি আমাকে হিফাযত করতেন। আমাকে ঘর থেকে বাইরে যেতে দিতেন না। ধর্মের দিক থেকে আমরা ছিলাম অগ্নিপূজক। আমার পিতা আমাকে অগ্নির তত্ত্বাবধায়ক ও নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, যাতে কোন সময় আগুন নিভতে না পারে। একবার আমার পিতা কোন কিছু নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন। ফলে বাধ্য হয়ে আমাকে কোন জমির কৃষি কাজ দেখাশোনার জন্য প্রেরণ করেন এবং তাকিদ করেন, আমি যেন বিলম্ব না করি। আমি ঘর থেকে বের হলাম। পথিমধ্যে একটি গীর্জা ছিল, সেখান থেকে কিছু একটা আওয়ায শোনা যাচ্ছিল। আমি তা দেখার জন্য ভিতরে প্রবেশ করি। দেখলাম একদল খ্রিস্টান উপাসনায় মগ্ন রয়েছে। তাদের এ উপাসনা আমার খুবই পসন্দ হলো। মনে মনে বললাম, এ ধর্ম আমাদের ধর্ম থেকে উত্তম। আমি তাদের প্রশ্ন করলাম, এ ধর্মের মূল কোথায় ? তারা বলল, সিরিয়ায়। ইত্যবসরে সূর্য ডুবে গিয়েছিল, পিতা আমার জন্য অপেক্ষা করে শেষে আমাকে খুঁজতে চাকর প্রেরণ করেছিলেন। যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন পিতা জিজ্ঞেস করলেন বাবা, এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? আমি সমুদয় ঘটনা খুলে বললাম। পিতা বললেন, এ ধর্মে (খ্রিস্টধর্মে) কোন কল্যাণ নেই, তোমার পিতা-পিতামহের ধর্মই (অর্থাৎ অগ্নি পূজা) উত্তম।

আমি বললাম, কখনই নয়, আল্লাহর শপথ! খ্রিস্টানদের ধর্মই আমাদের ধর্ম থেকে উত্তম। পিতা আমার পায়ে বেড়ী পরিয়ে দিলেন এবং আমার বাইরে বেরুনো বন্ধ করে দিলেন। যেমন ফিরাউন মূসা (আ) কে বলেছিল : لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ। "যদি তুমি আমাকে ছাড়া কাউকে মাবূদ মেনে নাও, তা হলে তোমাকে বন্দী করে রাখব" (যাসমস্ত বাতিলপন্থিরই পদ্ধতি)। আমি গোপনে খ্রিস্টানদের বলে পাঠালাম যে, যখন কোন কাফেলা সিরিয়া যাবে আমাকে জানাবেন। কাজেই তারা সুযোগমত আমাকে খবর পাঠাল, খ্রিস্টান বণিকদের একটি দল সিরিয়ায় ফিরে যাচ্ছে। আমি সুযোগ বুঝে পায়ের বেড়ী ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গৃহ ত্যাগ করে তাদের সঙ্গী হলাম।

সিরিয়ায় পৌঁছে আমি জিজ্ঞেস করলাম, খ্রিস্টানদের সবচে' বড় আলিম কে ? তারা একজন পাদ্রীর নাম বলল। আমি তার নিকট উপস্থিত হলাম এবং সমুদয় ঘটনা খুলে বললাম। আর এও বললাম যে, আমি আপনার কাছে থেকে আপনার ধর্ম শিখতে চাই, আমি আপনার ধর্মের প্রতি আগ্রহী ও তা পসন্দও করি। যদি আপনি অনুমতি দেন, তো আমি আপনার কাছে থাকি ও ধর্ম শিখে নিই এবং আপনার সাথে উপাসনা করি। তিনি বললেন, উত্তম। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে অভিজ্ঞতা হলো যে, সে ভাল মানুষ ছিল না, খুবই লোভী ও স্বার্থপর ছিল। অন্যদেরকে দান-খয়রাতের নির্দেশ দিত, আর যখন লোকেরা টাকা-পয়সা নিয়ে আসত, তখন তা জমা করত, ফকীর-মিসকীনকে দিত না। এভাবে সে সাত মটকা স্বর্ণ মুদ্রা জমা করে। যখন সে মরে গেল এবং লোকেরা সদুদ্দেশে তার দাফন-কাফনের জন্য একত্রিত হলো, আমি তাদের কাছে তার অবস্থা বর্ণনা করলাম এবং ঐ সাতটি মটকা দেখালাম। লোকেরা এ সব দেখে বলল, আল্লাহর কসম, আমরা এমন ব্যক্তিকে দাফন করব না। শেষ পর্যন্ত তারা ঐ পাদ্রীকে শূলীতে লটকিয়ে অপদস্থ করলো এবং তদস্থলে অপর এক আলিমকে নিয়োগ করল।

সালমান (রা) বলেন, আমি ঐ পাদ্রী অপেক্ষা বড় কোন আলিম, তারচে' বেশি ইবাদতকারী, দুনিয়াত্যাগী, আখিরাতে আগ্রহী এবং ইবাদত গুযার কাউকে দেখিনি। তাকে আমি যতটা ভালবাসতাম, ততটা আর কাউকে ভালবাসতে পারিনি। আমি সদা-সর্বদা তার খিদমতে নিয়োজিত ছিলাম। যখন তার শেষ সময় ঘনিয়ে এলো, তখন বললাম, আপনি আমাকে ওসীয়ত করুন এবং বলুন, আপনার পরে আমি কার নিকটে গিয়ে অবস্থান করব। তিনি বললেন, মসূলে একজন আলিম আছেন। তুমি তার কাছে চলে যাবে। সুতরাং আমি তার নিকটে গেলাম এবং তার পরে তারই ওসীয়ত মত 'নাসিবীনে' এক আলিমের নিকট গিয়ে অবস্থান করি। তার মৃত্যুর পর তার ওসীয়ত মত 'উমূরিয়া' শহরের এক আলিমের নিকটে গিয়ে অবস্থান করি। যখন তার অন্তিমকাল উপস্থিত হলো, আমি বললাম, আমি 'অমুক অমুক' আলিমের নিকটে ছিলাম। এখন আপনি বলুন, এরপর আমি কোথায় যাব। তিনি বললেন, আমার

দৃষ্টিতে বর্তমানে এমন কোন আলিম নেই, যিনি সত্য পথে আছেন এবং আমি তোমাকে তার সন্ধান দেব।

অবশ্য একজন নবী আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে, যিনি ইবরাহীম (আ)-এর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত হবেন। আরবের ঊষর ভূমিতে তাঁর অভ্যুদয় হবে এবং খেজুর বাগান সুশোভিত ভূমির দিকে হিজরত করবেন। তোমার সেখানে পৌঁছা সম্ভব হলে অবশ্যই পৌঁছবে। তাঁর বৈশিষ্ট্য এটাই হবে যে, তিনি সাদকার মাল গ্রহণ করবেন না, তবে উপহার গ্রহণ করবেন। তাঁর উভয় বাহুমূলের সন্নিকটে 'মোহরে নবূয়াত' থাকবে, তুমি তাঁকে দেখলেই চিনতে পারবে। এ সময়ের মধ্যে আমি কিছু গরু-ছাগলের মালিক হয়েছিলাম। ঘটনাক্রমে আরব দেশগামী একটি কাফেলার সাথে আমার সাক্ষাত হয়ে গেল। আমি তাদের বললাম, যদি তোমরা আমাকে তোমাদের সাথে নিয়ে যাও, তা হলে এ গরু-ছাগল সব তোমাদের দিয়ে দেব। তারা সেগুলো গ্রহণ করল এবং আমাকে তাদের সাথে নিয়ে নিল। যখন 'ওয়াদিউল কুরায়' পৌঁছল, তখন তারা আমার সাথে প্রতারণা করে আমাকে দাস হিসেবে এক ইয়াহূদীর কাছে বিক্রি করে দিল। যখন তার সাথে এলাম, খেজুর গাছ দেখে আমার ধারণা হলো, সম্ভবত এটাই সেই যমীন, কিন্তু তখনো পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করিনি। ইত্যবসরে বনী কুরায়যায় এক ইয়াহূদী তার কাছে এলো এবং আমাকে খরিদ করে মদীনায় নিয়ে এলো। حَتّٰى قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَاَيْتُهَا فَعَرَفْتُهَا بِصِفَةِ صَاحِبِىْ وَاَيْقَنْتُ اَنَّهَا هِىَ الْبَلْدَةُ الَّتِىْ وُصِفَتْ لِىْ (যখন আমি মদীনায় পৌঁছলাম, তখন আল্লাহর কসম, মদীনাকে দেখামাত্র আমি চিনে ফেললাম এবং নিশ্চিত হলাম যে, এটাই সেই শহর যার কথা আমাকে বলা হয়েছিল)।

সহীহ বুখারীতে হযরত সালমান (রা) সূত্রেই বর্ণিত আছে যে, এভাবে আমি দশবারেরও বেশি বিক্রি হই [লোকে সালমান (রা) কে অনাগ্রহের সাথে বারবার তুচ্ছ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে; কিন্তু তাঁর প্রকৃত মূল্য কেউ জানেনি]। আমি মদীনায় সেই ইয়াহূদীর কাছে থেকে গেলাম এবং বনী কুরায়যায় তার খেজুর গাছের পরিচর্যা করতে থাকলাম। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সা) কে মক্কায় প্রকাশ করলেন; কিন্তু গোলামী এবং কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন এ বিষয়ে আমার সম্যক ধারণা হলো না। যখন তিনি মদীনায় হিজরত করলেন এবং কুবা পল্লীতে আমর ইবন আওফ গোত্রে উঠলেন, সে সময়ে আমি একটি খেজুর গাছে উঠে কাজ করছিলাম আর আমার মনিব গাছের নিচে বসা ছিল। এ সময় এক ইয়াহূদী এলো, যে আমার মনিবের চাচাত ভাই ছিল। সে বলতে লাগল, আল্লাহ বনী কায়লা অর্থাৎ আনসারদের ধ্বংস করুন, ওরা কুবায় এক ব্যক্তির কাছে ভিড় জমিয়েছে, যে মক্কা থেকে এসেছে। আর তারা বলছে, ঐ ব্যক্তি নাকি নবী ও পয়গাম্বর। সালমান (রা) বলেন, فَوَاللّٰهِ اِنْ هُوَ اِلاَّ اَخَذَتْنِىِ الْعُرَوَاءُ

حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنِّىْ سَاَسْقُطُ عَلٰى صَاحِبِىْ (আল্লাহর কসম, এটা শোনামাত্রই আমার মধ্যে চাঞ্চল্য ও কম্পন সৃষ্টি হলো। মনে হলো আমি এক্ষুণি আমার মনিবের উপর পড়ে যাব)।

সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী নবী (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ হযরত সালমান (রা) কে এতই আবেগাপ্লুত করে তুলল যে, لَوْلاَ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا-এর[১] পর্যায় না হলে, তিনি গাছ থেকে পড়েই যেতেন। উভয় ইয়াহূদী তাঁর এ অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। আর হযরত সালমানের অবস্থা যেন এ কবিতা পাঠ করছিল :

خَلِيْلَىَّ لاَوَاللّٰهِ مَا اَنَا مِنْكُمَا اِذَا عَلَمٌ مِنْ الِ لَيْلٰى بَدَالِيَا

"ওহে আমার বন্ধুগণ, আল্লাহর কসম, আমি আর তোমাদের কেউ নই, যখন আমার দৃষ্টি লায়লীর প্রেম সমুদ্রে পাহাড় দেখতে পেয়েছে।"

مدتے بود کہ مشتاق لقایت بودم لا جرم روئے ترادیدم وازجا رفتم

মোটকথা, অন্তরকে কাবু করে গাছ থেকে নেমে পড়লাম এবং ঐ আগন্তুক ইয়াহূদীকে বললাম, সত্য করে বল দেখি তুমি কি বলছিলে ? সংবাদটা আমাকেও শোনাও দেখি। অবস্থা দেখে আমার মনিব রেগে গেল। সে আমাকে জোরে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিল এবং বলল, এতে তোর কি দরকার ? যা, নিজের কাজ কর গিয়ে।

যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো এবং নিজের কাজ শেষ হলো, তখন আমার কাছে যা কিছু জমা হয়েছিল, সব সাথে নিলাম এবং তাঁর খিদমতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন কুবায় অবস্থান করছিলেন। আমি আরয করলাম, আমি জানি যে, আপনার এবং আপনার সঙ্গীদের কাছে কিছুই নেই। আপনারা সবাই প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী। কাজেই আমি আপনার এবং আপনার সঙ্গীদের জন্য সদকা পেশ করতে চাই।

তিনি তাঁর পবিত্র সত্তার জন্য সদকা গ্রহণে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, আমি সদকা খাই না; আর সাহাবাদের অনুমতি দিলেন, তোমরা তা গ্রহণ কর।

সালমান (রা) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম, এটা ঐ তিন নিদর্শনের মধ্যে একটি। আমি ফিরে গেলাম এবং পুনরায় কিছু জমা করতে শুরু করলাম। যখন তিনি মদীনায়, তখন আবার একদিন আমি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলাম। আরয করলাম, আমার মন চায় যে, আপনার খিদমতে কিছু হাদিয়া পেশ করি। সদকা তো আপনি গ্রহণ করেন না, তাই কিছু হাদিয়া নিয়ে এসেছি। তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং নিজে কিছু খেলেন ও সাহাবাদেরও কিছু দিলেন। আমি মনে মনে বললাম, এটা দ্বিতীয় নিদর্শন।

---

১. এ অবস্থাকেই হযরত সূফিয়ায়ে কিরাম (র)-এর পরিভাষায় 'উজূদ' (وجـود) বলে। আর এ আয়াত 'উজূদ'-এর উৎস। আল্লাহই ভাল জানেন।

আমি ফিরে এলাম এবং দু'চার দিন পর আবার তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলাম। সে সময় তিনি একটি লাশের সাথে 'জান্নাতুল বাকী'তে এসেছিলেন আর সাহাবায়ে কিরামের একটি দল তাঁর সাথে ছিলেন। হযরত (সা) ছিলেন দলের মাঝখানে। আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং সামনে থেকে উঠে তাঁর পেছন দিকে গিয়ে বসলাম, যাতে মোহরে নবূয়াত দেখতে পারি। তিনি বুঝতে পারলেন এবং পিঠের উপর থেকে চাদর সরিয়ে দিলেন। আমি দেখামাত্র চিনে ফেললাম এবং উঠে গিয়ে মোহরে নবূয়াতে চুম্বন করলাম এবং কেঁদে ফেললাম। তিনি ইশারা করলেন, সামনে এসো। আমি সামনে এলাম আর ওহে ইবন আব্বাস! যেমনটি তোমার কাছে আমার ঘটনা বলছি, অনুরূপভাবে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে বর্ণনা করলাম এবং ঐ সময়ই ইসলাম গ্রহণে ধন্য হলাম। তিনি (সা) খুবই খুশি হলেন। এরপরে আমি স্বীয় মনিবের কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। ফলে আমি বদর ও উহুদ যুদ্ধে শরীক হতে পারিনি। তিনি (সা) বললেন, ওহে সালমান, স্বীয় মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হও।[১] সালমান নিজ মনিবের সাথে কথা বললেন। মনিব বলল, যদি তুমি চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ দিতে পার এবং তিনশ' খেজুর গাছ লাগাতে পার, তা হলে সেগুলো ফলবান হলে তুমি মুক্ত হবে। সালমান (রা) রাসূল (সা)-এর নির্দেশমত এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। তিনি লোকজনকে উৎসাহ দিলেন যে, সালমানকে খেজুর চারা দিয়ে সাহায্য কর। সুতরাং কেউ ত্রিশটি, কেউ বিশটি, কেউ পনরটি আর কেউ দশটি চারা দিয়ে সাহায্য করলেন। চারা জমা হওয়ার পর তিনি বললেন, ওহে সালমান, গর্ত প্রস্তুত কর। যখন গর্ত প্রস্তুত হলো, তিনি (সা) নিজ হাতে চারাগুলো রোপণ করলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। এক বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই গাছে ফল এলো এবং এমন একটি চারাও পাওয়া গেল না, যেটি শুকিয়ে গেছে। সবগুলোই সবুজ ও তরতাজা হয়েছিল এবং সবগুলোতেই ফল এলো। গাছের শর্ত তো পূরণ হলো, কেবল দিরহাম অবশিষ্ট রয়ে গেল। একদিন এক ব্যক্তি ডিমের আকারের একটি স্বর্ণখণ্ড নিয়ে নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলো। তিনি বললেন, চুক্তিবদ্ধ মিসকীন অর্থাৎ সালমান ফারসী কোথায়, তাকে ডাকো। আমি উপস্থিত হলে তিনি আমাকে ঐ ডিমের আকারের স্বর্ণখণ্ডটি দান করলেন এবং বললেন, এটি নিয়ে যাও, আল্লাহ্ তোমাকে ঋণমুক্ত করবেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ তো সামান্যমাত্র স্বর্ণ, এর দ্বারা আমার ঋণ কিভাবে আদায় হবে ? তিনি বললেন যাও। এর দ্বারাই আল্লাহ্ তোমার ঋণ পরিশোধ করবেন। সুতরাং যখন আমি এটি ওজন করলাম, তো দেখলাম এটি ছিল পূর্ণ চল্লিশ উকিয়া। এতে আমার সম্পূর্ণ ঋণ আদায় হয়ে গেল এবং আমি মুক্ত হয়ে তাঁর সাথে খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম।

---

১. কোন দাস তার মুনিবের সাথে এভাবে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যে, সে মুনিবকে এত এত সম্পদ দিতে সক্ষম হলে মুনিব তাকে মুক্তি দেবে। ইসলামের পরিভাষায় এ ধরনের চুক্তিকে 'কিতাবাত' এবং চুক্তিবদ্ধ দাসকে 'মুকাতিব' বলে।

এর পর থেকে আমি প্রতিটি জিহাদেই তাঁর সঙ্গে থেকেছি (সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৭৩)।

মসজিদে নববী নির্মাণ

নবী (সা)-এর উটনী প্রথমে যে স্থানে বসেছিল, স্থানটি ছিল কয়েকটি ইয়াতীমের খেজুর শুকানোর খলান। স্থানটি কার মালিকানাধীন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তিনি জানতে পেলেন সাহল এবং সুহায়ল নামক দু'টি ইয়াতীম বালক এর মালিক। তিনি ঐ বালকদেরকে ডাকালেন, যাতে তাদের জমিটুকু ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণ করতে পারেন। আর তারা যে চাচার তত্ত্বাবধানে ছিল, তাকে ডেকে এ ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। বালকদ্বয় বলল, আমরা এ জমি বিনামূল্যে আপনাকে উপহার দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে আমরা এর বিনিময় মূল্য চাইব না। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি, বরং মূল্য দিয়ে তা কিনে নেন।

ইমাম যুহরী থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকর (রা) কে নির্দেশ দিলেন, এ জমির মূল্য পরিশোধ করে দিন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, আবূ বকর (রা) এর মূল্য বাবদ দশ দিনার পরিশোধ করেন (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৯২)।

এরপর তিনি ঐ জমি থেকে খেজুর গাছের গুঁড়িগুলো তুলে ফেলার এবং মুশরিকদের কবরগুলো সমান করে দেয়ার নির্দেশ দেন। আর অতঃপর কিছু কাঁচা ইঁট তৈরির নির্দেশ দেন এবং নিজেও এ মসজিদ নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন। আনসার ও মুহাজিরগণও তাঁর সাথে শরীক ছিলেন।[১] সাহাবায়ে কিরামের সাথে তিনি নিজেও ইঁট বহন করে আনছিলেন এবং মুখে বলছিলেন :

هٰذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالُ خَيْبَرَ   هٰذَا اَبَرُّ رَبَّنَا وَاَطْهَرُ

"এটা খায়বরের খেজুরের বোঝা নয়, হে আল্লাহ ! এ বোঝা সবচে' উত্তম।"

কখনো বা বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْاَجْرَ اَجْرُ الْاٰخِرَةِ   فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ

"হে আল্লাহ ! নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পুরস্কার হলো আখিরাতের পুরস্কার; অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি অনুগ্রহ কর।" (যারা শুধু আখিরাতের পুরস্কারের প্রত্যাশী)।

অপর এক রিওয়ায়াতে এভাবে আছে :

اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَةِ   فَانْصُرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

"হে আল্লাহ! আখিরাতের মঙ্গল ছাড়া কোন কল্যাণ নেই; অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদের সাহায্য কর।" (যারা কেবল আখিরাতের কল্যাণেরই প্রত্যাশী)।

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৪খ. পৃ. ৫৩।

আর সাহাবায়ে কিরামের মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল :

لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ   لَذٰلِكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ

"যদি আমরা বসে পড়ি আর নবী (সা) কাজ করতে থাকেন, তা হলে আমাদের কাজ (অর্থাৎ বসে থাকা) খুবই খারাপ কাজ হবে।"

আর হযরত আলী (রা) এ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন :

لاَ يَسْتَوِىْ مَنْ يَعْمُرُ الْمَسَاجِداً × يَدْأَبُ فِيْهَا قَائِمًا وَّقَاعِداً

وَمَنْ يُرٰى عَنِ التُّرَابِ حَائِداً

"যে ব্যক্তি উঠতে বসতে মসজিদ নির্মাণের চিন্তায় পেরেশান থাকে, আর যে ব্যক্তি পোশাকে ধূলিবালি লাগা থেকে বাঁচিয়ে রাখে, উভয়ে সমান নয়।"

ইঁট বহনকারীদের মধ্যে হযরত উসমান ইবন মাযঊন (রা)ও শামিল ছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই পরিচ্ছন্ন রুচিবোধসম্পন্ন। পোশাকের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ছিলেন খুবই সচেতন। কাজেই ইঁট বহনকালে তিনি পোশাক বাঁচিয়ে বহন করতেন। আর ছিঁটেফোঁটা ধূলিবালি লেগে গেলে সাথে সাথে ঝেড়ে ফেলতেন (হাসান সূত্রে বায়হাকী বর্ণিত)।[১]

হযরত আলী (রা) وَمَنْ يُرٰى عَنِ التُّرَابِ حَائِداً হযরত উসমান ইবন মাযঊন (রা) কে শোনাবার জন্য পাঠ করতেন। আশ্চর্য নয় যে, এর দ্বারা হযরত আলী (রা) এদিকেও ইঙ্গিত করতেন, এ অবস্থায় পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার চেয়ে ধূলি ধূসরিত হওয়াই উত্তম। যেমনটি হাদীস শরীফে এসেছে, প্রকৃত হাজী তো ঐ ব্যক্তি, যে ধূলি ধূসরিত ও অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। মুসনাদে আহমদে হযরত তালক ইবন আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে গর্তের ময়লা নিষ্কাষণের নির্দেশ দেন। আমি এ জন্যে কোদাল নিয়ে প্রস্তুত হই। সহীহ ইবন হিব্বানে আছে, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি ইঁট বহন করি ? তিনি (সা) বললেন, না, তুমি মাটি মাখ, তুমি এ কাজটি ভালই জান।[২]

এ মসজিদ সাদা সিধে[৩] হওয়ার ব্যাপারে ছিল অতুলনীয়। দেয়াল ছিল কাঁচা

---

১. প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ৩৬৮।

২ প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ৩৬৬।

৩. সুতরাং হযরত হাসান বসরী (র) থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তোমরা এমন ছাপড়া বানাও যেমন ছাপড়া বানিয়েছিলেন হযরত মূসা (আ)। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মূসা (আ)-এর ছাপড়া কেমন ছিল ? তিনি বললেন, যখন হাত উঠাতেন, তখন ছাদে হাত স্পর্শ করত। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, আনসারগণ কিছু অর্থ জমা করে আরয করলেন যে, মসজিদের মেঝে পাকা করা হোক। তিনি ইরশাদ করলেন, আমার ভ্রাতা মূসা (আ)-এর পদ্ধতি থেকে আমি অতিরিক্ত কিছু করতে চাই না। ব্যাস, এটা একটা ছাপড়া, মূসা (আ)-এর ছাপড়ার মত। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২১৫)।

ইঁটের, খুঁটি ছিল খেজুর কাণ্ডের আর ছাউনী ছিল খেজুর পাতার। বৃষ্টি এলে পানি ভিতরে প্রবেশ করত। ফলে ছাদ কাদা দ্বারা লেপে দেয়া হয়। দৈর্ঘ্য একশত গজ ও প্রস্থেও প্রায় একশত গজ ছিল এবং প্রায় তিন হাত ভিত্তি ছিল। উচ্চতায় দেয়াল ছিল মানুষের উচ্চতা থেকে বেশি। কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রাখা হয়েছিল এবং দরজা রাখা হয়েছিল তিনটি। একটি দরজা ঐদিকে ছিল, যেদিকে বর্তমানে কিবলার দেয়াল বিদ্যমান, দ্বিতীয় দরজা ছিল পশ্চিমদিকে, যাকে বর্তমানে 'বাবুর-রহমত' বলা হয়, আর তৃতীয় দরজা, যেটি দিয়ে তিনি আসা-যাওয়া করতেন। একে বর্তমানে 'বাবু জিবরীল' বলা হয়। আর ষোল-সতর মাস পর যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতি কিবলা হওয়া মনসুখ হয়ে গেল এবং কাবাগৃহের দিকে কিবলা করে নামায আদায়ের নির্দেশ জারী হল, তখন কাবাগৃহের দিকের দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে এর বিপরীতে আরেকটি দরজা খোলা হলো।

সীরাত বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মধ্যে মসজিদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত ছিল এ ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। কেউ কেউ বলেন, একশ গজ দীর্ঘ ও একশ গজ প্রস্থ ছিল। মদীনার ফকীহ খারিজা ইবন যায়দ (র) বলেন, সত্তর গজ দীর্ঘ এবং ষাট গজ প্রস্থ ছিল। ইমাম মালিকের ছাত্র মুহাম্মদ ইবন ইয়াহিয়া (র) বলেন, পূর্ব-পশ্চিমে তেষট্টি গজ এবং উত্তর-দক্ষিণে অনুরূপ এবং আরো দুই-তৃতীয়াংশ ছিল।

মূলত মসজিদে নববী দু'বার নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রথমত যখন তিনি হিজরত করে হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী (রা)-এর গৃহে অবস্থান করেন। দ্বিতীয়বার সপ্তম হিজরীতে খায়বর বিজয়ের পর জীর্ণ হয়ে যাওয়ায় তিনি একে সম্পূর্ণভাবে পুনরায় নির্মাণ করান। যেমনটি বিভিন্ন হাদীস এবং বিভিন্ন রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত। প্রথমবারে নির্মিত মসজিদের দৈর্ঘ্য একশ গজের কম ছিল এবং দ্বিতীয়বার নির্মাণে দৈর্ঘ্য একশ গজের কিছুটা বেশি ছিল। কাজেই ইবন জুরায়জ জা'ফর ইবন আমর থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) মসজিদটি দু'দফা নির্মাণ করান। প্রথম দফা যখন তিনি হিজরত করে মদীনা আগমন করেন, তখন মসজিদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ একশ গজের কম ছিল। দ্বিতীয়বার সপ্তম হিজরীতে খায়বর বিজয়ের পর অতিরিক্ত জমি নিয়ে মসজিদটি বর্ধিত আকারে পুনর্নির্মাণ করান। মু'জামে তাবারানীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মসজিদ প্রশস্ত করার ইচ্ছা করলেন, তখন মসজিদ সংলগ্ন এক আনসারীর জমি ছিল। তিনি ঐ আনসারীকে বললেন, জান্নাতের একটি মহলের বিনিময়ে তুমি এ জমি আমাদের কাছে বিক্রি কর। কিন্তু তিনি তার দারিদ্র্য, অর্থ সঙ্কট ও পরিবারের সদস্য সংখ্যাধিক্যের কারণে বিনামূল্যে দানে অপারগ ছিলেন। এ কারণে হযরত উসমান গনী (রা) এ জমিটুকু দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ঐ আনসারীর নিকট থেকে খরিদ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যে জমিটুকু জান্নাতে মহলের বিনিময়ে আপনি ঐ আনসারীর নিকট থেকে খরিদ করতে চেয়েছিলেন, তা এ অধমের নিকট থেকে খরিদ করুন। তিনি জান্নাতের

বিনিময়ে জমিটুকু খরিদ করে মসজিদে অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং প্রথম ইঁটটি স্বহস্তে স্থাপন করেন। এরপর তাঁর নির্দেশে হযরত আবূ বকর (রা), তারপর হযরত উমর (রা), তারপর হযরত উসমান (রা) ও পরে হযরত আলী (রা) ইঁট রাখেন। এ হাদীসটি যদিও সনদের দিক থেকে যঈফ কিন্তু মুসনাদে আহমদ এবং জামে তিরমিযী কর্তৃক হাসান সনদে বর্ণিত একটি হাদীস এর সমর্থনে রয়েছে। তা হলো এই যে, বিদ্রোহীরা যখন হযরত উসমান (রা)-এর গৃহ অবরোধ করে, তখন তিনি বলেন, তোমরা কি জান না, যখন মসজিদে নববীতে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না, তখন নবী (সা) ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যে অমুক জমিটুকু খরিদ করে জান্নাতের বিনিময়ে মসজিদে শামিল করে দেয় ? আর তোমরা জান যে, ঐ জমি আমিই কিনে নিয়ে মসজিদে শামিল করে দিয়েছি। অথচ তোমরা আমাকে সেই মসজিদে দু' রাকাআত সালাত আদায়ে বাধা দিচ্ছ ?

এ বর্ণনা জামে তিরমিযীতে সুমামা ইবন হুযন কুশায়রী থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী এ বর্ণনাকে হাসান বলেছেন। আর এ বর্ণনাই মুসনাদে আহমদ এবং সুনানু দারু কুতনীতে হযরত আহনাফ ইবন কায়স (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অধিকন্তু, হযরত আবূ হুরায়রা (রা), যিনি সপ্তম হিজরীতে মহানবী (সা) সকাশে উপস্থিত হন, তিনিও এ নির্মাণে শরীক হয়েছিলেন। যেমনটি মুসনাদে আহমদে খোদ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরামের সাথে নবী (সা)ও স্বয়ং ইঁট বহন করছিলেন। এক দফা আমি সামনে পড়ে গেলাম। দেখলাম, তিনি অনেকগুলো ইঁট নিয়েছেন এবং বুকের সাথে লাগিয়ে নিয়েছেন। বুঝলাম, তিনি ভার ঠেকানোর জন্য এমনটি করেছেন। আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে দিয়ে দিন। তিনি বললেন : خُذْ غَيْرَهَا يَا اَبَاهُرَيْرَةَ فَاِنَّهُ لاَعَيْشَ الاَّ عَيْشَ الاٰخِرَةَ (হে আবূ হুরায়রা, তুমি অন্যগুলো বহন কর। কেননা আখিরাতের জীবনের চেয়ে উত্তম কোন জীবন নেই)।

এতে প্রকাশ পেল যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর এ অংশগ্রহণ দ্বিতীয় নির্মাণকালে ছিল, যা সপ্তম হিজরীতে খায়বর বিজয়ের পর করা হয়েছিল। আর যা প্রথম হিজরীতে হয়েছিল, তাতে হযরত আবূ হুরায়রার অংশগ্রহণ কিভাবে সম্ভব ? এছাড়া হযরত আমর ইবন আস (রা), যিনি পঞ্চম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, মসজিদ নির্মাণে তাঁর অংশগ্রহণের কথা 'দালাইলে বায়হাকী'তে বর্ণিত আছে। উল্লেখ্য যে, যিনি পঞ্চম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করে নবী (সা) সকাশে উপস্থিত হলেন, তিনি কিভাবে প্রথম হিজরীর মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করবেন ? এটা অসম্ভব। কাজেই তাঁর অংশগ্রহণ দ্বিতীয় নির্মাণকালে ধরে নিতে হবে। এতদসমুদয় বর্ণনা বিস্তারিতভাবে 'ওফা আল-ওফা' এবং 'খুলাসাতুল ওফা' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে।

পবিত্র সহধর্মিণীগণের জন্য হুজরা নির্মাণ

যখন মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করলেন; তখন পবিত্র সহধর্মিণীগণের জন্য

হুজরা তৈরির ভিত দিলেন এবং প্রথমে দু'টি হুজরা নির্মাণ করালেন, একটি হযরত সাওদা বিনত জামা'আ (রা)-এর জন্য এবং অপরটি হযরত আয়েশা (রা)-এর জন্য। বাকী হুজরাগুলো পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজন অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে। মসজিদ সন্নিকটে হযরত হারিসা ইবন নু'মান আনসারী (রা)-এর ঘরগুলো অবস্থিত ছিল। যখন নবী (সা)-এর প্রয়োজন দেখা দিত, হযরত হারিসা (রা) তাঁকে একটি ঘর হাদিয়া হিসেবে দিয়ে দিতেন। এভাবে একটির পর একটি করে সবগুলো ঘর তিনি হাদিয়া হিসেবে দিয়ে দেন।

অধিকাংশ ঘর ছিল খেজুর ডাল দ্বারা এবং কয়েকটি ছিল কাঁচা ইঁটের তৈরি, দরজায় ছিল কম্বল অথবা চটের পর্দা। হুজরা বলতে ছিল অল্পে তুষ্টির বাস্তব চিত্র এবং অস্থায়ী দুনিয়ার প্রতিচ্ছবি। এ হুজরাসমূহে যদিও অধিকাংশ ও বেশির ভাগ সময়ে বাতি জ্বলত না (বুখারী শরীফ, ১খ. পৃ. ৫৬) এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও ছিল না। যে গৃহে আল্লাহর পথে আহ্বানকারী, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী উজ্জ্বল প্রদীপ অবস্থান করেন, সেখানে সান্ধ্য দীপের কি প্রয়োজন ? কেউ বলেছেন :

يَا بَدِيْعُ الدَّلَّ وَالْغَنَجِ لَكَ سُلْطَانُ عَلَى الْمُهَجِ
اِنَّ بَيْتًا اَنْتَ سَاكِنُهُ غَيْرَ مُحْتَاجِ اِلَى السُّرُجِ
وَجْهُكَ الْمَاءُ مَوْلُ حُجَّتُنَا يَوْمَ يَأْتِى النَّاسُ بِالْحُجَجَ

"ওহে আশ্চর্য ও বিস্ময়কর শান-শওকতের অধিকারী, আপনার বাদশাহী তো মানুষের অন্তরের উপর। যে গৃহে আপনি অবস্থান করেন তা প্রদীপের মুখাপেক্ষী নয়। যে দিন লোকেরা নিজ নিজ দলীল পেশ করবে, সেদিন আপনার পবিত্র চেহারাই আমাদের জন্য দলীল হিসেবে যথেষ্ট হবে।"

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, আমি যখন কিছুটা বড় হলাম হাত দিয়ে হুজরার ছাদ স্পর্শ করতাম। এ হুজরাসমূহ পূর্বমুখী এবং সিরিয়ার দিকে ছিল; পশ্চিমদিকে কোন হুজরা ছিল না (খুলাসাতুল ওফা, পৃ. ১২৭)।

পবিত্র সহধর্মিণীগণের ইনতিকালের পর

পবিত্র সহধর্মিণীগণের ইনতিকালের পর ওলীদ ইবন আবদুল মালিকের নির্দেশে এ সমুদয় হুজরা মসজিদে নববীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যখন ওলীদের এ নির্দেশ মদীনায় পৌঁছল, সমস্ত মদীনাবাসী বেদনায় চিৎকার করে উঠেছিল।

আবূ উমামা সাহল ইবন হুনায়ফ বলতেন, যদি হুজরাসমূহ ঐভাবেই ছেড়ে দেয়া হতো, যাতে লোকজন দেখতে পেত যে, আল্লাহর তরফ থেকে সারা পৃথিবীর সম্পদের চাবি যে নবীর হাতে দেয়া হয়েছিল, সেই নবী কেমন হুজরা ও কেমন ছাপড়ায় জীবন যাপন করতেন। সেই নবী, তাঁর সন্তান-সন্তুতি, তাঁর সহধর্মিণীগণ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। (যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৭০)

মসজিদে নববীর কাছে হুজরা নির্মাণের সময়ই রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) ও হযরত আবূ রাফে (রা) কে মক্কায় প্রেরণ করেন। যাতে তাঁরা হযরত ফাতিমাতুয যোহরা,[১] হযরত উম্মে কুলসূম এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা) কে নিয়ে আসতে পারেন। আর তাদের সাথেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর (রা) কে প্রেরণ করেন যাতে তিনি হযরত আয়েশা, হযরত আসমা, হযরত উম্মে রুমান এবং হযরত আবদুর রহমান ইবন আবূ বকর (রা) কে নিয়ে আসতে পারেন।

হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) যখন সবাইকে নিয়ে মদীনায় পৌঁছলেন, তখন নবী (সা) হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা)-এর গৃহ ছেড়ে নির্মিত হুজরায় চলে এলেন। [এ হদীস তাবারানী হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৭০]।

নবী-রাসূল (আ)গণের শেষ মসজিদ[২] খুলাফায়ে রাশিদীন কর্তৃক সম্প্রসারণ

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খিলাফতকালে মসজিদে নববীতে কোন কিছু বর্ধিত করেননি। শুধু যে সমস্ত খুঁটি পুরাতন হওয়ায় পড়ে গিয়েছিল, সেগুলোর স্থলে খেজুর গাছের খুঁটিই পুনঃস্থাপন করেছিলেন।

হযরত উমর (রা) সতর হিজরীতে কিবলার দিক এবং পশ্চিম পার্শ্ব বর্ধিত করেন। পূর্ব পার্শ্বে যেহেতু পবিত্র নবীসহধর্মিণীগণের হুজরা ছিল, তাই সেদিকে বর্ধিত করেননি।

---

১. হযরত ফাতিমা (রা) এবং হযরত উম্মে কুলসুম (রা) হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) ও হযরত আবূ রাফে (রা)-এর সাথে মদীনা আগমন করেন। আর হযরত রুকাইয়া (রা) নিজ স্বামী হযরত উসমান (রা)-এর সাথে পূর্বেই মদীনায় এসেছিলেন। হযরত যয়নব স্বীয় স্বামী আবুল আস ইবন রবীর সাথে মক্কায়ই থেকে যান। কেননা আবুল আস তখনো মুসলমান হননি। বদর যুদ্ধে যখন তিনি বন্দী অবস্থায় নীত হন, তখন নবী (সা) তাকে এ শর্তে ছেড়ে দেন যে, আমার কন্যা যয়নবকে তুমি পাঠিয়ে দেবে। কাজেই আবুল আস মক্কা ফিরে আসেন এবং হযরত যয়নবকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। (যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৭০)।

২ এটি একটি হাদীসের প্রতি ইশারা। সহীহ মুসলিম এবং নাসাঈতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'আমি নবীদের ধারা সমাপ্তকারী এবং আমার মসজিদ নবীগণের শেষ মসজিদ।' এ বাক্য নাসাঈর। মুসলিমের বাক্যাবলী হলো, 'আমি শেষ নবী, আর আমার মসজিদ শেষ মসজিদ।' মুসনাদে বাযযার ইত্যাদিতে এ বাক্যাবলী রয়েছে যে, 'আমি নবীদের ধারা সমাপ্তকারী আর আমার মসজিদ নবীগণের শেষ মসজিদ। যে সমস্ত মসজিদ আম্বিয়া (আ) নির্মাণ করিয়েছেন, এটি তার শেষ মসজিদ।' সুতরাং তাঁর পরে যেমন কোন নবী বা পয়গাম্বর আগমন করবেন না, তেমনি তাঁর মসজিদ নির্মাণের পর আর কোন পয়গাম্বর এসে মসজিদ নির্মাণ করবেন না। এ অর্থ নয় যে, তাঁর মসজিদের পর পৃথিবীতে আর কোন মসজিদ নির্মিত হবে না।

হযরত উমর (রা) কেবল মসজিদ বর্ধিতই করেছিলেন, এর আসল রূপ ও বৈশিষ্ট্যে কোন পরিবর্তন করেন নি। অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর মতই কাঁচা ইঁট দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করান, খেজুর গাছের কাণ্ড দ্বারা খুঁটি এবং খেজুর পাতা ও কাদা লেপে ছাদ নির্মাণ করান এবং এর প্রকৃত সাদাসিধে বৈশিষ্ট্য বজায় রাখেন।

হযরত উসমান (রা) তাঁর খিলাফতকালে মসজিদের বিস্তৃতি সাধনও করেন এবং সেইসঙ্গে কাঁচা ইঁটের পরিবর্তে নকশী পাথর এবং কলি চূন দ্বারা নির্মাণ করান, স্তম্ভগুলোও পাথর দ্বারা নির্মাণ করান এবং শাল কাঠ দ্বারা ছাদ নির্মাণ করান।

হযরত উসমান (রা) যখন এভাবে মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা করেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম মসজিদের এ বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের প্রবল বিরোধিতা করেন। হযরত উসমান যখন সাহাবীগণের বারবার অস্বীকৃতি এবং অপসন্দের প্রকাশ লক্ষ্য করলেন, তখন এক ভাষণে তিনি বলেন :

انكم اكثرتم وانى سمعت النبى ﷺ النبى يقول من بنى مسجدا يبتغى به وجه له مثله فى الجنة

"তোমরা এ ব্যাপারে খুবই বাড়াবাড়ি করেছ, আর আমি অবশ্যই নবী করীম (সা) থেকে শুনেছি, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি কেউ একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি মহল তৈরি করে দেন।"[১]

উনত্রিশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ত্রিশ হিজরীর মুহররম মাসে সমাপ্ত হয়। এ হিসেবে নির্মাণকাল হয় দশ মাস।[২]

ইমাম মালিক (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উসমান (রা) যখন মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করান তখন কা'ব আল-আহবার প্রার্থনা করেন যে, আয় আল্লাহ! এ নির্মাণ যেন সমাপ্ত না হয়। লোকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এ নির্মাণ সমাপ্ত হওয়া মানে আসমান থেকে ফিতনা অবতীর্ণ হওয়া।[৩]

জানাযা নামাযের স্থান

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন হিজরত করে মদীনা আগমন করেন, তখন আমাদের মধ্যে কারো অন্তিমকাল উপস্থিত হলে আমরা তাঁকে সংবাদ দিতাম। তিনি এসে তার জন্য ইস্তিগফার পাঠ করতেন। মৃত্যুর পর দাফন পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করতেন। কোন কোন সময় এ কাজে অনেক বিলম্ব হয়ে যেত। এ জন্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, মৃত্যুর পরই কেবল তাঁকে সংবাদ দেয়া হবে। সুতরাং কয়েকদিন এ নিয়মই চালু রাখা হলো যে, কারো মৃত্যুর পরই

---

১. ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৪৫৩।

২. ওফা আল-ওফা, ১খ. পৃ. ৩৫৬।

৩. ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৪৫৩।

কেবল তাঁকে সংবাদ দেয়া হতো। তিনি এসে জানাযা পড়াতেন এবং মৃতের জন্য দু'আ ইস্তিগফার পাঠ করতেন। কোন কোন সময় দাফনেও শরীক হতেন, আর কোন সময় জানাযা পড়িয়েই চলে যেতেন।

কিছুদিন পর তাঁর সুবিধার জন্য আমরা এ নিয়ম চালু করলাম যে, জানাযা বহন করে আমরাই তাঁর হুজরায় উপস্থিত হতাম। তিনি নিজ হুজরার পাশেই জানাযা পড়িয়ে দিতেন। এ জন্যে তিনি যে স্থানে জানাযা পড়াতেন, সে স্থানের নাম 'জানাযার স্থান' হিসেবে পরিচিত হয় (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. দ্বিতীয় অংশ, পৃ. ১৪)। বুখারী শরীফে[১] বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর হাদীস থেকেও এটাই জানা যায় যে, জানাযা আদায়ের জন্য মসজিদে নববীর পার্শ্বে একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল। তাঁর চিরাচরিত নিয়ম এটাই ছিল যে, তিনি মসজিদে জানাযা পড়াতেন না। তবে কোন কোন সময় বিশেষ কোন কারণবশত মসজিদেও জানাযা পড়িয়েছেন (ফাতহুল বারী, ৩খ. পৃ. ১৬০, الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد অধ্যায়)। এ কারণে মসজিদে জানাযা পড়ানো ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিকের মতে মাকরূহ। আর ইমাম শাফিঈর নিকট জায়েয।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন

মুহাজিরগণ কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে মক্কায় নিজেদের আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করে মদীনায় এসেছিলেন। মহানবী (সা) তাই মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেন যাতে মাতৃভূমি এবং আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথক হওয়ার দুঃখ ও পেরেশানী আনসারদের ভালবাসা ও অন্তরঙ্গতার দ্বারা লাঘব হয়। প্রয়োজনের সময় একে অপরের সাহায্য- সহযোগিতা করতে পারে আর বিপদের সময় পরস্পরে সমব্যথী হতে পারে। দুর্বল যাতে শক্তিশালী ও সাহসী ব্যক্তির ভ্রাতৃত্বের দরুন শক্তি অর্জন করতে পারে আর দুর্বল শক্তিশালীর সহায়ক হতে পারে। উত্তম ব্যক্তি নিম্নস্তরের ব্যক্তির উপকারের দ্বারা এবং নিম্নস্তরের ব্যক্তি উত্তম ব্যক্তির অনুদানে তৃপ্ত এবং লাভবান হতে পারে। আর মুহাজির এবং আনসারের পৃথক অবস্থা ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের দ্বারা এককে পরিণত হতে পারে এবং বিভেদ ও মতপার্থক্যের কোন নিশানা অবশিষ্ট না থাকে। সবাই মিলে যাতে আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারে। যে বিভেদ ও মতপার্থক্য বনী ইসরাঈলের ধ্বংস ও বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে পরিণত হয়েছিল, অনুগ্রহপ্রাপ্ত এ উম্মত যেন তা থেকে নিরাপদে থাকে। আর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দরুন আল্লাহ তা'আলার কুদরতী হাত তাদের

---

১. ইমাম বুখারী এ হাদীসটি তাঁর জামিউস-সহীহ গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে এনেছেন। উদাহরণত الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد অধ্যায়ে পৃ. ১৭৭; আলামাতুন নুবূওয়াত অধ্যায়ে পৃ. ৫১৩; কিতাবুত-তাফসীরে, পৃ. ৬৪৫; কিতাবুল মুহারিমীনের الرجيم بالبلاط পৃ. ১০০৭ ইত্যাদি।

মাথার উপরে থাকে। আর যদি জাহিলী যুগের আত্মগর্ব ও অহংকারের বাতিল ধারণা কারো মনে অবশিষ্ট থাকে, তা হলে এ সাম্যের সম্পর্কের দরুন তা যেন বিলীন ও পরিপূরক হয়ে যায় এবং আত্মগর্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, অহংকার ও জাঁকজমকের পরিবর্তে বিনয়, দারিদ্র্য ও ভ্রাতৃত্বের সাম্য আর সহমর্মিতায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। খাদিম এবং খিদমত গ্রহণকারী, দাস এবং প্রভু, মাহমূদ এবং আয়ায সব এক কাতারে শামিল হয়ে যায়। পার্থিব সমস্ত বিভেদ দূরীভূত হয়ে কেবল আল্লাহভীতি ও পরহেযগারীর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অবশিষ্ট থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন :

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে বেশি আল্লাহর হুকুম পালনে সাবধান।" (সূরা হুজুরাত : ১৩)

এ কর্মের দরুনই তিনি মদীনায় আগমনের পূর্বে মক্কায় শুধু মুহাজিরগণের মধ্যে পরস্পরে ভ্রাতৃত্বে সম্পর্ক গড়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং হাফিয আবদুল বার বলেন, ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক দু'বার বেঁধে দেয়া হয়েছিল। একবার শুধু মুহাজিরদের মধ্যে যে, এক মুহাজিরকে অপর মুহাজিরের ভাই সাব্যস্ত করা হয়, আর দ্বিতীয়বার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন হিজরতের পর আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে সম্পাদন করা হয়।

সুতরাং হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যুবায়র (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বেঁধে দেন। অথচ তাঁরা উভয়েই ছিলেন মুহাজিরের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি হাকিম এবং ইবন আবদুল বার বর্ণনা করেন। এর সনদ হাসান। আর হাদীসটি হাফিয যিয়াউদ্দীন মাকদিসী তাঁর 'মুখতারা' গ্রন্থে তাবারানীর 'মু'জামুল কাবীর' গ্রন্থের বরাতে উদ্ধৃত করেন।

হাফিয ইবন তাইমিয়া বলেন, মুখতারার হাদীসসমূহ মুসতাদরাকে হাকিমে বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অনেক বেশি বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী। মুসতাদরাকে হাকিমে হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর মধ্যে এবং অমুক ও অমুকের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বেঁধে দেন। তখন হযরত আলী (রা) জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার ভাই কে ? তিনি (সা) বলেন, তোমার ভাই হলাম আমি।[১]

হাফিয ইবন সায়্যিদুন-নাস তাঁর 'উয়ূনুল আসার' গ্রন্থে বলেন, মক্কায় বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে যাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে দেয়া হয়, তাঁদের নাম নিম্নরূপ :

১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)	হযরত উমর (রা)
২. হযরত হামযা (রা)	হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)
৩. হযরত উসমান গনী (রা)	হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২১।

৪. হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা)	হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা)
৫. হযরত উবায়দা ইবনুল হারিস (রা)	হযরত বিলাল ইবন রাবাহ (রা)
৬. হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা)	হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)
৭. হযরত আবূ উবায়দা (রা)	হযরত আবূ হুযায়ফার মুক্ত দাস সালিম (রা)
৮. হযরত সাঈদ ইবন যায়দ (রা)	হযরত তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা)
৯. হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)	হযরত আলী (রা)।

দ্বিতীয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন

হিজরতের পাঁচ মাস পর হযরত আনাস (রা)-এর গৃহে পঁয়তাল্লিশজন আনসার ও পঁয়তাল্লিশজন মুহাজিরের মধ্যে দ্বিতীয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সম্পাদিত হয়। এক এক মুহাজিরকে এক এক আনসারের ভাই বানানো হয় (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২১০)। যাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ ঃ

মুহাজির	আনসার
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)	হযরত খারিজা ইবন যায়দ (রা)
হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা)	হযরত উতবান ইবন মালিক (রা)
হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)	হযরত সাদ ইবন মু'আয (রা)
হযরত আবদুর রাহমান ইবন আউফ (রা)	হযরত সা'দ ইবন রবী (রা)
হযঃ যুবায়র ইবন আওয়াম (রা)	হযঃ সালামা ইবন সালামা ইবন ওকীশ (রা)
হযরত উসমান ইবন আফফান (রা)	হযরত আওস ইবন সাবিত (রা)
হযরত তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা)	হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা)
হযরত সাঈদ ইবন যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল (রা)	হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা)
হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা)	হযরত আবূ আয়্যূব খালিদ ইবন যায়দ আনসারী (রা)
হযরত আবূ হুযায়ফা ইবন উতবা (রা)	হযরত আব্বাদ ইবন বিশর (রা)
হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)	হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)
হযরত আবূ যর গিফারী (রা)	হযরত মুনযির ইবন আমর (রা)
হযরত সালমান ফারসী (রা)	হযরত আবুদ-দারদা উয়ায়মির ইবন সা'লাবা (রা)
হযরত বিলাল (রা)	হযরত আবূ রাওয়ায়হা আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রাহমান (রা)
হযরত হাতিব ইবন আবূ বালতা'আ (রা)	হযরত আওয়াইম ইবন সায়িদা (রা)
হযরত আবূ মারসাদ (রা)	হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা)
হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহশ (রা)	হযরত আসিম ইবন সাবিত (রা)
হযরত উতবা ইবন গাযওয়ান (রা)	হযরত আবূ দুজানা (রা)
হযরত আবূ সালামা ইবন আবদুল আসাদ (রা)	হযরত সা'দ ইবন খায়সামা (রা)
হযরত উসমান ইবন মায'ঊন (রা)	হযরত আবুল হায়সাম ইবন তায়হান (রা)

হযরত উবায়দা ইবন হারিস (রা)	হযরত উমায়র ইবন হাম্মাম (রা)
হযরত তুফায়ল ইবন হারিস (রা) (অর্থাৎ উবায়দা ইবন হারিসের ভ্রাতা)	হযরত সুফিয়ান নাসর খাযরাজী (রা)
হযরত সাফওয়ান ইবন বায়যা (রা)	হযরত রাফে ইবন মুয়াল্লা (রা)
হযরত মিকদাদ (রা)	হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)
হযরত যু-শ-শামালাইন (রা)	হযরত ইয়াযীদ ইবন হারিস (রা)
হযরত আরকাম (রা)	হযরত তালহা ইবন যায়দ (রা)
হযরত যায়দ ইবন খাত্তাব (রা)	হযরত মা'আন ইবন আদী (রা)
হযরত আমর ইবন সুরাকা (রা)	হযরত সা'দ ইবন যায়দ (রা)
হযরত আকিল ইবন বুকায়র (রা)	হযরত মুবাশশির ইবন আবদুল মুনযির (রা)
হযরত খুনায়স ইবন হুযায়ফা (রা)	হযরত মুনযির ইবন মুহাম্মদ (রা)
হযরত সিররা ইবন আবূ রুহম (রা)	হযরত উবাদা ইবন খাশখাশ (রা)
হযরত মিসতাহ ইবন উসাসা (রা)	হযরত যায়দ ইবন মুযায়্যিন (রা)
হযরত উক্কাশা ইবন মিহসান (রা)	হযরত মুজযির ইবন দিমার (রা)
হযরত আমের ইবন ফুহায়রা (রা)	হযরত হারিস ইবন সিম্মাহ (রা)
হযরত উমর (রা)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস মাহজা (রা)	হযরত সুরাকা ইবন আমর ইবন আতিয়্যা (রা)।[১]

আনসারগণ ভ্রাতৃত্বের যে হক আদায় করেন, নিঃস্বার্থভাবে নিজের উপর অপরকে প্রাধান্য দানের যে নযীর স্থাপন করেন, পূর্বে এবং পরবর্তীতে এর উদাহরণ পাওয়া অসম্ভব। জায়গা-জমি এবং ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্রের ব্যাপারে মুহাজিরদের সাথে যে ব্যবহার করেন, তা এভাবে করেছেন যে কৃষি জমি এবং বাগানাদি তো মুহাজিরদেরকে দিয়েই দিয়েছেন; এমনকি যে আনসারীর দু'জন স্ত্রী ছিল, তিনি তার একজনকে তালাক দিয়ে নিজ মুহাজির ভাইয়ের বিবাহ দেয়ারও প্রস্তাব দেন।

সুনানু আবূ দাউদ ও জামে তিরমিযীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, কোন আনসারীই নিজের অর্থ-কড়ির ভাগের ব্যাপারে আপন মুহাজির ভাই অপেক্ষা নিজকে বেশি হকদার মনে করতেন না (যারকানী, ১খ., পৃ. ৩৭৪)।

কাজেই মুহাজিরগণ আনসারীগণের এহেন নযীরবিহীন সহমর্মিতা ও অগ্রাধিকার দানের উৎসাহ দেখে নবী (সা)-এর খিদমতে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! যে সম্প্রদায়ে আমরা এসে উপনীত হয়েছি, এদের অপেক্ষা অন্য কোন সম্প্রদায়কে আমরা সহমর্মী, চিন্তা হরণকারী, নিঃস্বার্থ, অভাব এবং প্রাচুর্য সর্বাবস্থায় সাহায্যকারী দেখিনি। আমাদের সন্দেহ হয় যে, তারাই সমস্ত সওয়াব নিয়ে নেবে, আমাদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বললেন না, তা হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদের

১. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ২০১।

জন্য দু'আ করবে [ইবন সায়্যিদুন-নাস হযরত আনাস (রা) থেকে নিজস্ব সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন, উয়ূনুল আসারেও হাদীসটি এসেছে; আল্লামা ইবন কাসীর বলেন, এটি সুলাসী সনদবিশিষ্ট হাদীস, বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ। তবে এ সনদে সিহাহ সিত্তার কোন গ্রন্থেই হাদীসটি উদ্ধৃত হয়নি]।[১]

অর্থাৎ দু'আর অনুগ্রহ অর্থ-কড়ির অনুগ্রহ অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়; বরং কিছু বেশিই। গণনাযোগ্য দিরহাম তো সামান্য ব্যাপার। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর মাত্র একটি নিঃস্বার্থ দু'আ অপর পাল্লায় রেখে ওজন করা হয়, তা হলে ইনশা আল্লাহ দু'আর পাল্লাই বেশি ভারী হবে। আর এ 'ইনশা আল্লাহ' শর্ত সাপেক্ষ নয়; বরং বরকতের জন্য বলছি। ইমাম বুখারী 'জামিউস সহীহ' গ্রন্থের কিতাবুত তাওহীদের فى المشية والارادة অধ্যায়ে অধিকাংশ এ ধরনের হাদীসই উদ্ধৃত করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে নয়; বরং বরকতের জন্য 'ইনশা আল্লাহ' বলাকে উদ্ধৃত করেছেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকটে যখন কোন ফকীর এসে দু'আ করত, যেমনটি সাহায্যপ্রার্থীদের অভ্যাস, তখন উম্মুল মু'মিনীন (রা)ও সে ফকীরের জন্য দু'আ করতেন। এরপর কিছু সাহায্য দান করতেন। কেউ জিজ্ঞেস করল, হে উম্মুল মুমিনীন, আপনি সাহায্যপ্রার্থীকে সদকাও দেন এবং সে যেভাবে আপনার জন্য দু'আ করে, আপনিও তার জন্য অনুরূপ দু'আ করেন ? তিনি বললেন, আমি যদি কেবল তাকে সাদকাই দান করি এবং দু'আ না করি তা হলে আমার প্রতি তার অনুগ্রহ বেশি হবে। দু'আ সাদকা অপেক্ষা উত্তম, এ জন্যে আমি দু'আর বিনিময় দু'আ দ্বারা করে থাকি, যাতে আমার সাদকা সঠিক থাকে, তা যেন কোন অনুগ্রহের বিনিময়ে না হয়। যেমনটি 'মাফাতীহে শারহে মাসাবীহ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি সীমিত দিরহামের বিনিময়ে নিঃস্বার্থ দু'আ খরিদ করতে পারে, সে তা কখনই ছাড়বে না, আর এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইবে না। ফারসী কবির ভাষায় :

جمادے چند دادم جان خریدم   بحمد الله زهے ارزان خریدم

এ ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক এতই অটুট ও শক্তিশালী ছিল যে, একে নিকটাত্মীয়তার বিকল্প মনে করা হতো। কোন আনসারী ইনতিকাল করলে মুহাজির তার উত্তরাধিকারী হতেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْا اُوْلٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২২৮।

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।" (সূরা আনফাল ঃ ৭২)

কিছুদিন পর উত্তরাধিকারের নির্দেশ স্থগিত হয়ে যায় এবং সমস্ত মু'মিনকে ভাই ভাই বানানো হয়। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয় : اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ। "নিশ্চয়ই মু'মিনগণ ভাই ভাই।"

এক্ষণে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কেবল পারস্পরিক সহানুভূতি, দুঃখে সান্ত্বনা দান এবং সাহায্য-সহযোগিতার মধ্যে রয়ে গেল, আর উত্তরাধিকার শুধু আত্মীয়-স্বজনের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২১০; যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৭৪)।

আযানের সূচনা

দু' ওয়াক্ত নামায, ফজর ও আসর তো নবূয়াত লাভের প্রারম্ভেই ফরয করা হয়েছিল, এরপর শবে মি'রাজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। কিন্তু তখন মাগরিব ছাড়া অপরাপর ওয়াক্তের নামায ছিল দু'রাকাআত করে। হিজরতের পর মুসাফিরের জন্য তো দু' দু' রাকাআতই রয়ে গেল আর মুকীমের জন্য যোহর, আসর ও ইশার নামায চার রাকাআত করে দেয়া হলো [হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে বুখারীতে বর্ণিত]।

এ পর্যন্ত এ নিয়মই চালু ছিল যে, নামাযের ওয়াক্ত হলে লোকজন আপনা আপনি একত্রিত হতো। ফলে তাঁর ধারণা হলো যে, নামাযের জন্য কোন নিদর্শন এমন হওয়া উচিত, যাতে করে মহল্লার সব লোক একই সাথে অনায়াসে মসজিদে উপস্থিত হতে পারে।

কেউ বলল, নাকূস[১] বাজানো হোক, কেউ বলল বুক[২] বাজানো হোক, যাতে লোকজন এর আওয়াজ শুনে একত্রিত হবে। কিন্তু তিনি খ্রিস্টানদের অনুরূপ হওয়ার কারণে নাকূস এবং ইয়াহূদীদের মত হওয়ার কারণে বুক বাজানোর প্রস্তাব নাকচ করে দেন। কারণ উভয় প্রস্তাবই ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের অনুরূপ হওয়ার দরুন তিনি অপসন্দ করেন। কেউ বলল, কোন উঁচু স্থানে আগুন জ্বালানো হোক, যা দেখে লোকজন একত্রিত হবে। তিনি বললেন, এটা অগ্নিপূজকদের পদ্ধতি। অগ্নিপূজকদের সদৃশ হওয়ার কারণে তিনি এটাও অপসন্দ করলেন। সভা ভেঙ্গে গেল এবং কোন সিদ্ধান্তই হলো না। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চিন্তা ও ধারণার প্রভাব হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আবদে রাব্বিহ (রা)-এর উপর খুব বেশি পড়ত।

---

১. নাকূস এমন একটি কাঠির নাম, খ্রিস্টানরা তাদের গীর্জায় লোকজন একত্র করার জন্য যা বাজাতো। যেমন আজকালকার ঘন্টা অথবা শঙ্খ।

২ বুক অর্থ বিউগল, ইয়াহূদীদের পদ্ধতি ছিল যে, যখন তারা তাদের উপাসনালয়ে লোকজন একত্রিত করতে চাইত, তখন বিউগল বাজাতো।

ইত্যবসরে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) স্বপ্নে দেখেন যে, সবুজ পোশাক পরিহিত জনৈক ব্যক্তি একটি নাকূস হাতে নিয়ে আমাকে অতিক্রম করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, নাকূসটি কি বিক্রি করবে ? সবুজ পোশাকধারী বলল, তুমি এটা কিনে নিয়ে কি করবে ? আমি বললাম, এটি বাজিয়ে লোকজনকে নামাযের জন্য আহ্বান করব। সবুজ পোশাকধারী বলল, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম কোন পদ্ধতি বলব না ? আমি বললাম, কেন নয়, অবশ্যই বল। ঐ ব্যক্তি বলল, এভাবে বল ঃ 'আল্লাহু আকবার-আল্লাহু আকবার', 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ', 'হাইয়্যা আলাস সালাহ হাইয়্যা আলাস সালাহ', 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ-হাইয়্যা আলাল ফালাহ', 'আল্লাহু আকবার-আল্লাহু আকবার', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'

আর কিছুটা সরে গিয়ে ইকামত শিক্ষা দিল। এভাবে যে, যখন নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে, তখনও অনুরূপ বলবে এবং হাইয়্যা আলাল ফালাহ-এর পর দু'বার 'কাদ কামাতিস সালাত' অতিরিক্ত যোগ করল। প্রভাত হতেই আমি নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং এ স্বপ্ন বর্ণনা করলাম। শোনামাত্র তিনি বললেন : انَّ هٰذه لَرُؤْيَا حَقٌّ انْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى "এ স্বপ্ন ইনশা আল্লাহ অবশ্যই সত্য।"[১]

এখানেও 'ইনশা আল্লাহ' বাক্যটি শর্তসাপেক্ষ ও সন্দেহের কারণে নয়, বরং বরকত ও আদবের জন্য বলা হয়েছে, যেমনটি আমরা একটু আগেই বর্ণনা করেছি।

পরে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দকে নির্দেশ দিলেন যে, এ বাক্যগুলো বিলালকে বলে দাও এবং সে আযান দিক। কেননা বিলালের স্বর তোমার চেয়ে বেশি উচ্চ।

বিলাল (রা) আযান দিলেন আর এ ধ্বনি হযরত উমর (রা)-এর কানে পৌঁছামাত্র তিনি চাদর টানতে টানতে ঘর থেকে বেরুলেন এবং নবী (সা) সকাশে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, والذى بعثك بالحق لقد رايت مثل الذى ارى "ইয়া রাসূলাল্লাহ, কসম ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমিও অনুরূপ স্বপ্নই দেখেছি।" শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। হাদীসটি মুহাম্মদ ইবন ইসহাক নিম্নরূপ সনদে বর্ণনা করেন :

---

১. এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) এ কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

احمد الله ذالجلال وذاالاكرام محمدا على الاذان كثيرا اذا اتانى به البشير من الله

فاكرم به لدى بتيرا فى ليال والى بهن ثلاث كلما جاء زانى توقيرا

"আমি আযানরূপ নিয়ামতের জন্য আল্লাহ যুল-জালালের অসংখ্য প্রশংসা করি। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে এক সুসংবাদদাতা এলেন, আর তিনি ছিলেন উত্তম সুসংবাদদাতা। পরপর তিন রাত্রি পর্যন্ত আল্লাহর ঐ সুসংবাদদাতা এলেন আর আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকলেন।" (সুনানু ইবন মাজাহ)

قال ابن اسحق حدثنى بهذا الحديث محمد بن ابراهيم التيمى عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن ابيه

"ইবন ইসহাক বলেন, হাদীসটি আমাকে মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম তায়মী মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আবদে রাব্বিহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন।"

ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম আবূ দাউদ এ সনদেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম তায়মীর এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীসটি সহীহ (ইমাম বায়হাকী কৃত 'সুনানুল কুবরা')। ইমাম ইবন খুযায়মা তাঁর সহীহ গ্রন্থে বলেন, هذا الحديث صحيح ثابت من جهت النقل "হাদীসটি সনদ এবং মূলপাঠ উভয় দিক থেকে বিশুদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠিত।"

মুহাম্মদ ইবন ইয়াহিয়া যুহলীও হাদীসটি সহীহ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, আবদুল্লাহ ইবন যায়দ বর্ণিত এ হাদীসটি হাসান সহীহ।[1]

আবদুর রাহমান ইবন আবূ লায়লা বলেন, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি স্বপ্নে দেখলাম দুটি সবুজ চাদর পরিহিত এক ব্যক্তি প্রথমে দেয়ালের উপর চড়ে আযানের বাক্যগুলো দু'বার করে বলল। এরপর নিচে নেমে ইকামতে দু' দু'বার বলল।

হাফিয আলাউদ্দীন মারবিনী বলেন, এ হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারী বুখারীর শর্তানুযায়ী বিশ্বস্ত। জাওহার নকী প্রণীত 'সুনানুল কুবরা'র হাশিয়ায় (১খ. পৃ. ৪২০) এবং 'মু'জামে তাবারানী'র আওসাতে আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও এ স্বপ্নই দেখেছিলেন (দ্র. শায়খ ইবন আল্লান মক্কী প্রণীত 'আল-ফুতূহাতে রাব্বানিয়াহ আলাল-আযকারিন-নবূবিয়াহ', ২খ. পৃ. ৭০)।

তত্ত্ব ও দর্শন

ঈমানের পরেই নামাযের স্থান, যা জামায়াতের সাথে আদায় করা অত্যন্ত জরুরী। আর ঘোষণা দান ও অবহিতকরণ ছাড়া লোকজন একত্রিত করা সুকঠিন। নবী (সা) বিষয়টি মজলিসে উল্লেখ করেন। কেউ আগুন জ্বালানোর কথা বলেন, কেউবা বিউগল বাজানোর কথা উল্লেখ করেন আর কেউ নাকূস বাজানোর বিষয়ে উল্লেখ করেন। নবী (সা) আগুন জ্বালানো অগ্নিপূজকদের সাথে সদৃশ হওয়ার কারণে অনুমোদন করেননি। আর বিউগল ইয়াহূদীদের অনুরূপ হওয়ার দরুন এবং নাকূস খ্রিস্টানদের অনুরূপ হওয়ার কারণে বাতিল করে দেন। কোন প্রকার সিদ্ধান্ত ছাড়াই মজলিস সমাপ্ত হয় এবং লোকজন আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

---

১. নায়লুল আওতার, ২খ. পৃ. ৬।

[১]

ইত্যবসরে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আবদে রাব্বিহী (রা) কে স্বপ্নে আযান ও ইকামত দেখানো হয়। আবদুল্লাহ ইবন যায়দ তার স্বপ্ন নবী (সা)-এর সামনে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করেন, এ স্বপ্ন বাস্তব ও সত্য। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত, শয়তানের প্ররোচনা থেকে পাক-পবিত্র। উত্তম স্বপ্ন ও ইলহাম দ্বারা যদিও নিশ্চিত নির্দেশ প্রমাণিত হতে পারে না, কিন্তু নবী (সা)-এর সত্যায়ন এবং তা বহাল রাখা এটিকে প্রকাশ্য ওহীর রূপ দিয়েছে এবং ঐ বাক্যাবলী দ্বারাই তিনি লোকদেরকে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। এমন কি আযানের প্রচার দীন ইসলামের একটি বিরাট প্রচারে পরিগণিত করা হয়। আর তা দীনের একটি বিশেষ নিদর্শনে পরিণত হয়।

[২]

আবার আযানের এ বাক্যগুলোর প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিও খুবই আশ্চর্যজনক যে, মাত্র কয়েকটি বাক্যের মধ্যেই ইসলামের তিনটি মৌলিক ভিত্তি তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর মধ্যে তাওহীদের স্বীকৃতি এবং শিরকের অস্বীকৃতি বিদ্যমান।

'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'তে রিসালতের প্রত্যায়ন বিদ্যমান এবং এ বাক্যের ঘোষণা যে, আল্লাহ তা'আলার পরিচয় এবং তাঁর ইবাদতের পদ্ধতি আমরা এ সত্য নবীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি। আর তাওহীদ ও রিসালতের ঘোষণার পর মানুষকে সর্বাপেক্ষা উত্তম ইবাদত নামাযের দিকে 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' বলে আহ্বান করা হয়।

এরপর আবার 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলে স্থায়ী কল্যাণের প্রতি আহ্বান করা হয়, যা দ্বারা মূলের দিকে অর্থাৎ আখিরাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়ে যায় যে, যদি চিরস্থায়ী সাফল্য অর্জন করতে চাও, তা হলে প্রকৃত প্রভুর আনুগত্য ও ইবাদতে নিয়োজিত থাক। ফালাহ দ্বারা (পরকালীন) স্থায়ী সাফল্যই উদ্দেশ্য।

সবশেষে পুনরায় 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে স্মরণ করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহই সবার বড় এবং তিনি ছাড়া কেউই আনুগত্য ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্য নয়।[১]

---

১. আল্লামা কুরতুবী বলেন ঃ قال القرطبى وغيره الاذان على قلته الفاظه مشتمل على مسائل العقيده لانه بداء بالاكبرية وهى تتضمن وجود الله وكماله ثم ثنى بالتوحيد ونفى الشرك ثم اثبات الرسالة لمحمد ﷺ ثم دعا الى الطاعته المخصوصة عقيب الشهادة لانها لا نعرف الا من جهة الرسول ثم دعا الى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الاشارة الى المعاد ثم اعاده ما عاد توكب (ফাতহুল বারী, ২খ. পৃ. ৬২)।

আল্লাহ তা'আলা যাকে কিছুমাত্র সাধারণ জ্ঞান দান করেছেন, সে ব্যক্তিই আযানের বাক্যগুলোর সরাসরি অর্থ এই দেখতে পাবে যে, আযান সত্যের প্রতি আহ্বান এবং আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী আওয়াজ। আর ইয়াহূদী, খ্রিস্টান অথবা হিন্দুদের বিউগল, নাকূস, ঘন্টাধ্বনি বা শিঙ্গা, সবকিছু খেল-তামাশার বস্তু। আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, তাঁর সার্বভৌমত্ব ও একত্বের ঘোষণার দ্বারা বান্দা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম, ঘন্টা ধ্বনি এবং তবলার আওয়াজে কখনই আল্লাহর নিকট পৌঁছা সম্ভব নয়।

ایں رہ کہ تومی روی بترکستان است

[৩]

স্বপ্নের মাধ্যমে আযানের বিধিবদ্ধতা বাহ্যত এ জন্যে হয়েছে যে, আযান হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবূয়াত ও রিসালাতের ঘোষণার সাথে সম্পৃক্ত। আর তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের ডংকা বাজানো এবং তাঁর দীনের প্রতি লোকজনকে আহ্বান করা এটা খাদিম ও দাসদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

خوشتران باشد کہ سر دلبران　　گفتہ آید در حدیث دیگران

মি'রাজ রজনীতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সরাসরি নামাযের নির্দেশ দেন এবং আসমানসমূহে আরোহণ ও অবতরণের সময় তাঁকে আযান শোনানো হয়। আসমানে ফিরিশতাগণ আযান দেন এবং তিনি শ্রবণ করেন। যেমনটি 'খাসাইসুল কুবরা' গ্রন্থে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে।[১]

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) বলেছেন, হযরত জিবরাঈল আমীন (আ) আসমানে আযান দেন এবং ইমামতির জন্য আমাকে আগে বাড়িয়ে দেন।[২]

আবার হিজরতের পর যখন নামাযের জামায়াতের জন্য লোকজনকে অবহিতকরণ ও ঘোষণা দানের প্রয়োজন অনুভূত হলো, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) কে স্বপ্নে আযান ও ইকামত দেখানো হলো। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) স্বপ্নে যে আযান ও ইকামত দেখেন, মহানবী (সা) তা শোনামাত্র বুঝলেন যে, এটা ঐ আযান ও ইকামত, যা মি'রাজের রাতে আমি আসমানে শুনেছিলাম। এ জন্যে তিনি শোনামাত্র বলেছিলেন, এটা সত্য স্বপ্ন। অর্থাৎ আমি মি'রাজের রাতে জাগ্রত অবস্থায় যা শুনেছি, তা সম্পূর্ণ এরই মত ও অনুরূপ।

[৪]

আযান ও ইকামতের ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। হযরত আবূ মাহযূরা (রা)-এর বর্ণনায় পুনরাবর্তন এসেছে, যাতে আযানে ঊনিশটি এবং ইকামতে সতরটি

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৬৪।

২ খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৭৬।

বাক্য রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র) হযরত আবূ মাহযূরা (রা)-এর আযান গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-এর হাদীস অনুসারে বর্ণিত আযান গ্রহণ করেছেন। এ জন্যে যে, আযানের প্রকৃত সূচনা হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-এর স্বপ্ন থেকে শুরু হয়। হযরত ফারূকে আযম (রা) ও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন।

শায়খ ইবন আল্লান[১] মক্কী 'শরহে কিতাবুল আযকারে' (২খ. পৃ.৭০) বলেন, মু'জামে তাবারানী'র আওসাত গ্রন্থে আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন।

অধিকন্তু, নবী করীম (সা) একে সত্য স্বপ্ন বলে সত্যায়ন করেছেন এবং তদনুসারে হযরত বিলাল (রা) কে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। এ জন্যে যে, আবদুল্লাহ ইবন যায়দের আযান ঐ আযানের অনুরূপ ছিল, যা নবী (সা) মি'রাজের রাতে হযরত জিবরাঈল (আ) থেকে শুনেছিলেন এবং জিবরাঈল (আ)-এর কথামত ফিরিশতাদের নামায পড়িয়েছিলেন। হাদীসে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) যখন নিজ স্বপ্ন নবী (সা)-এর সামনে বর্ণনা করলেন, তখন নবী (সা) বললেন, এ আযান যা তোমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে, বিলালকে শিখিয়ে দাও। কেননা তার আওয়াজ তোমার চেয়ে বেশি উচ্চ।

এরপর বিলাল (রা) সারা জীবন নবী (সা)-এর উপস্থিতিতে এ আযানই দিতে থাকেন যা হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) তাঁকে শিখেয়েছিলেন।

আর বিশুদ্ধতা ও পরম্পরার দিক থেকে প্রামাণ্যতার পর্যায়ে উপনীত হাদীসসমূহে এসেছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-এর আযানে পুনরাবর্তন ছিল না এবং কিছু পূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর ও হযরত ফারূকে আযম (রা) অনুরূপ স্বপ্নই দেখেছিলেন যেমনটি হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) দেখেছিলেন (যাতে পুনরাবর্তন ছিল না)।

এ জন্যে ইমাম আযম (র) এ সমস্ত দলীলের ভিত্তিতে আযানের এ বর্ণনাকে

---

১. তাবারানীর 'আওসাত' গ্রন্থে আছে, হযরত আবূ বকর (রা)-ও এ স্বপ্ন দেখেছিলেন। অধিকন্তু 'ওয়াসীতে' আছে, দশের অধিক ব্যক্তি এ স্বপ্ন দেখেছেন। 'ফুতূহাতে রাব্বানিয়াহ আলা আযকারে নুবুবিয়াহ' (২খ. পৃ. ৭০) গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা যারকানী বলেন, তাবারানীর 'আওসাত' গ্রন্থে আছে, হযরত আবূ বকর (রা)-ও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন। যুফর ইবন হুযাইল আবূ হানীফা থেকে, তিনি আলকামা ইবন মিরসাদ থেকে, তিনি ইবন বুরায়দা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে জনৈক আনসার সাহাবী (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি প্রসঙ্গে তাবারানী বলেন, আবূ হানীফা ছাড়া এ হাদীসটি আর কেউ আলকামা থেকে বর্ণনা করেন নি (যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৭৭)।

উত্তম ঘোষণা করেছেন যা হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে।

[৫]

আযান যেহেতু ইসলামের একটি বিরাট প্রচার, সেহেতু এর বাক্যাবলীতে বিশেষ নূর ও বরকত নিহিত রয়েছে। এ জন্যে শরী'আতের নির্দেশ হলো, যখন সন্তান জন্ম নেবে, তখন তার কানে আযান দিতে হবে যাতে জন্মগ্রহণের পর সর্বপ্রথম তার কানে তাওহীদ ও রিসালাতের বাণী পৌঁছে যায় এবং যাতে করে 'আলাসতু' (الست بربكم আমি কি তোমাদের রব নই)-এর নবায়ন ও স্মরণ হয়ে যায়।

আরব কবির ভাষায় :

اَتَانِىْ هَوَاهَا قَبْلَ اَنْ اَعْرِفُ الْهَوٰى　　فَصَادَفَ قَلْبًا خَالِيًا فَتَمَكَّنَا

অধ্যায় : মক্কা মুকাররামা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত স্মরণে

وَاِذْ فَشَا الْاِسْلَامُ بِالْمَدِيْنَة　　هَاجَرَ مَنْ يَّحْفَظْ فِيْهَا دِيْنَهُ

"মদীনায় যখন ইসলাম প্রসার লাভ করল, সাহাবায়ে কিরাম তখন নিজেদের দীনের হিফাযতের উদ্দেশে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন"– যাতে নিশ্চিন্তে ইসলামের বিধানগুলো পালন করতে পারেন এবং নিরাপদে লা-শারীক আল্লাহর ইবাদত করতে পারেন।

وَعَزَمَ الصِّدِّيْقُ اَنْ يُّهَاجِرَا　　فَرَدَّهُ النَّبِىُّ حَتّٰى هَاجَرَا

مَعًا اِلَيْهَا فَتَرَافَقَا اِلٰى　　غَارِبِثُوْرِ بَعْدَ ثُمَّ اَرْتَحَلاً

"আর (আবূ বকর) সিদ্দীক হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন, নবী (সা) তা নাকচ করে দেন। এমন কি তাঁরা পরে উভয়ে একত্রে হিজরত করেন। তাঁরা উভয়েই সওর গুহায় সঙ্গী হন এবং এরপর (মদীনার পথে) যাত্রা করেন।"

যখন মুসলমানগণ একের পর এক মদীনায় রওয়ানা হতে শুরু করেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা) ও হিজরতের ইচ্ছা করেন। কিন্তু নবী করীম (সা) তার সহায়তা ও বন্ধুত্বের খাতিরে হযরত আবূ বকর (রা) কে হিজরত থেকে নিরস্ত করেন। পরে তিনি ও আবূ বকর (রা) এক সাথে হিজরত করেন। প্রথমে ঘর থেকে বেরিয়ে উভয়ে সওর গুহায় আত্মগোপন করেন। তিন রাত এখানে অবস্থানের পর উভয়ে মদীনার পথে যাত্রা করেন।

وَمَعَهُمَا عَامِرُ مَوْلٰى الصِّدِّيْقُ　　وَابْنُ اُرَيْقَط دَلِيْلُ لِلطَّرِيْق

فَاَخَذُوْا نَحْوَ طَرِيْقِ السَّاحِلِ　　وَالْحَقُّ لِلْعَدُوِّ شَاغِلُ

تَبِعَهُمْ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ　　يُرِيْدُ فَتْكًا وَهُوَ غَيْرُ فَاتِكٍ

لَمَّا دَعَ عَلَيْهِ سَاخَتِ الْفَرَسُ　　نَادَاهُ بِالْاَمَانِ اِذْ عَنْهُ حَبَسُ

مَرُّوْا عَلٰى خَيْمَةِ اُمِّ مَعْبَدٍ　　وَهِىَ عَلٰى طَرِيْقِهِمْ بِمَرْصَدِ

وَعِنْدَهَا شَاةٌ اَضَرَّ الْجُهْدُ　　بِهَا وَمَا بِهَا قُوًى تَشْتَدُّ

فَمَسَحَ النَّبِىُّ مِنْهَا الضَّرْعَا　　فَحَلَبَتْ مَا قَدْ كَفَاهُمْ وُسْعًا

وَحَلَبتْ بَعْدُ اِنَاءً اٰخَرَا　　تَرَكَ ذٰلِكَ عِنْدَهَا وَسَافَرَا

"আর তাঁদের সাথে ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীকের দাস আমের এবং পথপ্রদর্শক ইবন আরীকত। অতঃপর তাঁরা উপকূলের পথ ধরেন এবং দুশমনকে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ধরতে ব্যস্ত রাখেন। অথচ তাঁরা নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে যান। সুরাকা ইবন মালিক তাঁদের অনুসরণ করে এবং হযরতকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। কিন্তু যাঁর সাথে আল্লাহ থাকেন, কেউ কি তাঁকে হত্যা করতে পারে ? সুরাকার প্রতি যখন তাঁর দৃষ্টি পড়ল, তিনি তাকে বদ-দু'আ করলেন, সাথে সাথে সুরাকার ঘোড়া যমীনে ধ্বসে গেল। বাধ্য হয়ে সে তাঁর কাছে নিরাপত্তার আবেদন জানাল। পথিমধ্যে উম্মে মা'বাদের তাঁবু অতিক্রম করেন আর তার তাঁবু ছিল যাত্রা বিরতিস্থলে। উম্মে মা'বাদের একটি বকরি ছিল, অসুখের কারণে যেটা চলতে পারত না। এমনকি দলের সাথে হেঁটে চারণভূমিতে যাওয়ার ক্ষমতাও তার ছিল না (কাজেই সেটি তাঁবুতে বাঁধা ছিল)। নবী (সা) তার পালানে হাত ছোঁয়ালেন। ফলে সে এ পরিমাণ দুধ দিল যে, সবার জন্য তা যথেষ্ট হয়ে গেল এবং সবাই তৃপ্ত হলো। এরপর আরেকটি পাত্রে দুধ দোহন করলেন এবং ঐ দুধ ভর্তি পাত্র উম্মে মা'বাদের কাছে রেখে তাঁরা যাত্রা করলেন।"

যেমনটি হাফিয ইরাকী তাঁর 'উলফিয়াতুস-সীরাত' (সীরাত বিষয়ক কবিতা শতক) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

অধ্যায় : নবী (সা)-এর কুবায় উপস্থিতি এবং সেখান থেকে মদীনায় আগমন

حتى اتى الى قباء　　نزلها بالسعدوالهناء

فى يوم اللاثنين لثنتى عشره　　من شهر مولود فنعم الهجره

اقام اربعا لديهم وطلع　　فى يوم جمعة وصلى وجمع

فى مسجد الجمعة وهى اول　　ما جمع النبى فيما نقلوا

وقيل بل اقام اربع عشره　　فيهم وهم ينتحلون ذكره

وهو الذى اخرة الشيخان　　لكن ما مر من الاتيان

بمسجد الجمعة ويوم الجمعه　　لايستقيم مع هذه المدة

الا على القول بكون القدمه — الى قبا كانت بيوم الجمعة
بنى بها مسجده وارتحلا — بطيبة الفيحاء طابت نزلا
فبركت ناقته المامورة — بموضع المسجد فى الظهيره
فحل فى دار ابى ايوبا — حتى ابتنى مسجده الرحيبا
وحوله منازلا لاهله — وحوله اصحابه فى ظله
طابت به طيبة من بعد الردى — اشرق ماقد كان منها اسود
كانت لمن اوبا ارض الله — فزال داءها بهذا الجاه
ونقل الله بفضل رحمه — ما كان من حمى بها للجحفه

"এমনকি তিনি তাঁর জন্মের মাস অর্থাৎ রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ সোমবারে সহীহ-সালামতে কুবায় পৌঁছেন। চার রাত কুবায় অবস্থান করে শুক্রবারে তিনি মদীনা মুনাওয়ারার পথে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি জুমু'আ মসজিদে জুমু'আর নামায আদায় করেন। আর এটা ছিল তাঁর প্রথম জুমু'আ আদায়। (কুবায় চারদিন অবস্থান করা সীরাত গ্রন্থকারদের বক্তব্য। বুখারী ও মুসলিমের বক্তব্য পরবর্তী পংক্তিমালায় আসছে)। কেউ বলেন, তিনি চৌদ্দ রাত কুবায় অবস্থান করেন। আর মুহাক্কিক আলিমগণ এ বর্ণনার প্রতিই আকৃষ্ট। যেমনটি বুখারী ও মুসলিমে আছে, তিনি কুবায় চৌদ্দ রাত অবস্থান করেন। কিন্তু এতে সমস্যা এই যে, তিনি সোমবারে কুবায় উপস্থিত হন এবং শুক্রবারে মদীনার দিকে যাত্রা করেন। যদি প্রথম শুক্রবারেই তিনি মদীনায় যাত্রা করেছেন বলে ধরে নেয়া হয়, তা হলে এ হিসেবে কুবায় তিনি চার রাত অতিবাহিত করেন। আর যদি পরবর্তী শুক্রবারে রওয়ানা হয়েছেন বলে ধরা হয়, তা হলে তিনি দশ রাত কুবায় কাটিয়েছেন। মোট কথা, বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনামতে চৌদ্দ রাত কুবায় অবস্থান সঠিক বলে মনে হয় না। তবে যদি কুবায় উপস্থিতি সোমবারের পরিবর্তে শুক্রবার ধরা হয়, তা হলে শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চৌদ্দ রাত হয়। কুবায় অবস্থানকালে তিনি কুবার মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তারপর কুবা থেকে মদীনায় যাত্রা করেন। আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট তাঁর উটনী, দ্বিপ্রহরে মদীনায় উপস্থিত হয় এবং মসজিদে নববীর স্থলে বসে পড়ে। আর তিনি আবূ আয়্যুব আনসারী (রা)-এর গৃহে গিয়ে অবতরণ করেন। এমনকি তিনি সেখানে এক বিরাট মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের পাশে পবিত্র সহধর্মিণীগণের জন্য হুজরা নির্মাণ করেন। নির্মাণ সমাপ্ত হলে রাসূল (সা) আবূ আয়্যুব (রা)-এর গৃহ ছেড়ে হুজরায় চলে আসেন। তাঁর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশে কতিপয় সাহাবীও তাঁর হুজরার আশপাশে গৃহ নির্মাণ করেন। পূর্বে মদীনা ছিল নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। তাঁর আগমনে তা পবিত্র হয়ে যায়। পূর্বে ছিল অন্ধকার, তাঁর আগমনে হয়ে উঠে আলোকিত। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি মদীনায় প্রবেশ করেন, তখন

সব কিছু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, হাদীসটি সহীহ-গরীব। (যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৫৯)।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে মদীনার জ্বরকে জুহফার দিকে প্রেরণ করেন। বুখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন পৃথিবীর মধ্যে বেশি মহামারী আক্রান্ত এলাকা ছিল মদীনা। তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন যে, আয় আল্লাহ ! মদীনাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দাও এবং মহামারী জুহফার দিকে প্রেরণ কর। হাদীসটি সহীহ বুখারীর বিভিন্ন অধ্যায়, যেমন 'ফাযাইলে মদীনা', 'কিতাবুল মারীয', 'কিতাবুদ দাওয়াত' প্রভৃতি অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে :

قال ابن اسحق وذكر ابن شهاب الزهرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله ﷺ لما قدم المدينة هو واصحابه اصابتهم الحتمى المدينة حتى جهد وامرضا وصرف الله ذلك عن نبيه ﷺ حتى كانوا ما يصلون الاوهم قعود قال فخرج عليهم رسول الله ﷺ وهم يصلون كذلك فقال لهم اعلموا ان صلوة القاعد على النصف من صلوة القائم قال فتجشم المسلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل

"ইবন ইসহাক বলেন, ইবন শিহাব যুহরী (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবাগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) জ্বরে এতই দুর্বল হয়ে পড়েন যে, বসে বসে নামায আদায় শুরু করেন। একদিন নবী (সা) চলার পথে দেখতে পান, লোকজন বসে নামায আদায় করছে। তিনি বলেন, বসে নামায আদায়ে দাঁড়িয়ে নামাযের অর্ধেক সওয়াব হয়। এ কথার পর সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের অত্যন্ত দুর্বল এবং অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও কষ্ট সহ্য করে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন যাতে দাঁড়ানোর সওয়াব ও ফযীলত লাভ করতে পারেন।" (সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ২১৬)।

ليس دجال ولا طاعون يدخلها فحررها حصين

"মদীনায় না দাজ্জাল প্রবেশ করতে সক্ষম হবে, আর না মহামারী। মদীনা এ সমস্ত বিপদাপদের ক্ষেত্রে মযবুত দুর্গবিশেষ।"

যেমন বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মদীনার পথে পথে ফিরিশতাদের পাহারা রয়েছে, কাজেই এখানে দাজ্জালও প্রবেশ করতে পারবে না, আর মহামারীও না। ইমাম বুখারী এ হাদীসটি ফাযাইলে মদীনা, কিতাবুত-তিব এবং কিতাবুল ফিতান-এ বর্ণনা করেছেন।

اقام شهرا ثم بعد نزلت عليه اتمام الصلوة كملت

"এক মাস অবস্থানের পর মুকীম ব্যক্তির নামাযে দু' রাকাআত বৃদ্ধি পায় এবং মুসাফিরের নামায পূর্ববৎ দু'রাকআতই থেকে যায়, যেমন শুরু থেকে ছিল।"

যেমনটি বুখারী ও মুসলিমে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

اقام شهرا ربيع لصفر يبنى له مسجده

ووداع اليهود فى كتابه ما بينهم وبين اصحابه

"রবিউল আউয়াল মাস থেকে সফর মাস পর্যন্ত সময় মসজিদে নববী নির্মাণে ব্যস্ত থাকেন। আর এ সময়ের মধ্যেই তিনি সাহাবায়ে কিরাম এবং ইয়াহূদীদের মধ্যে একটি চুক্তিনামা লিখান।" (যে প্রসঙ্গে আমরা শীঘ্রই আলোচনা করব)।

وكان امر البدء بالاذان رويا ابن زيدا ولعام ثان

"আর আযানের সূচনা হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-এর স্বপ্ন থেকেই হয়েছিল। এটা প্রথম অথবা দ্বিতীয় হিজরী সনের ঘটনা।" (এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে)।

মদীনার ইয়াহূদীদের সাথে চুক্তি

মদীনা মুনাওয়ারায় অধিকাংশ ও বেশিরভাগ আবাস ছিল আওস ও খাযরাজ গোত্রের। তাদের সংখ্যাও ছিল অনেক। মদীনা এবং খায়বর ছিল তাদের শিক্ষাকেন্দ্র এবং খায়বরে ছিল তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ। এরা ছিল আহলে কিতাব এবং হিজায ভূমির মুশরিকদের তুলনায় শিক্ষিত। তাদের আসমানী কিতাবের মাধ্যমে তারা শেষ নবী (সা)-এর অবস্থা এবং গুণাবলী সম্বন্ধে ছিল সম্যক অবগত। যেমন আল্লাহ বলেন يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ "তারা তাকে চেনে যেমন চেনে নিজেদের সন্তানদের।" কিন্তু তাদের মানসিকতা ভাল ছিল না। সত্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ, জেদ, জেনে শুনে অস্বীকৃতি ও অহংকার তাদের মধ্যে ছিল পুরোমাত্রায়। যেমন আল্লাহ বলেন : وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسَهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا "ওরা অন্যায় ও উদ্ধত্যভাবে আমার নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও ওদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল।"

নবী (সা) যতদিন মক্কা মুকাররামায় ছিলেন, সে সময়ও ইয়াহূদীরা নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে কুরায়শদেরকে উস্কানী দিত। তাদেরকে শিখিয়ে দিত যে, তাঁকে আসহাবে কাহফ, যুল কারনায়ন এবং রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর ইত্যাদি। যখন তিনি হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন, তখন তাদের বিদ্বেষ ও হিংসার আগুন অধিক জ্বলে উঠলো। আর তারা বুঝতে পারলো যে, আমাদের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব শেষ হয়ে গেছে। এ প্রবৃত্তির অনুসারী ও স্বেচ্ছাচারীরা তখন শত্রুতার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করলো এবং 'আসহাবুস-সাবত'-এর রীতি গ্রহণ করলো। وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ "আর তারা নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে।"

ইয়াহূদী আলিম ও দরবেশদের মধ্যে যারা সৎ ও সাদাসিধে প্রকৃতির ছিলেন, তারা শেষ নবীর আগমন বার্তা প্রকাশ করেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। কিন্তু অধিকাংশই বিদ্বেষের পথ অনুসরণ করল এবং হিংসা ও শত্রুতা তাদের জন্য শত রাস্তা খুলে দিল। নবী (সা) তাদের হিংসা-বিদ্বেষ ও ফিতনা-ফাসাদের পথ রুদ্ধ করার লক্ষ্যে তাদের সাথে লিখিত চুক্তি করেন, যাতে তাদের বিরোধিতা ও শত্রুতা মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। কাজেই তিনি মদীনায় হিজরতের পাঁচ[1] মাস পর মদীনার ইয়াহূদীদের সাথে একটি চুক্তি করেন। এ চুক্তিতে তাদেরকে তাদের ধর্ম ও তাদের সম্পত্তিতে বহাল রেখে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহে তাদের নিকট থেকে লিখিত অঙ্গীকারনামা নেয়া হয়। বিস্তারিত চুক্তিনামা 'সীরাতে ইবন হিশাম', (১খ. পৃ. ১৭৮) এবং 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া', (৩খ. পৃ. ২২৪)-তে বর্ণিত হয়েছে। যার সারসংক্ষেপ ছিল নিম্নরূপ :

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

এ লিখিত চুক্তিনামা উম্মী নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে কুরায়শ মুসলমান এবং ইয়াসরিবের ইয়াহূদীদের মধ্যে, যারা মুসলমানদের অধীনে এবং যারা তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ, প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে নিম্নের শর্তসমূহ পালন করবে ঃ

১. হত্যার প্রতিশোধ এবং বদলা গ্রহণের যে পদ্ধতি পূর্বকাল থেকে চলে আসছে, তা সুবিচার ও ইনসাফের সাথে যথারীতি বহাল থাকবে।

২. প্রত্যেক গোত্রকেই সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে নিজ দলের পক্ষে মুক্তিপণ দিতে হবে। অর্থাৎ যে সম্প্রদায়ের যতজন বন্দী থাকবে, তাদের উদ্ধারের জন্য মুক্তিপণ প্রদান তাদেরই যিম্মায় থাকবে।

৩. অত্যাচার, পাপাচার, শত্রুতা ও বিবাদের বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকবে। এ ব্যাপারে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না, যদিও অপরাধী কারো পুত্রও হোক না কেন।

৪. কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে হত্যায় কোন কাফিরের বিরুদ্ধে সহায়তা করতে পারবে না। আর কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্য করারও অনুমতি থাকবে না।

৫. (বিপন্নকে আশ্রয়দানের ক্ষেত্রে) একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের যে অধিকার থাকবে, একজন সাধারণ মুসলমানেরও অনুরূপ অধিকার থাকবে।

৬. যে সমস্ত ইয়াহূদী মুসলমানদের অধীনে থাকবে, তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর বর্তাবে। তাদের প্রতি না কোন অত্যাচার করা হবে, আর না তাদের শত্রুকে কোন প্রকার সাহায্য করা হবে।

---

১. আসল চুক্তি তো 'সীরাতে ইবন হিশাম' এবং 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' (৩খ. পৃ.২২৪)-তে উল্লিখিত আছে। কিন্তু এতে তারিখের উল্লেখ নেই। হিজরতের পাঁচ মাস পর চুক্তির সময়কাল 'তারিখুল খামীস' (১খ. পৃ. ৩৫) থেকে নেয়া হয়েছে।

৭. কোন কাফির বা মুশরিকের এ অধিকার থাকবে না যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন কাফিরের জীবন অথবা সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করে; কিংবা (মক্কার) কুরায়শ এবং মুসলমানদের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

৮. যুদ্ধের সময় ইয়াহূদীদেরকে জীবন ও সম্পদ দিয়ে মুসলমানদের সহায়তা করতে হবে। মুসলমানদের বিরুদ্ধ পক্ষকে সাহায্য করার অনুমতি থাকবে না।

৯. নবী করীম (সা)-এর কোন দুশমন যদি মদীনা আক্রমণ করে, তা হলে মহানবী (সা) কে সাহায্য করা ইয়াহূদীদের জন্য আবশ্যকীয়।

১০. যে সমস্ত গোত্র এ চুক্তি ও শপথে শরীক আছে, তাদের মধ্যে যদি কেউ এ চুক্তি ও শপথ থেকে পৃথক হতে চায়, তা হলে নবী করীম (সা)-এর অনুমতি ছাড়া পৃথক হতে পারবে না।

১১. কোন ফিতনাবাজকে সাহায্য করা কিংবা আশ্রয় দেয়ার অনুমতি দেয়া হবে না। যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কাউকে সাহায্য করে কিংবা আশ্রয়দান করে, তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত ও ক্রোধ নিপতিত হবে। কিয়ামত পর্যন্ত তার কোন আমল কবূল হবে না।

১২. মুসলমানগণ যদি কারো সাথে সন্ধি করতে চায়, তা হলে ইয়াহূদীদের জন্যও ঐ সন্ধিতে অংশগ্রহণ করা আবশ্যকীয়।

১৩. যে কেউ কোন মুসলমানকে হত্যা করলে যদি তার সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, তা হলে এ হত্যার বদলা নেয়া হবে। তবে নিহতের অভিভাবক যদি রক্তপণ ইত্যাদির বিনিময় গ্রহণে সম্মত হয় তা হলে বদলা নেয়া হবে না।

১৪. যদি কখনো কোন ঝগড়া-বিবাদ কিংবা পারস্পরিক মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, তা হলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে পেশ করা হবে। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২২৪)।

যে সমস্ত গোত্রের সাথে নবী (সা) এ চুক্তি করেন, তাদের মধ্যে ইয়াহূদীদের তিনটি বড় গোত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা মদীনা এবং মদীনার উপকণ্ঠে বাস করত। তারা ছিল ১. বনী কায়নুকা, ২. বনী নযীর এবং ৩. বনী কুরায়যা।[১] এ গোত্রগুলো যেহেতু নবী করীম (সা)-এর আনুগত্য থেকে পলায়ন করেছিল, সেহেতু তাদের জন্য তিনি এ চুক্তিনামা লিখান, যাতে তারা ফিতনা-ফাসাদ বিস্তার করতে না পারে। কিন্তু তিনটি গোত্রই একের পর এক এ চুক্তির লজ্ঘন করে এবং ইসলামের সাথে শত্রুতা ও ইসলাম

---

১. ইবন ইসহাক বলেন ঃ ان النبى ﷺ وادع اليهود لما قدم المدينة امتعوا من اتباعه فكتب منهم كتابا وكانوا ثلاث قبائل قينقاع والنضير واستاصل بنى قريضة فنقص الثلاثة العهد طائفة بعد طائفة فمن على بنى قينقاع واجل بنى نضير واستاصل بنى قريضة ويناتى بيان ذلك كله مفصلا انشا الله تعالى (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ ৩১৪)।

বিরোধী ষড়যন্ত্রের সাথে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করে নিজেদেরকে শাস্তিযোগ্য করে তোলে। যে বিষয় সামনে যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনায় আসবে।

আবূ উবায়দ কিতবুল আমওয়ালে বলেন, এ চুক্তিনামা জিযয়ার বিধান নাযিলের পূর্বে লিখিত হয়েছিল। ইসলাম সে সময়ে দুর্বল ছিল এবং নির্দেশ এও ছিল যে, ইয়াহূদীরা যদি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তা হলে গনীমতের কিছু অংশ তাদেরকেও দেয়া হবে। এ কারণে এ চুক্তিনামায় ইয়াহূদীদের জন্য এ শর্ত আরোপ করা হয় যে, যুদ্ধের ব্যয় বহনে তাদেরও অংশ নিতে হবে।[১]

সতর্ক বাণী

চুক্তিনামার বাক্যাবলী দ্বারা এটা পরিষ্কার প্রকাশ পেয়েছে যে, এ চুক্তি মুসলমান এবং ইয়াহূদীদের মধ্যে এভাবে সম্পাদিত হয় যে, মুসলমানগণ আনুগত্য গ্রহণকারী এবং ইয়াহূদীরা তাদের অনুগত হবে। আর নবী করীম (সা) হবেন উভয়ের মধ্যে বিচারক। যখন কোন মতভেদ সৃষ্টি হবে, তখন তা নিষ্পত্তির জন্য নবী (সা)-এর সামনে উপস্থাপন করা হবে। এতে তিনি যে ফয়সালা করবেন, তা মেনে নেয়া হবে আবশ্যিক।

আপাতদৃষ্টিতে এ চুক্তিটি এ ধরনের, যেমনটি মুসলমান এবং যিম্মীদের মধ্যে হয়ে থাকে। কিন্তু তা আসলে এমনটি নয়। কেননা হিজরত পরবর্তী সময় এটা ছিল ইসলামের শক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ প্রারম্ভিক কাল। হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয় থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের শুরু হয়।

কিছু সংখ্যক মুসলমান, যারা (অবিভক্ত ভারতে তৎকালীন) কংগ্রেসের সাথে ঐক্য গঠনের প্রবক্তা, তারা এরূপ ঐক্যের সপক্ষে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহতে কোন সুযোগ না পেয়ে মদীনার চুক্তিনামাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা শুরু করেছে। প্রকৃতপক্ষে এটা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ এ চুক্তির সমুদয় ধারা। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ কথার সাক্ষ্য যে, ইসলামের নির্দেশ বিজয়ী হবে এবং অমুসলিম সম্প্রদায় ইসলামী হুকুমতের অধীনে থাকবে, যেমনটি 'সিয়ারুল কাবীর' প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রবক্তাদের এ এক নব আবিষ্কার, শরী'আতে যার কোন ভিত্তি নেই।

প্রথম হিজরী সনের বিভিন্ন ঘটনাবলী

১. মদীনায় আগমনের পর কুবায় অবস্থানকালে নবী (সা) যার গৃহে অবস্থান করেছিলেন, সেই কুলসুম ইবন হাদম ইনতিকাল করেন।

২. মসজিদে নববী নির্মাণ সবে শেষ করেছেন, বনী নাজ্জারের নকীব হযরত সা'দ ইবন যুরারা (রা) ইনতিকাল করেন। বনী নাজ্জার নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত

১. রাউযুল উনুফ, ২খ. পৃ. ১৭।

হয়ে অপর কাউকে নকীব নির্বাচনের প্রস্তাব পেশ করে। তিনি (সা) বললেন, তোমরা আমার মাতুল গোষ্ঠীর, আমি তোমাদেরই একজন। আমিই তোমাদের নকীব।[১]

তাঁর নকীব হওয়াটা ছিল বনী নাজ্জারের জন্য গৌরবের ব্যাপার। কাজেই এ জন্যে তারা গর্ববোধ করত।[২]

৩. এ বছরেই মক্কার মুশরিকদের দু'জন সর্দার, ওলীদ ইবন মুগীরা এবং মিসর বিজয়ী হযরত আমর ইবন আস (রা)-এর পিতা আস ইবন ওয়ায়েল মৃত্যুবরণ করে।[৩]

৪. মদীনা পৌঁছার আট মাস পর এ বছরের শাওয়াল মাসে তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে গৃহে বরণ করে নেন, যাঁকে হযরত খাদীজা (রা)-এর ইনতিকালের পর হিজরতের পূর্বেই বিয়ে করেছিলেন।

বিয়ে করার সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর বয়স ছিল ছয় অথবা সাত বছর এবং বাসরকালে বয়স হয়েছিল নয় বছর। কারো কারো মতে হিজরতের আঠার মাস পরে দ্বিতীয় হিজরীতে তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে বাসর যাপন করেছেন।[৪]

৫. হিজরতের পর যখন মুসলমানগণ মদীনা আগমন করেন, তখন মদীনার সমস্ত কূপের পানি ছিল লবণাক্ত। একমাত্র 'বিরে রুমা' নামক কূপটির পানিই মিষ্ট ছিল, যা ছিল এক ইয়াহূদীর মালিকানাধীন। সে বিনামূল্যে পানি দিত না। ফলে দরিদ্র মুসলমানদের জন্য পানি সংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়ল। হযরত উসমান গনী (রা) 'বিরে রুমা' খরিদ করে "জান্নাতের একটি ঝর্ণার বিনিময়ে" নবী (সা)-এর হাতে সোপর্দ করেন এবং মুসলমানদের জন্য তা ওয়াক্ফ করে দেন, যেন যে কোন লোক ইচ্ছে করলে এ থেকে পানি নিতে পারে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

হাদীসটি প্রসিদ্ধ। ইমাম তিরমিযী ছাড়াও অপরাপর হাদীসবেত্তাগণ এটি উদ্ধৃত করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য 'কানযুল উম্মাল' দেখুন।

হযরত উসমান গনী (রা)-এর এ ঘটনা ইমাম বুখারী সাধারণভাবে 'কিতাবুল মুসাকাত' ও 'কিতাবুল উকূফ' শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।[৫]

হযরত সারমা ইবন আবূ আনাস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত সারমা ইবন আবূ আনাস আনসারী নাজ্জারী (রা) প্রথম থেকেই তাওহীদের প্রতি আকৃষ্ট এবং কুফর শিরক থেকে বিরক্ত ও বিদ্বিষ্ট ছিলেন। এক সময় খ্রিস্টধর্মে

---

১. প্রাগুক্ত, ২খ. পৃ. ৭০।

২. তারীখে তাবারী, ২খ. পৃ. ২৫৭।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. প্রাগুক্ত, ২খ. পৃ. ৩৭২।

অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ইচ্ছেও করেছিলেন; কিন্তু (সম্ভবত খ্রিস্টানদের শিরকী ধ্যান-ধারণার কারণে) সে ইচ্ছে বাতিল করেন।

তিনি খুবই ইবাদত গুযার ও পরহেযগার ছিলেন। দরবেশ সুলভ জীবন যাপন করতেন, কখনো পাতলা কাপড় পরতেন না, সব সময় মোটা কাপড় পরিধান করতেন।

ইবাদত করার জন্য একটি বিশেষ কক্ষ নির্মাণ করিয়েছিলেন যেখানে ঋতুবতী স্ত্রীলোক এবং অপবিত্র ব্যক্তির প্রবেশাধিকার ছিল না। সারমা ইবন আবূ আনাস (রা) বলতেন, আমি ইবরাহীম (আ)-এর প্রভুর ইবাদত করি।

তিনি সমসাময়িক কালের বড় কবি ছিলেন। তাঁর কবিতা ছিল বিজ্ঞোচিত উপদেশমালায় সমৃদ্ধ।[1]

যখন নবী করীম (সা) হিজরত করে মদীনা আগমন করেন, তখন সারমা খুবই বয়ঃবৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। নবী (সা)-এর খিদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিম্নোক্ত কবিতাসমূহ আবৃত্তি করেন :

ثوى فى قريش بضع عشرة حجة   يذكر لو يلقى صديقا مواتيا

ويعرض فى أهل الموسم نفسه   فلم ير من يؤوى ولم ير داعيا

فلما اتانا اظهر الله دينه   فاصبح مسرور بطيبة راضيا

والقى صديقا واطمانت به النوى   وكان له عونا من الله باديا

يقص لنا ما قال نوح لقومه   وما قال موسى اذا جاب المناديا

فاصبح لا يخشى من الناس واحدا   قريبا ولا يخشى من الناس نائيا

بذلناله الاموال من جل مالنا   وانفسنا عند الوعى والتاسيا

ونعام ان الله لا شئى غيره   ونعلم ان الله افضل هاديا

نعادى الذى عادى من الناس كلهم   جميعا وان كان الحبيب مصافيا

"তিনি কুরায়শদের মাঝে (মক্কা মুকাররামায়) দশ বছরেরও অধিক অবস্থান করেন এবং লোকজনকে সদুপদেশ দান করেন। আর মনে মনে এ কামনা করেন, যদি কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী মিলে যায়।

আর হজ্জের মওসুমে নিজেকে উপস্থাপন করে বলতেন, আমাকে কেউ এখান থেকে নিয়ে যাও, আমাকে আশ্রয় দাও। কিন্তু কোন আশ্রয়দানকারী এবং সাড়াদানকারী পাওয়া গেল না।

---

১. ইবন হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে দুটি কাসিদা বর্ণনা করেছেন। সম্মানিত বিজ্ঞ পাঠক 'সীরাতে ইবন হিশাম' (১খ. পৃ. ১৮২) দেখে নিন।

"অতঃপর তিনি যখন আমাদের কাছে এলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দীনকে বিজয় দান করলেন আর মদীনার প্রতি তিনি আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হলেন। আর এখানে এসে তিনি বন্ধুও পেলেন এবং মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছেদ ব্যথায় সান্ত্বনাও লাভ করলেন। আর তাঁর বন্ধুগণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর জন্য প্রকাশ্য সাহায্য ও সহায়তাকারী হলেন।

"তিনি আমাদের কাছে ঐ সব কথা বলেন, যা নূহ (আ) এবং মূসা (আ) তাঁদের সম্প্রদায়কে বলতেন। আর এখানে এসে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁর থাকল না নিকট কিংবা দূরবর্তী কোন ভীতি।

"আমরা আমাদের সমুদয় সম্পদ তাঁর জন্য উৎসর্গ করেছি। যুদ্ধের ময়দানেও তাঁর জন্য আমরা জীবন উৎসর্গ করব। আর আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন কিছুরই স্থায়িত্ব নেই। আর এটাও জানি যে, আল্লাহই সর্বোত্তম হিদায়াতকারী ও শক্তি সামর্থ্য দাতা। নিশ্চয়ই আমরা সেই ব্যক্তির দুশমন, যে নবী মুস্তফা (সা)-এর দুশমন যদিও কেউ হোক না আমাদের অতীব প্রিয় স্বজন।"

দ্বিতীয় হিজরী সন

কিবলা পরিবর্তন : মহানবী (সা) যতদিন পর্যন্ত মক্কায় ছিলেন, ততদিন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন। তবে তা এভাবে যে, বায়তুল্লাহও যেন সামনে থাকে। যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন উভয় কিবলা একসাথে অনুসরণের সুযোগ আর থাকলো না। এ জন্যে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী ষোল অথবা সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে থাকেন।

কিবলা পরিবর্তনের বিধান নাযিলের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা নবীজির মনে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামায আদায়ের সুপ্ত বাসনা সৃষ্টি করে দেন। কাজেই তিনি এ উদ্দেশে বার বার আসমানের দিকে মাথা তুলে তাকাতেন যে, কখন কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায়ের হুকুম নাযিল হবে। সুতরাং দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসের মাঝামাঝি এ বিধান নাযিল হয় : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "অতঃপর তোমার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফিরিয়ে নাও।"

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদের দ্বিতীয় পারার শুরুতেই কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এবং এর রহস্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। পাঠকগণ, তাফসীর গ্রন্থসমূহ দেখে নিন।

সুফফা ও সুফফার অধিবাসীগণ

কিবলা পরিবর্তনের পর যখন মসজিদে নববীর মিহরাব বায়তুল্লাহর দিকে হলো, তখন প্রথম কিবলার দিকটিতে দেয়াল তোলা হলো এবং এর সন্নিহিত স্থানে ঐ দরিদ্র

নিঃস্ব ব্যক্তিদের অবস্থানের জন্য ছেড়ে দেয়া হলো যাঁদের কোন ঠিকানা বা ঘরবাড়ি ছিল না। স্থানটি 'সুফফা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

ছায়া ঢাকা স্থানকে প্রকৃতপক্ষে সুফফা বলা হয়। ঐ সব অসহায় মুসলমান এবং শোকরগুযার দরিদ্র ব্যক্তিবর্গ, যাঁরা নিজেদের দারিদ্র্যে কেবল ধৈর্যই ধারণ করতেন না; বরং আমীর ও ধনী ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি শোকরগুযার ও আত্মতৃপ্ত ছিলেন। যখন হাদীসে কুদসী ও মহানবীর কথা শোনার জন্য নবীর দরবারে উপস্থিত হতেন, তখন সেখানেই পড়ে থাকতেন। মানুষ এ মহাত্মাগণকে 'আসহাবে সুফফা' নামেই স্মরণ করতেন। যেন এটা সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী প্রদর্শনকারী দরিদ্র নবীরই বৈঠকখানা ছিল, যিনি অল্পে তুষ্টি ও দারিদ্র্যকে পৃথিবীর বাদশাহীর উপর প্রাধান্য দিতেন।

আসহাবে সুফফা ছিল আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার প্রতীক ও একনিষ্ঠতার অধিকারী একটি দল। তাঁরা দিবারাত্র আত্মশুদ্ধি এবং কিতাব ও হিকমত, বস্তু ও বিষয় সম্পর্কিত সূক্ষ্মভাষী শেখার উদ্দেশে নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত থাকতেন। এ ছাড়া না ছিল তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহ, আর না ছিল কৃষি কাজের প্রতি কোন উৎসাহ।

এ মহাত্মাগণ নিজেদের চোখকে কেবল নবী (সা) কে দেখার জন্য, দু'কানকে তাঁর পবিত্র বাক্যাবলী শোনার জন্য এবং দেহকে তাঁর সাহচর্যে অবস্থান ও তাঁকে সাহায্য করার জন্য ওয়াক্‌ফ ও নিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

وان حدثوا عنها فكلى مسامع   وكلى اذا حدثتهم السن تتلو

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি এমন সত্তরজন আসহাবে সুফফাকে দেখেছি, যাঁদের চাদর পর্যন্ত ছিল না, শুধু লুঙ্গি ছিল অথবা কম্বল, যা তাঁরা গলার সাথে বেঁধে রাখতেন। আর কম্বলও এত ছোট ছিল যে, কারো পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছত, আর কারো টাখনু পর্যন্ত। আর তা তাঁরা হাত দিয়ে ধরে রাখতেন, যাতে সতর খুলে না যায়। (সহীহ বুখারী, ১খ, পৃ, ৬৩, نوم الرجال فى المسجد অধ্যায়)।

হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) বলেন, আমিও আসহাবে সুফফার একজন ছিলাম। আমাদের কারো কাছে পূর্ণ একটি কাপড়ও ছিল না। ঘামের দরুন শরীরে

---

১. হাফিয ইবন তাইমিয়া (র) তাঁর 'আল-জাওয়াবুস-সহীহ' গ্রন্থের কোন এক স্থানে নবী করীম (সা)-কে পূর্ববর্তী নবী (আ) গণ অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান ছিলেন। এ কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমাদের নবী করীম (সা) হযরত সুলায়মান (আ) অপেক্ষা অধিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এ জন্যে যে, সুলায়মান (আ) ছিলেন নবী বাদশাহ, আর আমাদের নবী ছিলেন নবী ফকীর। যেমনটি হযরত মূসা (আ) বলেছেন, رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ "হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে, আমি তার কাঙ্গাল।" (সূরা কাসাস ঃ ২৪)

ময়লা জমে যেত (হিলয়াতুল আউলিয়া, ১খ. পৃ. ৩৪১), যা আল্লাহর দরবারে সহস্র পবিত্রতার চেয়ে অধিক প্রিয় ও পসন্দনীয় ছিল। বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই বুযুর্গগণকে ঐ ধূলি-ধূসর মাথা ও নোংরা শরীর নিয়ে থাকতে হতো যে, যদি তাঁরা কোন বিষয়ে আল্লাহর কসম করে কিছু বলতেন, আল্লাহ্ তখন তাঁর কসম পুরা করতেন।

মুজাহিদ বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলতেন, ঐ আল্লাহ্ পাকের শপথ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, আমি কোন কোন সময় ক্ষুধার যন্ত্রণায় নিজের বুক ও পেট মাটিতে লাগিয়ে রাখতাম (যাতে মাটির আর্দ্রতা ও শীতলতার দরুন ক্ষুধার জ্বালা কিছুটা হ্রাস পায়)। আর কোন কোন সময় পেটে পাথর বাঁধতাম, যাতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি।

একদিন আমি রাস্তার মাথায় গিয়ে বসে পড়লাম। ইত্যবসরে হযরত আবূ বকর (রা) সেদিক দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আমি তাঁকে কুরআনের একটি আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করলাম। উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি আমার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুভব করে খাওয়ানোর জন্য সাথে নিয়ে যাবেন। কিন্তু আবূ বকর চলে গেলেন (উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি)।

অনুরূপভাবে হযরত উমর (রা) অতিক্রম করলেন। তাঁকেও আমি একইভাবে কুরআনের আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু তিনিও চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর হযরত আবুল কাসেম নবী মুস্তাফা (সা) (যাঁকে আল্লাহ্ যুল জালাল কল্যাণ ও বরকত বন্টন করার জন্য প্রেরণ করেছেন), ঐ দিক দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আমাকে দেখামাত্র তিনি ব্যাপার বুঝে ফেললেন। মুচকি হেসে বললেন, ওহে আবূ হুর (অর্থাৎ আবূ হুরায়রা)।

আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি হাযির আছি। তিনি বললেন, আমার সাথে চলে এসো। আমি তাঁর সঙ্গী হলাম। রাসূল (সা) ঘরে পৌঁছলেন। দেখলেন, এক পেয়ালা দুধ রাখা আছে। জিজ্ঞেস করলেন, এ দুধ কোত্থেকে এলো ? ঘর থেকে বলা হলো, অমুক আপনাকে হাদিয়া স্বরূপ দিয়েছে। তিনি ইরশাদ করলেন, হে আবূ হুরায়রা, আসহাবে সুফফাকে ডাকো।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আসহাবে সুফফা ছিলেন ইসলামের মেহমান। তাঁদের না ছিল ঘর আর না ছিল কোন সম্পদ। মোট কথা, তাঁদের কোন আশ্রয়ই ছিল না। নবী (সা)-এর কাছে যখন কোন সদকা আসত, তিনি আসহাবে সুফফার কাছে তা পাঠিয়ে দিতেন, নিজের জন্য কিছুই রাখতেন না (কেননা সদকা তাঁর জন্য নিষিদ্ধ ছিল)। আর যদি হাদিয়া আসত, তা হলে নিজেও কিছু গ্রহণ করতেন এবং আসহাবে সুফফাকেও তাতে শরীক করতেন। এই সময়ে তাঁর নির্দেশটি যে, "আসহাবে সুফফাকে ডাকো" আমার অন্তরে কিছুটা কষ্টের সৃষ্টি করল এবং মনে মনে বললাম, মাত্র এক পেয়ালা দুধ, এ কি আসহাবে সুফফার জন্য যথেষ্ট হবে ? এর সবচে' বেশি

হকদার তো ছিলাম আমিই—যে কিছুটা পান করে শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করতাম। এখন আসহাবে সুফফা আসার পর তো তিনি আমাকেই বন্টন করার নির্দেশ দেবেন, আর বন্টনের পর এ আশা নেই যে, আমার জন্য এর কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য না করে উপায় ছিল না।

সুতরাং আসহাবে সুফফাকে ডেকে আনলাম এবং তাঁর নির্দেশে এক এক করে তাঁদের ডাকলাম। সবাই তৃপ্ত হয়ে গেলেন। তখন নবী (সা) আমার প্রতি তাকিয়ে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, কেবল আমি আর তুমি অবশিষ্ট আছি। আমি বললাম, সম্পূর্ণ ঠিক। তিনি বললেন, বসে যাও এবং পান কর। আমি পান করা শুরু করলাম আর তিনি বার বার বলতে থাকলেন, আরো পান কর, আরো পান কর। এমন কি আমি বলতে বাধ্য হলাম, কসম ঐ আল্লাহর, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, পেটে আর কোন জায়গা নেই। তিনি আমার হাত থেকে পেয়ালাটি গ্রহণ করলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করে ও বিসমিল্লাহ পাঠ করে যা অবশিষ্ট ছিল, তা পান করে ফেললেন (বুখারী শরীফের কিতাবুর রিকাক-এ كيف كان عيش النبى ﷺ واصحابه تخليهم من الدنيا অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে)।

হযরত আবদুর রাহমান ইবন আবূ বকর (রা) বলেন,[১] আসহাবে সুফফাগণ ছিলেন নিঃস্ব। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবাগণের মধ্যে তাঁদেরকে ভাগ করে দিতেন এভাবে যে, যার কাছে দু'জনের খাদ্য আছে, সে একজন এবং যার কাছে তিনজনের খাদ্য আছে, সে চতুর্থজনকে সঙ্গে নিয়ে যাবে এবং এ অনুপাতে (বুখারী শরীফ)।

মুহাম্মদ ইবন সীরীন বলেন, যখন সন্ধ্যা হতো, তখন তিনি আসহাবে সুফফার সদস্যগণকে জনগণের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। কেউ দু'জনকে নিয়ে যেত, কেউ তিনজনকে এবং এভাবে। আর হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) তো আশিজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং তাঁদের খানা খাওয়াতেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ,আমিও আসহাবে সুফফার একজন ছিলাম। যখন সন্ধ্যা হতো, আমরা সবাই নবী (সা)-এর কাছে চলে যেতাম। তিনি এক একজন, দু' দু'জন করে ধনী সাহাবাগণের কাছে সোপর্দ করতেন। যারা অবশিষ্ট থাকত, তাদের তিনি নিজের সাথে খাবারে শরীক করতেন। খাওয়ার পর আমরা রাতে মসজিদে ঘুমাতাম (ফাতহুল বারী, كيف كان عيش النبى ﷺ واصحابه تخليهم من الدنيا অধ্যায়)।

মসজিদে নববীর দুটি খুঁটির মধ্যে একটি রশি বাঁধা থাকত। আনসার সাহাবীগণ বাগান থেকে থোকা থোকা ফল এনে আসহাবে সুফফার জন্য তাতে ঝুলিয়ে রাখতেন।

১. হযরত আবদুর রাহমান ইবন আবূ বকর (রা)-এর এ হাদীস ইমাম বুখারী তাঁর 'জামিউস-সহীহ' গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃত করেছেন। যেমন, السمر مع الاهل وضيف অধ্যায় ১খ. পৃ. ৮৪ এবং علامت النبوة فى الاسلام অধ্যায়, ১০খ. পৃ. ৫০৬।

আসহাবে সুফফা তা লাঠির দ্বারা নামিয়ে খেতেন। হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা) এর ব্যবস্থাপনা ও দেখাশোনা করতেন। (ওফা আল-ওফা, ১খ. পৃ. ৩২৪)।

হযরত আউফ ইবন মালিক আশজাঈ (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) এলেন, তাঁর পবিত্র হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি দেখলেন, একটি নষ্ট থোকা ঝুলে আছে। তিনি সেই নষ্ট থোকায় লাঠি লাগিয়ে বললেন, এ সদকাকারী ইচ্ছে করলে এর চেয়ে উত্তম থোকা সদকা করতে পারত। (ইমাম নাসাঈ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদ শক্তিশালী)।

অপর একটি হাদীসে তিনি (সা) নির্দেশ দেন যে, প্রত্যেক বাগানের মালিক একটি করে থোকা এনে দরিদ্রদের জন্য ঝুলিয়ে রাখবে (ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৪৩১, القسمة وتعليق القنو فى المسجد অধ্যায়)।

হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন

فى كل عشرة اقناء قنو بوضع فى المسجد للمساكين

"প্রতি দশটি থোকার মধ্যে একটি থোকা মসজিদে এনে মিসকীনদের জন্য রেখে যাওয়া জরুরী" (তাহাবী, ২খ. পৃ. ৩১৩, العرنا অধ্যায়)। হাদীসটির সনদ শক্তিশালী এবং বর্ণনাকারীগণ সবাই বিশ্বস্ত।

মাসআলা : ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তের জন্য পানি এবং খাদ্যদ্রব্য এনে রাখা একটি পসন্দনীয় ও উত্তম কাজ।

আবদুল্লাহ ইবন শাকীক বলেন, আমি এক বছর হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর কাছে ছিলাম। একদিন তিনি বলছিলেন, আহা! যদি তুমি আমাদের সময়টা দেখতে, যখন পর পর কয়েকদিন আমাদের এমন কাটত যে, এতটুকু খাদ্যও জুটত না, যা দ্বারা মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারি। এমন কি কোমরে পাথর বাঁধতাম, যাতে মেরুদণ্ড সোজা রাখা যায় (ইমাম আহমদ বর্ণিত, ফাতহুল বারী, ১১খ. পৃ.২৪২)।

হযরত ফুযালা ইবন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, কোন কোন সময় আসহাবে সুফফা ক্ষুধার যন্ত্রণায় নামাযরত অবস্থায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতেন। বাইরে থেকে যদি কোন বেদুঈন কিংবা গ্রাম্য লোক আসত, তা হলে তাঁকে মস্তিষ্ক বিকৃত উম্মাদ মনে করত।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কাছে আসতেন এবং নিম্নোক্ত বাক্যাবলী দ্বারা তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন :

لو تعلمون مالكم عند الله لاحببتم ان تزدادوا فقرا وحاجة

---

১. হাফিয আসকালানী বলেন, যদিও এ হাদীসটির সনদ সহীহ, কিন্তু বুখারীর শর্তানুযায়ী নয়। এ জন্যে ইমাম বুখারী হাদীসটি উদ্ধৃত করেন নি, কিন্তু তরজমাতুল বাব-এ القسمت وتعليق القنو فى المسجد শীর্ষক অধ্যায়ে হাদীসটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যেমনটি ইমাম হুমাম-এর অভ্যেস।

"যদি তোমরা জানতে যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য কি প্রস্তুত রয়েছে, তা হলে তোমরা অবশ্যই কামনা করতে আমাদের দারিদ্র্য ও উপবাস থাকা আরো বেড়ে যাক।" (ওফা উল-ওফা, ১খ. পৃ.৩২২; উপরন্তু আবূ নুয়ায়ম-এর 'হিলয়া' গ্রন্থে সংক্ষেপে, ১খ. পৃ. ২৩৯)।

সুফফাবাসীগণের গুণাবলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)

হযরত ইয়ায ইবন গানাম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে বাছাইকৃত, পসন্দনীয় এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি তারাই, যাদের ব্যাপারে মালা-ই-আ'লা তথা নৈকট্য-ধন্য ফিরিশতাগণ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা বাহ্যত আল্লাহ তা'আলার বিশাল অনুগ্রহ স্মরণ করে হাসে, আর অন্তরে আল্লাহর আযাব ও ভয়াবহ শাস্তির কথা স্মরণ করে কাঁদে। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্র গৃহ অর্থাৎ মসজিদসমূহে আল্লাহকে স্মরণ করে।

আশা এবং ভীতির সাথে মুখে আল্লাহকে ডাকতে থাকে, আর অন্তরে তাঁর সাক্ষাতের আগ্রহ পোষণ করে। মানুষের উপর তাদের বোঝা খুবই হালকা এবং তাদের নিজেদের আত্মার উপর তারা খুবই ভারী ও দুর্বহ। তারা যমীনে খুবই ধীরে ও আরামের সাথে পা ফেলে চলে, বিলাসিতা এবং অহমিকার সাথে চলে না। পিপীলিকার মত চলে, অর্থাৎ তাদের চলায় বিনয় ও দারিদ্র্য প্রকাশ পায়।

তারা কুরআন তিলাওয়াত করে, পুরাতন ও ছেঁড়া কাপড় পরিধান করে, সব সময় আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকে, আল্লাহর দৃষ্টি সব সময় তাদের হিফাযত করে। তাদের আত্মা পৃথিবীতে থাকে কিন্তু মন থাকে আখিরাতের দিকে। আখিরাত ছাড়া তাদের আর কোন চিন্তা নেই এবং সব সময় তারা আখিরাত ও কবরের প্রস্তুতি গ্রহণে রত থাকে।

ازدروں شوآشنا وازبروں بیگانہ باش

این چنیں زیبا روش کم می بود اندر جهان

পরে রাসূলুল্লাহ (সা) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ "এ ওয়াদা ঐ সমস্ত ব্যক্তির জন্য, যারা আমার সামনে দাঁড়াতে ভয় পায় এবং আমার সতর্ক বাণীকে ভয় করে।"[1]

সুফফাবাসীগণের নাম

আসহাবে সুফফা বা সুফফাবাসীগণের সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি হতো। আরিফ সুহরাওয়ার্দী তাঁর 'আওয়ারিফ' গ্রন্থে লিখেছেন, আসহাবে সুফফার সংখ্যা চারশ' পর্যন্ত পৌঁছে যেত।

---

১. হিলয়াতুল আউলিয়া, ১খ. পৃ. ১৬।

আবূ আবদুর রাহমান সুলামী, ইবনুল আরাবী এবং হাকিম তাঁদের নাম এবং অবস্থাসমূহ একত্র করার ব্যবস্থা করেন। হাফিয আবূ নুয়াইম তাঁর 'হিলয়াতুল আউলিয়া'[1] গ্রন্থে এ সব কিছু একত্র করেছেন এবং সংসার ত্যাগী ও সুফফাবাসী সাহাবীগণের বিস্তারিত অবস্থা লিপিবদ্ধ করেন। (দ্র. ফাতহুল বারী, ১১খ. পৃ. ২৪৫ كيف كان عيش النبى ﷺ واصحابه تخليهم من الدنيا অধ্যায়)।

তাঁদের মধ্যে কতিপয়ের নাম নিম্নরূপ :

১. হযরত আবূ উবায়দা আমির ইবন জাররাহ (রা),
২. হযরত আম্মার ইবন ইয়াসীর আবূ ইয়াকযান (রা),
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা),
৪. হযরত মিকদাদ ইবন আমর (রা),
৫. হযরত খাব্বাব ইবন আরাত (রা),
৬. হযরত বিলাল ইবন রাবাহ (রা),
৭. হযরত সুহায়ব ইবন সিনান (রা),
৮. হযরত যায়দ ইবন খাত্তাব (রা), [হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর ভাই],
৯. হযরত আবূ মারসাদ কান্নায ইবন হুসায়ন আদাবী (রা),
১০. হযরত আবূ কাবশাহ (রা), [রাসূল (সা)-এর গোলাম],
১১. হযরত সাফওয়ান ইবন বায়যা (রা),
১২. হযরত আবূ আবস ইবন জুবায়র (রা),
১৩. হযরত সালিম (রা), [হযরত আবূ হুযায়ফা (রা)-এর মুক্ত দাস],
১৪. হযরত মিসতাহ ইবন উসাসা (রা),
১৫. হযরত উকাশা ইবন মিহসান (রা),
১৬. হযরত মাসঊদ ইবন রবী' (রা),
১৭. হযরত উমায়র ইবন আওফ (রা),
১৮. হযরত উয়ায়ম ইবন সায়েদাহ (রা),
১৯. হযরত আবূ লুবাবা (রা),
২০. হযরত সালিম ইবন উমায়র (রা),
২১. হযরত আবুল বাশার কা'ব ইবন আমর (রা),
২২. হযরত খুবায়ব ইবন সায়্যাফ (রা),
২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনায়স (রা),
২৪. হযরত জুনদুব ইবন জানাদাহ, আবূ যর গিফারী (রা),
২৫. হযরত উতবা ইবন মাসঊদ হুযালী (রা),

---

১. মিসরে মুদ্রিত।

২৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা), [বিয়ের পূর্বে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) সুফফাবাসীদের সাথে থাকতেন এবং তাঁদের সাথেই মসজিদে রাত কাটাতেন]।
২৭. হযরত সালমান ফারসী (রা),
২৮. হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা),
২৯. হযরত আবুদ-দারদা উয়ায়মির ইবন আমির (রা),
৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ জুহানী (রা),
৩১. হযরত হাজ্জাজ ইবন আমর আসলামী (রা),
৩২. হযরত আবূ হুরায়রা দাওসী (রা),
৩৩. হযরত সাওবান (রা), [রাসূল (সা)-এর মুক্ত দাস],
৩৪. হযরত মু'আয ইবন হারিস (রা),
৩৫. হযরত সায়িব ইবন খাল্লাদ (রা),
৩৬. হযরত সাবিত ইবন ওয়াদিয়া (রা)। (মুস্তাদরাক, ৩খ. পৃ. ১৮)।

রমযানের রোযা

একই বছরের শা'বান মাসের শেষ দশকে রমযানের রোযা ফরয হয় এবং এ আয়াত নাযিল হয় :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"রমযান মাস। এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে।" (সূরা বাকারা : ১৮৫)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমন করে আশূরার রোযা অর্থাৎ দশই মুহররমের রোযা পালনের নির্দেশ দেন। রমযানের রোযা যখন ফরয হলো, তখন ইরশাদ করলেন, এখন আশূরার রোযার ব্যাপারটি ইচ্ছাধীন, কেউ চাইলে পালন করুক, আর না চাইলে ছেড়ে দিক। (বুখারী শরীফ)।

হযরত সালমা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) আশূরার দিন এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন, মানুষের মাঝে ঘোষণা দিয়ে দাও যে, যে ব্যক্তি এখনো খায় নি, সে যেন রোযা রাখে। আর যে ব্যক্তি খেয়ে ফেলেছে, সেও যেন দিনের অবশিষ্টাংশ রোযাদারের ন্যায় না খেয়ে কাটায়।

(বুখারী শরীফ, اذا نوى بالنهار صوما অধ্যায়; বিস্তারিত জানার জন্য 'ফাতহুল বারী' এবং 'তাহাবী' দেখুন)।

ফিতরা এবং ঈদের নামায

রমযান মাস শেষ হতে দু'দিন মাত্র বাকি ছিল। এ সময় ঈদের নামায এবং ফিতরা আদায়ের নির্দেশ অবতীর্ণ হলো এবং এ আয়াত নাযিল হলো :

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি সাফল্য লাভ করবে যে আত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জন করে এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও রীতিমতো সালাত কায়েম করে।"

(সূরা আলা : ১৪-১৫)

হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয (র) এবং আবুল আলিয়া এ আয়াতের তাফসীর এভাবে করেছেন যে, 'ঐ ব্যক্তিই সাফল্য অর্জন করবে, যে ফিতরা আদায় করেছে এবং ঈদের নামায আদায় করেছে।'[১]

ঈদুল আযহা এবং কুরবানী

আর এ বছরেই ঈদুল আযহা এবং কুরবানীর নির্দেশ আসে এবং এ আয়াত নাযিল হয় ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"অতএব তোমার প্রভুর জন্য (ঈদের) নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর।"

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, এ আয়াত দ্বারা ঈদুল আযহার নামায এবং কুরবানী বুঝানো হয়েছে। (আল্লামা জাসসাস প্রণীত আহকামুল কুরআন, ৩খ. পৃ. ৪৭৫)।

দরূদ শরীফ

হযরত আবূ যর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠের নির্দেশও দ্বিতীয় হিজরীতে নাযিল হয়। আর কেউ বলেন, শবে মি'রাজে এ নির্দেশ হয়েছে (ফাতহুল বারী, তাফসীরে সূরা আহযাব, ৮খ. পৃ. ৪১১)।

সম্পদের যাকাত

সম্পদের বার্ষিক যাকাত আদায় কখন ফরয হয়েছে এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। জমহূর আলিমগণের বক্তব্য হলো, এটা হিজরতের পর ফরয হয়েছে। কেউ বলেন প্রথম হিজরীতে, আর কেউ বলেন দ্বিতীয় হিজরীতে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর এটা ফরয হয়েছে।

মুসনাদে আহমদ, সহীহ ইবন খুযায়মা, নাসাঈ এবং ইবন মাজাহ-এ হযরত কায়স ইবন সা'দ (রা) সূত্রে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে ফিতরা দানের নির্দেশ দেন। ইমাম ইবন খুযায়মা বলেন, সম্পদের যাকাত হিজরতের পূর্বে ফরয হয়েছে। যেমনটি আবিসিনিয়ায়

---

১. আল্লামা জাসসাস প্রণীত আহকামুল কুরআন, ৩খ. পৃ. ৪৭৩।

হিজরতের ঘটনায় হযরত উম্মে সালমা (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে, নাজ্জাশী যখন হযরত জা'ফর (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নবী কি নির্দেশ দেন ? তখন হযরত জা'ফর (রা) বলেন :

اِنَّهٗ يَاْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَالصِّيَامِ "তিনি আমাদেরকে নামায, যাকাত এবং রোযার নির্দেশ দেন।"

হাফিয ইরাকী (র) বলেন :

وفيه فرض الصوم والزكاة للفطر والعيدين بالصلاة

بخطبتين بعد والاضحية كذا زكوة مالهم والقبله

للمسجد الحرام والبناء بعايش كذلك الزهراء

"আর ঐ দ্বিতীয় বর্ষে রমযানের রোযা, ফিতরা অর্থাৎ সদকা এবং ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায শুরু হয়। আর ঈদের নামাযের পর দু' খুতবা, কুরবানী এবং সম্পদের যাকাতও এ বছরেই শুরু হয় এবং এ বছরেই কিবলা পরিবর্তনের হুকুম নাযিল হয়। এ বছরেই তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে যথারীতি দাম্পত্য জীবন যাপন করেন এবং হযরত আলী (রা)-এর সাথে হযরত ফাতিমা (রা) কে বিয়ে দেন।" মহান পবিত্র আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

[ছবি : বাহরায়নের গভর্নর মুনযিরের প্রতি নবী (সা)-এর পত্র]

ইফা (উন্নয়ন)/ ২০০৯-২০১০/অঃ সঃ/ ৪৫১৫–৩,২৫০

গ্রন্থকার পরিচিতি

হাফিয, আলিম, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও লেখক মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলবী (র) ১৮৯৯ খ্রি. ভূপালে এক ঐতিহ্যবাহী আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারটির আদি নিবাস কান্ধালাহ হলেও তাঁর পিতা বিশিষ্ট আলিম ও হাফিয মুহাম্মদ ইসমাঈল কান্ধলবী চাকুরীর সুবাদে তৎকালে ভূপালে অবস্থান করছিলেন।

মাওলানা ইদ্রিসের জন্মের পর তাঁর পিতা চাকুরী ভূপালের ত্যাগ করেন এবং কান্ধালায় ফিরে এসে এক মসজিদে অবৈতনিকভাবে হাদীসের দরস দানে নিয়োজিত হন। মাত্র নয় বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফয সমাপ্তের পর তাঁর পিতা তাঁকে থানা ভবনে এনে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)-এর তত্ত্বাবধানে মাদরাসা-ই-আশরাফিয়াতে ভর্তি করেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর মাওলানা থানবী তাঁকে সাহারানপুরে মাদরাসা আরাবিয়া মাযাহিরুল উলূমে ভর্তি করেন।

১৯১৯ খ্রি. মাদরাসা আমীনিয়ায় সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। মাত্র এক বছর পর তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে মুদাররিস হিসেবে তাফসীর ও হাদীসের অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯২৪ খ্রি. তিনি শায়খুত-তাফসীর পদলাভ করেন এবং ১৯২৯ খ্রি. দেওবন্দের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) চলে যান। সেখানে তিনি 'আত-তা'লিকুস-সাবীহ শারহ মিশকাতিল মাসাবীহ' রচনা করেন। চার খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থটি তাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থটি ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়াও মিসর, সিরিয়া ইরাক প্রভৃতি দেশের আলিমগণের নিকট মিশকাত শরীফের একটি নির্ভরযোগ্য ভাষ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৩৮ খ্রি. দারুল উলূম দেওবন্দে তাফসীর বিভাগ খোলা হলে তাঁকে শায়খুত তাফসীর হিসেবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি ইলমের খিদমতের উদ্দেশে হায়দরাবাদে মাসিক দুইশত পঞ্চাশ টাকা আয় পরিত্যাগ করে মাত্র সত্তর টাকা বেতনে এ পদে যোগদান করেন। প্রায় দশ বছর অধ্যাপনার পর তিনি উক্ত পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং ভাওয়ালপুর জামেয়া আব্বাসিয়ার অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু অল্প কিছুদিন পর ১৯৫১ খ্রি. তিনি লাহোর জামেয়া আশরাফিয়ার শায়খুল হাদীস পদে যোগ দেন। সেখানে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করার পর ২৮ জুলাই, ১৯৭৪ খ্রি. তিনি লাহোরে ইনতিকাল করেন এবং তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়।

মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস কান্ধলবী কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন ইত্যাদিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসেবে তিনি পাকিস্তানের জন্য ইসলামী শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মাওলানা কান্ধলবী একাধারে তাফসীর, হাদীস, সীরাত, গীতি কাব্য, আকাইদ ও ইলমে কালাম প্রভৃতি নানা বিষয়ে পঞ্চাশেরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। চার খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর রচিত 'সীরাতুল মুস্তফা' শীর্ষক গ্রন্থটি মহানবী (সা)-এর সীরাত বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে একটি তথ্যবহুল ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

[সূত্র ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩খ. পৃ. ৩৯৭-৪০০, ২সং, ২০০০ খ্রি., ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা]

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন